বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন
(১৮০০ ১৯০০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি ডিগ্রীর জন্য
প্রস্তুত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

h.D.

মোঃ মুজিবুর রহমান চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন
(১৮০০ - ১৯০০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি ডিগ্রীর জন্য
প্রস্তুত গবেষণা অভিসন্ধর্ভ

মোঃ মজিবুর রহমান চৌধুরী

Dhaka University Library
382358

382358

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন
(১৮০০- ১৯০০)

সূচীপত্র

ভূমিকা ঃ-

পৃঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ-

বাংলাদেশের পরিচিতি ১ - ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ-

বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন ও ইসলামের অভ্যুদয় ১৯- ৬০

তৃতীয় অধ্যায় ঃ-

(ক) সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা (হিন্দু ও মুসলিম) ৬১ - ৯৫

(খ) সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা (হিন্দু ও মুসলিম) ৯৬ - ১২৩

চতুর্থ অধ্যায় ঃ-

(ক) মুগল শাসনামলে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা (হিন্দু ও মুসলিম) ১২৪ - ১৪১

(খ) মুগল শাসনামলে বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা (হিন্দু ও মুসলিম) ১৪২ - ১৬০

পঞ্চম অধ্যায় ঃ-

(ক) নবাবী ও বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা (হিন্দু ও মুসলিম) ১৬১ - ১৮৪

(খ) নবাবী ও বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা (হিন্দু ও মুসলিম) ১৮৪ - ২০০

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ- পৃঃ

(ক) সুলতানী শাসনামলে (১২০৪-১৫৭৬) বাংলাদেশের মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ২০১ - ২২৯

(খ) মুগল শাসনামলে (১৫৭৬-১৭১৭) বাংলাদেশের মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ২৩০ - ২৫০

(গ) নবাবী শাসনামলে (১৭১৭-১৭৬৫) বাংলাদেশের মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ২৫১ - ২৬৯

সপ্তম অধ্যায় ঃ-

বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন (১৮০০ - ১৯০০) ২৭০ - ২৭৩

(ক) বাংলাদেশে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা (১৮০০-১৯০০) ও বৃটিশ সরকারের নীতি (মক্তব বা প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ও পাঠ্যসূচী) ২৭৩ - ২৯৭

(খ) বাংলাদেশে মুসলিম উচ্চ শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষা ও বৃটিশ সরকারের নীতি ২৯৮ - ৩৮৭

382358

বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা (১৮০০-১৯০০) ৩৮৭ - ৩৮৯

(ক) হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা (প্রাথমিক) ৩৮৯ - ৪০০

(খ) হিন্দু উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা (টোল) ৪০০ - ৪০৮

(গ) বৃটিশ সরকারের নীতি ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ৪০৮ - ৪১৭

উপসংহার ঃ- ৪১৭ - ৪২৪

গ্রন্থপুঞ্জী ঃ - ৪২৫ - ৪৪৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন (১৮০০ - ১৯০০)

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন (১৮০০-১৯০০) এতিসম্পর্কের বিষয়ে গবেষণা শুধু শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি । গবেষণাকে সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনে এদেশের পরিচিতি, ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে । এবং এসব বিষয়গুলিকে ৭টি ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে ।

বহু বছরের পরাধীনতার পর বাংলাদেশ এক নতুন স্বাধীন দেশ । "বাংলাদেশ" নামটি প্রাচীনকালে ঠিক এই নামেই পরিচিত ছিল না । বিভিন্ন সময় এর নামের পরিবর্তন হয়েছে । কখনো 'বঙ্গ' 'বঙ্গালা' বাঙলাল, পূর্ববঙ্গ ইত্যাদি এরূপ বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের উৎপত্তি হয়েছে । অতীতের বাংলাদেশ বর্তমানের সীমা ও আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা । তারাতের পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, মালদহ, ত্রিপুরা এবং বর্তমান বাংলাদেশসহ বিশাল ভূভাগের নাম ছিল বাংলাদেশ । এ দেশের উপর দিয়ে অসংখ্য নদ-নদী, খাল বিল প্রবাহিত হয়েছে এবং অসংখ্য জলাশয়পূর্ণ । এ দেশের বৈচিত্রময় আবহাওয়া, জলবায়ু ভূপ্রকৃতি এ দেশের মানুষের উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে । বাংলাদেশের মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন আলোচনা করতে হলে এ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন । তাই প্রথম অধ্যায়ে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

প্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে । সে সময় এ দেশে মুসলিম আবাস তেমন ছিল না । ৭ম শতকের দিকে আরবীয় মুসলিম বণিকদের ব্যবসায় উদ্দেশ্যে আগমন এবং ব্যবসার সাথে সাথে ধর্ম প্রচারের ফলে অনেকে মুসলমান হতে থাকে এবং ক্রমশ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর এদেশে ইরানী, ইরাকী, আফগানী, তুর্কী মিশরী ও আরবীয় বহিরাগত মুসলমানদের আগমন ও স্থানীয় মুসলমানদের সমন্বয়ে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে । অপরদিকে পীর, দরবেশ, আওলীয়াগণের অনেক শীষ্যসহ আগমন ও তাদের ধর্ম প্রচারে অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে । কেননা সে

Dhaka University Institutional Repository

সময় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধ ও অন্যান্য জাতীর উপর অত্যাচার নির্যাতন ও হিন্দু ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করণের ফলে এবং তাদের বর্ণ, গোত্র ও কৌলিন্য প্রথার প্রবল চাপে ও নির্যাতনে অনেক উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাও মুক্তির আশায় সাম্য ও আদর্শের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হতে থাকে। এভাবে এদেশে ইসলামের অভ্যুদয় ও সমপ্রসারন হয় এবং মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ট জাতীতে পরিনত হওয়ার ফলে আলাদা মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। আলোচ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাই এদেশে ইসলামের অভ্যুদয় ও বিকাশ সমপর্কে বিভিন্ন যুক্তি তর্ক ও তথ্যের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ শতকের পর হতে বৃটিশ শাসন পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৫০ বছর মুসলমানরা এদেশ শাসন করেছে, যা ইতিহাসে মধ্যযুগ নামে পরিচিত। এ সময় বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু এ দু'টি সমপ্রদায়েরই প্রাধান্য ছিল। দুটি সমপ্রদায়ের সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, নিয়ম কানুন সমপূর্ণ ভিন্ন ছিল। তাই সমগ্র মধ্যযুগকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ১ম পর্যায়ে সুলতানী আমল, ২য় পর্যায়ে মুগল আমল এবং ৩য় পর্যায়ে নবাবী ও বৃটিশ আমলে বিভক্ত করে উভয় সমপ্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার বিবরণ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে মুসলমানরা যেমন স্বীয় ধর্মীয় বিশ্বাস, একতা, সততা ও সাম্যের বাণী দিয়ে হিন্দুদেরকে তাদের কুসংস্কার, বর্ণ, গোত্র ও কৌলিন্য প্রথার অসারতা প্রমাণ করে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছে তেমনি হিন্দুদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি ও সামাজিক মেলামেশার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক নামধারী মুসলমানদের উপর কুসংস্কারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই উভয় সমপ্রদায়ের তৎকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থাকে যথাযথ তথ্য সম্বলিত গবেষণার জন্য উক্ত তিনটি অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত ও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এ দেশের শিক্ষার ঐতিহ্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন গবেষণা হয়নি। বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণা আরো অবহেলিত থেকে গেছে। তাই বঙ্গ বিজয়ের পর এদেশে দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে তথা সুলতানী, মুগল ও নবাবী শাসন যুগে উভয় সমপ্রদায়ের ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার অবস্থা জানার জন্য উল্লেখিত তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জ্ঞানের যেমন পরিবর্তন, পরিবর্ধন হয়েছে। তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও সময়ের সাথে সাথে এর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার এই পরিবর্তন ও উন্নতিকে ধারাবাহিকভাবে গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মুসলিম শাসকগণ মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছেন এবং এগুলির রক্ষনাবেক্ষনের জন্য যে সাহায্য সহযোগীতা ও পৃষ্টপোষকতা করেছেন তাও তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া এ সময় পীর, দরবেশ, আওলিয়া এবং শিক্ষানুরাগী অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিগণ স্বীয় উদ্যোগে মক্তব, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা বিস্তারে যে অসীম ত্যাগ ও অবদান রেখেছেন সে বিষয়েও আলোচনার চেষ্টা হয়েছে। এদিকে মুসলিম শাসন পূর্ব যুগে সাধারন হিন্দুদের শিক্ষার তেমন সুযোগ ছিলনা। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর এই বাধা দূর হলে হিন্দুরা প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়। এতে সরকারী সাহায্যে, হিন্দু জমিদার অভিজাত ও ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহযোগিতায় পাঠশালা, টোল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। এ ছাড়া উভয় সম্প্রদায়েরই শিক্ষার বিষয় শিক্ষা নীতি, পাঠ্যসূচী ও শ্রেনী ভিত্তিক পাঠ্য পুস্তক ও পাঠের ধরন ও আলোচনায় স্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

এভাবে শেষ বা ৭ম অধ্যায়ে গবেষণার আলোচ্য সময় তথা বৃটিশ শাসনামলে (১৮০০-১৯০০) উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ক্ষমতা দখলের পর হতেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং এরপর বৃটিশ সরকার দূরভিসন্ধি ও চক্রান্ত-মূলকভাবে অত্যন্ত কৌশলে এদেশের ধর্মীয় শিক্ষা ধ্বংশ করার পায়তারা শুরু করে। সরকার ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের সাধারন জ্ঞান বিজ্ঞান ভিত্তিক ইংরেজী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে ঐতিহ্যগত ধর্মীয় শিক্ষাকে বিলুপ্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য শিক্ষানীতি ও আইন প্রণয়ন করে। শুধু তাই নয় সারাদেশ ব্যাপী ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে তাতে আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে এদেশের মানুষদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে অনুৎসাহিত করে। এ সময় তাই শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয় এবং প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বন্দ্ব সংঘাতে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত

Dhaka University Institutional Repository

হয় । তাই উভয় সম্প্রদায়েরই নানা কারনেই ধর্মীয় শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে । বিশেষ করে পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমানরা রাজ্য হারিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংকটাবস্থায় পতিত হয় । বস্তুতঃ বৃটিশদের ক্ষমতা দখলের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান সকল কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ে এবং তাদের শাসন ও শোষনে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে । ঐতিহাসিক মহা দুর্ভিক্ষ ৭৬ এর মন্বন্তরের প্রভাবে এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে মুসলমান জমিদার ও ধনীরা আরো নিঃস্ব হয়ে পড়ে । অপরদিকে ১৭৬৫ সালে দিওয়ানী বা রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে চলে গেলে বাংলার মুসলমানদের অর্থ উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় । ফলে অর্থের অভাবে অনেক মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এতে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের চরম অবনতি দেখা দেয় । তবুও ওয়াকফ ও লাখেরাজ সম্পত্তির বদৌলতে কিছু কিছু মক্তব, মাদ্রাসা কিছুকাল অব্যাহত ছিল । কিন্তু ১৮২৮ সালের নিস্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন, ১৮৩৫ সালের ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য বন্ধ সংক্রান্ত আইন, ১৮৩৭ সালের ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী রাজভাষা পরিবর্তন আইন ইত্যাদির আঘাতে মুসলমানরা নিঃস্ব হয়ে পড়ে । তাই সহায় সম্বলহীন মুসলমানদের পক্ষে মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে । ফলে এসব প্রতিষ্ঠান অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে । কিন্তু এত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার ধর্মীয় শিক্ষাকে বিলুপ্ত করতে পারেনি । কেননা আর্থিক অসচ্ছলতাও দুরাবস্থা থাকা সত্ত্বে ও ধর্মপ্রান অভিজাত মুসলমান ও ধর্মীয় নেতা আলেমগণ সাধারন মানুষের সাহায্য সহযোগীতায় ধর্মীয় শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রান চেষ্টা করে এবং কিছু কিছু মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা রক্ষাও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । কাজেই বৃটিশ সরকারের ধর্ম শিক্ষা ধ্বংশের চক্রান্ত এবং মুসলমানদের ধর্ম শিক্ষা রক্ষার সংগ্রাম তথ্য সমৃদ্ধভাবে আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে । অপরদিকে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষেত্রেও অনুরুপ অবস্থা বিরাজ করছিল কিন্তু অভিজাত ও শিক্ষিত হিন্দুদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ ও অবহেলার কারণে পাঠশালার শিক্ষা ধ্বংস প্রায় হয়ে যায় । তাছাড়া মক্তব, মাদ্রাসায়, পাঠশালায় ও টোলের শিক্ষা নীতি, প্রাথমিক শিক্ষার ধরন, শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠ্যসূচী শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী বই পুস্তক, পাঠ্য তালিকা ইত্যাদিও আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে বৃটিশ সরকার এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করলেও মুসলমানরা রাজনৈতিক কারণে কিংবা ধর্মহীনতার ভয়ে ইংরেজী শিক্ষাকে মনে প্রানে গ্রহণ করতে পারেনি । অপরদিকে হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে চাকুরী ও অন্যান্য কর্মকান্ডে মুসলমানদের তুলনায় অনেক অগ্রগামী হয়ে পড়ে এবং বৃটিশদের নেক নজরে পড়ে । কিন্তু বৃটিশ বিরোধীতা ও ইংরেজী শিক্ষা না করার কারনে মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে । শুধু তাই নয় বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বে ও বৃটিশ সাহায্য প্রাপ্ত মুসলমানদের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা । তাছাড়া যে সব স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা দিত ধর্মহীনতার ভয়ে মুসলমান ছাত্ররা সেখানে যেতনা ,এবং তাদের আকৃষ্ট করার মত কোন ব্যবস্থাও গৃহীত হত না । বৃটিশদের এরুপ বিমাতা সুলভ নীতি , অবহেলা ইত্যাদির কারণে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । আলোচনায় এসব কিছু তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে ।

অপরদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতা লক্ষ্য করে নেতৃস্থানীয় ও শিক্ষানুরাগী মুসলমানরা সরকারের নিকট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবেদন করেন । এ প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার ১৭৮১ সালে কলিকাতায় সর্বপ্রথম আলিয়া মাদ্রাসা নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন । এই মাদ্রাসা তখন গোটা মুসলিম জাতির বিপর্যস্ত শিক্ষার আশার আলো হয়ে দাড়ায় । মাদ্রাসায় এ্যারাবিক এ্যাংলো এ্যারাবিক , এ্যাংলো পার্শিয়ান ইত্যাদি বিভাগ খোলা হয় । প্রতিটি বিভাগে শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন , পাঠ্য পুস্তক প্রনয়ন , ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ক বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকের সংযোজন , শিক্ষানীতি ইত্যাদির প্রচলন করা হয় । প্রথমত এখানে বাগদাদের দরসে নিজামীয়া এবং পরবর্তীতে ধর্মীয় ও বিজ্ঞান ভিত্তিক লখনৌর দরসে নিজামীয়ার পাঠ্যসূচীর সংযোজন করা হয় এবং শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী পাঠ্য পুস্তক সন্নিবেশিত করা হয় । ইত্যাদি আলোচনায় তথ্য সম্বলিতভাবে তুলে ধরা হয় ।

মাদ্রাসায় ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য ইংরেজী বিভাগ খোলা হয় । এতে প্রাচ্য বনাম প্রাশ্চাত্য শিক্ষাকে কেন্দ্র করে আরবী বিভাগের অবলুপ্তির চক্রান্ত করা হয় । মাদ্রাসায় ইংরেজী বিভাগ খোলা হলেও ধর্মহীনতা ও ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে মুসলিম ছাত্রদের নিকট হতে আশা ব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়নি । এভাবে ইংরেজীকে প্রাধান্য দিয়ে আরবীকে গুরুত্বহীন করার

Dhaka University Institutional Repository

কারণে এবং প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বন্দ্বে মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা দারুনভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার এরূপ অচলবস্থা নিরসনের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সংস্কার ও তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং তাদের সুপারিশ মালা অনুযায়ী পাঠ্যসূচী প্রনয়ন ও অন্তর্ভূক্তি করণের মাধ্যমে সংস্কার করা হয়। এদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে ১৮১৩, ১৮৩৫ ও ১৮৩৭ সালের শিক্ষানীতি, ১৮৩৯ সালের লর্ড অকল্যান্ড কর্তৃক শিক্ষা সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স, ১৮৫৭ সালের ডেসপ্যাচ ইত্যাদির মাধ্যমে মাদ্রাসার সংস্কার কারার চেষ্টা নেয়া হয়। তাছাড়া কিছু সংখ্যক লোকের মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধাচারন ,১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সাথে মাদ্রাসার ছাত্রদের সংশ্লিষ্টতা মনে করে মাদ্রাসা বিলুপ্তির প্রস্তাব এবং এ প্রেক্ষিতে মুসলমানদের প্রতিবাদ ও আন্দোলন এবং বড় লাটের হস্তক্ষেপে মাদ্রাসা রক্ষা ইত্যাদি অত্যন্ত জোড়ালো ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। অপরদিকে হিন্দুদের উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা বনাম পাশ্চাত্য ইংরেজী শিক্ষার দ্বন্দ্ব ও তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া এ সময়ের হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা সূচী ,পাঠ্যসূচী ও শ্রেনী ভিত্তিক পাঠ্যক্রম, বই পুস্তকের বর্ণনা সর্বোপরি হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের নীতি, সংস্কার কর্মসূচী, আইন প্রণয়ন এবং ধর্মীয় সচেতন মানুষের ধর্মীয় শিক্ষা রক্ষার আন্দোলন ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃংখলা ও অনিয়মতান্ত্রিকতাদূর করে শৃংখলা আনয়ন এবং প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কার ও পরিবর্তন করে আধুনিক ও পার্থিব বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বস্তুতঃ বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাস বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যের ইতিহাস। কিন্তু শিক্ষার ঐতিহ্য নিয়ে তেমন কোন গবেষনা হয়নি। বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে এর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে যথাযথ তথ্য সম্বলিত তেমন সন্তোষজনক ও উল্লেখযোগ্য কোন গবেষনা হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে যে সব গ্রন্থ রচনা ও গবেষনা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগন্য। ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ে গবেষনা অবহেলিতই থেকে গেছে। অথচ এ বিষয়টি .. অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষার ইতিহাসকে জানার ও এ বিষয়ে গবেষনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই ১৮০০-১৯০০সালের বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থা ও ইতিহাসকে বিবর্তনের ধারায় তুলে ধরাই হল গবেষনার মূল উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন (১৮০০-১৯০০)

প্রথম অধ্যায় ঃ- বাংলাদেশের পরিচিতি

প্রাচীনকাল হতেই বাংলা জনপদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, তবে 'বাংলাদেশ' নামের বর্তমান স্বাধীন সার্বভৌম দেশটি অতীতকালে এরূপ ছিল না। বহু কালের বিবর্তনের ধারায় বিবর্তিত হয়ে বর্তমান বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাচীনকাল হতে বিভিন্ন সময় যে সব রাজা বাদশাহগণ এ দেশ শাসন করেছে। উক্ত শাসকদের সংখ্যা সঠিকভাবে এখনও জানা যায়নি। এ দেশে তাই হাজারো রাজা বাদশার উত্থান পতনের ঘটনা ও স্মৃতি বিজড়িত কাহিনী রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এক বিশাল অতীত ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় বর্তমান বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিপূর্ণতা পেয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান বাংলাদেশের ব্যবধান হাজার বছরের। এই দীর্ঘ সময়ের ধারা বাহিকতার ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন বিষয় এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাচীন হিন্দু মহা কাব্য হতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে উপজাতীয়রা 'ভাঙ্গা' নামক রাজ্যে বসবাস করত, যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ নামে পরিচিত হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে এদেশ 'মাওরী' সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ঐতিহাসিকগণ এ সময়ের পূর্ববর্তী ইতিহাস খুব সামান্যই সংগ্রহ করতে পেরেছেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৫ সালে এ সরকারের পতনের পর স্থানীয় শাসক গোষ্ঠী যেমন কুষান ও মৌর্য্য বংশীয় রাজারা বাংলা শাসন করেছেন। পরবর্তীতে ৩২০ সাল হতে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে গুপ্ত বংশীয় রাজারা শাসন করেন। গুপ্ত রাজাদের পর পাল বংশীয় বৌদ্ধ শাসকগণ ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পূর্ব বাংলা শাসন করে। সে সময় বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পূর্ব বাংলায় সবর্ত্র ছড়িয়ে পড়ে। সুদীর্ঘ ৩০০ শত বছর বৌদ্ধ শাসনের অবসানের পর সেন বংশীয় হিন্দু রাজারা ক্ষমতায় আসে এবং মুসলিম আগমন পূর্ব পর্যন্ত তারা শাসন পরিচালনা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কী মুসলমানরা উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

ভারত জয় করে পূর্ব বাংলা পর্যন্ত তাদের শাসন বিস্তৃত করে । এ সময় তারা এ দেশে সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা করে । ১৫৭৬ সালে মুগল সম্রাট আকবরের রাজ্য জয়ের পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীন সুলতানী শাসকগণ বাংলায় স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকে ।[১]

মুগল শাসনামলে বাংলা বিশাল ও বিস্তৃত মুগল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত হয় । এ সময় সমগ্রদেশ ব্যাপী মুগল স্থাপত্য ও সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার ঘটে । ১৬০০ শতকের দিকে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ লোক ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিল । মুগল সম্রাটগণ বিভিন্ন সুবা বা প্রদেশে শাসন করার জন্য একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন । এদেরকে সুবাদার বা নবাব বলা হত । ১৭০০ সালের দিকে মুগল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয় । কারণ বাংলার এবং পশ্চিম অঞ্চলীয় হিন্দু সমাজ শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে । এ সময় বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের নবাবগণ মুগলদের দুর্বলতার সুযোগে নিজেরা শক্তিশালী হয়ে উঠে ও স্বাধীনভাবে শাসন কার্য চালাতে থাকে । এ দিকে ১৫০০ সালের দিকে বৃটিশ, ডাচ, ফরাসী, পর্তুগীজরা পূর্ব ভারত ও ইউরোপের মধ্যে লাভজনক ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হয় । ১৬০০ সালের মধ্যে বাংলায় ইউরোপীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হয় । দূর প্রাচ্য এবং ভারতের মধ্যে ব্যবসার উন্নতির কল্পে ১৬শত সালে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বৃটিশ সরকারের নিকট হতে সনদ লাভ করে । ১৭০০ সালের মাঝামাঝি সময় কোম্পানী বাংলায় পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে । ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানীর সৈন্যরা বাংলার নবাবের সেনাপতি ও কিছু সংখ্যক লোকের চক্রান্তে বাংলার নবাব সিরাজ উদ-দৌলাকে পরাজিত করে এবং এক পুতুল সরকার ক্ষমতায় বসিয়ে নিজেরাই বাংলা শাসন করতে থাকে । পরবর্তীতে বৃটিশ সরকার এ দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং বাংলা বৃটিশ ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয় । এ সময় বাংলা বেঙ্গল নামে অভিহিত হয় ।[২]

----

১. দি ওয়ার্ল্ড বুক ইন সাইক্লোপেডিয়া, (চিকাগো, লন্ডন, সিডনী ১৯৮৮) ২য় খন্ড, পৃ-৫৮, জি ।
২. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮, জি ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫ সালে বৃটিশ ভারতের রাজ প্রতিনিধি বাংলাকে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। পূর্ব বাংলা এ সময় নতুন প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শাসন কাজের সুবিধার জন্য পূর্ব বাংলাকে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম, ও রাজশাহী বিভাগকে আসামের সাথে যুক্ত করে একটি মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর হতে কার্যকর হয়। ঢাকা হয় নব গঠিত প্রদেশের রাজধানী। বাংলাদেশের শিক্ষিত হিন্দু সমাজ এ ব্যাপারে প্রচন্ড প্রতিবাদ করে এবং ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।[১] অবশেষে তীব্র প্রতিবাদের মুখে বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালে বাংলা বিভক্তি রহিত করেন এবং বাংলা আবার একটি প্রদেশে পরিণত হয়।[২] ১৯০০ সাল হতে ভারতে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। ১৯০৬ সালে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের মুখপত্র হিসেবে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯৪০ সালে লীগের নেতাগণ বৃটিশ সরকারের নিকট একটি পৃথক মুসলিম আবাস ভূমির দাবী করতে থাকে। ১৯৪০ সালের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বৃটিশ সরকারকে ভারত বিভক্ত করতে বাধ্য করে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা দেয়। এভাবে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পশ্চিম বাংলা ভারতের একটি রাজ্যে এবং পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।[৩]

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় বাংলা প্রদেশের পূর্বাঞ্চল এবং আসাম প্রদেশের সিলেট জেলা নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী এ দেশের জনগণের উপর অত্যাচার ও শোষনের কারণে এ দেশের জনগণ স্বভাবতই বিদ্রোহী হয়ে উঠে। অবশেষে দীর্ঘ ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় নয় মাস স্বাধীনতা

----

১. 'বাংলাদেশ', বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৪৪।

২. ডঃ এম,এইচ, খান, 'এ্যান্ড আর্লি হিস্ট্রি এন্ড টেকনিক্যাল অব পেপার ম্যানুফ্যাকচার ইন বেঙ্গল', দি ইস্টার্ন লাইব্রেরীয়ান, (ঢাকা ১৯৮৬) দ্বাদশ খন্ড, পৃঃ ২১।

৩. দি ওয়ার্ল্ড বুক ইন সাইক্লোপেডিয়া, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৮ -জি।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এদেশ পাকিস্থান হতে আলাদা হয়ে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন ও স্বাবভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।[১] অতএব বাংলাদেশ এখন নতুন নামে একটি পুরাতন রাষ্ট্র । হাজার বছরের দীর্ঘ শাসন শোষনের অবসানের পর সর্বোপরি পরাধীনতার শৃংখল হতে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ এখন দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার একটি নবীন, স্বাধীন ও স্বাবভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । হাজার বছর পূর্বের বাংলাদেশ না হলেও আজ নতুন প্রজন্মের নতুন বাংলাদেশ পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে । সুতরাং এভাবে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে বিবর্তনের ধারায় বর্তমান বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ হয়েছে ।

বাংলাদেশের নাম প্রসংগ বা 'বাংলাদেশ' নামের উৎপত্তির ইতিহাস ঃ-

বর্তমান স্বাধীন স্বাবভৌম এই দেশ 'বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হলেও অতীতে এই নামে পরিচিত ছিল না । বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে এর নাম করণ করা হয়েছে । বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পন্ডিতগণ তাই 'বাংলাদেশ' নামের উৎপত্তির প্রসংগে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন । নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ।

বাংলাদেশের নাম হিসেবে 'বঙ্গ' নামের প্রাচীনতম ব্যবহার 'ঐতরেয় ব্রাহ্মন' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় । এ ছাড়া বেদ, ও জৈন ধর্ম গ্রন্থে ও 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ দেখা যায় । পানিনির রচনাতেও 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' নামের স্বীকৃতি পাওয়া যায় । পানিনির পরবর্তীতে পতঙ্গলির (খৃীঃ পূঃ ১৫০ সাল) স্বীয় রচনায় 'বঙ্গাদি' দেশের কথা উল্লেখ করেছেন ।[২] অনেকে মনে করেন যে, 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে আর্যদের আমলে । রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, 'বঙ্গ' শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'ঐতরেয় অরন্যক' গ্রন্থে । যেখানে মগদের সাথে বঙ্গের উল্লেখ আছে ।[৩] রমেশ চন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেন যে, পরবর্তীতে বৌধায়ন ধর্ম সূত্রে

১. ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা, ১৫তম সংস্করণ ২য় খন্ড, (চিকাগো ১৯৭৩-৭৪) পৃঃ ৬৮৭-৬৯৪ ।
২. মোহাম্মদ কাসেম, 'বাংলাদেশ জাতি ও সংস্কৃতি', বাংলা একাডেমী, (ঢাকা ১৯৮৪) পৃঃ ১২
৩. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাস' (কলিকাতা, ১৯৭১) ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩ । উদ্ধৃত, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে জুলাই ১৯৯৩ 'বাংলা জনপদ ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ ।

Dhaka University Institutional Repository

রামায়ন, মহাভারতেও বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] দেশ বাচক নাম হিসেবে বাংলার ব্যবহার প্রথম মুসলমান অধিকারের গোড়ার দিকে প্রচলিত হয়।[২] তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তুর্কী মুসলিম বিজেতারাই সর্বপ্রথম বাংলার সমগ্র অঞ্চলকে 'বাঙ্গালাহ' নামে অভিহিত করে।[৩]

আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেশ বাচক বাংলা শব্দ ব্যবহার করে এর উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, এ দেশের প্রাচীন নাম ছিল 'বঙ্গ'। এবং এ দেশের লোকেরা জমিতে উঁচু উঁচু 'আল' বেধে বন্যা হতে জমি রক্ষা করত। সময়ের ব্যবধানে 'আল' শব্দটি দেশের নামের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এভাবে বাধ বা জমির সীমা নির্দেশক আল, বা আইল প্রত্যয় যোগে 'বঙ্গাল' (বঙ্গ+আল) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং পরবর্তিতে এই 'বঙ্গাল' হতে 'বাংলা' হয়েছে।[৪] আবুল ফজলের মতে চট্টগ্রাম হতে গড়ি (রাজমহল) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল 'বঙ্গ'। প্রাচীন কালে এখানকার রাজারা দশ গজ উঁচু এবং ২০ গজ বিস্তৃত বিরাট আল নির্মাণ করতেন। এ থেকেই 'বাঙ্গাল' বা 'বাঙ্গালাহ্' নামের উৎপত্তি হয়েছিল।[৫]

কোন কোন পন্ডিতগণ মনে করেন যে, বাংলাদেশের অতি প্রাচীন নাম 'বাং' বা 'বাঙ্গ' ছিল। এই 'বাঙ্গ' অঞ্চলে অতীতকালের শাসকেরা বিভিন্ন স্থানে উঁচু টিপি তৈরি করত। এই টিপি সাধারণত ১০ হাত উঁচু ও ২০ হাত প্রশস্ত হত। সম্ভবত বহিরাক্রমন হতে দেশকে সুরক্ষিত করার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে মাটি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত দূর্গ প্রাচীর তৈরী করত। এদেরকে আল বা আলি বলা হত। এই 'বাঙ্গ' এর সাথে আল সংযোগের ফলে (বাঙ্গ+আল)

----

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, সম্পাদিত, 'দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (ঢাকা ১৯৪৩) ১ম খন্ড, পৃঃ ৭,৯।

২. কে,এম,রইছ উদ্দীন খান, 'বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা' (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ, ঢাকা ১৯৮৬) পৃঃ ২৩।

৩. আইন-ই-আকবরী, জ্যারেট এবং সরকার অনূদিত ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩২। এ,এফ,এম, আব্দুল জলিল, 'সুন্দর বনের ইতিহাস', ২য় খন্ড, (ঢাকা, ১৩৭৬ বাংলা) পৃঃ ৫।

৪. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃঃপৃঃ ২৪। বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৩,১৪।

৫. আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, অনুবাদ জ্যারেট এবং সরকার, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩২। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃঃপৃঃ২৪। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে জুলাই, ১৯৯৩, পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

'বাঙ্গাল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে । আবার বাঙাল শব্দ হতে 'বাঙ্গালা' এবং উহা হতে 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে । আবুল ফজল এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও এই মত সমর্থন করেন ।[১] কেউ কেউ 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, যে অঞ্চলে 'বং' গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত সে অঞ্চল এই নামেই পরিচিত হত । সংস্কৃত 'বঙ্গ' শব্দ 'বং' বা 'বঙ' গোষ্ঠীর নাম ছিল । 'বং গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের আবাস ভূমি ভাগীরথী নদীর পূর্বতীর থেকে আসামের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ।[২] এ সম্পর্কে গোলাম হোসেন সলীম উল্লেখ করেছেন যে, প্রাচীন বাংলার নাম ছিল 'বং' । 'বং' এর সাথে 'আল' সংযোগ হওয়ার কারণ হল, বাংলা ভাষায় আল অর্থ বাধ । যাতে বন্যার পানি বাগানে অথবা আবাদী জমিতে প্রবেশ না করতে পারে সেজন্য জমির চারদিকে বাধ তৈরী করা হত । প্রাচীনকালে বাংলার সরকার পাহাড়ের পাদদেশে নীচু জমিতে ১০ হাত উঁচু ও ২০ হাত চওড়া মাটির স্তূপ তৈরী করে তার উপর বাড়ী ঘর, চাষাবাদ করতো । তৎকালীন লোকেরা এই গুলিকে বাঙ্গালা বলত ।[৩]

আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে আরো উল্লেখ করেছেন যে, প্রাচীনকালে 'বং' সমতট অঞ্চলের লোকেরা জমিতে উঁচু আল তৈরী করে কৃষি উৎপাদন করত । এ কথাও সত্য যে, এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদ নদীর প্লাবন ও ভাঙ্গন রোধ করে ফসল রক্ষার জন্য আল বা বাধের প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল । আবার কোন কোন স্থানে ফসল উৎপাদনের জন্য আল বা বাধ তৈরী করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হত । সম্ভবত আবুল ফজলের উপরোক্ত মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মত প্রকাশ করেন যে, 'বং' বলে পরস্পর সম্বোধনকারী লোকেরা কৃষি জমির চারদিকে উঁচু উঁচু আল নির্মাণ করে ফসল উৎপাদন করত । তাই এ থেকেই এ অঞ্চলের নাম হয়েছে 'বঙআল' বিবর্তিত হয়ে বঙ্গাল, বাঙ্গাল বাঙ্গালাহ বা অপভ্রংশ 'বাংলা' অর্থাৎ বংদের নির্মিত আল এর দেশ, 'বাংলাদেশ' ।[৪]

---

১. সুন্দর বনের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২০
২. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪ ।
৩. গোলাম হোসেন সলীম, 'বাংলার ইতিহাস', রিয়াজ উস-সালাতিনের বঙ্গানুবাদ, অনুবাদক, আকবর উদ্দীন, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা ১৯৭৪) পৃঃ১৬ । দৈনিক ইত্তেফাক ২৯শে জুলাই, ১৯৯৩, পূর্বোক্ত ।
৪. সাপ্তাহিক নতুন দিন, ৫ম সংখ্যা, ১৯৫৪ । বাংলাদেশ জাতি ও সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত পৃঃ১৩,১৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গাল, বাঙ্গালা, বাঙ্গালাহ্ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আবুল ফজলের ব্যাখ্যা অবশ্য রমেশ চন্দ্র মজুমদার মেনে নিতে পারেন নি। তিনি এ প্রসংগে মত প্রকাশ করেন যে, প্রাচীনকালে 'বঙ' ও বাঙ্গাল নামে দুটি পৃথক দেশ ছিল। কাজেই বঙ্গ দেশের নামের সাথে আল যোগ করে অথবা অন্য কারণে 'বাঙ্গাল' অথবা 'বাংলা' নামের উদ্ভব হয়েছে ইহা স্বীকার করা যায় না। তিনি মনে করেন যে, বাঙ্গালা দেশের নাম হতেই কালক্রমে সমগ্র দেশের নাম বাংলা নামকরণ করা হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[১] কিন্তু বঙ্গাল জনপদ বিষয়ে মজুমদারের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে মেনে নেয়া যায় না, কেননা বঙাল শব্দের একটি ভিন্ন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। সেমেটিক ভাষায় 'আল' অর্থ 'আওলাদ' বা বংশধর এর অর্থে 'বং+আল' সংযোগে বঙ্গাল (অর্থ বং এর বংশধর) শব্দের উৎপত্তি হতে পারে।[২] এই অর্থের উপর ভিত্তি করে আব্দুল করিম উল্লেখ করেন যে, প্রাচীন লিপির বঙ্গাল দ্বারা বঙ্গাল দেশ না বুঝিয়ে বঙ্গ এর অধিবাসী বঙ্গাল বুঝান হয়েছে এবং বঙ্গাল দেশ দ্বারা বঙ্গালদের দেশ বুঝান হয়েছে।[৩] আব্দুল করিম আরও উল্লেখ করেন যে, প্রথম দিকে মুসলিম রাজ্য লখনৌতি নামে অনেক দিন পরিচিত ছিল কিন্তু বঙ্গ অধিকারের পর তারা দেখে যে, বঙ্গাল শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং এই শব্দ দ্বারা বঙ্গদেশের অধিবাসীদেরকেই বুঝান হয়। প্রথমে বঙ্গাল শব্দ উল্লেখকারী মুসলিম ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দীন বরনীর তারিখ-ই-ফিরুজ শাহীতে 'আবু বঙ্গাল' (বঙ্গালদের পিতা) শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে বঙ্গাল দ্বারা বঙ্গাল জাতির পরিচয় দেয়া হয়েছে। এই বঙ্গাল থেকেই বঙ্গালা, বাঙ্গালা ইত্যাদির উৎপত্তি।[৪]

বঙ্গাল, বাঙ্গালা ও বাঙ্গালাহ ইত্যাদি সম্পর্কে আবুল ফজল 'আল' অর্থাৎ উচু বাধ বা ঢিপির সংযোগ করে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার চেয়ে 'বং' জাতির আবাস স্থল তথা 'বং' বংশধরেরা এখানে বসবাস করত, তার সাথে আল প্রত্যয়কে যোগ করে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যেমন 'বংআল,' বঙ্গাল, বঙ্গালা, বাঙ্গালাহ বাংলা ইত্যাদি, এই যুক্তিই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে।

----

১. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪।

২. আব্দুল মান্নান, তালিব, 'বাংলাদেশে ইসলাম', (ঢাকা ১৯৮০) পৃঃ ১৫। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে জুলাই, ১৯৯৩, পূর্বোক্ত।

৩. আঃ করিম বঙ্গঃবাঙ্গালাঃবাংলাদেশ, পৃঃ ২৬। উদ্ধৃত, দৈনিক ইত্তেফাক ২৯শে জুলাই ১৯৯৩, পূর্বোক্ত।

৪. বঙ্গঃবাঙ্গলা, বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৪, ২৫। উদ্ধৃত, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে জুলাই, ১৯৯৩, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আমরা অন্য ভাবেও বলতে পারি যে, 'বং' জাতিরা যেহেতু কৃষিজীবি ছিল, তাই তারা তাদের কৃষি জমিকে প্লাবনের হাত হতে রক্ষা করার জন্য আল বা উঁচু বাধ তৈরী করত, কিংবা শত্রুর আক্রমন হতে দেশকে রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় বাধ তৈরী করত । অর্থাৎ এ সব কিছুই বং জাতিরা বাঁচার তাগিদেই করত । যেহেতু এ সব কর্মকান্ড বং জাতিরা করত সেহেতু বং এর সাথে আল যোগ করে যেমন-বংআল, বঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙ্গালাহ্, বাংলা ও বাংলাদেশ এভাবে বিবর্তনের ধারায় বিবর্তিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় । সুতরাং উভয় যুক্তিই যথাযথ বলে মনে হয় । এমন হতে পারে যে, যেহেতু বং জাতিরা এদেশে বাস করত সেহেতু এদেশের নাম হয়েছিল বঙ্গ বা বঙ্গাল । অর্থাৎ বংদের আবাসভূমি । এভাবে বঙ্গ বাসীরা যেহেতু বাঁচার তাগিদে আল তৈরী করত সেহেতু বিবর্তনের ধারায় বঙ্গ+আল=বঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙ্গালাহ বাংলা এবং বাংলাদেশ এ ভাবেও এর উৎপত্তি হতে পারে । অতএব দুভাবেই আমরা গ্রহণ করতে পারি ।

দেশ হিসেবে বঙ্গ পরবর্তী নাম হয় বঙ্গালা, বাঙ্গালা এবং ফার্সীতে বাঙ্গালাহ্ । ইবনে বতুতার ভ্রমন কাহিনীতে বাঙ্গালা নামের উল্লেখ পাওয়া যায় । ইবনে বতুতার ভ্রমন কাহিনী হতে জানা যায় যে, সে সময় দক্ষিন ও পূর্ব বঙ্গ বঙ্গাল বা বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল এবং এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙ্গালী নামে অভিহিত হত । পরবর্তীকালে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী শব্দ দুটি এই অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের প্রতি ও প্রযোজ্য হয় ।[১] তারিখ-ই-ফিরুজ শাহীতে উল্লেখ হয়েছে যে, প্রাচীন বঙ্গই পরবর্তীতে বঙ্গালা বা বাঙ্গালা নামে পরিচিতি লাভ করে । মুগল শাসনামলে বাঙ্গালা নামের বহুল প্রচার হয় । সুলতানী আমলের বঙ্গালা, আকবরের আমলে সুবই বাঙ্গালাহ তে রুপান্তরিত হয় । আকবরের আমলে বাঙ্গালাহ্ নামাংকিত মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল । আকবরের পরে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজদের নিকট ইহা বেঙ্গালা নামে পরিচিত হয় । পর্তুগীজদের দেয়া বেঙ্গালা নাম পরবর্তী ইংরেজ শাসনে বেঙ্গল নামে রুপান্তরিত হয় এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল নামেই পরিচিত ছিল ।[২] এরপর ভারত বিভক্তির পর পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ও পশ্চিম বাংলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় । অতপর ১৯৭১ সালের পর পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হিসেবে রুপান্তরিত হয় ।

---

১. ডঃ মুহম্মদ আব্দুর রহিম,"বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস"(১২০৩-১৫৭৬)অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান,বাংলা একাডেমী(ঢাকা ১৯৮২)১ম খন্ড, পৃঃ ৪ ।

২. দৈনিক ইত্তেফাক,২৯শে জুলাই ১৯৯৩, পূর্বোক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে 'বং' নামে যে জনগোষ্ঠী বাস করত তা থেকে এ জনপদের নাম হয় বঙ্গ। এই বঙ্গ হতে বঙ্গাল নামের উৎপত্তি হয়। সুলতানী আমলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্য একত্রে বঙ্গালা, বাঙ্গালা, বা ফার্সী ভাষায় বাঙ্গালাহ্ নামে অভিহিত হয়। এই বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা পর্তুগীজদের কর্তৃক বেঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। ইংরেজ শাসনামলে বেঙ্গলা, বেঙ্গল নাম ধারন করে। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই নামেই চলতে থাকে। ভারত বিভক্তির পর বাংলার পূর্বাঞ্চল পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত হয় এবং পশ্চিমাঞ্চল পশ্চিম বঙ্গ হিসেবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতপর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দেশ হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। সুতরাং এ ভাবেই প্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশ বিবর্তনের ধারায় বিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি ঘটে।

বাংলাদেশের আয়তন ও সীমা (প্রাচীন হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত):-

প্রাচীনকাল হতে বিভিন্ন শাসনামলে যুগে যুগে বাংলাদেশের আয়তন ও সীমানার হ্রাস, বৃদ্ধি ঘটেছে। কখনো যুদ্ধে জয় লাভ করে এদেশের সীমানা বৃদ্ধি হয়েছে, কখনো পরাজিত হবার পর সীমানা হ্রাস পেয়েছে। এভাবে যুগে যুগে বাংলাদেশের আয়তন ও সীমানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

এমন এক সময় ছিল যখন বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিম বাংলার সমগ্র অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ বুঝাত। আবার কখনো বাংলাদেশ বলতে সমতট রাঢ়, পুন্ড্র বর্ধন, গৌড় ও তাম্রলিপ্তিকে বুঝাত। মহাভারতের যুগে বাংলাদেশ মোদাগিরি, পুন্ড্র, কৌশিকী কচ্ছ, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তি ইত্যাদি এ সব বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল।[১] কোন কোন ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, বঙ্গ ছিল পুন্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্ম সংলগ্ন দেশ। পরবর্তীকালে গঙ্গা,

---

১. ডঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ, 'বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ঢাকা ১৯৮৬) পৃঃ ১

Dhaka University Institutional Repository

ভাগীরথীই ছিল বঙ্গের পশ্চিম সীমা । যশোর এবং তার চার পাশের অঞ্চলসমূহ ও এক সময় বঙ্গ থেকে স্বতন্ত্রভাবে উপবঙ্গ নামে অভিহিত হত । মধ্যযুগে রচিত 'দিগ বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ হয়েছে ।[১]

তাই প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্দিষ্ট করে নির্দেশ করা যায় না । কারণ আজকের বাংলা বলতে আমরা যে সব এলাকাকে বুঝি প্রাচীনকালে এ সব এলাকার কোন একটি মাত্র নাম ছিল না । এ সমস্ত এলাকার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল । এ সব অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাজ ছিল । আবার বিভিন্ন সময়ে এদের নামের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । যেমন উত্তরাংশে পুন্ড্র ও বরেন্দ্র, দক্ষিন ও পূর্বাংশে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, ও বঙ্গাল এবং পশ্চিমাংশে রাঢ়, তাম্রলিপ্তি ও কজঙ্গল প্রভৃতি দেশ ছিল । পশ্চিমাংশে সুহ্ম ও দন্ডভুক্তি নামেও অভিহিত হত । তা ছাড়া উত্তর ও দক্ষিনাংশে এক সময় গৌড় নামেও অভিহিত হত । তাই মোটামুটিভাবে প্রাচীন বাংলা সীমানা আমরা এভাবে নির্দেশ করতে পারি । যেমন-উত্তরে হিমালয়, দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর পূর্বে গারো, খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা এবং পশ্চিমে বিহারের রাজ মহল পাহাড় ও কলিঙ্গ । এই সীমানার মধ্যবর্তী অঞ্চলই সাধারনত বাংলা নামে পরিচিত ছিল ।[২]

গুপ্ত সম্রাট চন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালে বঙ্গ রাজ্য 'মগধ' সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় । ৭ম শতাব্দীতে কর্ণ সুবর্ণ রাজা শশাংক বঙ্গ রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করেন । এবং বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জনপদগুলিকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালান । শশাংকের পরে বাংলা গৌর, পুন্ড্র ও বঙ্গ এ তিনভাগে বিভক্ত ছিল ।[৩] তবে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ এর বিবরণ হতে জানা যায় যে, তৎকালীন বঙ্গ রাজ্য কামরূপ পুন্ড্রবর্ধন কর্ণ সুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত এই পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল ।

----

১. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৪ ।
২. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২ ।
৩. বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

সেন বংশের রাজত্বকালে বল্লাল সেনের সময় বঙ্গ রাজ্য মিথিলা, রাঢ় (পশ্চিম বঙ্গ) বরেন্দ্র (উত্তর বঙ্গ) বাগড়ি বা বকদ্বীপ (মধ্য ও দক্ষিন বঙ্গ) ও বঙ্গ (পূর্ব বঙ্গ) এই পাঁচ অংশে বিভক্ত ছিল।[১] তবে মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেও সমগ্র বঙ্গ অঞ্চল পাঁচ অংশেই বিভক্ত ছিল কিন্তু নামের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-(ক) রাঢ় অঞ্চল, গঙ্গার দক্ষিন ও হুগলী নদীর পশ্চিম ভাগ পর্যন্ত।(খ) বাগড়ী- গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর বদ্বীপ (গ) বঙ্গ বা বদ্বীপের পূর্ব দিকের স্থানসমূহ।(ঘ) বরেন্দ্র বা গঙ্গা ও পদ্মার উত্তর, মহানন্দ এর পূর্ব এবং করতোয়া নদীর পশ্চিম দিক। (ঙ) মিথিলা বা মহানন্দার পশ্চিম দিকে অবস্থিত দেশ।[২]

কিন্তু পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের শাসনামলে বঙ্গের আয়তন সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই যুগে গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই বঙ্গ জনপদ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। হেম চন্দ্র বিরচিত অভিধান চিন্তামনি নামক গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র নদীর উপকূল বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাল বংশ যখন ক্ষীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে তখন বঙ্গ জন পদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর বঙ্গ এবং দক্ষিন বা অনুত্তর বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। পদ্মা ছিল উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমানা, দক্ষিনের বদ্বীপ অঞ্চল ছিল অনুত্তর বঙ্গ। এর বহুকাল পরে কেশব সেন, ও বিশ্বরূপ সেনের আমলেও বঙ্গের দুটি বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান বিক্রমপুর পরগনা ও তার সাথে আধুনিক ইদিলপুর পরগনার কিছু অংশ মিলে হয়েছিল বিক্রমপুর ভাগ। অপর ভাগের নাম ছিল নাব্য মন্ডল। বর্তমান বরিশাল জেলা ও আরো পূর্ব দিকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের নাম ছিল নাব্য মন্ডল। মেঘনা নদীর মোহনা ও ছিল এই নাব্য মন্ডলের অন্তর্গত।[৩]

ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দীন বরনীর বিবরণ হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সুলতানী শাসনামলে বাংলা তখন কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং মুসলমানগণ এর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করে ছিলেন।

---

১. বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১।
২. সুন্দর বনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮।
৩. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন-আরসাই বাঙ্গালহ্, ইকলিমই বাঙ্গালাহ এবং দিয়ারাই বাঙ্গলাহ । ডঃ কে,আর,কানুনগো আরসাই বাঙ্গালাকে সাত গাঁও অঞ্চল বা দক্ষিন বঙ্গ, ইকলিমই বাঙ্গালাহকে সোনার গাঁও অঞ্চল বা পূর্ব বঙ্গ এবং দিয়ারাই বাঙ্গালাকে সংযুক্ত সোনার গাঁও ও সাত গাঁও অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করেছেন ।[১] ইলিয়াস শাহ বাংলার তিনটি শাসন কেন্দ্র যেমন-লখনৌতি, সাতগাঁও, ও সোনার গাঁও এর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করে । কার্যত বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের ভিত্তি স্থাপন করেন । ডঃ আব্দুর রহিম উল্লেখ করেন যে, এ রূপে সুলতান ইলিয়াস শাহ বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিগনিত হন । এর ফলে বাংলার সমগ্র এলাকা একীভূত হয় এবং সমস্ত বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভাষাগত ঐক্য স্থাপিত হয় । এ সময় থেকে তেলিয়া গর্হি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গপোসাগর পর্যন্ত বিশাল জনপদ বাঙ্গালা, এই একটি সাধারণ নামে পরিচিত হয় ।[২] সুতরাং মুসলিম শাসনামলে বাংলার বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা সফলকাম হয় । কোন কোন ঐতিহাসিকগণ বাংলাদেশের ভৌগলিক আয়তন ও সীমারেখা সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, সুবে[৩] । বাংলা দ্বিতীয় ইকলিমে[৪] অবস্থিত । চট্টগ্রাম হতে 'তেলিয়াগিরী'[৫] ।

---

১. হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ২য় খন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা ১৯৭৪), পৃঃ৬৭ ।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত ,পৃঃ ৫ ।দৈনিক ইত্তেফাক ২৯শে জুলাই ১৯৯৩ ।

৩. বাদশাহ আকবরের সময় সুবা নামের উৎপত্তি হয় । আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে প্রশাসনিকভাবে দশশালা বন্দোবস্তের সময় রাজস্ব বিভাগগুলিকে বিভিন্ন সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন । আবার এ রাজস্ব বিভাগগুলিকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনিক রাজ বিভাগে ভাগ করেছিলেন । তবে সুবা ছিল সর্বোচ্চ রাজস্ব বা প্রশাসনিক বিভাগ । যেমন-কতকগুলি সরকার নিয়ে একটি সুবা গঠিত হত ,আবার কতকগুলি দস্তুর নিয়ে একটি সরকার গঠিত হত (ইলিয়ট দস্তুর গুলিকে একটি জেলার সমান বলে উল্লেখ করেছে) কতকগুলি পরগনা বা মহল নিয়ে একটি দস্তুর গঠিত হত । পরগানা বা মহল মুগল সম্রাটদের অধীন স্থানীয় প্রধানদের অধীনস্থ এক একটি রাজস্ব বিভাগের প্রাথমিক স্তর ছিল । আর সর্বোচ্চ স্তর ছিল সুবা ।

ইলিয়টের গ্লোসারী ,আইন,(জ্যারেট কর্তৃক অনূদিত ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৫, তবকাত-ই-নাসিরী, পৃঃ১৪৮ ,১৬২, উদ্ধৃত গোলাম হোসেন সলীম,'বাংলার ইতিহাস(রিয়াজউস সালাতীনের বঙ্গানুবাদ)অনু আকবর উদ্দীন বাংলা একাডেমী (ঢাকা-১৯৭৪) পৃঃ৮ ।

৪. মুসলমান জ্যোতির্বিদ ও ভূগোলবিদগণ সমস্ত পৃথিবীতে আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিত্তিতে ৭টি অংশে বিভক্ত করেন । এবং প্রত্যেকটি আবহাওয়াভুক্ত অংশকে এক একটা 'ইকলিম' নাম দিয়েছিলেন । বাংলা অঞ্চল এই দ্বিতীয় ইকলিম বা আবহাওয়াভুক্ত ছিল ।

আইন-ই-আকবরী(জ্যারেট কর্তৃক অনূদিত)৩য় খন্ড ,পৃঃ৪৩ । উদ্ধৃত,বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮ ।

৫. তেলিয়াগিরী একটি গিরিপথের নাম । এর দক্ষিনে রাজমহল ও উত্তরে গঙ্গা নদী । পূর্বে এই গিরিপথ বাংলায় প্রবেশের জন্য সামরিক কৌশলের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ।

উইলিয়াম হান্টার,ইম্পায়ার গেজেটিয়ার,১৩শ খন্ড,পৃঃ২৩৬ । আইন-ই-আকবরী(জ্যারেট)২য় খন্ড, পৃঃ ১১৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর হতে দক্ষিনে অর্থাৎ উত্তরে পর্বত হতে সুবার দক্ষিন সীমানাস্থ সরকার মান্দারান[১] পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ প্রস্থ । আকবরের শাসনামলে কালো পাহাড়[২] কর্তৃক সুবে উড়িষ্যার বিজয়ের পর উক্ত সুবা দিল্লীর বাদশাহর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই অঞ্চলকে সুবে বাংলার অংশ করা হয় । এতে সুবে বাংলার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৪৩ ক্রোশ ও প্রস্থে ২০ ক্রোশ বৃদ্ধি পায় । এবং এই সুবার দক্ষিন সীমানে সমুদ্র এবং উত্তর ও পূর্বদিকে উচ্চ পর্বতমালা এবং পশ্চিমে সুবে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । সম্রাট আকবরের শাসনামলে ঈশাখান পূর্ব দিকের প্রদেশ সমূহ জয় করেন এবং সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন ।[৩]

আবুল ফজল সুবে বাংলার ভৌগলিক সীমারেখা ও আয়তন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছেন । তাঁর মতে বাংলা দ্বিতীয় ইকলিম (বা দ্বিতীয় আবহাওয়া) অঞ্চলে অবস্থিত, এবং চট্টগ্রাম হতে তেতলিয়া গর্হি পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য চারশত ক্রোশ । এর পূর্ব ও উত্তর সীমায় পাহাড়, পর্বত, দক্ষিনে সাগর ও পশ্চিমে বিহার প্রদেশ । এ দেশের প্রান্ত সীমায় কামরূপ ও আসাম অবস্থিত ।[৪] সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর 'তুজুক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলা দ্বিতীয় ইকলিমে অবস্থিত এবং ইহা একটি

----

১. সরকার মানদারনের সীমানা হল -অর্ধবৃত্তাকারে পশ্চিম বীর ভূমের নাগোর হতে রানীগঞ্জ হয়ে দামোদোর নদী বরাবর বর্ধমানের উপর দিয়ে খন্ডগোশ, জাহানাবাদ, চন্দ্রকোন (পশ্চিম হুগলী জেলা) থেকে রূপ নারায়ন নদীর মুখে 'মন্ড ঘাট' পর্যন্ত বিস্তৃত ।

আইন-ই-আকবরী, ২য় খন্ড, (জ্যারেট) পৃঃ ১৪১ । উদ্ধৃত, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮ ।

২. কালা পাহাড় ছিলেন বাংলার সুলতান সুলায়মান কররানীর প্রসিদ্ধ সেনাপতি, দক্ষিন উড়িষ্যার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রসিদ্ধ বিজেতা ।

আইন-ই-আকবরী, (জ্যারেট) ১ম খন্ড, পৃঃ৩৭০ ।২য় খন্ড, পৃঃ ১২৮ ।

৩. গোলাম হোসেন সলীম, 'বাংলার ইতিহাস' পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮ ।

৪. আইন-ই-আকবরী, সরকার অনুদিত ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩০-৩১ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১-২ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিশাল দেশ । সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম হতে তেলিয়া গর্হি পর্যন্ত ৪৫০ ক্রোশ এর দৈর্ঘ্য এবং উত্তরের পর্বতমালা হতে মান্দারান অঞ্চল ২২০ ক্রোশ প্রস্থ[১] । মুগল যুগে সুবে বাংলা সাত গাঁও খলিফাবাদ, মাহমুদাবাদ, ফতেহাবাদ, প্রভৃতি ১৮টি সরকার বা বিভাগে বিভক্ত ছিল । বাংলার শেষ নবাব সিরাজ দৌলার সময় বাংলা, বিহার, ও উড়িষ্যা মিলে ছিল বাংলাদেশ ।[২] ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে । বঙ্গ ভঙ্গের ফলে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পায় । কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ হলে ও বাংলাদেশ তার পূর্বের সীমানা ফিরে পায়নি । তখন বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশের মর্যাদা পায় । নতুন ব্যবস্থায় পূর্ব বঙ্গ দার্জিলিং ও পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত হয় । অপরদিকে আসাম পৃথক প্রদেশে রূপান্তরিত হয় । এরফলে একদিকে বাংলা ভাষাভাষি সিলেট, কাছাড়, শিলচর, ও গোয়ালপাড়া জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং অন্য দিকে পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংহভূম, ও সাওতাল পরগনা প্রভৃতি বাংলা ভাষাভাষি জেলাগুলি বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয় ।[৩] বৃটিশ শাসনামলে ভারত বর্ষ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল এবং পাঁচটি বিভাগের অধিনে ২৭টি জেলা ছিল ।[৪] অর্থাৎ মূল বাংলা বলতে এই পাঁচটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাকেই বুঝান হত । প্রত্যেকটি বিভাগের অধীনে বিভিন্ন জেলা ছিল । যেমন-বর্ধমান বিভাগ :-বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদনীপুর, হুগলী, হাওড়া ইত্যাদি । প্রেসিডেন্সি বিভাগ :-চব্বিশ পরগনা, কলিকাতা, নদিয়া, যশোর, মুর্শিদাবাদ, খুলনা । রাজশাহী বিভাগ :-দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, দার্জিলিং জলপাইগুড়ি । ঢাকা বিভাগ :-ঢাকা, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ।চট্টগ্রাম বিভাগ :-চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ইত্যাদি ।[৫] এ ছাড়া উত্তর বঙ্গে কুচবিহার ও পূর্ব বাংলায় সীমান্তে এ দুটি দেশীয় রাজ্য ছিল । এ সময়ে বর্তমান ভারতের আসাম ও বিহার প্রদেশের

---

১. তুজুক ই জাহাঙ্গিরী (উর্দু অনুবাদ) পৃঃ২২৯ । উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১-২ ।

২. বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১ । বাংলাদেশে ইসলাম পূর্বোক্ত, পৃঃ১৩ ।

৩. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩ ।

৪. বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১ ।

৫. খন্দকার ফজলে রাব্বি, "বাংলার মুসলমান", অনুবাদক মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, বাংলা একাডেমি (ঢাকা-১৯৬৮) পৃঃ ৪-৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে বাংলাদেশের কিছু কিছু অংশ যেমন-সিলেট, কাছাড়, গোয়াল পাড়া, মানভুম জেলা ও সিংহভুমের ধলভুম, পরগানা সংযুক্ত ছিল । ১৯৪৭ সালের পূর্বে বঙ্গদেশ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের বৃটিশ শাসনের একটি প্রদেশ ।[১] ১৯৪৭ সালের পর ভারত বর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর সমগ্র বাংলা দু'ভাগে বিভক্ত হয় । এক পশ্চিম ভাগ অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গ যা ভারতের অন্তর্গত হয় । দুই, পূর্বভাগ অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্তর্গত হয় ।[২] এ সময় এর সীমানা ছিল উত্তরে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের জলপাই গুড়ি, ও কুচ বিহার জেলা এবং আসাম ও মেঘালয় রাজ্য । পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং বার্মা । দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গ।[৩] পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই পূর্ব পকিস্তান তথা উপরোক্ত সীমানা সমৃদ্ধ ভূখন্ডই স্বাধীন, স্বার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আত্ম প্রকাশ ঘটে ।

ভূ প্রকৃতি ও গঠন ঃ-

আইন-ই-আকবরীতে বাংলার যে ভৌগলিক বিবরণ পাওয়া যায়, তার সংগে ভারত বিভাগ পূর্ব (১৯৪৭ সালের পূর্বের বাংলাদেশ) বাংলার ভৌগলিক ও প্রকৃতির মিল খুজে পাওয়া যায় । বাংলার উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতশ্রেনী । দক্ষিনে জঙ্গালাকীর্ণ সুন্দর বন ও বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চল । বাংলার পূর্ব সীমায় গারো, খাসিয়া, জয়নিত্তয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্বতমালা অবস্থিত । পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে গঙ্গা, মহানন্দা ও এদের বহু শাখা প্রশাখা প্রবাহিত হয়েছে । তাছাড়া রাজ মহলের পাহাড়, ঝড় খন্ডের বণাঞ্চল, বীরভূম, সাওতাল পরগনা, সিংহভূম, মানভূম ও ময়ুরভঞ্জের জঙ্গালাকীর্ণ মালভূমি ইত্যাদি দ্বারা এর পশ্চিম সীমানা বেষ্টিত ।[৪]

---

১. বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১-২ ।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২ ।

৩. স্টাটিসটিকাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ-১৯৮৭ ।

৪. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর অনন্য। বাংলা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। এই বদ্বীপ অঞ্চলের বেশীর ভাগ ভূভাগই গঙ্গা, ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদ নদী বিধৌত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। বাংলার অধিকাংশ ভূ-ভাগই অপেক্ষাকৃত নতুন বা নব্য ভূমি। তবে সম্পূর্ণ ভূ-ভাগই নতুন নয়। পশ্চিমাংশের বেশ কিছু অঞ্চল প্রাচীন বা পুরাভূমি বিদ্যমান। বাংলার পশ্চিমাংশের প্রাচীন ভূমি রাজমহলের দক্ষিন থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজ মহলের সাওতাল পরগানা, মানভূম, সিংহভূম, ধনভূমের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল এই প্রাচীন ভূমির অন্তর্গত।[১] উত্তর বাংলায় এই প্রাচীন ভূমির একটা অংশ অপরাংশের চেয়ে কিছুটা উঁচু। বগুড়া, উত্তর রাজশাহী, পূর্ব দিনাজপুর এবং রংপুরের পশ্চিমাঞ্চল ব্যাপী অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলই হল ইতিহাস খ্যাত বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রস্থল। বাংলার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের প্রাচীন ভূমির বন্ধনীটুকু বাদ দিলে বাকী সবটুকু অঞ্চলই (চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত) নব্যভূমি এবং ইহা গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, ও তার শাখা প্রশাখা নদী পলিমাটি দ্বারা বিধৌত। এ দিকে সিলেটের পূর্বাঞ্চল ময়মনসিংহের মধুপুর গড়, ঢাকার ভাওয়ালের গড়, পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত পূর্ব বাংলার সবটুকু ভাগই নব্য ভূমি অঞ্চল। তবে এর মধ্যে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর এর সমতল ভাগ ও সিলেটের অধিকাংশ ভূমি তুলনামূলকভাবে প্রাচীন। খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সমতল ভূমি অঞ্চল আরো নব্যভূমি অঞ্চল। সে জন্য এ অঞ্চলকে বলা হয় নাব্য মন্ডল।[২] অতএব ভৌগলিক গঠনের দিক থেকে পূর্ব ও দক্ষিন পূর্ব দিকের কয়েকটি প্রত্যন্ত ব্যতীত বাংলাদেশ একটি বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ও পলিমাটির দেশ।

প্রকৃতি ও জলবায়ু :-

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অসংখ্য নদীনালা ও পলিমাটির দেশ বাংলার সমতল ভূমি বছরে প্রায় অর্ধেক সময় জলে প্লাবিত থাকত। নদ নদী বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক শোভায় সৌন্দর্য মন্ডিত করেছে। বর্ষার সময় নদীগুলি দুকূল ছেপে পানি প্রবাহিত হয়। এ দেশে বর্ষাকাল প্রায় ছয় মাস কাল স্থায়ী

---

১. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪।
২. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ দেশে বর্ষাকাল প্রায় ছয় মাসকাল স্থায়ী হয় । বাংলাদেশের অন্যতম ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য হল এর আবহাওয়া । দেশটি বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিত । কর্কটক্রান্তি এদেশের উপর দিয়ে চলে গেছে । এজন্য এখানকার আবহাওয়া মৃদু ও নাতিশীতোষ্ণ । মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রভাবিত বলে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং বায়ু মন্ডল আদ্র জলীয় বাষ্পপূর্ণ থাকে । ভৌগলিক অবস্থানের দরুন এখানে কালবৈশাখী, ঘূর্ণি ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস মাঝে মাঝে প্রলয়ংকারী রূপ ধারন করে । এতে ব্যাপক জানমালের ক্ষতি সাধিত হয় ।[১] আবুল ফজলের মতে এই বাংলা প্রদেশে গ্রীষ্মের গরম ছিল মৃদু এবং শীতকাল ছিল ক্ষনস্থায়ী । এখানে মে মাস হতে বৃষ্টিপাত শুরু হত এবং ছয়মাস কিংবা তারো বেশী সময় বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকত । সে সময় সারাদেশ প্লাবিত থাকত ।[২] বর্তমানে অদ্যও এ ধরনের আবহাওয়ার বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিন অঞ্চলে লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য । এজন্য এ অঞ্চলকে বলা হয় ভাটি অঞ্চল বা জোয়ার ভাটার দেশ । কিন্তু মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর উপর অধিক হওয়ায় বাংলাদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু বলা হয় ।

প্রকৃতির প্রভাব ঃ-

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া স্বভাবতই অধিবাসীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে । মৃদু আবহাওয়া এ দেশের অধিবাসীদেরকে প্রকৃতিগতভাবে কোমল ও শান্ত স্বভাবের করে গড়ে তুলেছে । এ দেশের জনগনের আবেগ মমতায় এবং তাদের পারিবারিক জীবনের ঘনিষ্ঠতায় এ প্রকৃতির প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ।[৩] তাই হাজার নদীর জলধারায় বিধৌত উর্বরাভূমি ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্রকৃতিগত ভাবে এ দেশের মানুষকে যেমন হাসি, খুশি, কোমল, অমায়িক ও

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০ ।

২. আইন-ই-আকবরী, সরকার অনূদিত ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩২ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০ ।

৩. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০ ।

Dhaka University Institutional Repository

শান্ত প্রকৃতির করেছে, তেমনি কোমল অনুকরণের চমৎকার আবেগময়তা তাদের পারিবারিক জীবনেও সামাজিক সম্পর্ককে মধুময় করে গড়ে তুলেছে। আত্মীয় স্বজনদের প্রতি তাদের অপরিমিত স্নেহ মমতা, ভালবাসা, বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে একান্নবর্তী পরিবারের সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় নদীর দুর্দান্ত স্রোত, ঝড় ঝঞ্ঝা, প্লাবন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ইত্যাদি ও এ দেশের মানুষকে অত্যন্ত সাহসী ও বীর করে তুলেছে। বাংলাদেশে এখন যেমন, অতীতেও তেমনি বেশীরভাগ লোক গ্রামেই বসবাস করত এর মুল কারণ হল প্রকৃতির অকৃপন দান, কেন না বাঙ্গালীর কৃষি পণ্য দ্রব্যের উৎপাদনে প্রকৃতির উদার অবদান ছিল অপরিসীম।[১]

ভৌগলিক পরিবেশই বাংলার অধিবাসীদের খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান,আচার ব্যবহার ইত্যাদি আলাদা বৈশিষ্ট্যতা দান করেছে। এ দেশের প্রধান কৃষি দ্রব্য হল ধান, তেমনি নদী,খাল বিল সরবরাহ করেছে প্রচুর মাছ। তাই বাংলার অধীবাসীদের প্রধান খাদ্য হল ভাত, মাছ। আবার বর্ষা, বন্যা, ঝড় তুফান, নদীর ভাঙ্গন ইত্যাদি প্রকৃতির বিরূপতার সাথে যুদ্ধ করেই এ দেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। আর এ জন্যই সংগ্রামশীলতা এ দেশের মানুষের প্রকৃতিতে আর এক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।[২] আবুল ফজল তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, বাংলার নদ-নদী অসংখ্য ,গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, করতোয়া, পদ্মা, মহানন্দা, এবং এদের শাখা প্রশাখা যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালী অধিবাসীদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৩]

ধর্ম :-

জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গি হতে বলা যায় যে, বাংলা বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রনস্থল।মৌলিকভাবে বাঙ্গালীরা সমজাতিয় নয়। তারা বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রন। তাই বিভিন্ন ধরনের ধর্ম এখানে দেখতে পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ লোকের ধর্ম ইসলাম অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন মুসলমান। বাদ বাকী হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টান।[৪] এ দেশের ভাষা ও মুখের ভাষা হল বাংলা। এই ভাষার নিজস্ব ছাপার অক্ষর ও উপভাষা আছে। এই বাংলা ভাষা এ দেশের হাজার বছরের অধিককাল থেকেই প্রতিষ্ঠিত।[৫]

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৯।
২. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।
৩. আইন-ই-আকবরী, (সরকার অনূদিত) ২য় খন্ড, পৃঃ১৩৩। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮
৪. এ্যান্ড আর্লি হিস্ট্রি এন্ড টেকনিক্যাল অব পেপার ম্যানুফাকচার ইন বেঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃঃ২১।
৫. এস,কে,চ্যাটার্জি, ' দি অরিজিন এন্ড ডিভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গালী ল্যাংগুয়েজ', (লন্ডন১৯৭০) পৃঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন ও ইসলামের অভ্যুদয়

১২০৩ মতান্তরে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হয় । এ সময় হতে বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । সাধারনত বাংলা জয়ের সময় থেকে এ অঞ্চলে মুসলমানদের বসতি শুরু হতে থাকে । প্রাক মুসলিম যুগে বাংলার জনসাধারন প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ, কিছু সংখ্যক জৈন ও অন্যান্য শ্রেনীর লোক ছিল । তবে জৈনরা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল । বৌদ্ধরা তখন ও সংখ্যায় অনেক ছিল । কিন্তু পাল বংশের পতনের পর তাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য হারাবার সংগে সংগে এবং গৌড়ের সিংহাসনে সেনদের আরোহনের ফলে হিন্দু ব্রাহ্মন্যদের অত্যাচার, উৎপীড়ন বেড়ে যায়, যার ফলে বৌদ্ধদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে । সংখ্যার দিক থেকে, রাজনৈতিক শক্তিতে, সামাজিক মর্যাদায় ইত্যাদিতে হিন্দুরা শক্তিশালী ছিল । অবশ্য তখন বর্ণপ্রথা, ব্রাহ্মনদের অন্যায় অত্যাচার, ধর্মীয় ও সামাজিক নীতি হীনতা ইত্যাদি আদেশকে কলুষিত করে ফেলেছিল । একথায় মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার অধিবাসীদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা বিশৃংখলা পূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছিল । ঠিক এমনি এক সময় আরব মুসলিম বণিকগণ ব্যবসার জন্য ও দরবেশগণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে পদার্পন করে । ক্রমশ তাদের সংস্পর্শে ও ধর্ম প্রচারে ইসলামের মর্মবানী, পরমত সহিষ্ণু, সাম্য মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, জাতি বর্ণ গোত্রভেদের অনুপস্থিতি ইত্যাদি ইসলামের এই সুমহান নীতি ও আদর্শের প্রতি অত্যাচারিত বৌদ্ধ ও অন্যান্যরা সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । তাই এ দেশের অত্যাচারিত, মানুষ শান্তি ও সামাজিক নিরাপত্তার আশায় মুসলমান হতে থাকে । ফলে বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের পাশাপাশি সম্পূর্ণ নতুন এক জাতি ও ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে এবং অবশেষে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় । কিন্তু বাংলাদেশে কবে নাগাদ এ মুসলিম বণিক ও সাধকগণ আসেন এবং কিভাবে এখানে ইসলামের অভ্যুদয় হয়, তা আমরা নিম্নে আলোচনার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব ।

Dhaka University Institutional Repository

খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব হতেই আরবদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল । আরবীয় বণিকগণ নৌপথে বঙ্গোপসাগরীয় উপকূল ও দূর প্রাচ্য দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ভ্রমন করত । আরবে ইসলামের অভ্যুদয়ের পর মুসলিম বণিকরা ব্যবসার কারণেই বাংলাদেশে আসতে থাকে এবং তারা ব্যবসার সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম ও প্রচার করতে থাকে । মুসলমান ব্যবসায়ীদের পর পরই সাধক, ধর্ম প্রচারক প্রভৃতিরাও এ দেশে আসেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ দেশে ধর্ম প্রচার করেছেন । অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে ইসলামের আদি যুগেই ইসলাম প্রচারের ঢেউ এদের মাধ্যমে এ দেশে এসেছিল । অর্থাৎ হিজরী সনের প্রথম শতকেই তথা খ্রীষ্ট ৭ম শতকে বঙ্গে ইসলাম প্রচার হয়েছিল । আমরা বিভিন্নভাবে এদের আগমন সম্পর্কে অর্থাৎ প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র, আরব ভৌগলিকদের বিবরণ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির সাহায্যে প্রাথমিক যুগে বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন ইসলামের অভ্যুদয় ও বসতি স্থাপনের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারি ।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ও ভ্রমনে আরবরা ছিল পৃথিবীর সেরা জাতি । ৭১২ সালে আরবদের সিন্দু ও মুলতান বিজয় এবং সেখানে বসতি স্থাপনের ফলে প্রাচ্য ও ভারতের সাথে আরবদের ব্যবসা বাণিজ্য আরো সম্প্রসারিত হয় । বাণিজ্য উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক আরব বণিক সিংহল ও মালাবার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে । এ রকম প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আরবদের সমুদ্র পথ বাংলার উপকূল অনুসরন করত এবং আরব বণিকগণ এদেশের সামুদ্রিক বন্দরগুলোর সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল ।[১]

একেবারে প্রথম দিকের আরব মুসলমান বণিকদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না । তবে আরবের মুসলমান ভৌগলিকদের লিখনী হতে এই বাণিজ্য সম্বন্ধে কিছুটা জানা যেতে পারে । সোলায়মান, ইবনে খুরদাদবিহ্, ইদ্রিস ও আল মাসুদীর দেয়া বিবরণে আরব মুসলমান বণিকদের পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সমূহের সাথে বাণিজ্য পথের ও দ্রব্য সামগ্রীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, (১২০৩-১৫৭৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository

একথা প্রমাণিত হয় যে, আরবের মুসলিম বণিকদের দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ সমূহের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং তাদের এ যাত্রা পথে তারা বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় আসত ।[১]

আরব ভৌগলিকদের মধ্যে বেশ কয়জন, আরব বণিকদের বাণিজ্য পথ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন, এদের মধ্যে 'সোলায়মানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ৮৫১ সালে রচিত সোলায়মানের সিলসিলাত উত-তাওয়ারীখ গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় সোলায়মানের পর আরো কয়েকজন ভৌগলিকবিদ এই বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন, তবে তাদের বর্ণনা মোটামুটিভাবে সোলায়মানের উল্লেখিত গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল । ইবনে খুরদাদবিহ্ (মৃত্যু ৯২২খৃীঃ) তাঁর "কিতাব উল মাসালিক উল মামালিক" গ্রন্থে সর্বপ্রথম আরবদেশ হতে চীন দেশ পর্যন্ত মুসলমান বণিকদের বাণিজ্য পথের বর্ণনা দিয়েছেন । এছাড়া আল মাসুদী (মৃত্যু ৯৫৬খৃীঃ) এবং আল ইদ্রিসী (জন্ম একাদশ শতকের শেষ ভাগ) প্রমুখ ভৌগলিকবীদগণ ইবনে খুরদাদ বিহ্কে অনুসরণ করে আরব বণিকদের বাণিজ্য পথের বিবরণ দিয়েছেন ।[২]

সোলায়মান বর্ণনা করেছেন যে, তিনটি রাজ্য যেমন জুর্জ, বলহার, ও তফক, 'রুহমী' নামক এক রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত যা (রুহমী) জুর্জ রাজ্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত । জুর্জের সঙ্গে রুহমী যেমন যুদ্ধে লিপ্ত তেমনি বলহারের সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত । জুর্জ, বলহার ও তফকের চেয়ে তার অনেক বেশী সৈন্য সামন্ত আছে ।[৩] আল মাসুদী 'তফক' রাজ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, এই দেশের অপর প্রান্তে রাহ্মা নামক রাজ্য অবস্থিত । রাহ্মা' তহিদার রাজার উপাধি এবং

----

১. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৭ ।

২. ইলিয়ট এন্ড দুজন,' হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়া এ্যাজ টোলড্ বাই ইটস্ ওন হিস্টোরিয়ানস' প্রথম খন্ড, পৃঃ ২ । সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ ও ইসলাম '(ঢাকা ১৩৯৪ বাং ১ম খন্ড, পৃঃ২৪ । প্রফেসর আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস' (সুলতানী আমল) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, ২য় প্রকাশ, পৃ ঃ৩১ ।

৩. বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২ । এলিয়ট ও ডুজন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারনত তাদের রাজার নাম ও বটে । আল মাসুদীর এই উক্তির সমর্থনে এবং ইবনে খুরদাদবিহের অনুসরণ করে, আল ইদ্রিসী বর্ণনা করেছেন যে, রাজারা সাধারনত বংশগত উপাধি গ্রহণ করে । যেমন চীন দেশের রাজারা শতাব্দীকাল ধরে 'বাগবুম' বা 'বাগবুন' উপাধিতে ভূষিত হত এবং এই উপাধি বংশ পরম্পরায় চলতো । ভারত বর্ষীয় রাজাদের মধ্যেও তেমনি বলহার, জাব, কাফির, দুমী (রুহমী) এবং কামরুন ইত্যাদি উপাধি দেখতে পাওয়া যায় ।[১] সোলায়মান কর্তৃক উল্লেখিত রুহমী রাজ্য নির্দেশ করার জন্য আধুনিক পন্ডিতরা অনেক গবেষণা করেছেন এবং অনেক তথ্যও যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছেন ।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক 'হোদওয়ালা' সর্বপ্রথম প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, 'ধরহমী' শব্দ ভুল বশত রুহমী (মাসুদীর রাহমা) লেখা হয়েছে এবং তিনি মনে করেন যে, রুহমী রাজ্য পাল বংশীয় রাজা ধর্মপালের রাজ্য ছাড়া আর কিছু নয় ।[২] হোদাওয়ালার পরবর্তী গবেষকগণ তার উক্ত যুক্তিকে জোরদার ও প্রতিষ্ঠিত করার[৩] জন্য উল্লেখ করেছেন যে, যেমন তিব্বতী বৌদ্ধ পন্ডিত লামাতারা নাথের বিবরণের ভিত্তিতে এস,এস,দাস বর্ণনা করেছেন, প্রাচীন চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য নগরী ছিল । ত্রিপুরার দক্ষিনে এবং আরাকানের উত্তরে অবস্থিত ভূভাগ 'রম্ম' (সাংস্কৃতিতে রম্য) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ছিল । নালন্দার পতনের পর তা (চট্টগ্রাম) বৌদ্ধ ধর্মের প্রান কেন্দ্রে পরিণত হয় । চট্টগ্রাম শহরে পন্ডিত বিহার নামে একটি বিরাট বৌদ্ধ বিহার ছিল ।[৪] এস,সি, দাসের এই উক্তির উপর নির্ভর করে অনেকেই অনুমান করেন যে, 'রম্ম' আরব ভৌগলিকদের কর্তৃক বর্ণিত 'রুহমী' রাজ্য এক অভিন্ন ।[৫] অর্থাৎ রম্ম বা রামুকে যদি আমরা রুহমীর অভিন্ন নাম হিসেবে গণ্য করি তাহলে রুহমী রাজ্য চট্টগ্রাম তথা

---

১. বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫ ।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩২-৩৩ । হোদওয়ালা স্টাডিজ ইন ইন্দো মুসলিম হিস্ট্রি পৃঃ ৪ ।

৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩২-৩৩ । হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭৬ ।

৪. বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৩ । জে,এ,এস,বি,১৮৯৮, পৃঃ ২৪ ।

৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৩ । Indian Historical Quarterly. Vol.XVI. P.232.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অন্তর্গত ছিল । যেহেতু আরব ভৌগলিকগণ রমকে রুহমী নামে অভিহিত করেছেন এবং এই রুহমী রাজা ধর্ম পালের সমসাময়িক ,সেহেতু বুঝা যায় যে, আরব বণিকরা ৮ম শতাব্দীর প্রথম দিকেই চট্টগ্রাম অর্থাৎ বাংলাদেশে আগমন করে ।

আল মাসুদী রুহমী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, রাহমা রাজ্য ছিল সমুদ্র ও স্থল উভয় দিকে বিস্তৃত ও অন্তর্বর্তী ভূভাগের দিকে কামন রাজ্যের সীমানে অবস্থিত। কামন রাজ্য কামরূপ নামে অভিহিত একটি দ্বীপরাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল ।[১] ইবনে খুরদাদবীহ্ উল্লেখ করেছেন যে, রাহমী রাজ্য সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল এবং রাহমী ও অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে তখন জাহাযযোগে যাতায়াত চলত । রাহমীর পরবর্তী রাজ্যকে কামরুন' নামে উল্লেখ করা হয়েছে ।[২] কেননা চট্টগ্রাম সমুদ্র তীরবর্তী শহর ছিল এবং জাহাজযোগেই এর যোগাযোগ রক্ষা হত । তা ছাড়া এর পূর্ব পশ্চিম দিকে বর্তমান বার্মা ও ত্রিপুরা দ্বারা বেষ্টিত ছিল । এতে বুঝা যায় আরব ভৌগলিকদের রুহমী বাংলাদেশের অন্তর্গত ছিল । সুতরাং মাসুদী ও খুরদাদবীহ্র সূত্র থেকে রুহমীকে নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশকেই বুঝায় ।

রুহমী রাজ্যের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন রুহমী সম্পর্কীয় আরব ভৌগলিকদের বিবরণ যে বাংলাদেশের সম্পর্কে প্রযোজ্য তা সে বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না । হাতী, অত্যন্ত মিহি সূতী কাপড়, (যা মসলিনের অভিন্ন) গন্ডার এবং ব্যবসার মাধ্যমে হিসেবে কড়ির প্রচলন, ইত্যাদি সকল সূত্রই বাংলাদেশকে নির্দেশ করে । পরবর্তী পর্যটক এবং ঐতিহাসিকদের বিবরণ যেমন ইবনে বতুতার সফরনামা, মিনহাজই সিরাজের তবকাতই নাসিরী এবং টমাস বাউরীর বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী দেহসমূহের বর্ণনায় ও বাংলাদেশের অনুরূপ চিত্র ফুটে উঠে ।[৩]

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৩ ।মাসুদী, মুরুজ আল জাহাব ওয়া মাদানে জাওহার,(১৩০৩হিঃ) ইলিয়ট (অনুবাদ)এ্যারাব জিওগ্রাফারস,পৃঃ৩২ ।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩২ ।ইবনে খুরদাদবীহ,কিতাব আল মাসালিক আল মামালিক (অনুবাদ) ইলিয়ট, এ্যারাব জিওগ্রাফারস, পৃঃ ১৬ ।

৩. বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে আবার রুহমীর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, রুহমী রামু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। রামু চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিনাংশের অর্ন্তগত কক্সবাজারের একটি স্থান। র‍্যালফ ফিচ ১৫৮৫-৮৬ সালে বঙ্গদেশ পরিদর্শন করে চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্যে অবস্থিত রেকন (আরাকান) ও র‍্যামে (রামু) রাজ্যের উল্লেখ করেছেন।[১] এ থেকে বুঝা যায় যে, ষোড়শ শতকে চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে রামু বলা হত। রামু সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা হওয়াতে আরব বণিকদের সরাসরি সান্নিধ্যে আসে। অতপর তারা সমুদ্র ও কামরুপের মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলকে রামু নামে আখ্যায়িত করে। এখানে উল্লেখ্য যে, এস, সি, দাস রামু সম্পর্কে যে ভৌগলিক বিবরণ দিয়েছেন এবং র‍্যালিফ ফিচ রামু সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মোটামুটি একই রকমের। তাই রহ্ম বা রামুকে আমরা একই অঞ্চলের দুরকম নাম হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

এ ছাড়াও প্রমান পাওয়া যায় যে, আরব বণিকদের বর্ণিত রাহমী রাজ্যের সীমানা বাংলার ভৌগলিক সীমানার সঙ্গে মিল আছে। এর একদিকে ছিল সমুদ্র ও অপরদিকে কামরুপ। আরবদের উল্লেখিত রাহমী রাজ্যের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ও রপ্তানী দ্রব্য ছিল বাংলার বিশিষ্ট জিনিস। সোলায়মান এ দেশের মৃত কুমারী কাঠ, কড়ি এবং এক ধরনের সূক্ষ্ম ও মিহি সূতী বস্ত্রের (মসলিন) কথা উল্লেখ করেছেন।[২] খুরদাদবীহও রাহমীর এসব সামগ্রীর কথা উল্লেখ করেছেন।[৩] পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি' নামক গ্রন্থে উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্রের উল্লেখ হয়েছে।[৪] অতএব এ সমস্ত প্রমানাদিতে একথা প্রমাণ হয় যে, রাহমী ও বাংলা এক ও অভিন্ন।

----

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩। সিলসিলাহ আত তাওয়ারীখ, ইলিয়ট এ্যারাবজিওগ্রাফারস, পৃঃ ৪।

৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩, ইলিয়ট, এ্যারাব জিওগ্রাফারস, পৃঃ ৬

৪. পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি, উইল ফ্রিড, এইচ, স্কফ কর্তৃক সম্পাদিত ১৯১২, পৃঃ ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম যুগের ভৌগলিকদের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, আরবের মুসলিম বণিকরা তাদের প্রাচ্য দেশীয় যাত্রায় সমন্দর, 'ওরনাসীন[১] ও আবিনা (বার্মা) পর্যন্ত ভ্রমন করে। তাদের বর্ণিত সমন্দর বন্দরের পরিচয় সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সমন্দর বাংলার উপকূল অঞ্চলের একটি বন্দর ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই।[২] ইবনে খুরদাদবিহ্ সমুদ্র উপকূলবর্তী বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রের যে নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে একটি বন্দর সমন্দর নামে বিখ্যাত ছিল।[৩]

ইবনে খুরদাদবিহ্ (মৃত্যু ৯১২ খৃীঃ) আরো উল্লেখ করেছেন যে, সমন্দর চাউল উৎপাদন করে এবং 'কামরুন' ও অন্যান্য স্থান হতে ১৫ বা ২০ দিনের নদীপথে এস্থানে ঘৃত কুমারী কাঠ আমদানী করা হয়।[৪] আল ইদ্রিসী এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন সমন্দর একটি বাণিজ্য কেন্দ্রও সমৃদ্ধশালী বড় শহর। এখানে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রচুর মুনাফার সুযোগ আছে। কাশ্মীর হতে প্রবাহিত 'খাওর' বা প্রবেশ পথের উপরে এ বন্দর অবস্থিত। তিনি এই স্থানে চাউল উৎপাদন এবং ১৫ দিনের নদীপথে এখানে কামরুপ থেকে ঘৃত কুমারী কাঠ আমদানীর কথাও উল্লেখ করেছেন।[৫] আল ইদ্রিসী কখনও ভারত বর্ষে আসেননি তা সত্ত্বেও তার সমন্দর বন্দরের বর্ণনার সঙ্গে ইবনে খুরদাদবিহর বর্ণনার যথেষ্ট মিল রয়েছে। কেননা আরব দেশীয় এই ভৌগলিকের মতে 'কামরুপ বা কামরুন' এলাকা হতে নদীপথে এ সমুদ্র বন্দর ছিল ১৫ থেকে ২০ দিনের পথ। তাছাড়া এ এলাকা প্রচুর পরিমানে রপ্তানীযোগ্য ঘৃত কুমারী কাঠ উৎপাদন করে। কামরুপ বাংলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র মেঘনার মাধ্যমে সমুদ্র বন্দরগুলোর সাথে যুক্ত ছিল। বাংলার উত্তরে অবস্থিত কামরুপ সম্পূর্ণ স্থল বেষ্টিত দেশ। বাংলার বন্দরগুলো ব্যতীত সমুদ্রে প্রবেশের

----

১. ওরনাসীন, আরাকানের পুরাতন নাম 'রোসাঙ্গ' বা রোসাঙ্গের অপভ্রংশ।

২. বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০,৪১।
ডঃ হাছান দানী, "আর্লী মুসলিম কনট্যাক্ট উইথ বেঙ্গল", প্রসিডিংস অব দি পাকিস্তান হিস্টোরিকাল কনফারেন্স, ১ম সেশন (করাচী, ১৯৫১) পৃঃ ১৯৫।

৩. সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ও ইসলাম, ১ম খন্ড (ঢাকা ১৩৯৪ বাংলা) পৃঃ ২৪,২৫।

৪. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১। এম, এইচ, নায়নার, "এ্যারাব জিওগ্রাফারস, নলেজ অব সাউর্থান, ইন্ডিয়া, পৃঃ ৮৯।

৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য কোন পথ নেই । সুতরাং ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মধ্য দিয়ে সমুদ্র বন্দরের মুখে নীত না হলে কামরুপের পক্ষে ঘৃত কুমারী কাঠ রপ্তানী করা সম্ভব হত না ।

উপরোক্ত যুক্তির ও অভিমতের সমর্থনে আরব ভৌগলিকদের বর্ণনাও পাওয়া যায় ।তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, সমন্দর সাগর উপকূলের প্রবেশ পথে একটি বড় নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং উহা মুসালা নামক অপর একটি নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল । তৎকালে ব্রহ্মপুত্র, কামরুপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সোনার গাঁয়ের দক্ষিনে মেঘনার সহিত মিলিত হয়ে এদের সম্মিলিত প্রবাহ সন্দ্বীপের নিকটে বঙ্গোপসাগরে পতিত হত । সন্দ্বীপের নিকট এই সমস্ত নদীর মোহনায় বিখ্যাত সমন্দর বন্দর অবস্থিত ছিল ।[১]

আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সন্দ্বীপ তৎকালীন সময়ে আরেকটি বন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল । আরব বণিকরা প্রাচ্যের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে এই বন্দরটি পরিদর্শন করে ।আল ইদ্রিসী উল্লেখ করেছেন, সমন্দর বন্দর থেকে এক দিনের পথ এ পরিমান দূরে অবস্থিত একটি জন বহুল দ্বীপ আছে, যেখানে সকল দেশের বণিকরা প্রায়ই আসে । সরনদ্বীপ (সিংহল) থেকে এটা চার দিনের পথ ।[২] আল ইদ্রিসী বর্ণিত দ্বীপটি যে সন্দ্বীপ এ মতের সমর্থন পর্তুগীজদের বর্ণনা হতে ও প্রমাণ পাওয়া যায় । পর্তুগীজদের বর্ণনায় সন্দ্বীপ দ্বীপটিকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ।[৩] অতএব আমরা উপরোক্ত আলোচনার উপর নির্ভর করে বলতে পারি যে, আরব ভৌগলিকদের বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, আরব মুসলিম বণিকরা বাংলার উপকূলবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের সাথেই সুপরিচিত ছিল এবং তারা ক্রমশ

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২ । ডঃ এ,এইচ, দানী, উল্লেখ করেছেন যে, এখন পর্যন্ত মেঘনার মোহনার অধিবাসীরা সে অংশের সমুদ্র অঞ্চলকে সমন্দর নামেই ডেকে থাকে । আর্লি মুসলিম কনটাক্ট উইথ বেঙ্গল-প্রোসিডিংস অব দি পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল কনফারেন্স, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৫ ।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ৪২ ।

৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ৪২ । আর্লি মুসলিম কনটাক্ট উইথ বেঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯৫, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬০ ।

Dhaka University Institutional Repository

আসা যাওয়া করত । তারা তখনও সম্ভবত বাংলা, বঙ্গ বা বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত ছিলনা, এজন্য তারা এদেশকে রুহমী বা রাহমী ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছিল । এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এক সকল মুসলিম আরব বণিকরা শুধু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আগমন করেনি । তারা ব্যবসার সাথে সাথে ইসলামের বাণী সুযোগ বুঝে মানুষের কাছে প্রচার করেছে । তৎ সময়ের মানুষেরা ইসলামের সাম্যের বাণী শ্রবন করে এবং মুসলিম বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের আচার ব্যবহার ও ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে । তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে দুটি ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা বেশী ছিল । এক হিন্দু ব্রাহ্মন অপরটি বৌদ্ধ । হিন্দু ব্রাহ্মনেরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অকথ্য অত্যাচার, অবিচার, নিপীড়ন, ধর্মান্তরিত করন, ধর্ম কাজে বাধা ইত্যাদি নির্যাতন চালাত । অপরদিকে হিন্দু ব্রাহ্মন্যবাদের শ্রেনীবিভেদ, বর্ণভেদ ও কৌলিন্য প্রথা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি মানুষকে অসহ্য ও ভীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল । মানুষ এই অত্যাচার, অবিচার থেকে মুক্তি ও শান্তি পাওয়ার আশায় দিন গুনছিল । ঠিক এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষনে আরব মুসলিম বণিকদের বাংলাদেশে আগমন এবং তাদের দ্বারা সাম্যের ধর্ম ইসলামের বানী প্রচারের কারণে অত্যাচারিত মানুষদেরকে আলোড়িত ও আন্দোলিত করে তুলে । তারা ইসলামের সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, অপরের প্রতি মমত্ববোধ, ভালবাসা, ইত্যাদি মানুষের প্রতি ভেদাভেদহীন সম্পূর্ণ এক নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং অত্যাচারের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে ।

ইসলাম প্রচারের প্রাক্কালে আমরা দেখতে পাই বাংলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে আত্মিক সাধনার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রচলন ছিল । মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ এই সাধনার পন্থাকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে ছিলেন । ধর্ম প্রচারকদের আত্মত্যাগ ও সাধনা বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক মতবাদ ও হিন্দুবেদান্ত দর্শনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল । এর ফলশ্রুতিতে হিন্দু মুনি ঋষি, ব্রাহ্মন এবং বৌদ্ধ, যোগী ও সিদ্ধাচার্যগণ দলে দলে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে ।[১] এভাবে তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারক কর্তৃক সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে ।

----

১. এ,এফ,এম,আবদুল জলীল,'পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ',খুলনা, ১৯৭৫, পৃঃ ২১৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

আরব ভৌগলিকগণ সমন্দর নামক যে বন্দরের উল্লেখ করেছিলেন, প্রফেসর আবদুল করিম এই সমন্দরকে চট্টগ্রাম বলে চিহ্নিত করেছেন।[১] এই সমন্দরকে আবার অনেক পর্যটক এবং ভৌগলিকবিদগণ 'সুদকাওয়ান' নামে অভিহিত করেছেন। যেমন মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশে আমরা প্রথমে যে শহরে প্রবেশ করি তার নাম ছিল 'সুদকাওয়ান' ইহা সমুদ্র তীরে অবস্থিত একটি শহর। হিন্দুদের তীর্থ স্থান গঙ্গানদী এবং 'যুন'(যমুনা) নদী সমুদ্রে পতিত হওয়ার আগে এর কাছাকাছি স্থানে এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে। যদিও 'সুদকাওয়ান-এর চিহ্নিত করনের বিষয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবুও এন,কে,ভট্টশালীর অভিমত অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। ভট্টশালী চট্টগ্রামকে 'সুদকাওয়ানের' সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন।[২]

ইবনে বতুতা আরো উল্লেখ করেছেন যে, চট্টগ্রাম 'সুদকাওয়ান' সাগরের তীরে অবস্থিত এবং এর সন্নিকটে সমুদ্রে পতিত হওয়ার আগে গঙ্গা ও যমুনা নদী একসংগে মিলিত হয়েছে। আবুল ফজলের মতে গঙ্গানদী চট্টগ্রামের নিকটে সমুদ্রে পতিত হয়।'ডি ব্যরসের' মানচিত্রে ও এইমতের সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, প্লিনাস হতে আবুল ফজল পর্যন্ত কয়েকশত বছরের ব্যবধানে গঙ্গা নদীর পূর্ব ধারায় সময় সময় পরিবর্তন হলেও দুটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য সব সময় বজায় আছে। যেমন (ক) নদীর মোহনার কাছাকাছি স্থানে একটি বন্দর বা নগরের অস্তিত্ব এবং (খ) বন্দরের বিপরীত দিকে একটি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপের অস্তিত্ব। আইন-ই-আকবরী এবং ডি-ব্যরসের' মানচিত্রে বন্দরটিকে চট্টগ্রাম এবং দ্বীপটিকে সন্দ্বীপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রফেসর করিম এর উপর ভিত্তি করে মন্তব্য করেছেন যে,ইবনে বতুতার সুদকাওয়ানকে চট্টগ্রামের সাথে এবং প্লিনাসের Chryse (খারাইজ)কে সন্দ্বীপের সাথে

---

১. বাংলাদেশ ও ইসলাম, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪,২৫।

২. প্রফেসর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮। ট্রাভেলস অব ইবনে বতুতা,৪র্থ খন্ড, ডিফ্রেমারী ও সেঙ্গুনেটি কর্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ২১২।জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ৮ম খন্ড, নং-২, ১৯৬৩, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

চিহ্নিত করা যায়।[১] সুতরাং আরব ভৌগলিকদের কর্তৃক বর্ণিত সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে এবং দ্বিপটিকে সন্দ্বীপের সাথে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এখন ইহা প্রমাণিত হয় যে, আরব বণিকরা বাংলার উপকুল অঞ্চল পরিভ্রমন করেছিল এবং এর সমন্দর তথা চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ ইত্যাদি সমুদ্রগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক করেছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের অনেক পূর্বেই মুসলমানরা আরাকান ও চট্টগ্রাম আগমন করে এবং বানিজ্যের উদ্দেশ্যে সেখানে তারা বসবাস শুরু করে। শুধু তাই নয় আরব বণিকদের সমুদ্র উপকুলবর্তী দ্বীপ সন্দ্বীপেও তাদের পদাচরন হয়েছে। কেননা সন্দ্বীপ ও তৎকালীন সময়ে একটি বিখ্যাত বন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল। বস্তুত আরব ব্যবসায়ীগণ মেঘনার মুখ হতে কক্সবাজার পর্যন্ত যাতায়াত করত বলে ভৌগলিক বিবরণে প্রমাণ পাওয়া যায়।[২]

মুসলমান বণিকরা যে সন্দ্বীপ দ্বীপে আসত সে সম্পর্কে ডঃ আবদুর রহিম বর্ণনা দিয়েছেন যে, পঞ্চদশ শতকে সন্দ্বীপ হাতিয়া ও বাংলার উপকুল এলাকায় বাংলার মুসলিম শাসকদের অধিকার বিস্তৃত হয়নি। তা সত্ত্বেও বারথেমা বার্বোসা যখন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মেঘনার মোহনায় বাঙ্গালা শহর পরিভ্রমন করেন তখন তারা তথায় অনেক আরবী, ইরানী ও আবিসিনীয় বণিক এবং অন্যান্য মুসলমান বসতি দেখেছিলেন। কিভাবে এ সকল মুসলমানরা এল? এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার সমুদ্র বন্দরগুলোর সঙ্গে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য চলাকালে তারা এখানে আগমন ও বসতি স্থাপন করে।[৩] এ থেকে বুঝা যায় যে, আরব মুসলিম বণিকরা চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য বাংলার উপকূলীয় দ্বীপ ও অঞ্চলসমূহে আগমন করেছিল এবং সমন্দর, সন্দ্বীপ ইত্যাদি সমুদ্র বন্দরগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ গড়ে তুলেছিল।

---

১. প্রফেসর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯।
২. বাংলাদেশ ও ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪,২৫।
৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষনীয় যে, চট্টগ্রামের নামের উৎপত্তি হতে অনুমান করা যায় যে এ স্থানের সঙ্গে আরব বণিকদের দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিল । ইবনে বতুতা, চীনা লেখকগণ ও আবুল ফজলের বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, চট্টগ্রাম গঙ্গার মোহনার কাছে অবস্থিত ছিল । গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলে এর (চট্টগ্রাম) অবস্থানের কারণে আরব বণিকরা চট্টগ্রামের নাম দিয়েছিল 'সাত-আল-গঙ্গা' যা কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে চাটগাঁও ও চট্টগ্রাম নামে রূপান্তরিত হয়েছে ।[১] আরাকানী ঘটনা পঞ্জীর উপর ভিত্তি করে, অনেকে মনে করেন যে, চট্টগ্রাম নামটির উৎপত্তি হয়েছে আরাকানী রাজার 'শাত-তা গোয়িং' অর্থাৎ যুদ্ধ করা উচিত নয় এই মন্তব্য থেকে । কেননা ইতিপূর্বে আরাকানের রাজা এ অঞ্চল জয়লাভ করে সেখানে একটি বিজয় স্তম্ভ তৈরী করেছিলেন । কিন্তু ইহা গ্রহণযোগ্য নয় বরং ইহাই সঙ্গত মনে হয় যে, যখন তিনি অভিযান করে এ স্থানে আগমন করেন তখন তিনি 'শাত-আল-গঙ্গা' নামের সঙ্গে পরিচিত হন । ইহা আরাকানী উচ্চারণে 'শাত-তা গোয়িং' এর মত শুনা যায় । এরপর তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন । এভাবে চট্টগ্রাম আরবীয় বণিক কর্তৃক শাত-আল-গঙ্গা নামেরই স্থানীয় ভাষার অপভ্রংশ বলে ধারণা করা যেতে পারে ।[২] বর্ণোলীর মতে আরবী শব্দ 'শাত-অর্থ বদ্বীপ এবং গঙ্গ' অর্থ গঙ্গা হতে আরব বণিকরা এই নাম ব্যবহার করেছিলেন ।

আরাকানি ঘটনা পঞ্জীর উপর ভিত্তি করে আরো একটি উপাখ্যান মতে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ৯৫৩ খৃীষ্টাব্দে আরাকানের রাজা 'সুলত ইঙ্গ চন্দয়,' 'সুরতন' রাজ্য জয় করে সেখানে একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন । বিজয় স্তম্ভটি ছিল 'চেতা গৌং' লেখা । অর্থাৎ যুদ্ধ করা উচিত নয় । রাজার এই উক্তির অনুসারে কালক্রমে এই 'চেতাগৌং' চট্টগ্রামে রূপান্তরিত হয় । অপর একটি জনশ্রুতি আছে যে, 'শাহ বদরের চাটি-ই-নাম থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি ।[৩]

----

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৫ । বার্ণভিল্লীর মতে চট্টগ্রাম নামটি আরবদের থেকে উৎপত্তি হয়েছে । চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পৃঃ১ ।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫, ৪৬ ।

৩. প্রফেসর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০ । জে,এস,এস,বি, ১৮৪৪, পৃঃ ৩) ইস্টার্ণ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, চট্টগ্রাম ,পৃঃ ১ ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান চট্টগ্রামের নাম যেভাবেই হোক না কেন আরব বণিকরা পূর্ব হতেই এ বন্দরের সাথে পরিচিত ছিল এবং তারা এর বিভিন্ন নামকরণ করেছে। আরব বণিকরাই এই বন্দরকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিনত করে। বাংলাদেশের মুল্যবান পন্য দ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহের লক্ষ্যে তাদের অনেকেই চট্টগ্রামে অবস্থান করে। সুতরাং চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তিগত দিক থেকে বুঝা যায় যে, আরব মুসলিম বণিকরা চট্টগ্রাম ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে তথা বাংলাদেশে বহু পূর্ব হতেই ব্যবসা ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন করেছে।

এখন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, উল্লেখিত নামসমুহ আরব ভৌগলিকরা গ্রহণ না করে 'সমন্দর' নামের উল্লেখ করলেন কেন? এ সম্পর্কে স্টিনগাস (Steingass) সমন্দরের এ রূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমন্দর সমন্দল, সমন্দুর এই তিনটি শব্দ 'সাম'(আগুন) এবং আন্দোরোন (অর্থাৎ ভিতরে) হতে উৎপত্তি হয়েছে এবং ইহা হিন্দুস্থানের অন্তর্গত একটি স্থান যেখান হতে মশলা বা চন্দন কাঠ আমদানী করা হয়।[১] এখানে বুঝা যায় যে, সমন্দর নামের একটা বিশেষত্ব আছে এবং এতে প্রতীয়মান হয় যে, সমন্দর শব্দের শেষের অর্থটি আরব ভৌগলিকদের বিবরণের সাহায্যে দেয়া হয়েছে। প্রকৃত শব্দটি 'সমন্দরোন' বা ভিতরে আগুন। তিব্বতী গ্রন্থ 'সমপা খান পো' (Sumpa Khan po) এর লিখিত 'শ্যাগসাম জোন জান' এবং লামা তারা নাথ লিখিত 'কাহবাত ডান ডান' (Kahbad dun dun)এ বলা হয়েছে যে চট্টগ্রামে জলন্দর আছে, সেখানে আগুনের শিখা পানিতে মিশেছে বলে মনে হয়।[২]

তিব্বতী বইগুলি পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত, কিন্তু এ গুলিতে অষ্টম ও নবম শতকের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হবেনা যে, আরব ভৌগলিকদের সমন্দর এবং তিব্বতীদের জলন্দর একই স্থান, হয়ত আরবরা জলন্দরকেই সমন্দর নামে অভিহিত করেছে

---

১. বাংলার ইতিহাস, পুর্বোক্ত, পৃঃ৪০, কম্প্রিহেনসিভ পার্শিয়ান ইংলিশ ডিকশিনারী, সমন্দর শব্দ দ্রষ্টব্য।

২. পুর্বোক্ত, পৃঃ ৪০, জে,এ,এস,বি, ১৮১৮, পৃঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

তাই এখন বিশেষ কোন সন্দেহ থাকেনা যে, আরব ভৌগলিকদের সমন্দর এবং চট্টগ্রাম একও অভিন্ন। সমন্দর নামটি এখনও স্থানীয় জনগনের মনে আছে কিন্তু তারা সমন্দরের পুরাতন অর্থ ভুলে সমুদ্রকেই সমন্দর বলে থাকে।[১] উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় আরব ভৌগলিকদের বর্ণিত সমন্দর এবং চট্টগ্রাম অভিন্ন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও অন্যান্য উপকূলবর্তী অঞ্চল যেমন সন্দ্বীপ ইত্যাদির সঙ্গে আরব মুসলিম বণিকদের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। অতএব আরব ভৌগলিকদের বর্ণনা হতে ধারণা করা যায় যে, বঙ্গোপসাগরীয় বন্দর চট্টগ্রামে তাদের বাণিজ্য তরী ভিড়ত।

বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের বহু পূর্বেই আরব ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কও আদান প্রদান এবং মুসলিম আরবী ব্যবসায়ীদের আগমনের ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে কোন মত পার্থক্য না থাকলেও বাংলাদেশে মুসলমান বণিকদের বসতি স্থাপনের প্রশ্নে তাদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ডঃ এনামুল হক জানিয়েছেন যে, দশম শতাব্দীর দিকে আরব বণিকগণ চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিল। তিনি আরো এগিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, নবম শতাব্দীর দিকেই চট্টগ্রামে তাদের বসতি স্থাপিত হয়েছিল।[২] ডঃ আবদুর রহিম উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম যুগের আরব বণিকগণ বাণিজ্য উদ্দেশ্যে প্রাচ্যের বহু স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল। এভাবে তারা মালাবার সিংহল, জাভা, মালয়, বোর্ণিও এবং ভারত মহাসাগরের বহু দ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিল। ইহা অসম্ভব নয় যে, বাংলার ঐশ্বর্য ও মূল্যবান গন্য দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিছু সংখ্যক আরব বণিক এদেশে সমুদ্র উপকূল ও বন্দরসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল।[৩]

----

১. বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪০।

২. বাংলাদেশ ও ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫।

৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫। বাংলাদেশ ও ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

আরব মুসলিম বণিকগণ চট্টগ্রামে যে বসতি স্থাপন করেছিল তা আমরা উপাখ্যানের মাধ্যমে ও জানতে পারি। একটি উপাখ্যানে দেখা যায় যে, আরাকানের রাজা 'সুলত ইঙ্গ চন্দয় অ', 'সুরতন' জয় করে সেই দেশে একটি বিজয় সুম্ভ স্থাপন করেন। রাজার উক্তি অনুসারে তার নাম হয় 'চেত্তাগৌং'[১]। আধুনিক পন্ডিতদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, সুরতন শব্দটি 'সুলতান' শবেদর আরাকানী রূপ এবং তদানুসারে তারা উল্লেখ করেন যে, চট্টগ্রামে ঐ সময় মুসলমানেরা একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিল।[২] ডঃ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ অবশ্য সুরতনকে সুলতান শব্দের আরাকানী রূপ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে, ঐ সময়ে আরব বণিকরা বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। এমন কি তারা দশম শতাব্দীর মাঝা মাঝি সময়ে উক্ত এলাকায় তাদের প্রভাবে ছোট খাট এক রাজত্ব ও প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখানকার রাজাকে সুলতান নামে অভিহিত করা হয়।[৩]

ডঃ আবদুর রহিম উল্লেখ করেছেন যে, আরাকানের রাজা যুদ্ধ করে সে স্থানটি দখল করে বিজয় সুম্ভ স্থাপন করেছিলেন, তখন তিনি 'শাত-আল গঙ্গা' নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[৪] এই আরব বণিকরাই চট্টগ্রামের নাম শাত-আল-গঙ্গা দিয়েছিল। অপরদিকে আরাকানের রাজা 'সুরতন' বা চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন দশম শতকের দিকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে আরব বণিকরা আরাকানের রাজার সুরতন জয়ের বহু পূর্বেই চট্টগ্রামে এসেছিল এবং সেখানে তারা বসতিও স্থাপন করেছিল, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। এভাবে চট্টগ্রাম আরবী বণিক কর্তৃক শাত-আল-গঙ্গা নামেরই স্থানীয় অপভ্রংশ বলে অনুমান করা যেতে পারে। আরব বণিকরা এই বন্দরকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের একটি বৃহৎ কেন্দ্রে পরিনত করে। পন্য দ্রব্য নিয়মিত সরবরাহের লক্ষ্যে তাদের নিজেদের কিছু সংখ্যক বণিক চট্টগ্রামে অবস্থান করে এবং কালক্রমে এরা প্রভাবশালী হয়ে উঠে। ফলে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

---

১. জে,এ,এস,বি,১৮৪৪, পৃঃ ৩৬।

২. ডঃ এনামুল হক, ও আবদুল করিম, "আরাকান রাজ্য সভায় বাংলা সাহিত্য", (কলিকাতা,১৯৩৫) পৃঃ ৪।

৩. পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ২২৩।

৪. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে যে আরবীয় বণিকগণ বসতি স্থাপন করেছিল তা একটি আরাকানী ঘটনাপঞ্জী হতেও জানা যায় যে, আরাকান উপকূলের নিকট জাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার পর কিছু সংখ্যক আরব বণিক, রাজা মা-বে তোয়িং মান-দা-য়্যাব (৭৮৮-৮১০ খৃীঃ) এর সহায়তায় সে দেশের কয়েকটি গ্রামে তাদের বসতি স্থাপন করেন ।[১] ডঃ এনামুল হক আর একটি আরাকানী ঘটনাপঞ্জী হতে দশম শতকের শুরুতেই চট্টগ্রামে আরবরা বসতি স্থাপন করেছিল বলে উল্লেখ করেছেন । এই ঘটনাপঞ্জী থেকে জানা যায় যে, আরাকান রাজা সু-লা-তায়িং স্যান-দ্যা-য়্যা(৯৫১-৯৫৭ খৃীঃ) বাংলা আক্রমন করে সুরাতনকে পরাজিত করেন ।[২] ডঃ এনামুল হকের মতে, সুরাতান-হল সুলতান শব্দের আরাকানী রূপ । এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ঐ সময়ে চট্টগ্রামে মেঘনার মোহনা থেকে পূর্বে নাফ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি আরব রাজ্য ছিল এবং এর শাসন কর্তা সুলতান উপাধি ধারন করতেন ।[৩] অবশ্য প্রকারন্তরে ডঃ আবদুর রহিম ডঃ হকের অভিমতকে সমর্থন করেছেন ।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আরব বণিকগণ নিশ্চয়ই একজন দলপতির অধীনে দলবদ্ধভাবে বসবাস করতেন । এই আরব দলপতি ছিলেন 'সুরতন' । আরাকান রাজ সুলা তায়িং স্যান দায়্যা' (৯৫১-৫৭ খৃীঃ) তার অভিযানে একেই অর্থাৎ সুরতনকে পরাজিত করেন বলে দাবী করেন । তিনি উল্লেখ করেন যে, ডঃ এনামুল হকের 'থুরা-তন' শব্দটির সুলতান হিসেবে পাঠ করা বা মনে করা কলপনা প্রসূত বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না । এই নামের শব্দ গঠনের সঙ্গে কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, আরাকানী নাম কিংবা উপাধির কোন রূপ সম্পর্ক নেই । অবশ্য হিন্দীতে সুলতান শব্দটি সুরতান' রূপে উচ্চারিত হয় এবং যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে, ইহা মুসলমান নাম বা উপাধিরই হিন্দীর বিভিন্ন উচ্চারন । কিন্তু আরাকানী ঘটনাপঞ্জী এই শব্দটিকে দশম শতকের মধ্যভাগে চট্টগ্রামে সংঘটিত একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে বর্ণনা করে । ইহা উল্লেখ্য যে সে সময় হিন্দি

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪ । জে,এ,এস,বি ১৮৪৪, ১৩শ সংখ্যা, পৃঃ ৩৬ ।

২. জে,এ,এস,বি, ১৮৪৪, ১৩শ সংখ্যা, পৃঃ ৩৬ ।

৩. ডঃ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম প্রচার, পৃঃ ১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার জন্ম সঠিকভাবে হয়নি । এই ব্যাপারে ইহা বলা অসঙ্গত হবেনা যে, 'সুরতান'-সুলতান শব্দেরই আরাকানী অপভ্রংশ । এই সুলতান অবশ্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রভাবশালী আরব বণিকদের প্রধান বা দলপতি ছিলেন ; কিন্তু কোন রাজ্যের শাসক ছিলেন না ।[১]

তবে যে সব তথ্য ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ডঃ এনামুল হক, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ডঃ আবদুর রহিম প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ যে বক্তব্য দিয়েছেন তা খুব জোড়ালো নয় বলে প্রফেসর আবদুল করিম এবং মমিন চৌধুরী দ্বিমত পোষণ করেছেন । তাঁদের মতে বখতিয়ার খিলজীর পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশে মুসলমানদের বসতি ছিল বা মুসলমান রাজ্য ছিল এমন মনে করার কোন সরাসরি সাক্ষ্য প্রমাণ নেই ।[২] প্রফেসর করিম উল্লেখ করেছেন যে, চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে আরব মুসলমান বণিকদের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু চট্টগ্রামে মুসলমানেরা আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিল, ইহা বলা অতিরঞ্জন ছাড়া কিছু নয় ।তাছাড়া একটি মাত্র শব্দ 'সুরতন' যার অর্থ পরিষ্কার নয়, তার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয় । দ্বিতীয়ত আরাকান বংশাবলী পড়ে মনে হয় 'সুরতন' শব্দটি 'সুলতান' এর বিকৃত রূপ নয় বরং ইহা কোন অধুনালুপ্ত স্থানের নাম বহন করে ।[৩] অর্থাৎ তারা বুঝাতে চান যে চট্টগ্রামে আরব মুসলিম বণিকদের কোন বসতি বা রাজ্য ছিল না ।

এ প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, প্রফেসর করিম এবং প্রফেসর মমিন চৌধুরী চট্টগ্রামে মুসলিম বসতি বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে দ্বিমত পোষণ করেছেন তা পুরোপুরিভাবে ঠিক নয় । যদিও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিতর্ক থাকলেও বসতি স্থাপনের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই বলে মনে হয় । কেননা যদি আরব বণিকদের আগমনকে স্বীকৃতি দেয়া হয়, তবে বসতি স্থাপন যে করেছিল এই মতকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না । কেননা বিভিন্ন উপাখ্যানে আমরা

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৬ ।

২. বাংলাদেশ ও ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬ ।

৩. প্রফেসর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪১ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩/

প্রমাণ পেয়েছি যে, আরব বণিকরা যে কারণেই হোক না কেন তারা চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাস করেছে। এ সব বণিকরা স্বভাবত চট্টগ্রামে বসে থাকেনি, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তারা নদী পথ দিয়ে বিভিন্ন বন্দরে বন্দরে ঘুরেছে। এবং শুধু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই তারা অবস্থান করেনি বরং তারা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সাথে ধর্ম প্রচারও করেছে। এরফলে উক্ত এলাকার অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে এবং ক্রমশ তা আরব মুসলিম বণিকদের আগমন ও স্থানীয় লোকদের ইসলাম ধর্ম গ্রহনে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, তৎকালীন সময়ে উগ্র ও মৌলবাদী ব্রাহ্মণ দের অত্যাচার, অবিচার, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বিবর্জিত আচরণ, ধর্মান্ধ করনে বাধ্য করণ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জাতি, বর্ণভেদ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা, শ্রেনী বিদ্বেষ ইত্যাদি কারণে তৎকালীন সময়ের মানুষের মধ্যে এক অস্থির অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই এর থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় তারা অহর্নিশ অপেক্ষা করত। ঠিক এমনি এক সময় যখন আরব মুসলিম বণিকরা তাদেরকে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব বোধের বাণী শুনালেন, তখন তারা ইসলাম ধর্মের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে ও মুসলমান হতে থাকে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচার, বর্ণভেদ ও কৌলিন্য প্রথার কারণে এ কাজ আরো দ্রুত ত্বরান্বিত হতে থাকে। এভাবে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একথা বলা অসঙ্গত হবেনা যে, এভাবে মুসলমানদের সংখ্যা চট্টগ্রামের বিস্তৃর্ণ এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং একটা মুসলিম বসতি ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। হয়ত এই নতুন মুসলমানদের ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য একজন নেতা বা পরিচালকের প্রয়োজন দেখা দেয়, সে কারণে হয়ত কাউকে নেতা বা পথ প্রদর্শক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। অনুমান করা যায় যে, এই নেতা বা পথ প্রদর্শককে আরব বণিকরা সুলতান নামে অভিহিত করতেন। সুরতন শব্দটি এই সুলতানের অপভ্রংশ হিসেবে পরিচিত ছিল, যা আরাকানের রাজা বিজয় করেছিলেন। অতএব আমরা বলতে পারি যে, আরব বণিক ও স্থানীয় মুসলমানদের কর্তৃক সে সময়ে চট্টগ্রামে বর্তমান কালের ন্যায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হলেও বসতি স্থাপন যে হয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা এবং উক্ত বসতি বা এলাকার যিনি নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি সুলতান নামে অভিহিত হতেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে সৈয়দ আমিরুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ না হলেও একথা অনুমান করা অযৌক্তিক হবেনা যে, আরব মুসলিম ব্যবসায়ীরা কেবল বাণিজ্য উদ্দেশ্যে এলেও তারা ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছে এবং ইসলামের আবির্ভাব ও সূত্রপাত এদেশে তারাই ঘটায়। আরব ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই নতুন ধর্মের বক্তব্য এ দেশীয় লোকদের কাছে তুলে ধরেছিল। বিভিন্ন ধরণের আচার অনুষ্ঠান যেমন নামাজ, রোজা, ঈদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য তারা এদেশের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। যতই দিন যেতে থাকে ততই তারা এদেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিসরে প্রবেশ করতে থাকে।[১] সুতরাং যতই তারা এ দেশীয় লোকদের সাথে মিশেছে, সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, ততই তাদের সাথে এ দেশের মানুষের সম্পর্ক গভীর ও জোরদার হয়েছে। এমন কি আরব বণিকরা এদেশীয় মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সূত্রেও আবদ্ধ হয়ে এখানেই থেকে গেছে। এভাবে আরবী মুসলিম বণিক, তাদের এদেশীয় বংশজাত মুসলিম সন্তান এবং স্থানীয় নতুন মুসলমানদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে মুসলিম বসতি। এভাবে ইসলাম ধর্মের প্রভাব তৎকালীন সমাজে ক্রমাগত এগুচ্ছিল।

মাহবুব উল-আলম উল্লেখ করেছেন যে, অষ্টম শতকের প্রথম দিকে ভারত বর্ষের সমুদ্র বক্ষে আরব বণিকগণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। সম্ভবত এই সময় তারা চট্টগ্রামে পৌছান। আরবগণ সাধারনত দেশ হতে সাথে স্ত্রী লয়ে বাহির হত না। যেখানেই তারা যেত সেখানেই স্থানীয় রমনীদের মুসলমান করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসতি স্থাপন করত। চট্টগ্রামেও তারা এভাবে বসতি স্থাপন করেছিল বলে মনে হয়।[২] বিশেষত বণিকগণের সঙ্গে সঙ্গে বহু অলী দরবেশ ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। সম্ভবত ঐ সময় হাওলার অন্তর্গত সৈয়দপুর মৌজা এবং সৈয়দখালী আবাদ করেন। তাহলে আমরা উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে আরব বণিকরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে এ দেশের রমনীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। এভাবে বিরাট এলাকা জুড়ে তাদের বসতি স্থাপিত হয়েছিল।

----

১. বাংলাদেশ ও ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬, ২৭।

২. মাহবুব উল-আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস, (পুরানা আমল)(চট্টগ্রাম,১৯৬৫) পৃঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

আরব বণিকরা যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল আরেকটি উপাখ্যানের মাধ্যমে আমরা তার প্রমাণ পাই । আরাকান রাজ বংশীয় উপাখ্যান 'রা দজা-তুয়ে', এতে নিম্নরূপ একটা কথার উল্লেখ আছে যে, এই সময়ের শেষভাগে 'কান-রা দজাগীর' বংশধর মত্য ইঙ্গিত চন্দ্রযুত' সিংহাসনে আরোহন করেন । এই রাজা দীর্ঘ বাইশ বছর রাজত্ব করার পর মৃত্যু বরণ করেন । কথিত আছে যে, তাঁর সময়ে ৭৮৮-৮১০ সালের দিকে কয়েকটি 'কুল' অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ' 'রনব্রী' দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙ্গে যায় এবং জাহাজের মুসলমান বণিক আরোহীদেরকে আরাকানে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে তারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করে ।[১] আরব বণিকরা যে বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য চালাত ইহা আর একটি প্রমাণ এবং আরাকান উপকূলে ব্যবসা করলে চট্টগ্রাম বন্দরকে মোটেই বাদ দেয়া যায় না, অর্থাৎ আরাকানে যেতে হলে চট্টগ্রামকে পেরিয়েই যেতে হবে তা উপরোক্ত উপাখ্যান হতে বুঝা যায় । আরব বণিকরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন করলেও তারা ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছে, তারা এদেশের মানুষের সাথে ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে মিশেছে, তাই বিভিন্ন কারণে তারা এদেশকে ভালবেসে থেকে গেছে ।তাদের এ অবস্থান এবং আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এ দেশীয় মানুষের ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি কারণে ক্রমশ আলাদাভাবে একটি মুসলিম সমাজ সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং এর ফল স্বরূপ আঞ্চলিকভাবে বসতিও গড়ে উঠে । যাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই ।বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে আরব মুসলিম বণিকদের যে আগমন হত এবং কোন কোন এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল, এবং সেখানকার সমাজ ও সংস্কৃতির উপর যে আরবী প্রভাব পড়েছিল তা উক্ত এলাকার ভাষা, সংস্কৃতি ও চাল চলন হতেও বুঝা যায় ।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী উপকূলবর্তী অঞ্চল আরবীয় প্রভাবযুক্ত কেননা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় ।চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়া পদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দ ব্যবহার ও আরবী ভাষার প্রভাবের ফল ।এ ছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন আলকরন, সুলকবহর, বাকলিয়া ইত্যাদি এখনও আরবী নাম বহন করে ।[২] এর কারণ এই যে, এই অঞ্চলসমূহ অবশ্যই আরবী ভাষাভাষী আরবদের দীর্ঘকাল

---

১. প্রফেসর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪১।জে,এ,এস,বি,১৮৪৪,পৃঃ ৩৬ ।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ৪১ ।

Dhaka University Institutional Repository

সান্নিধ্য লাভ করেছিল । স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে কিছু সংখ্যক আরবীর নিছক সংস্পর্শের ফলে আচার ব্যবহারে ও রীতি নীতিতে এত গভীর আরবীয় প্রভাব সৃষ্টি হতে পারেনা । আরবদের বসতি স্থাপন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের আদান প্রদান মিলামিশা ব্যতীত কোন প্রকারেই এই প্রভাব সম্ভব হত না ।[১] তাই দীর্ঘ দিনের মিলা মিশা, সংস্পর্শ, আদান প্রদান ইত্যাদি কারনেই উক্ত অঞ্চলসমূহে আরবী প্রভাব পড়েছিল এবং ইহা স্থায়ী বসতি স্থাপিত না হলে সম্ভব ছিলনা ।

বাংলা সাহিত্যের ভাষা তাত্ত্বিকদের মতে, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর স্থানীয় উপ-ভাষায় অনেক আরবী শব্দ, বাগধারা ও ভাষা প্রয়োগ পদ্ধতির অসংখ্য সংমিশ্রন রয়েছে । এমন কি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিদের লেখায় ও আরবী শব্দ বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হত । এসব অঞ্চলের অনেক স্থানে আরবী নাম দেখা যায় । আজও অনেক আরবীয় প্রথা এমনকি বহু আরবী খেলাধুলা পর্যন্ত সেখানে প্রচলিত আছে ।[২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, চট্টগ্রামের ভাষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক নাম ইত্যাদির মধ্যেও আরবী প্রভাব রয়েছে । আর ইহা দুই এক বছরে সম্ভব হয়নি , বরং দীর্ঘ দিনের অবস্থানের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে । তাই মুসলিম বিজয়ের পূর্বে আরবরা যে বসতি স্থাপন করেছিল এবং ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা । ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১২৫০ খৃীঃ) পূর্ব বঙ্গে মুসলিম আধিপত্যের প্রবনতা ও ক্রমবর্ধমানতা বাংলা সাহিত্যেও-এর প্রতিফলন হয়েছে । এই প্রভাব ও আধিপত্য এত বৃদ্ধি পায় যে, মুসলমানদের সঙ্গে সংস্পর্শের ভয়ে অনেক কুলীন ব্রাহ্মন পূর্ব বঙ্গের নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে পশ্চিম বঙ্গে বসতি স্থাপন করে । বাংলা ভাষায় রামায়ন কাব্যের লেখক চতুর্দশ শতকের হিন্দু কবি কৃত্তিবাস ওঝার মতে, এক ভয়ংকর ভীতি ব্রাহ্মনদের উৎকন্ঠিত করে তোলে, ফলে তারা সুখের জীবন ত্যাগ করে পশ্চিম বঙ্গে চলে আসে । কবি আরো উল্লেখ করেছেন, তাঁর পূর্ব পুরুষ নারসিংহ ওঝা, যিনি দনুজমর্দন দেবের (সুলতান বলবনের সময়ে সোনার গাঁয়ের একজন জমিদার) একজন সভাসদ ছিলেন, তিনিও পূর্ব বাংলা ত্যাগকারী

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৭

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৭ । পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম প্রচার, পৃঃ১৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

একজন ব্রাহ্মন ছিলেন ।[১] কৃত্তিবাস যে ভয় ভীতির কথা উল্লেখ করেছেন যার ফলে কুলীন সন্তান, ব্রাহ্মনেরা স্বীয় জন্মভূমি পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে পশ্চিম বঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয় । এর কারণ ছিল উক্ত অঞ্চলে মুসলমানদের জনসংখ্যা, প্রভাব প্রতিপত্তি, আধিপত্য ও শক্তি বৃদ্ধি । এর কারণে ব্রাহ্মনেরা তাদের কৌলিন্য ও জাত হারাবার ভয়ে স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে পশ্চিম বঙ্গে নির্বাসিত হয় । যদি মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি না পেত, তবে হয়ত তারা মাতৃভূমি ত্যাগ করত না । এতে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন সময়ে পূর্ব বঙ্গে ইসলামের বিরাট অগ্রগতি ও বিস্তৃতি লাভ করেছিল । এর কারণ চট্টগ্রামে আরবদের বসতি । কেননা তারা শুধু সেখানেই বসে থাকেনি বরং নদীপথ দিয়ে বাংলার অভ্যন্তর ভাগেও বাণিজ্য করেছে এবং ধর্ম প্রচারকগণ ধর্ম প্রচার ও করেছে । এভাবে আরব বণিকও ধর্ম প্রচারকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ব্রাহ্মন্যবাদীদের অত্যাচারে অত্যাচারি মানুষ মুক্তির আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ।

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত তোফায়েল আহমদ তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, সে সময় চট্টগ্রাম ও তার আশে পাশে মুসলমানদের উপনিবেশ স্থাপনের ভূমিকা হিসাবে যে কয়টি কারণ অনুমান করা হয় তাহলো মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে প্রতিপক্ষের অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ, নিয়মিত পন্য সরবরাহ নিশ্চিত করনের জন্য এজেন্টদের সে স্থানে বসবাস এবং জাহাজ ডুবির কারণে উপকূল ভাগে অনেক সময় স্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ । এ সময় চট্টগ্রাম নোয়াখালীর উপকূল ভাগে একটা মুসলিম রাজ শাসন গড়ে উঠে । এ অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষায় আরবী শব্দের প্রচলন থেকে সে আমলে সেখানে মুসলমানদের বসবাসের অনুমান করা হয় ।[২]

চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিতে যে আরবী প্রভাব পড়েছিল, সে সম্পর্কে তোফায়েল আহমদ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, মক্কার

---

১. কৃত্তিবাস, রামায়ন, ভূমিকা (আত্মকথা) উদ্ধৃত, ডঃ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৮
পূর্বেতে আছিল শ্রীদনুজ মহারাজা । তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা । দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মনের অধিকার । বঙ্গ ভোগে ভুনেক্ত তিহ সুখের সংহার ।। বঙ্গ দেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির । বঙ্গ দেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর ।।

২. তোফায়েল আহমদ, 'যুগে যুগে বাংলাদেশ', দৈনিক ইত্তেফাক-১১ই অক্টোবর, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

হেরেম শরীফের ভিতরেও বাইরে ছোট আকারের ড্রামের মত ফ্লাস্কে জম জম কূপের পানি রক্ষিত থাকে । দেশে ফিরে আসার সময় সে পানি আনতে গিয়ে বাইরের ফ্লাস্কে পানি জম জমের কিনা সন্দেহ হওয়াতে নিরাপত্তা রক্ষীকে আরবীতে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি উত্তর দিলেন "আই ও' না'য়াম", 'হা' অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয় । তিনি উল্লেখ করেন, আমার অঞ্চলেও(বৃহত্তর নোয়াখালীর লক্ষীপুর) আয়ও 'আয়্যা' 'হা' অর্থে ব্যবহৃত হয় ।[১] এতে প্রতীয়মান হয় আরব মুসলিম বণিকরা উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যবহার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে ও বসবাস করেছে । এ ভাবে যুগের পর যুগ অবস্থানের কারণে এবং ইসলামী আইন কানুন, বিধি বিধান, আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি সেখানকার নতুন মুসলমানদের উপর প্রভাব ফেলে এমনি করে দীর্ঘ দিনের অবস্থানের কারণে, মুসলিম বণিকদের সাথে মিলামিশা ও সংস্পর্শের কারণে এ দেশের নতুন মুসলমানেরা তাদের ভাষা কিছু কিছু শিখে ফেলে । ফলে বাংলা ভাষার সাথে আরবী ভাষার সংমিশ্রন ঘটে । তাই এদেশের মুসলমানগণ ক্রমাগত বাংলা ও আরবী ভাষার সংমিশ্রনে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে । এবং ইহা ধারাবাহিকভাবে চলে আসতে থাকে । যার ফলে উক্ত অঞ্চলের মানুষের মাঝে সেই আরবী ভাষার উচ্চারন ও শব্দ প্রয়োগ আজও আমরা দেখতে পাই, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকেই পাওয়া ।

খ' বাংলাদেশে আরবী ব্যবসায়ী, বণিক সওদাগরদের পর পরেই বিভিন্ন পীর, আউলিয়া, দরবেশ সাধক প্রমুখ বাংলাদেশে এসেছিল এবং তারা এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিল । তাদের ধর্ম প্রচারে এদেশের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বিরাট এক অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় । পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত আরবী মুদ্রা হতে আরবী বণিক, সূফী, সাধক ও দরবেশদের আগমনের সমর্থন পাওয়া যায় ।

গ' প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংস স্তুপের মধ্যে একটি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে । পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটি ৭৮৮ সালে খলিফা হারুন-অর-রশীদ কর্তৃক মোহাম্মদিয়া টাকশাল হতে উৎকীর্ণ বলে প্রমাণ পাওয়া যায়[২] । কুমিল্লার কাছে

১. যুগে যুগে বাংলাদেশ ,দৈনিক ইত্তেফাক,১১ই অক্টোবর ১৯৯০ ।

২. কে,এন,ডিকশিট,'মেমোরিয়র্স অব দি আর্কিওলোজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া', নং৫৫,১৯৩৮, পৃঃ৮৭ ।প্রফেসর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস,পূর্বোক্ত,পৃঃ৩০।বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ৪৮। আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত,'যশোর জেলার ইতিহাস',(ঢাকা ১৯৯০) ২য় মুদ্রন, পৃঃ১৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

ময়নামতির ধ্বংস স্তূপের মাঝেও কিছু আরবীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।[১] এই মুদ্রাগুলি কিভাবে এসেছে তা নিশ্চিত বলা যায় না, তবে অনুমান করা যায় যে, এই মুদ্রাগুলি আরব বণিক অথবা কোন ধর্ম প্রচারক ও সাধক কর্তৃক খৃীষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে বাংলায় এসেছে।

রাজশাহীর পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটির উপর ভিত্তি করে ডঃ এনামুল হক উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দু সভ্যতার কোন কোন প্রাচীন কেন্দ্রে এই প্রাচীন যুগের আরব পারশ্যের মুসলিম সাধক ও ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমাদের বিশ্বাস এইরূপ কোন ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে এই মুদ্রা আনীত হয়। সম্ভবত যিনি এই মুদ্রা সাথে নিয়ে তথায় ধর্ম প্রচার করতে আগমন করেন, তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রান হারিয়ে ছিলেন এবং তার মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর হস্তগত হয়েছিল। যে রূপেই হোক পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত খলীফার এই মুদ্রাটি অন্তত খৃীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে উত্তর বঙ্গের সহিত ইসলামের সম্বন্ধ সূচনা করেছে। ডঃ হক মনে করেন যে, এই মুদ্রাগুলি ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে বাংলাদেশে আনিত হয়নি, কারণ তারমতে পাহাড়পুর তখন ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিলনা। তিনি আরো দাবী করেন যে, এই মুদ্রা অষ্টম, নবম শতাব্দীর মধ্যেই পাহাড়পুরে আনীত হয়, তার কারণ খৃীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পর পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।[২]

তবে প্রফেসর আবদুল করিম, নানা কারণে ডঃ হকের উপরোক্ত মন্তব্যকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেন। কেননা, তার মতে যেহেতু মুদ্রাটি খলিফা হারুন অর রশিদ কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়, সেহেতু এই মুদ্রা খলিফা বা তাঁর জীবদ্দশায় বা তাঁর খেলাফতের পরে একশত বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে আনীত হয়, এমন মনে করার কোন যথার্থ কারণ নেই। এমন ও দেখা যায়যে, বাংলাদেশের অনেক লোক মুসলমানী আমলের সিক্কা টাকা কবচ করে ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৮। এফ,এ,খান, রিসেন্ট আর্কিওলোজিকাল ডিসকভারিজ ইন ইষ্ট পাকিস্তান, করাচী, পৃঃ১১।

২. প্রফেসর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০। পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, পৃঃ১২। বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের বাংলাদেশ বিজয়ের পর যে, এই মুদ্রা আনীত হয়নি, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। দ্বিতীয়ত পাহাড়পুরে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র থাকুক বা না থাকুক, সমুদ্র উপকূলবর্তী ব্যবসার কেন্দ্র স্থল হতে এই মুদ্রা অভ্যন্তরীন জনগনের কাছে হাত বদল হয়ে চলে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তৃতীয়ত খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে কোন মুসলমান সাধক ও ধর্ম প্রচারক বাংলাদেশে এসেছিলেন কিনা বা আসা সম্ভব কিনা তা প্রমাণ সাপেক্ষ। চতুর্থত ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, পাহাড়পুরের মুদ্রাটি ধ্বংস স্তুপের উপরিভাগে পাওয়া গিয়েছে। খননকৃত বৌদ্ধ বিহারের কোন নিম্ন স্তরে পাওয়া যায়নি।[১]

অর্থাৎ প্রফেসর করিম বুঝাতে চেয়েছেন যে, মুদ্রাটি বৌদ্ধ বিহার ধ্বংসের পর আনীত হয়েছে। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে কোন ধর্ম প্রচারক কর্তৃক মুদ্রা আনা সম্ভব নয়। কারণ সে সময় কোন ধর্ম প্রচারক ও সাধকের বাংলাদেশে আগমন করা সম্ভব কিনা তা প্রমাণ সাপেক্ষ। অবশ্য এ বিষয়ে নানা যুক্তি তর্ক রয়েছে। কোন বণিক কর্তৃক মুদ্রা আনিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কেননা আরব বণিকরা বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলেও তারা সেখানেই বসে থাকেনি, বরং কর্ণফুলী, মেঘনা, গঙ্গা ইত্যাদি নদী বেয়ে দেশের অভ্যন্তর ভাগেও তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। হয়ত তাদের কাছ হতে জনগনের হাত বদল হতে হতে পাহাড়পুরে আনিত হতে পারে। ইহা অনুমান করা অভ্রান্ত নয়। তবে কিভাবে এ মুদ্রা পাহাড়পুরে এল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে অনুমান করা যায় মুদ্রাটি সম্ভবত বণিকদের কর্তৃক আনিত হওয়াই অধিক যুক্তি যুক্ত। কেননা প্রাচীনকাল হতেই আরব বণিকরা নৌপথে বঙ্গোপসাগরীয় উপকূল ও দূর প্রাচ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করত। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভ্রমনে আরবরা ছিল পৃথিবীর সেরা জাতি। ৭১২ সালে আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় এবং সেখানে বসতি স্থাপনের ফলে স্বভাবতই প্রাচ্য ও ভারতের সাথে আরব বাণিজ্য আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয় এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যেই তারা সিংহল, মালাবার, আরাকান,

---

১. বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০, ৩১। মেমোয়র্স অব দি আর্কিওলোজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, নোয়াখালী ইত্যাদি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তাই তাদের কাছ হতে আরবী মুদ্রা এ দেশে আসাই স্বাভাবিক। যেহেতু তারা এই মুদ্রা দিয়ে এ দেশীয় পন্য ক্রয় করেছে সেহেতু হাত বদল হয়ে পাহাড়পুরে মুদ্রা নীত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

তবাকত-ই-নাসিরীর লেখক মিনহাজ তাঁর বর্ণনায় এই মত পোষণ করেছেন যে, হিন্দু আমলে বাংলার সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, যে, মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী যখন ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নদীয়া পৌছেন তখন স্থানীয় লোকেরা তাঁর দলকে ঘোড়া ব্যবসায়ী বলে মনে করেছিল। তারা যে এ শহর দখল করার অভিপ্রায়ে এসেছিল এ সন্দেহ তাদের মনে উদ্রেক হয়নি।[১] এতে ধারণা করা হয় যে, মুসলিম ব্যবসায়ীগণ মুসলিম পূর্ব যুগেও ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসত। মমতাজুর রহমান তরফদার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নয় হতে বার শতকের মধ্যে জীবিত সুলায়মান ইবনে খুরদাদবিহ ও ইদ্রিসী প্রমুখ ভৌগলিকবিদগণ চট্টগ্রাম, আরাকান অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জানও ময়নামতির ধ্বংস স্তুপের মধ্যে পাওয়া আব্বাসীয় দীনার ও দিরহাম হতে প্রায় নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন যে, পূর্ব বাংলার নগরকেন্দ্রগুলিতে আরব বণিকদের আগমন ঘটত এবং তারাই আবার এই অঞ্চলের পন্যগুলিকে দক্ষিন পূর্ব মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের যে সকল স্থানে আরব উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল নিয়ে যেত। তার মধ্যে পালেংবাম, লাম্রী এবং কালাহ পেও বন্দর সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে মনে হয় দক্ষিন পূর্ব বাংলার সাথে যুক্ত ছিল।[২]

মিনহাজ, মমতাজুর রহমান, ডঃ রহিম ও অন্যান্যদের বক্তব্য হতে বুঝা যায় যে, আরব বণিকদের সিন্ধু বিজয়ের পর হতেই বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল সমূহের সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বসতি ও স্থাপন করে। আব্বাসীয় যুগের মুদ্রাটি সম্ভবত তাদের কাছ হতেই এদেশে আনীত হতে পারে। এমনও হতে পারে যে,

----

১. তবাকাতই নাসিরী (ইলিয়ট) পৃঃ৫৫৭।

২. মমতাজুর রহমান তরফদার, 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক', বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৯৮১) পৃঃ৮

Dhaka University Institutional Repository

আরব বণিকরা উক্ত মুদ্রা এদেশে প্রচলন বা ব্যবসায়িক লেন দেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। যার ফলে ইহা হাত বদল হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। কিংবা কোন কারণে পাহাড়পুর এবং ময়না মতির বৌদ্ধ বিহারের রাজকর্মচারীর উক্ত মুদ্রা হস্তগত হয়েছিল। অথবা আরব বণিক কর্তৃক উক্ত বিহারে মুদ্রাগুলি উপঢৌকন হিসেবে প্রেরিত হয়েছিল। তাই ধর্ম প্রচারকদের কর্তৃক আনীত না হলেও বণিকদের কর্তৃক যে আনীত হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ থেকে বুঝা যায় যে, ৮ম ও নবম শতক হতে আরব বণিকদের যাতায়াত ও যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্টতর ছিল এবং তাদের বসতি ও ধর্ম প্রচারের ফলে এদেশের মানুষ ক্রমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ডঃ মমিন চৌধুরীর মতে এই মুদ্রার আবিষ্কার আরব মুসলমানদের সহিত বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথাই প্রমাণ করে।[১]

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটি সম্পর্কে আবদুল মান্নান তালিব তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আরাকানের 'রামনী দ্বীপে' আরবীয় মুসলিম বণিকদের জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনার সাথে প্রাপ্ত মুদ্রা গুলোর সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, স্বাভাবিকভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে, মুদ্রাগুলো উল্লেখিত সময়েই অর্থাৎ ৭৮৮ খৃীষ্টাব্দে বাংলায় আনীত হয়েছিল। কেননা রামনী দ্বীপে জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনাটিও ঘটে ৭৮৮ হতে ৮১০ সালের মধ্যে। সম্ভবত আরব বণিকদল বাংলার বৃহত্তম নদী গঙ্গার উপকূল বেয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যবসা বাণিজ্য করত এবং তাদের মাধ্যমেই পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধ বিহারে এই মুদ্রাটি আনীত হয়েছিল।[২] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আরব মুসলিম বণিকদের বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্টতর ছিল। কেননা সুলায়মান আবু যায়েদ হাসান, ইবনে খুরদাদবিহ, আল মাসুদী, ইবনে হাউকাল, ইদ্রিস প্রমুখ প্রাচীন আরব ভৌগলিকদের বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, আরবরা সমুদ্র পথে মেঘনা নদীর ডানে চট্টগ্রাম বন্দরে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সে সময় তাদের প্রচেষ্টায় মেঘনা নদীর পূর্ব পার হতে আরাকান পর্যন্ত এক বিরাট এলাকা তাদের পদাচরন হতে থাকে।

---

১. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৬।

২. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ত এ বণিকদের মধ্য হতে কেউ ধর্ম প্রচারার্থে পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ও ময়নামতির শালবন বিহারে গিয়ে থাকবেন এবং তাদের নিকট হতেই এই মুদ্রাগুলি সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ বিহারে আনীত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে ।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, আরব মুসলিম বণিকরা অষ্টম ও নবম শতকের দিকে কিংবা তার পূর্ব হতে ব্যবসা বাণিজ্যের উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগমন করতে থাকে । ব্যবসা বাণিজ্য করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলনা বরং তারা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সাথে নিজ দায়িত্বে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব ও পালন করেছেন । তাদের এ আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনেক মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে এবং ক্রমাগত এদের মাধ্যমে ইসলাম এ দেশে প্রবেশ করেছে । বস্তুত বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমেই এ দেশে ইসলামের সূত্রপাত হয়েছে ।

অপরদিকে ডঃ এনামুল হক উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের বিশ্বাস কোন ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে খলিফার এ মুদ্রা অনীত হয় । সম্ভবত যিনি এই মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে সেখানে ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন, তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন এবং মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হয়েছিল ।[১] অবশ্য ডঃ আবদুল করিম উল্লেখ করেছেন যে, খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতকে কোন মুসলমান সাধক ও ধর্ম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন কিনা তা প্রমান সাপেক্ষ ।

তবে খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে উপকূলবর্তী অঞ্চল সমূহের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে, আরব বণিকগণ চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের সাথে সাথে মুসলমান ওলি, দরবেশগণ ও আসতে থাকে বলে অনুমান করা হয় । জানা যায় যে, ৮ম শতকের দিকে একজন ঐতিহাসিক সাধক সূফী চট্টগ্রামে আগমন করেন তার নাম সূফী সুলতান বায়জিদ বোস্তামী ।

---

১. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ৫৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ৭৭৭ সালে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৭৪ সালে পারস্যের বোস্তাম নগরে ইন্তেকাল করেন । তিনি ইরাক, ইরান ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের পর সম্ভবত বণিকদের সাথে চাঁটগায়ে আসেন ।[১]

ঘ. চট্টগ্রাম শহরের পাঁচ মাইল উত্তরে গিয়াসপুর অঞ্চলের নাসিরাবাদ নামক গ্রামে এক পর্বত চূড়ায় এই সাধকের একটি "চিল্লা" ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় ।[২] এই আস্তানা ও চিল্লার প্রতি সকল সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলমানরা যে ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছিল তাতে বিনা দ্বিধায় এটা ধরে নেয়া যায়, সুফী সাহেব এই স্থানে ধর্ম সাধনা ও ইসলাম প্রচার করে অগনিত ভক্ত সৃষ্টি করেন ।[৩] আরো জানা যায় যে, তিনি চট্টগ্রামে দীর্ঘ ছয় বছর অবস্থান করেন ।[৪] এমনি ধরনের কোন মুসলমান সুফি সাধক হয়ত এ সময়ে বাংলাদেশে আসতে পারে, যারা ধর্ম প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, আনাচে কানাচে প্রবেশ করে । এই সাধকদের মধ্যে কেউ হয়ত ময়নামতি পাহাড়পুরে ধর্ম প্রচার করতে পারেন, তাঁদের দ্বারা হয়ত এই মুদ্রা আনীত হতে পারে, যা ধ্বংস স্তূপ খননকালে পাওয়া গিয়েছে । তবে এ সময়ে অন্য কোন সুফী সাধকদের আগমন সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য প্রমাণ নেই । আব্বাসীয় মুদ্রা আরব মুসলিম বণিক কর্তৃক আনীত হোক কিংবা সুফী সাধক পুরুষদের কর্তৃক আনীত হোক, যেভাবেই হোক, আরবদের এ দেশে আগমনের ফলেই তা হয়েছে । অতএব, আরব মুসলিম বণিকরা যে ৮ম, ৯ম শতকে এদেশে এসেছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে ইসলাম প্রচার করে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা ।

----

১. আবুল মনসুর আহম্মদ, "বাংলাদেশের কালচার", (ঢাকা ১৯৭৬) পৃঃ২৪৩ ।

২. কাজী মোহাম্মদ মিছের, "বগুড়ার ইতিকাহিনী" (অতীত ও বর্তমান) (বগুড়া,১৯৫৭)পৃঃ৪০৯

৩. বাংলাদেশের কালচার, পূর্বোক্ত,পৃঃ২৪৩ ।

৪. চট্টগ্রামের ইতিহাস, (পুরানা আমল) পৃঃ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

এখন এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা হতে পারে যে, আরব মুসলিম বণিকদের বাণিজ্য তরী সঠিক কখন বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এসে ভীরে ছিল । কিন্তু এর সঠিক উত্তর হয়ত পাওয়া সম্ভব নয়, তবে বিভিন্ন পন্ডিত এবং ঐতিহাসিকগণ যে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, তাদের আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, খ্রীষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতকের দিকেই আরব মুসলিম বণিকদের এ দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে আগমন ঘটেছে । কিন্তু এর পূর্বেই অর্থাৎ ৭ম শতকের দিকেই আরব মুসলিম বণিকদের এদেশে আগমন হয়েছিল বলে অনুমিত হয় ।

কেননা খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্ব হতেই আরবদের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল । ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবীয় নাবিকরা নৌপথে বঙ্গোপসাগরীয় উপকূল ও দূর প্রাচ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সাথে ইসলাম প্রচার করত । যেমন মুসলিম বণিকদের কর্তৃক মালাবারে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল সন্দেহ নেই, তাছাড়া জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও তথা সমগ্র ইন্দোনেশিয়া, মালেয়েশিয়া মালদ্বীপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।[১] তাহলে দেখা যাচ্ছে হিজরী প্রথম শতকের প্রারম্ভেই খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে ভারতের পশ্চিম উপকূল ইসলামের সংস্পর্শে আসে । নিশ্চয়ই আরব বণিকদের জাহাজ কেবল মাত্র ভারতের পশ্চিমে উপকূলেই থেমে থাকেনি । বরং তাদের বাণিজ্য তরী পূর্ব চীন উপকূল পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল । অপরদিকে ৭ম শতকে বঙ্গোপসাগর বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থল । তাই ৭ম শতকে আরব বণিকদের জাহাজ বাংলার উপকূলীয় বন্দরসমূহে এসে ভিড়েছিল তা বলা যেতে পারে । অনেক ঐতিহাসিকের মতে ইসলামের আদি যুগেই ইসলাম প্রচারের ঢেউ এদেশে এসেছিল অর্থাৎ ৭ম শতকেই বঙ্গে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল ।[২]

'টলেমী' হতে শুরু করে আধুনিক ঐতিহাসিকরা এমত পোষণ করেন যে, খ্রীষ্ট-পূর্ব কয়েক শতক ধরে আরবরা ভূমধ্য সাগর, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে এক চেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারী ছিল । আর এ যুগেই চট্টগ্রাম বন্দর আরবদের অন্যতম উপনিবেশ বন্দর ছিল । ডঃ এনামুল হক এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আরবরা স্বভাবতই বন্দরে বসে

---

১. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ৫৪ । পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ পূর্বোক্ত, পৃঃ২১৮ ।

২. পাচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

থাকেনি । কর্ণফুলী, মেঘনা, সুরমা, গঙ্গা, ইত্যাদি নদী উজিয়ে ব্যবসা করেছে । এ উপলক্ষ্যে আরবরা বাংলায় যে জনতার সাথে পরিচিত হয়, তারা তাদেরই ভাই, পূর্ব পুরুষ, ব্যাবলনীয় দ্রাবীড় । এ অবস্থায় ৭ম শতকে আরবে ইসলামের আবির্ভাব হলে প্রবাসী আরবরা স্বভাবতই নিজের দেশের এই নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল । আরব বণিকদের সংস্পর্শে ইহা আরো ত্বরান্বিত হয় । ফলে ইসলাম আবির্ভাবের ৫০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ৭ম শতকের শেষ হওয়ার আগেই ইসলাম ধর্ম বাংলার জনতার এক বিরাট অংশের ধর্ম হয়ে গিয়েছিল । অষ্টম, নবম ও দশম শতকের দিকে আমরা বাংলার বিভিন্ন জেলায় যে সব সূফী দরবেশদের সাক্ষাৎ পাই তারা খালি ময়দানে ইসলাম প্রচার করতে আসেনি । তাদের অভ্যর্থনা করার মত যথেষ্ট মুসলমান তখন বাংলাদেশে ছিল বলেই তারা এখানে এসেছিল ।[১] এবং পরবর্তীতে এই সুযোগে বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে অভিযান চালাতে সাহসী ও সক্ষম হয়েছিল ।

তাই উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, আরব মুসলিম বণিকরা ৭ম শতকের দিকে এসে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করে, তারা মুটামুটি একটি অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, যারফলে সূফী, দরবেশ, আউলিয়ারা এসে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র পেয়েছিল এবং তাদের অনুকূলে জনগনের সমর্থন ও আদায় করেছিল ।

আরব বণিকগণ যে আনুমানিক ৭ম শতকের দিকেই এসেছিল তা আমরা একটি কিংবদন্তী হতে প্রমাণ পেতে পারি । কিংবদন্তীটি ফটিকছড়ি থানার মালুমঘাটিলার সাথে জড়িত । কেননা আরব বণিকদের এখানে আসার পূর্ব হতে এমনকি এর বহু পরেও চন্দ্রনাথ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী এই ভূভাগ যা মালুমঘাটিলা নামে পরিচিত তা সমুদ্র গর্ভে ছিল । কালক্রমে তা টিলায় পরিনত হয় । কিংবদন্তীটির মর্মকথা এই যে, এখানে প্রাচীনকালে আরবদের এক জাহাজ ডুবি হয়েছিল, উহার মালুম বা মাস্তুল বহু বৎসর পর্যন্ত দেখা যেত, কালক্রমে উক্ত স্থান চড়া পড়ে উহাকে ঘিরে এই টিলার সৃষ্টি হয়েছিল । যে জাহাজ ডুবি হয়েছিল তার সকল আরোহীই মৃত্যু

----

১. পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২১, ২২২, ২২৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

বরণ করে কিন্তু মাত্র দুজন রক্ষা পায় । তারা উভয়ই আরবী ছিলেন । তাদের মধ্যে একজন লেখাপড়া জানত, কালক্রমে তাঁর বংশ আরব খন্দকারের বংশ নামে খ্যাত হয় । অপর ব্যক্তি নিরক্ষর ছিল সে বাধ্য হয়ে কুমার বৃত্তি অবলম্বন করে । তার বংশ উল্টা কুমারের বংশ নামে পরিচিত ।[১]

চট্টগ্রামের 'সাতকানিয়া থানার' ডিঙ্গা ভাঙ্গা সম্পর্কে অপর একটি কিংবদন্তী হতে জানা যায় যে, এখানে নাকি আরব বণিক সাধু বা 'সাউদ' নামক এক বণিকের ডিঙ্গা ডুবে গিয়েছিল । সেই হতে এ এলাকার নাম হয় 'ডিঙ্গা ভাঙ্গা' । যেমন আধুনিক যুগে কক্সবাজারের উপকন্ঠে 'জাহাজ ভাঙ্গা' নামের উৎপত্তি হয়েছে । চড়ায় আটকানো ভাঙ্গা জাহাজ এখন ও দেখতে পাওয়া যায় । ডিঙ্গাভাঙ্গা এখনও নীচু জমি, আর মালুম্যা টিলার পাশেই পর পর দয়েরাখালি, দমদমা প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাওয়া যায় । এতে সন্দেহ থাকেনা যে, এক সময় এ এলাকা সমুদ্রে গর্ভে ছিল । আর উভয় ক্ষেত্রেই আরব বণিকদের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল ।[২]

উক্ত কিংবদন্তী দুটি মাহবুব উল আলমের মতে ৭ম শতকেই ঘটেছে । কেননা এ সময় এরূপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব কিছু নয় । কারণ খৃীষ্ট-পূর্ব কাল হতেই এদেশের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল । সেহেতু ৭ম শতকে আরব মুসলিম বণিকদের এ দেশীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে আগমন করা বিচিত্র কিছু নয় । উপরোক্ত কিংবদন্তী হতে প্রতীয়মান হয় যে, আরব বণিকদের ইসলাম পূর্ব যুগ হতেই বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ছিল এবং ইসলামের আবির্ভাবের পঞ্চাশ(৫০) বছরের মধ্যে অর্থাৎ ৭ম শতকের মধ্যেই আরব মুসলিম বণিকরা এদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে বিশেষ করে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সন্দ্বীপ ইত্যাদি অঞ্চলে আগমন করেছে । চট্টগ্রামের ডিঙ্গাভাঙ্গা মালুম্যা টিলা ইত্যাদি অঞ্চলে নৌকাডুবি, বিভিন্ন স্থানের আরবী নামকরণ,

---

১. চট্টগ্রামের ইতিহাস, (পুরানা আমল) পূর্বোক্ত, পৃঃ৩,৪ ।

২. চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানা আমল) পূর্বোক্ত, পৃঃ৩, ৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় ভাষায় আরবী শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি এর প্রমাণ । ৭১২ সালের দিকে আরবদের সিন্ধু বিজয় এই আগমনের পথকে আরো সুপ্রসস্থ ও ত্বরান্বিত করে । অর্থাৎ ৭ম শতক হতে ক্রমাগত মুসলিম বণিকদের আগমন, বসতি, ইসলাম প্রচার ইত্যাদির ফলে, মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । যারফলে ধর্ম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ, পরিস্থিতি ও ক্ষেত্র তৈরী হয় । এতে করে এই পথ অনুসরণ করেই ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতকের দিকে মুসলিম বণিক ও সূফী দরবেশদের ব্যাপকভাবে সমাবেশ ঘটতে থাকে এবং ইসলাম প্রচারের ব্যাপক বিস্তৃতি হতে থাকে । অতএব আমরা ৭ম শতককেই আরব মুসলিমদের প্রথম আগমন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি ।

আরব মুসলিম বণিকরা সমুদ্রপথে বাণিজ্য তরী নিয়ে যেমন এদেশে এসেছে, তেমনি স্থল পথেও তাদের আগমন ঘটেছে । তবে মুহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের পর এ আগমন দ্রুততর হয় । এবং অষ্টম শতকের মধ্যেই সিন্ধু ও পান্জাবের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের উপনিবেশ ও বসতি স্থাপিত হয় । ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নিগৃহীত পশ্চিম ভারতের বহু সংখ্যক বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে । এভাবে হিজরী প্রথম শতকেই তথা খৃষ্টীয় ৭ম শতকে ইসলাম ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ।[১] এবং এভাবে বাংলাদেশেও প্রবেশ করে । এ সময়ে বাংলার মানুষের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কি পরিমান সাড়া জাগিয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না । তবে একাদশ শতক থেকে বিভিন্ন সূফী, দরবেশদের আগমনের ফলে ইসলাম প্রচারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় এবং এ সম্পর্কে কিছু কিছু ঘটনা ও জানা যায় ।

অনেকের ধারণা বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর হতেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয় । কিন্তু এ ধারণা মেনে নেয়া যায় না, কারণ উপরোক্ত বিভিন্ন আলোচনায় আরব বণিকগণ ৭ম, ৮ম শতকে এ দেশে ইসলাম প্রচার করেছে তা প্রমাণিত হয়েছে । তাছাড়া নবম, দশম শতকের দিকে যে বিভিন্ন সূফী ,দরবেশগণ ইসলাম প্রচার করেছেন তাও ঐতিহাসিকভাবে সত্য । কাজেই এ ধারণা অমূলক ।

---

১. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ৬১ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ উল্লেখ করেন যে, সীমান্ত পাঞ্জাবের প্রায় তিনশত বছর পূর্বে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। তার মতে, ইসলাম প্রচারের ব্যাপকতা মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের বহু পূর্বের। আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় বস্তুত বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রবর্তনের প্রায় তিন হতে চার শত বছর পূর্বে এখানে ইসলাম জনতার ধর্মরূপে গৃহীত হয়েছিল।[১] ডঃ এনামুল হক তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে' এবং অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান তাঁর বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাসে' অকাট্যভাবে এই মতের খন্ডন করেছেন এবং বখতিয়ারের আগমনের তিন শত বছর হতে আগেকার বহু আওলিয়া, দরবেশ ইসলাম প্রচার ও তাঁদের মাজারের অবস্থিতির দ্বারা এই সত্য প্রমাণ করেছেন।[২]

অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজীর আগমনের পূর্বেই বাংলাদেশে পীর, দরবেশ, আওলীয়াদের আগমন ঘটে এবং তাঁরা এ দেশের আনাচে কানাচে বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করতে থাকে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে হিন্দু মুনি ঋষি, ব্রাহ্মন এবং বৌদ্ধযোগীও সিদ্ধার্থগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এভাবে প্রাথমিকভাবে আরব মুসলিম বণিকদের এদেশে আগমন ও ধর্ম প্রচারের ফলে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ধর্ম প্রচারের কিছুটা ক্ষেত্র তৈরী হয়। এবং এর পরই শুরু হয় সূফী দরবেশদের আগমন ও তাঁদের ব্যাপক ধর্ম প্রচার।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে আরবীয় বণিকও ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং এই ধর্ম এ দেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয় তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর, দরবেশ ও সূফী সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ব বঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। অতপর তুর্কীগণের দ্বারা বাংলাদেশ বিজিত হলে বাংলাদেশের পীর, দরবেশ ও সূফী সাধকগণ ধর্ম প্রচারের মহান ব্রত গ্রহণ করেন।[৩]

---

১. পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ২২০।
২. পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ২২০।
৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

ফরাসী পন্ডিত সেসিনিও তার গ্রন্থে লিখেছেন, মুসলমান শেখ ও দরবেশগণ জনগণের সাথে মিলে মিশে এদের ভাষা আয়ত্ত করে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে, অসংখ্য হিন্দু ও মালয়ীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষার পথ সুগম করে দিয়েছিল। বিদেশাগত দিগ্বিজয়ীদের অত্যাচারে ও ধর্মান্ধতা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। ইসলাম প্রচারকদের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে সাধারনে ইসলাম গ্রহণ করত।[১]

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে কিছু সংখ্যক সাধু দরবেশ যাদের বেশীর ভাগই ছিলেন আরব ও ইরানীয়, তারা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন এবং হিন্দু রাজাদের আমলে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।[২] বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন মুসলমান সূফী সাধকের জীবন সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত লোক কাহিনী ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ আক্রমনের পূর্বেই এই সব সূফী সাধক বঙ্গ দেশে এসে ইসলাম প্রচার ও বসতি স্থাপন করে। একাদশ ও দ্বাদশ শতকের দিকে যে সকল সূফী, সাধক দরবেশ বাংলাদেশে[৩] এসেছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য। যেমন :

সূফী সাধকদের মধ্যে বগুড়া জেলার মহাস্থানের বিখ্যাত সূফী শাহ সুলতান মাহিসাওয়ার একজন। কথিত আছে যে, শাহ সুলতান সন্দ্বীপ হয়ে সমুদ্র পথে বাংলায় উপস্থিত হন। যেহেতু তিনি মৎস্যাকৃতি নৌকাযোগে অথবা মাছের পিঠে চড়ে আগমন করেছিলেন সে কারণে তিনি মাহিসাওয়ার নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হরিরামপুরে উপস্থিত হলে সেখানকার হিন্দু রাজা 'বলরাম' তাকে বাধা দেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি নিহত হন। ফলে তার মন্ত্রীবর্গ ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর তিনি বরেন্দ্র ভূমি মহাস্থানের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে তিনি মহাস্থানের রাজা পরশুরাম ও তার ভগ্নি শীলা দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পরশুরাম পরাজিত ও নিহত

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ২২২, ২২৩ ও ২২৫।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪১।

৩. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃঃ১৮৭। প্রফেসর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২। বগুড়ার ইতিকাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

হন এবং শীলাদেবী করতোয়া নদীতে আত্মহত্যা করেন । অতপর সেখানে ইসলামী পতাকা উত্তোলীত হয় ।[১] তিনি একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ তথা ১০৪৭ খৃীঃ মৃত্যু বরণ করেন । বগুড়ার মহাস্থান গড়ের শাহ সুলতান মাহিসাওয়ারের স্বীকৃতি আওরঙ্গজীবের সনদ পত্রেও (১৬৮৫-৮৬ খৃীঃ) পাওয়া যায় ।[২]

শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী বঙ্গে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন বলে কথিত আছে । ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোনা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মদনপুরে এই সূফীর মাজার বিদ্যমান । মাজারের খাদেমের নিকট রক্ষিত ১৬৭১ সালের একটি দলিল অনুসারে বুঝা যায় যে, শাহ সুলতান রুমী মদনপুরে ১০৫৩ সালে আগমন করেন । তিনি ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে ছিলেন বলে পরবর্তী কালের দলীল সুত্রেও দাবী করা হয় ।[৩] স্থানীয় একটি কিংবদন্তী হতে জানা যায় যে, শাহ সুলতান রুমীর অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে একজন কোচ রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি মদনপুর গ্রামখানি সূফী দরবেশকে দান করেন ।[৪]

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে রয়েছে মখদুম শাহদৌলাহ শহীদের দরগাহ ।[৫] কথিত আছে যে, মখদুম শাহদৌলা ও তাঁর অনুচরসহ সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং মসজিদ নির্মান করে ধর্মীয় প্রচার কার্যে আত্ম নিয়োগ করেন । এই বসতি স্থাপন কারীদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে

----

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯১ । আহমদ শরীফ "বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য", ২য় খন্ড, ১ম প্রকাশ বাংলা একাডেমী (ঢাকা ১৯৮৩) পৃঃ৬৯ । জে,এ,এস,বি,১৮৭৫, পৃঃ১৮৩-৮৪, জে,এ,এস,বি,১৮৭৮, পৃঃ৮৮-৯৫ । এনামুল হক, "বঙ্গে সূফী প্রভাব"(ঢাকা১৯৩০) পৃঃ ১৪০-৪১ । জে,এন,গুপ্ত, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স"বগুড়া" (এলাহবাদ, ইন্ডিয়া ১৯১০) পৃঃ১৫৪-১৫৫ ।

২. বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স বগুড়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৫৪-১৫৫ ।

৩. বঙ্গে সূফী প্রভাব, ১৯৩৫, পৃঃ১৩৫ । বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য,২য় খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ৬৮ । বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত, পৃঃ৯০ ।

৪. এফ,এ, সাক্সী,বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস " ময়মনসিংহ"(কলিকাতা ১৯১৭) পৃঃ১৫২ । বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ৯০ ।বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড,পূর্বোক্ত, পৃঃ৬৯ ।

৫. বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড,পূর্বোক্ত, পৃঃ৬৯ ।বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস', "পাবনা"(কলিকাতা ১৯২৩) পৃঃ১২১-২৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুরাজা আদেরকে আক্রমন করেন এবং যুদ্ধে মখদুম শাহ্দৌলাহ ও তাঁর কয়েকজন অনুচর শহীদ হন । হিন্দু রাজার হাতে অপমানিত হওয়ার আশংকায় মখদুমের ভগ্নি একটি পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহুতি দেন ।[১] জনশ্রুতি হতে জানা যায় যে, শেখ শামসুদ্দিন তাবরিজী ছিলেন মখদুম শাহ্দৌলার আধ্যাত্মিক শিক্ষক । শামসুদ্দিন তাবরিজী বিখ্যাত সূফী কবি মওলানা জালাল উদ্দীন রুমির ও (১২০৭-৭৩) শিক্ষক ছিলেন । তিনি ১২৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন । প্রচলিত প্রবাদে আছে যে, মখদুম শাহ্দৌলাহ শেখ জালাল উদ্দীন বুখারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন । এ তথ্যানুসারে মখদুম শাহ্দৌলাহ শহীদ এয়োদশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় আগমন করেন । অর্থাৎ তিনি বার তের শতকের লোক[২], ইত্যাদি এ সমস্ত সুফী দরবেশদের সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায় তাতে মনে করা হয় যে, তারা সকলেই বখতিয়ার খিলজীর আগমনের পূর্বেই বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং বাংলাদেশের নানা স্থানে বসতি স্থাপন করে ধর্ম প্রচার করেন । অবশ্য মুসলিম বিজয়ের পর সুফী দরবেশদের ব্যাপকভাবে আগমন হতে থাকে ।

এমনিভাবে আউলিয়া দরবেশ ও জ্ঞান সাধকদের গুণ মাধুর্য, অলৌকিক ক্ষমতা এবং জ্ঞান স্পৃহার আশ্চর্য নিদর্শন সমূহ এদেশের মানুষের অন্তরে দুর্বার আকর্ষন সৃষ্টি করেছিল । তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মুসলমান হয়, এভাবে ক্রমাগত ইসলামের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং মুসলমানদের সংখ্যা ও বৃদ্ধি পেতে থাকে । ... ধর্ম প্রচারকগণ যে বীজ বপন করেছিলেন, তার ফল স্বরূপ পরবর্তীতে মুসলিম শাসকদের রাজ্য গঠনে সহায়ক হয়েছিল।[৩] তাই এ সমস্ত কিছু আমাদের মনে এ ধারণার সৃষ্টি করে যে, মুসলিম বিজয়ের পূর্বে কিছু সংখ্যক সুফী দরবেশ বাংলায় আগমন করে থাকবেন ।

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯২ । এল,এস,এস, ও মালী, উদ্ধৃত জে,এ,এস,বি,১৮৭৮, প্রথম অংশ নং-১, পৃঃ ৯২-৯৩ ।

২. জে,এ,সুবহান 'সুফীজম ইটস সেইন্টস এন্ড শ্রাইনজ'- পৃঃ২৩৬ । বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯২,৯৩ । বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ৬৯ ।

৩. পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ২২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে ৭ম শতক শেষ হবার পূর্বেই বাংলাদেশের অনেক অধিবাসী মুসলিম বণিক ও সূফী দরবেশদের প্রচেষ্টায় মুসলমান হয়ে যায় এবং ৮ম শতকের দিকে বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। আট শতকে ইসলাম ধর্ম উত্তর বঙ্গ পর্যন্ত যে প্রসারিত ও বিস্তৃত হয়েছিল তার প্রমান আমরা রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে আবিষ্কৃত খলিফা হারুন অর রশিদের আমলের প্রাপ্ত মুদ্রার মধ্যে পাই। এতে বখতিয়ারের পূর্বেই ইসলাম বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে বুঝা যায়।[১]

বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রমশই মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিধি বিধান যেহেতু আলাদা, সেহেতু মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এর স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর এ জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। তাই শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ও ধর্ম গুরুদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বখতিয়ার খিলজী বঙ্গ বিজয়ের পর পরই এর সুব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মিনহাজ লিখেছেন যে, বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে অনেকগুলো খানকাহ্ নির্মান করেন।[২১] এতে অনুমিত হয় যে, বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই কতিপয় মুসলিম সাধু পুরুষ এদেশে তাদের ধর্ম প্রচারকার্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং এজন্য খানকাহ নির্মানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।[৩]

অতএব উপরোক্ত আলোচনার পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, সপ্তম শতক হতে আরব মুসলিম বণিকগণ যখন বাংলাদেশে আসতে থাকেন, তখন হতেই এদেশে ইসলামের নবযাত্রা শুরু হয়। কেননা তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সাথে ধর্ম প্রচার ও করতে থাকেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এদেশের অনেক লোক ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হতে থাকে।

---

১. বাংলাদেশের কালচার, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৫৩।
২. তাবাকতই নাসিরী (ইলিয়ট), পৃঃ৫৪০।
৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মন্য ধর্ম তথা হিন্দু ধর্ম এ দুটি ধর্মই প্রবল ছিল । বৌদ্ধ ধর্ম সহজ সরল ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মন্য ধর্ম গোঁড়া, ... ও পর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ছিল । সেন শাসনামলে দেখা যায় বৌদ্ধ দেরকে ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করত এবং নানাভাবে জুলুম ও নির্যাতন করে ধর্মীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করত । খৃষ্টীয় ৭ম শতকের পূর্ব হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মীয় অনাচার, অবিচার, অত্যাচার ও নীপিড়ন চলতে থাকে । ব্রাহ্মন্যবাদীদের এরূপ অত্যাচারে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ ভীত শ্রদ্ধ হয়ে পড়ে । তাছাড়া গোত্র, বর্ণ, জাতি ভেদ প্রথা, কুলীন, অকুলীন, উচ্চ নীচের প্রভেদ ইত্যাদির ফলে সাধারন মানুষ কম বেশী বিক্ষুদ্ধ ও অসহনীয় হয়ে পড়ে এবং এ থেকে মুক্তির আশায় প্রহর গুনতে থাকে । পাল শাসনামলে ও এ অত্যাচার চলে, তবে সেন শাসনামলে এর তীব্রতা আরো বেড়ে যায় । তাই আরব মুসলিম বণিক ও সূফী দরবেশদের কতৃর্ক প্রচারিত ধর্মকে সহজভাবে সাদরে গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গদেশ আক্রমনকে তারা স্বাগত জানায় এবং মুক্তির দূত হিসেবে চিহ্নিত করে । ঠিক এমনি এক ধর্মীয় ... দুর্যোগময় মুহূর্তে আরব মুসলিম বণিকগণ বাংলাদেশে বাণিজ্যে আসেন এবং বাণিজ্যের সাথে সাথে ধর্মীয় প্রচারনাও চালাতে থাকেন । এদের প্রচেষ্টায় অনেক মুসলমান হয় । যখন কিছু সংখ্যক মুসলমান হয়ে যায় এবং মোটামুটি ধর্ম প্রচারের পরিবেশ সৃষ্টি হয় । তখন বণিকদের পথ অনুসরন করে কিছু সংখ্যক সূফী দরবেশদের আগমন ঘটে । তাদের প্রচেষ্টায় ধর্ম প্রচার ব্যাপক ত্বরান্বিত হয় এবং বাংলাদেশের আনাচে কানাচে তা বিস্তৃতি লাভ করে ।

যারা মুসলমান হয়ে যায় তাদেরকে ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য, কিংবা ধর্মকে ভালভাবে জানার ও বুঝার জন্য সূফী সাধকগণ এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন খানকাহ, মসজিদ, মক্তব গড়ে তুলেন । এতে ইসলামী শরীঅতের আইন, কানুন, হালাল-হারাম এবং কুরআন শিক্ষার প্রতি প্রাধান্য দেয়া হয় । এভাবে বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধর্মীয় প্রচারনা চলতে থাকে এবং ক্রমানুয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

এমনি করে তৎকালীন বঙ্গ দেশে ধর্মীয় দুর্যোগ ও নীরাপত্তা হীনতার মুহূর্তে বণিকদের অসামান্য ত্যাগ, পরিশ্রম ও ধর্মের প্রতি উৎসর্গকৃত প্রান এবং সূফী দরবেশদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা, রাজ শক্তির মোকাবেলা করে, জীবন পন করে যে ধর্মীয় প্রচারনা চালিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে এ দেশে মুসলমানদের অভ্যুদয় হয়েছে ।

তবে সে সময়ে মুসলমানদের জনসংখ্যা নিতান্তই কম ছিল । পরবর্তীতে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে । কেননা বঙ্গ বিজয়ের সাথে সাথে বাংলায় মুসলমান বহিরাগতদের আগমনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়, এরফলে মুগল, পাঠান, তুর্কী ইরানী ইত্যাদি দেশের মুসলমানগণ এদেশের শাসনকর্তা, সৈনিক, সেনাপতি, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও ভাগ্যান্বেসনকারী রুপে আগমন করেন এবং বসতি ও স্থাপন করেন । এভাবে হাজার হাজার সৈনিকদের আগমন ও বসতি সুফী দরবেশদের ধর্ম প্রচারের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে ।

খন্দকার ফজলে রাব্বি উল্লেখ করেছেন যে, বখতিয়ার খিলজী যখন বাংলা জয় করেন, তখন বহু সংখ্যক আফগান ও মোগল পদাতিক সৈন্য তার সঙ্গে এদেশে আগমন করে । তিনি অগনিত মুসলমানসহ বাংলা ও বিহার অধিকার করেন এবং এ সমস্ত রাজ্যে মুসলমান শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন । তিনি তাঁর আমীর ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য জায়গীর প্রদান করে সদ্য বিজিত রাজ্যগুলিতে তাদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন ।[১] অধিকন্ত খালজী তুর্কীরা, যারা বিজেতা, সৈনিক ও ভাগ্যোন্বেষণকারীরুপে বাংলায় আসে, তারা তাদের স্ত্রী পুত্র পরিজনসহই আগমন করেছিল ।[২] এমনিভাবে বহিরাগত মুসলমান ও এদেশীয় নব মুসলমানদের সমন্বয়ে

----

১. খন্দকার ফজলে রাব্বি, "বাংলার মুসলমান", অনুবাদক মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৯৬৮) পৃঃ৩৩ ।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৫৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । এভাবেই বাংলাদেশে মুসলমানদের অভ্যুদয় ও সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । এবং ১৭৬৫ সালে ইংরেজদের দেওয়ানী লাভের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৬২ বছর সময়কালের জন্য এদেশে মুসলমানদের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত গতিতে বজায় থাকে ।[১]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীনকাল হতেই বাংলাদেশের সাথে আরবীয়দের যোগাযোগ ছিল । বিশেষ করে খৃষ্ট পূর্বকাল হতেই বাংলাদেশের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল । তাই আরবে ইসলামের অভ্যুদয়ের পরেই, মুসলিম বণিকরা আসতে থাকে । তারা শুধু বাণিজ্যই করত না, সাথে সাথে ধর্ম ও প্রচার করত । ফলে এসব এলাকার লোকদের সাথে তাদের মেলা মেশার সুযোগ হয়েছে । এরফলে ধর্মীয়ভাবে অত্যাচারিত মানুষেরা বর্ণ বিদ্বেষী ও সংকীর্ণ ধর্ম ত্যাগ করে মহত উদার, ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য, পরধর্ম সহিষ্ণু সর্বোপরি মানুষ ও মানবতার ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে । এবং ইসলামে যে, কোন জাতি, বর্ণ, গোত্র, উঁচু নীচু ও কৌলিন্যের কোন স্থান নেই, মানুষ হিসেবে কোন ভেদাভেদ নেই তারা বুঝতে পারে মুসলিম বণিকগণ জীবনের ঝুকি নিয়ে ,অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে মহান কাজটি করেছিলেন তা অবিস্মরনীয় । কেননা তাদের কারণেই এদেশে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রবেশ করে এবং মুসলমান হয় । বণিকদের প্রচেষ্টায় যখন কিছু কিছু মানুষ মুসলমান হতে থাকে এবং ধর্ম প্রচারের কিছুটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তখন বণিকদের পদাংক অনুসরণ করে সুফী দরবেশগণ এদেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসতে থাকেন । অর্থাৎ বণিকদের পরই সুফী দরবেশদের ধর্ম প্রচার দেশের আনাচে কানাচে ব্যাপকভাবে শুরু হয় ।

সুফী দরবেশদের সাধনা, কর্ম তৎপরতা, পরিচর্যার ফলে এদেশের মরনোম্মুখ জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয় । আওলীয়া দরবেশ ও জ্ঞান সাধকদের গুন মাধুর্য, অলৌকিক ক্ষমতা এবং জ্ঞান স্পৃহার আশ্চর্য নিদর্শন সমূহ এদেশের মানুষের অন্তরে এক অভিনব আকর্ষনের সৃষ্টি করে । ধর্ম প্রচারকগণ ধর্মের যে বীজ বপন করেছিলেন,তাই মুসলিম শাসকদের রাজ্য গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল ।[১] এভাবে ইসলামের আবির্ভাবের ৫০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ৭ শতক শেষ

---

১. পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ২২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার আগেই ইসলাম ধর্ম বাংলার জনতার একটি বিরাট অংশের ধর্মে পরিণত হয়েছিল। ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতকে আমরা বাংলার বিভিন্ন জেলায় যে সব আওলীয়া দরবেশদের দেখা পাই তাঁরা ও খালি হাতে বা ময়দানে ইসলামের বাতি নিয়ে এদেশে আসেনি। তাঁদেরকে স্বাগত জানানোর মত যথেষ্ঠ মুসলমান তখন বাংলায় ছিল বলেই তাঁরা এসেছিল।[১] এভাবেই ক্রমাগতভাবে দীর্ঘদিন আরব মুসলিম বণিক ও সূফী দরবেশদের অমানুষিক পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে এদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর এয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় খুব সহজে ও শান্তিপূর্ণভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি আরব মুসলিম বণিক ও সূফী দরবেশগণ এই মহান কাজটি না করতেন তবে হয়ত বখতিয়ারের পক্ষে এত সহজে রাজ্য জয় ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হত কিনা, কিংবা আদৌ সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। তাই এই কৃতিত্বের দাবীদার সম্পূর্ণ আরব মুসলিম বণিক ও সূফী দরবেশদের। কেননা তাঁরা শুধু বাণিজ্যই করেনি এর সাথে ইসলামের বাণী ও প্রচার করেছেন। তাদের এ ঝুকিপূর্ণ কাজ, অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, সাধনা ইত্যাদি বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা স্বার্থক হয়েছিল তাই বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলায় রাজ্য ও শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরব মুসলিম বণিক, সূফী দরবেশ ও এদেশের জনগনের অবদান অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ- মধ্যযুগে বাংলাদেশের অবস্থা

আমরা জানি যে, বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশে বৌদ্ধ ও হিন্দু এ দু'টি ধর্মই প্রধানত প্রবল ছিল। তবে খ্রীষ্ট পূর্ব ৪র্থ শতাব্দী হতে খৃষ্টপর ৯ম, দশম তথা পাল শাসন পর্যন্ত কম বেশী বৌদ্ধদের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাল বংশের পতনের পর সেন বংশীয় হিন্দু রাজা ও ব্রাহ্মনেরা সহজ সরল বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন করে তাদেরকে ধর্ম ত্যাগ ও হিন্দু ধর্ম গ্রহন করতে বাধ্য করে। তাছাড়া সেনদের জাতিভেদ প্রথা, গোত্র, বর্ণ বিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন ইত্যাদি সাধারন হিন্দুদেরকে বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্দ করে তোলে। মানুষ এই চাপা অশান্ত পরিবেশ হতে মুক্তি পেতে চায়। ঠিক এমনি এক দুর্যোগময় সময় আরব মুসলিম বণিক ব্যবসায়ী ও দরবেশগণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসে। তাদের কর্তৃক ইসলামের সুমহান মর্মবাণী সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, পরমত সহিষ্ণুতা ইত্যাদি নীতি ও আদর্শের বাণী শ্রবন করে অত্যাচারিত বৌদ্ধ ও সাধারন হিন্দুরা সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য মুসলমান হতে থাকে। এভাবে বাংলাদেশে মুসলমানদের অভ্যুদয় ও মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর পরবর্তীতে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের (১২০২-৪) পর থেকে এ দেশে মুসলমান শাসনের গোড়া পত্তন হয়। তখন থেকে শুরু করে ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বছর অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলমান সুলতান সুবাদার ও নবাবগণ বাংলাদেশ শাসন করেন। মুসলমানদের বঙ্গ ভারত বিজয় থেকে ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কে ভারতের মধ্যযুগ বলা হয়। দীর্ঘ এ সময়ের ব্যবধানে কমবেশী ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলাদেশে মুসলমান সমাজের পত্তন গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়।[১] এই মধ্য যুগকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি, যথা-১২০১ সাল হতে ১৫৭৬ সাল তথা মুগল শাসনের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম পর্যায়। ১২০১ হতে ১৩৪০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত সুবাদার কর্তৃক শাসিত হয়। এবং

---

১. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনা ধারা', ১ম খন্ড, ১ম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী (ঢাকা ১৯৮৩) পৃঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪০ সাল হতে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত মোট ২৩৬ বছর স্বাধীন মুসলিম সুলতানরা বাংলা শাসন করেন ।[১] ১৫৭৬ সাল হতে ১৭১৭ সাল পর্যন্ত ১৪১ বছর প্রকৃত মুগল শাসক কর্তৃক নিযুক্ত সুবাদারগণ শাসন করেন । অর্থাৎ আকবর কর্তৃক বঙ্গ দেশকে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করার সময় হতে নবাবী শাসনের পূর্ব পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায় । ১৭১৭ সাল হতে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত মোট ৫০ বছর নবাবী আমল যাকে তৃতীয় পর্যায় বলা যেতে পারে ।[২] এভাবে মধ্য যুগ বলতে আমরা এখানে তিনটি পর্যায় বুঝব, সুলতানী আমল, মুগল আমল, এবং নবাবী আমল । কিন্তু এ সময়ে বাংলাদেশের অবস্থা বিশেষ করে সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে জানা প্রয়োজন । তাই নিম্নে উক্ত সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হল ।

(ক) সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা (মুসলিম ও হিন্দু) ঃ

বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম এবং সমাজের মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধান আছে । প্রাচীন যুগে এদেশে হিন্দু ,বৌদ্ধ ,জৈন, প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকলেও এদের মধ্যে ক্রমশ পার্থক্য কমে আসছিল বলে বুঝা যায় । কিন্তু মুসলমানেরা যখন বঙ্গদেশে বসবাস শুরু করল তখন উপরোক্ত জাতিসমূহ পরবর্তীতে ক্রমশ হিন্দু সাধারন নামেই এখানকার জাতি ধর্ম ও সমাজকে অভিহিত করল । মুসলমানদের সমাজ মৌলিক বিষয় এত স্বতন্ত্র ছিল যে, তারা কোন দিনই

---

১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' (ঢাকা ১৯৬৫) ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৭৩ ।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ৭৪ । এখানে উল্লেখ্য যে, ১৭১৭ সালে যখন মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয় তখন হতে পরবর্তী সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবেই বাংলা শাসন করেছেন । এ সময় নীতিগতভাবে বাংলা মুগল শাসনাধীন থাকিলেও সুবাদারগণ প্রকৃত স্বাধীনভাবেই দেশ শাসন করেছে । মুর্শিদকুলী খানের পর হতেই বাংলার শাসকগণ নবাব হিসাবেই অধিক পরিচিতি লাভ করে । এবং নবাব আলী বর্দী খানের সময় হতে মূলত বাংলায় মুগলদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না বল্লেই চলে । সুতরাং এ সময়কালকে আমরা এখানে নবাবী আমল বলেই উল্লেখ করব ।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুর সংগে মিশে যেতে পারে নি। মুসলমানদের পূর্বে গ্রীক, শাক, কুষান, হুন, প্রভৃতি যারা এদেশে বাস করেছে, তারা হিন্দু সমাজের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে, বর্তমানে তাদের স্বাতন্ত্রতা খুজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু মুসলমানগণ মধ্যযুগের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত স্থান বিশেষ ১৩০০ সাল হতে ৫০০ বছর পর্যন্ত হিন্দুদের সাথে পাশাপাশি বসবাস করেও বিশ্বাস ও সামাজিক বিধানের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে মুসলমানরা অপবিত্র ও ম্লেছ। তাদের সাথে বিবাহ, একত্রে খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ তো দূরের কথা তাদের স্পর্শও দুষিত বলে গন্য করত। গো মাংস ভক্ষন, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি আচার ব্যবহার হিন্দুদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত। কিন্তু বিবাহাদি ও উত্তরাধিকারের আইন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই সমুদয় প্রভেদ লক্ষ্য করেই আল বেরুনী উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দুরা যা বিশ্বাস করে আমরা তা করি না, আমরা যা বিশ্বাস করি হিন্দুরা তা করে না।[১] বাংলাদেশের তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে চীনা বিবরণে পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশের অধিবাসী মুসলমান ও হিন্দু এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। হিন্দুরা গরুর মাংস খেত না, এবং স্বামী স্ত্রী এক সংগে বসে আহার করত না। হিন্দু সমাজে স্বামী বা স্ত্রী আগে মারা গেলে কেহই দ্বিতীয় বার বিবাহ করত না।[২] এতে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিম ও হিন্দু এ দুটি ধর্মের প্রভাব ছিল। এবং এ দুটি ধর্ম দুধরনের সামাজিক মেরু করনের সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতঃ এদুটি ধর্মকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন বঙ্গদেশে সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল এ সম্পর্কে আমরা দুটি ধর্মের সামাজিক অবস্থাকে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করব।

মুসলিম সমাজ ঃ

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসার ঘটার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সমাজ বিস্তার লাভ করতে থাকে। বঙ্গের মুসলিম সমাজের মধ্যে দুটি শ্রেনী লক্ষ্য করা যায়। একটি

---

১. রমেশ চন্দ্র মুজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস", (কলিকাতা ১৩৮০ বাংলা) ২য় খন্ড, মধ্যযুগ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৩০-৩১।

২. প্রফেসর আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশাগত মুসলমান এবং অন্যটি স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমান । বিদেশাগত মুসলমানের মধ্যে ছিল, আরবী, পারশ্য, মুগল ,তুর্কী ইত্যাদি এলাকার লোকজন । তাদের কেউ কেউ ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল এবং অনেকেই আবার রাজ কার্যের কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল স্থানীয় হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিমগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের কৃষ্টি ও রীতিনীতি হতে খুব একটা পৃথক ছিল না । বিদেশী ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কৃষ্টি ও রীতি নীতি সম্পর্কিত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামের মাধুর্য, ভ্রাতৃত্ব ও একতার কারণে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেয়নি ।

প্রকৃতপক্ষে একাদশ ও দ্বাদশ শতক থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দর ও রাজধানীগুলিতে ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । কারণ প্রচারের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় নগরগুলিকেই মুসলিম প্রচারকরা বেছে নিয়েছিল । বর্ণ হিন্দু শাসকেদের অত্যাচারে জর্জরিত বৌদ্ধ ও অবর্ণ হিন্দুরা ইসলামের মতবাদও সাম্যের বাণীকে খোদার আর্শিবাদ বলে গ্রহণ করে । তাই তারা ইসলামের ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলমান হতে থাকে । বখতিয়ার খিলজী প্রথমে যে মুসলিম সমাজ গঠন করেছিলেন তাতে যে এ দেশীয় নতুন মুসলমানদের একটি অংশ ছিল তা অস্বীকার করা যায় না । তাই মধ্য এশিয়া থেকে আগত বহিরাগত মুসলমান এবং এ দেশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ হতে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সমন্বয়ে বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম সমাজ গঠিত হয়েছিল । মসজিদ ছিল মুসলিম সমাজের প্রধান কেন্দ্র । ধর্মীয় ও অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব এ মসজিদের মাধ্যমেই পালিত হত । মুসলিম ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া, ও জ্ঞানার্জনের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় । সুফী দরবেশদের জন্য খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয় । খানকাহগুলি ছিল একদিকে ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র এবং অন্য দিকে এগুলি বয়স্কদের জন্য আবাসিক শিক্ষায়তনের কাজও চলত ।[১]

এভাবে দেশীয় ও বিদেশ হতে আগত মুসলমানদের সংস্পর্শে বাংলার হিন্দু সমাজে ভাঙ্গন দেখা দেয় । মুসলিম সমাজের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও পেশা গ্রহনের স্বাধীনতা এবং বর্ণভেদহীন

---

১. 'বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ১১২-১১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

নিরুৎসাহিত করণ প্রভৃতি দেখে নিম্ন শ্রেনীর হিন্দুদের মন বিচলিত হয়ে পড়েও বাংলা ও বিহারের নিম্ন শ্রেনীর হিন্দুরা উদার নৈতিক ইসলাম ধর্ম গ্রহনে ব্রতী হয়ে উঠে।[১] কেননা ইসলামের ধর্ম নীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় এমন কতকগুলি গুন ছিল, যা সে যুগের মানুষকে চমকিত করে ছিল। ভারতের ধর্ম নীতিতে ও সামাজিক আচরণ বিধিতে কিছু বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করা হত। বিশেষ করে বর্ণভেদ প্রথা, দাস প্রথা, অস্পৃশ্য প্রথা ইত্যাদির কারণে নিম্ন শ্রেনীর মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক অধিকার বলতে কিছু ছিল না। ইসলামে জাতিভেদ প্রথা, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্য প্রথার কোন স্থান নেই, বরং নীতিগতভাবে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে সমর্থন করে।[২] ইসলামের এই মহান আদর্শে অনুপ্রানীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে সমস্ত কুসংস্কার, লৌকিকতা, জড়বাদ এবং যুক্তিহীন অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজ গঠন করে। এমনিভাবে বিদেশাগত মুসলমান ও এ দেশীয় মুসলমান মিলে মিশে একই সমাজে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে ও ইসলামী সমাজকে আরো পরিপুষ্ট করেছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল রাজা চেঙ্গিস খাঁ সমগ্র মধ্য এশিয়ায় তুর্কী মুসলমানদের রাজ্য এবং বোখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করেন। ফলে এ অঞ্চল হতে গৃহহীন মুসলমানগণ নিরাপত্তার জন্য দলে দলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তাদের অনেকে বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করে এবং বাংলার মুসলমান সুলতানগণ জ্ঞানী গুণী মুসলমানদের অর্থ ও সম্মান দিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলায় মুগল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান রাজ কর্মচারীরূপে বাংলায় আসে। এরূপে কালক্রমে বহু পন্ডিত ও উচ্চ শ্রেনীর মুসলমান বাংলায় আসেন এবং সংখ্যায় অল্প হলেও তারা বাংলার মুসলমান সমাজে উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করেন।[৩] শুধু তাই নয় ত্রয়োদশ শতকের লখনৌতির মুসলিম শাসন কর্তাগণের সাথে দিল্লী, বাগদাদ ও মক্কা, মদীনাসহ মধ্য এশিয়ার

---

১. বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩১।

২. উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২।

৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৩-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম অধ্যুষিত শহর ও এলাকাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও ছিল । এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের সুষ্ঠু গঠন সম্ভব হয়েছে ও পরিপুষ্ট হতে সাহায্য করেছে । বিশেষ করে ঐ সমস্ত এলাকার আলেম, সুফী দরবেশ ও মুজাহিদগণ বাংলাদেশে আগমন করে এখানে নতুন মুসলিম সমাজ গঠনে সাহায্য করে ।[১]

ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী বিজয়ের ফলে বাংলাদেশে পীর দরবেশদের যেমন আগমন ঘটতে থাকে, তেমনি ধর্মান্তরিত করণও ত্বরান্বিত হয় । এদিকে শাসক গোষ্ঠীর সাথে সামাজিক,প্রশাসনিক কর্মচারী, রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দিল্লীতে অনেকবার রাষ্ট্র বিপ্লব হয়েছে । শেষের দিকে মারাঠা, আমেঠি, নাদীর শাহ, আহমদ শাহ আবদালির আক্রমন ও লুন্ঠনের ফলে দিল্লীর নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে । এ কারণে তারা জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার কারণে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে । এদের একটি স্রোত বাংলাদেশেও প্রবাহিত হয় । পরে শান্তি স্থাপিত হলেও তাদের অনেকেই আর দেশে ফিরে যায়নি । তারা এদেশে বসতি স্থাপন করে এবং স্থানীয় নারী পুরুষ এর সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে । এভাবে শাসক, সৈনিক, বণিক ধর্মপ্রচারক, প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিক সূত্রে বংশ জাত মানুষ এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃষ্টি ,গঠন, বর্ধন সম্পন্ন হয় । সুতরাং বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার এবং মুসলমান সমাজের পত্তন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘ কালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বাঙালী মুসলমানের গঠন ও সমাজের বিকাশের কাজ সম্পন্ন হয় ।[২]

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী উল্লেখ করেন যে বঙ্গে যখন তুর্কী আফগানের আবির্ভাব ঘটে তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রায় ভগ্ন দশা । সুতরাং অস্তিত্ব থাকলেও অনেক বৌদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্ন স্তরে আশ্রয় নিয়েছিল । এর জন্য সমাজে তারা ছিল অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয় । এই অমানবিক ও

---

১. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৭ ।

২. উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩-৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

অসম্মানজনক অবস্থা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভগ্নদশা বৌদ্ধরা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করে। হিন্দু ধর্মের নিম্নস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে অপাংক্তেয় হয়ে থাকার চেয়ে ইসলাম গ্রহণ করে সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা লাভ অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে তারা মনে করেছিল। বস্তুত নব গঠিত মুসলমান সমাজ গঠনে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।[১] ইসলামের সাম্যবাদ, এদেশে বিজিত জাতিগুলির হৃদয় জয় করেছিল এবং এরফলে আরবদের দ্বারা বিজিত জাতির লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত।[২] এভাবে ইসলামের সাম্যবাদের উদার আবেদনের এবং সামাজিক বন্ধন ও মুক্তির আশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে ও সাথে সাথে ইসলামী আদর্শে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

মুসলিম বিজয়ের প্রথম শতকে কি পরিমান অমুসলিম মুসলমান হয়েছিল তা বলা কঠিন, তবে মুসলিম সমাজে যে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথা বলা যেতে পারে যে মুসলিম সমাজের শক্তিশালী সংগঠন উন্নত চরিত্র ও মহান আদর্শের কারণে আশে পাশে ভিন্ন সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে মুলত গোষ্ঠী ভিত্তিক সমাজ ছিল যার ফলে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ দলপতি মুসলমান হলে, তার সাথে সাথে সমাজের অন্যান্য লোকেরাও মুসলমান হয়েছে। এভাবে দেখা যায় যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার একশত বছরের মধ্যে বাংলার মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পায়। এ একশত বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি শহর ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থলে পরিণত হয়। তম্মধ্যে পান্ডুয়া ও দিনাজপুরের মাহিসন্তোষ ছিল আলেম ও সুফী দরবেশদের কেন্দ্র স্থল।[৩] এমনি করে কয়েকশত বছর ধরে আলেম সুফী দরবেশদের বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম প্রচার এবং ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি এলাকায় শক্তিশালী মুসলিম

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।

২. ডঃ ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, "বাংলার ইতিহাস", (সামাজিক বিবর্তন) (কলিকাতা,১৩৮৩ বাংলা) ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৬৬-৬৭।

৩. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যার কারণে সমগ্র বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও ব্যাপক ভিত্তিক মুসলিম সমাজ গঠনের এক বিরাট পরিবেশ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। ঠিক এ সময় মোঙ্গল আক্রমনে বিধ্বংস্ত মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন নগর হতে বিপুল সংখ্যক আলেম, সূফী দরবেশ উত্তর ভারতে আগমন করেন। তাদের মধ্যে অনেকে আবার বাংলাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন। তাই পরবর্তী শতকে বাংলায় ইসলাম প্রচারের গতি ছিল দ্রুত। চতুর্দশ শতকের বাংলায় ইসলাম প্রচারও মুসলমান সমাজ বিস্তারের ইতিহাস দেখলে বুঝা যায় যে, এ সময় ইসলাম প্রচারের বিশাল প্রভাব ও স্রোত ধারা সমগ্র বাংলাদেশকে প্লাবিত করেছিল। আবার এ শতকের মধ্যে পূর্বে সিলেটও চট্টগ্রাম পর্যন্ত বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চল প্রায় মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে। এ সময় বিপুল সংখ্যক সুফী, দরবেশ, মুজাহিদ ও আলেমগণের প্রচেষ্টায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিপুল সংখ্যক অমুসলিম মুসলমান হয় এবং মুসলিম শাসকদের প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজের ক্ষেত্র ও প্রসারিত হয়। তাই চতুর্দশ শতককে ইসলাম প্রচারের স্বর্ণ যুগ বলা হয়।[১]

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বাংলার সর্বত্র শহরে ও গ্রামে সুফীরা দর্গাহ খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। এরা ইসলাম ধর্ম শাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন। প্রত্যেক সুফীরই বহু সংখ্যক শিষ্য ছিল। এরা তাদেরকে ইসলামী শাস্ত্রে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতির বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এই শিষ্যরাও আবার বড় হয়ে দর্গাহ প্রতিষ্ঠা করে নতুন করে শিষ্যদের দীক্ষা দিতেন। কেননা অমুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা ইসলামী বিধান মতে পুন্যের কাজ। এ কারণে সুফীও তাদের শিষ্যগণ এ বিষয়ে অতিশয় তৎপর ছিলেন। তাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে বহু সংখ্যক হিন্দু বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করে।[২] এভাবে মুসলিম সমাজে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সামাজিকভাবে ধর্মীয় প্রভাব শিকড় গাড়তে থাকে।

মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তবে, ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সে শিক্ষা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের রীতি নীতির মধ্যে সীমা বদ্ধ ছিল। উচ্চ শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলই না

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ১১৮।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

বলে চলে। তাই ইসলাম গ্রহণ করে বাংলার মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আলাদা কোন চরিত্র লাভ করেছিল ইতিহাসে তার বেশী প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেন না পীর পূজা, কবর পূজা, মানত মানা, দরগাহ বানান, তাজিয়া নিয়ে শোভা যাত্রা করা, মর্সিয়া গাওয়া, মনসা, শীতলা দেবীর উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়া, যাত্রা ও মেলাতে অংশ গ্রহণ করা ভূত প্রেতে বিশ্বাস করা ইত্যাদি বিজাতীয় ও বিধর্মীয় কুসংস্কার ও রীতি নীতি মুসলিম সমাজে প্রচলন ও প্রভাব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১] তাই ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের মধ্যে বিধর্মীয় আচার আচরণ কুসংস্কার ইত্যাদির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ নিম্ন শ্রেনীর হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের কোন কোন বিশ্বাস, সংস্কার . . . . তখনো ত্যাগ করতে পারেনি। যেমন আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, হিন্দুদের গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুসলমান পীরের প্রতি ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু এরপর ইহা পঞ্চ পীর যথা-সত্য পীর, মানিকপীর, ঘোড়াপীর, কুমীরপীর, মদারী (মৎস্য ও কচ্ছপ) প্রভৃতির পীর ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। কুমীরের কৃপায় বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভ হলে প্রথম সন্তানটি কুমীরকে দান, মদারীকে ভোজ্য দান, গাছে সুতা বাঁধা ইত্যাদি নিম্নশ্রেনীর হিন্দুদের কুসংস্কার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে।[২] শুধু তাই নয় মুসলিম বঙ্গের সমাজ ব্যবস্থা হিন্দু সমাজের জাতি ভেদের কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ বাংলার মুসলমান সমাজে এ সময় কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেনীর উদ্ভব হয়েছিল। যেমন উচ্চ, মধ্য, এবং নিম্ন, এই তিনটি পৃথক শ্রেনীর অস্তিত্ব ছিল। এদের মধ্যে সৈয়দ, আলিম, শেখ, পীর দরবেশ, মোগল, পাঠান, তুর্কী, আরবী, পার্সিক, প্রভৃতি উচ্চ শ্রেনীভুক্ত এবং বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। কাজীও উচ্চ পদস্থ কর্মচারী এবং মোল্লাগন জনসাধারন অপেক্ষা উচ্চ স্তরে ছিল। কিন্তু এই শ্রেনী বিভাগ হিন্দুদের জাতিভেদের ন্যায় কঠোর ছিলনা। এদের মধ্যে ভোজন বা স্পর্শ জনিত দোষের কোন কারণ ছিলনা, এবং বিভিন্ন শ্রেনীর মধ্যে বিবাহাদিও অপ্রচলিত বা বাধা ছিল না।[৩]

---

১. ঊনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৪।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩৬।

৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সমাজ কাঠামোর মধ্যে শ্রেনীভেদ সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে, হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শুদ্র বা রক্ত ভিত্তিক চর্তুবর্ণের ভেদ রীতি কেবল মাত্র নাম পাল্টিয়ে মুসলমান সমাজে আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ, আরজল, প্রভৃতির নাম গ্রহণ করেছে। সমাজে মানুষের মধ্যে এই শ্রেনীভেদ প্রধানত খান্দানী রক্তধারা দিয়ে নির্মিত হয়েছে। বিত্ত ও বিদ্যা সমাজ স্তর গঠনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সৈয়্দ, শেখ, মোগল ও পাঠান প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলমানগণ নিজেদের আশরাফ বলে পরিচয় দিত। মহানবী (সঃ)-এর বংশধর দেরকে সৈয়্দ, সাহাবীদের বংশধরদের শেখ, আফগানিস্তান ও তুরস্কের অধিবাসীদের পাঠান, এবং মোঙ্গলীয় অধিবাসিদেরকে মোগল বলে অভিহিত করা হত। সৈয়্দ বংশজাত লোকেরা হোসাইনি, রিজভী, নকভি, ইসমাইলি, বুখারী, কিরমানী, প্রভৃতি এবং শেখ বংশ জাত লোকেরা সিদ্দিকী, ফারুকী, আব্বাসী, ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করত। ধর্মীয় নেতাগণ শাহ, খন্দকার, উপাধি ব্যবহার করত। পাঠানরা খান, শুর, এবং মোগলরা মীর্জা, বেগ, মীর, মল্লিক, লস্কর প্রভৃতি ব্যবহার করত।[১] এগুলি পেশাগত উপাধি ছিল। কাজী ও চৌধুরী, উক্ত চার শ্রেনী সকলেই পেশা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারত। শেখ, খান, মালিক প্রভৃতি পদবী ধর্মানুরিক্ত ব্যক্তিগত সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী গ্রহণ করত।[২] যারা কৃষি কাজে নিয়োজিত ছিল তারা নিজেদেরকে জোলা, তাঁতী, ও দর্জি অপেক্ষা বড় মনে করত। আবার জোলা, দর্জি জাতীয় লোকেরা নিজেদেরকে মাঝি, মাল্লা, কলু, কসাই, কামলা, খালাসী, ধুনারী, প্রভৃতি শ্রেনীর লোকদের উপরের স্তরে বলে মনে করত। এ ছাড়া নিম্ন শ্রেনীর মধ্যে তৎকালীন সময়ে ছিল, যেমন, মুচি দফালি, হাজম, ভাট, বোধি, নাট, বাদিয়া, প্রভৃতি। আশরাফদের মধ্যে এদের স্থান ছিল সমাজের সর্ব নিম্ন স্তরে। ভাঁড়, মেহতর, কসবি, হিজড়া, মাঙ্গতা, প্রভৃতি যারা অতি নিচু স্তরে

---

১. ১৮৯১ সালের সেনসাস রিপোর্টে মোট বিশটি উপাধির কথা বলা হয়েছে। যেমন, আখন্দজি, আতরাফ, খান, গাইন, গাজী, চৌধুরী, দফাদার, দেওয়ান, নায়েক, পাঠান, বিশ্বাস, বেগ, মীর, মীর্জা, মোগল, শেখ, শানা, সরদার, সৈয়্দ ও হাজরা। সেনসাস অব ইন্ডিয়া ১৮৯১, ৫ম খন্ড, (লোয়ার প্রভিন্স অব বেঙ্গল এন্ড দেয়ার ফিউডাটরিজ) (কলিকাতা ১৮৯৩,) পৃঃ ১৭।

২. দি অরিজিন অব দি মুসলমান অব বেঙ্গল, পৃঃ ১০০-১২০। উদ্বৃত, ঊনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, পুর্বোক্ত, পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

পেশায় নিয়োজিত ছিল, তারা আরজল বা ইতর শ্রেণীর মধ্যে গন্য হত । হিন্দুদের নিম্ন স্তরের শূদ্রদের পেশার সাথে এদের পেশা মিল ছিল ।[১]

সামাজিকভাবে মেলামেশা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং পানাহারের ক্ষেত্রে কোন শ্রেণীভেদ না থাকলেও কোন কোন অঞ্চলে হয়ত এ শ্রেণীভেদ কঠোরভাবে পালন করত । দেখা যায় যে, বিত্তবান গৃহস্থ ঘরের মেয়ে বিত্তহীন আশরাফগণ গ্রহণ করত, কিন্তু আশরাফগণ কৃষক, জেলে, তাঁতী ঘরের মেয়েকে গ্রহণ করত না । তবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী মুসলিম সমাজে কোনরূপ শ্রেণীভেদ ও উচ্চ নীচের স্থান না থাকায়, মুসলিম সমাজে এই শ্রেণীভেদ হিন্দু সমাজের মত কঠোর ছিলনা । হিন্দু সমাজে এক বর্ণ হতে অন্য বর্ণের মধ্যকার বাধা বিপত্তি দূর করা দুরূহ ছিল, কিন্তু মুসলিম সমাজে তা ছিল না। ধর্মের দিক থেকে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের বিধি নিষেধ না থাকায়, সমাজে শ্রেণীভেদ প্রথা সর্বত্র ছিল না বল্লেই চলে । সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মুগল, আশরাফ, আতরাফ, আরজল ইত্যাদি শ্রেণীভেদ প্রথা ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মীয় কোন ভিত্তি ছিল ন । অন্যান্য মুসলিম দেশে এরূপ শ্রেণীভেদের সামাজিক কোন মূল্যায়ন হয় না, যা আমাদের দেশে কিছুটা হয় ।

সুতরাং আমরা সব শেষে বলতে পারি যে, মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক জীবনে আশরাফ, আতরাফ, বা শরীফ ও রযীল, এই দুই শ্রেণী ছিল । এ দুটি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল, পানাহার, ওঠা বসাতেও পার্থক্য করা হত । বহিরাগত মুসলমানেরা সাধারণ শরীফ হিসেবে

---

১. ১৮৯১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলমান সমাজে মোট ১০২টি পেশাজীবি মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায় । তম্মধ্যে এখানে কিছু নাম উল্লেখ করা হল, যেমন, বাদ্যকার, বাজিকর, বকলি, বোরহি, বেহারী, বেপারী, বেসাতী, বেশ্যা, ভন্ড, ভাট, ভাতিয়ারা, চামার, চৌকিদার, চিক, চিত্রকর, চৌধুরী, চুনারি, দাই, দালাল, দপ্তরি, দর্জি, ধোপা, ধনিয়া, ফকির, গজনবী, গোলাম, হাজ্জাম, গোলদার, গোয়ালা, জমাদার, ঝাড়ুদার, জোতদার, জোলা, কলু, করদার, কারিগর, কসাই, কাজি, খোজা, খন্দকার, মহলদার, মন্ডল, মাঝি, মিস্ত্রি, মৃধা, মোল্লা, মুন্সী, পাটনি, পেসকার, সরকার, তরফদার ইত্যাদি । সেনসাস অব ইন্ডিয়া, ১৮৯১, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ১৭,১৯ । উদ্ধৃত, উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৫-১৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

এবং স্থানীয় নিম্ন বর্ণ হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা রযীল হিসাবে খ্যাত ছিল । তবে এ জাতীভেদ সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা ভিত্তিক ছিল, কিন্তু ধর্মীয়ভাবে ইসলামের কোন সমর্থন ছিল না ।[১] এই শ্রেণী হিন্দু সমাজ থেকে আগত । এ সময় মুসলিম সমাজে মোল্লা নামে এক নতুন যাজক শ্রেণীর উদ্ভব উল্লেখ যোগ্য । এরা হিন্দু পুরহিতদের মতই গ্রামবাসীর নিত্য নৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠান, এবং বিবাহাদি ইত্যাদি, কার্যাদি সমাধা করত । এ ছাড়া ঝাড় ফোক, ভূত প্রেতের উপদ্রব হতে রক্ষা এবং মুরগী, বকরী ইত্যাদি জবাই করে যে অর্থ উপার্জন হত তা ছিল তাদের উপজীব্য ।[২] তবে পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সমাজে মোল্লাদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে । এর কারণ ছিল তাদের জ্ঞানের বিকাশ লাভ । কুরআন, হাদীস চর্চা ও জ্ঞান সাধনায় এরা সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন । কাজীরাও মোল্লাদের এ কারণে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন । মোল্লাদের প্রতি সাধারন মানুষের বিশ্বাস ছিল অনেক । বিপদাপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মোল্লাদের দেয়া তাবিজ কবজ ব্যবহার করত । শুধু তাই নয় তারা গ্রামে ধর্মীয় ও সামাজিক কার্য ও উৎসবাদিতে নেতৃত্ব দিতেন । নামাজের ইমামতি করতেন এবং ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাও দিতেন । চন্ডি কাব্যে মুকুন্দরাম উল্লেখ করেছেন যে, মোল্লাগণ বিবাহ কার্যের অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করতেন ।[৩]

আলেম, শেখ, প্রভৃতি ধর্মপরায়ন ব্যক্তি ব্যতীত উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ বিলাসিতাও প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটাতেন । তাঁরা সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করতেন । পোশাক পরিচ্ছদে, আহারে, আমোদ প্রমোদে তারা অতিশয় বিলাস প্রিয় ছিলেন । পর্তুগীজ ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজক বার বোসা বাংলাদেশের প্রধান একটি শহর 'বাঙ্গালার' উচ্চশ্রেণীর লোকের বিলাসিতা পূর্ণ জীবনের চিত্র তুলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ধনী ও অভিজাত মুসলমানগণ হাটুর নীচ অবধি তথা

---

১. আব্দুল মওদুদ, 'মধ্যবিত্ত- সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর (ঢাকা ১৯৮২) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় মুদ্রন, পৃঃ৪৯ ।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩৬ ।

৩. অধ্যাপক কে, আলী 'বাংলাদেশের ইতিহাস (ঢাকা১৯৮৬) ২য় সংস্করণ ।

Dhaka University Institutional Repository

গোড়ালী পর্যন্ত সাদা ও ঈষৎরঙ্গীন লম্বা মরিস্ক শার্ট (রোব্বা) পড়তেন । শার্টের নীচে কোমর হতে নীচে লুঙ্গির মত কাপড় জড়ানো থাকত । উপরে রেশমের কোমর বন্দ বাধা থাকত এবং তার সাথে রৌপ্য খঁচিত তরবারি ঝুলান থাকত । পুরুষেরা স্বর্ন ও মনি মানিক্য খঁচিত একাধিক অঙ্গুরি পড়ত । মাথায় মশৃন কাপড়ের টুপী থাকত । এরা অত্যন্ত বিলাসময় জীবন যাপন এবং মেয়ে পুরুষ উভয়েই উৎকৃষ্ট খাবার ও পানেয় গ্রহণ করত । তাদের মদ্য পানের ও অভ্যাস ছিল । প্রত্যেককের ক্ষমতানুযায়ী ৩ থেকে ৪ জন বিবাহিতা স্ত্রী ছিল । তাদের পড়নে মুল্যবান পোষাক ও অলংকারাদি থাকত এবং পর্দানশীন ও ছিল । তাদের চাকর ও ছিল অনেক । মেয়েরা রাত্রি বেলায় আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী বেড়াতে যেত । বার-বোসার মতে মহিলারা মদ্য পানে আসক্ত ও অভ্যস্ত ছিল । বিবাহ উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে পানাহারের প্রাচুর্য্য দেখা যেত । মহিলারা কন্ঠ সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীতে পারদর্শী ছিল ।[১] চীনা পরিব্রাজক ফেইসিন বাংলার মুসলমান সমাজের পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানগণ মাথায় সাদা সুতী পাগড়ী, গায়ে লম্বা সুতির সাদা আলখাল্লা, এবং পায়ে ভেড়ার চামড়ার উপর সোনালী জরির কাজ করা জুতা পরত । সৌখিন ব্যক্তিরা নকশা আঁকা জুতা পরত । নারীরা খাটো কামিজ এবং উপরে চার দিক ঘিরে সুতী রেশমী অথবা কিংখাবের ওড়না পরত । তারা কানে দামী পাথর বসানো দুল পরত । মনি খচিত আংটি, গলায় হার, মাথায় চুল পিছনে খোপা করে বেঁধে রাখত । হাতে নানা প্রকার চুরি বালা এবং হাতে ও পায়ের আঙ্গুলে আংটি পরত ।[২]

----

১. ওয়াকিল আহমদ, 'মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক', ১ম সংস্করণ (ঢাকা, ১৯৬৮) পৃঃ৬০ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩৮ । বুক অব বারবোসা, ২য় খন্ড, পৃঃ১৪৭-৪৮ । উদ্ধৃত, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪৫-৪৬ ।

২. মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক, পূর্বোক্ত, পৃঃ৫১-৫২ । বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০৪৬ । বিশ্ব ভারতী এ্যানালস, ১৯৪৫, ১ম খন্ড, পৃ° ৯৬-১৩৪ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড (১২০৩-১৫৭৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

চৈনিক পর্যটক মাহুয়েন মুসলমানদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, মুসলমানদের পোষাক ছিল সাদা, মাথায় সাদা পাগড়ী, ঢিলা পাজামা, ও গোল কলারযুক্ত লম্বা যোব্বা গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলে থাকতো, কোমরে চ্যাপ্টা রঙ্গিন ফিতা জড়ানো থাকত । পায়ে চামড়ার ছুচালো জুতা পরত । রাজ পোশাকের সহিত সাধারনের পোশাকের গুণগত মান ব্যতীত রুপগত কোন পার্থক্য ছিল না । মুসলমানগণ মাথা নেড়া করে রাখত ।[১] মেয়েরা মাথায় সিথি পাটি, টিকলি, কন্ঠে হাসুলি, টাকার ছড়া, তাবিজের ছড়া, হাতে কংকন, বালা চুড়ি, অঙ্গদ, নাকে কোর, চাঁদ বোলাক, ডাল বোলাক, নাকমাছি, কানে কান ফুল, করম ফুল, ঝুমকা, কুন্ডল, কানবালা, মল, বাহাতে তাড়, বাজু, কেয়ুর, জসম, গ্রীবায় গ্রীবাপত্র, হাতের পাতার উপর অঙ্গুল সংলগ্ন রতন ছড়, কটিতে নীবি বন্ধ, কিংকিনী, চন্দ্র হার, প্রভৃতি ধারন করত ।[২] ধনী ঘরের মেয়েরা মনিমুক্তা খচিত নানা কারুকার্য খচিত অনেক বিচিত্র আকৃতির অলংকার পরত । আর গরীবের মেয়েরা রুপার ও পিতলের অলংকারে সজ্জিত হত । নারীর শাড়ি ও ছিল বিচিত্র ধরনে ও বিভিন্ন নামের । কাঁচুলির বৈচিত্রের আর সৌন্দর্যের ও উল্লেখ সর্বত্র পাওয়া যায় ।[৩] সুতরাং এ সব বিভিন্ন বিবরণী হতে অনুমান করা যায় যে, সুলতানী আমলে মুসলিম সমাজে অভিজাত মুসলমানেরা পোশাক ,সাজসজ্জা, অলংকার ব্যবহার ইত্যাদির দিক দিয়ে অত্যন্ত বিলাস বহুল জীবন যাপন করত ।

চিনা বিবরণী হতে সে সময়ে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য ও আহারের বর্ণনা পাওয়া যায় এতে প্রতীয়মান হয় যে, মাংশের রোষ্ট, কদলী, কাঁঠাল, ইত্যাদি তাঁদের আহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল । আহারের শেষে তারা মধু, এবং গোলাপ পানির শরবৎ পান করত । রিয়াজ উস সালাতীন, তারিখ-ই-ফিরিশতা ও বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে উল্লেখ হয়েছে যে, বাংলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা স্বর্ণ

---

১. মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১ ।

২. আসপেক্টস অব বেঙ্গলী সোসাইটি, ইনট্রোডাকশন,চেপ্টার,২বি,৪,পৃঃ২৮ । বেঙ্গল আন্ডার আকবর এন্ড জাহাঙ্গীর, পৃঃ১১৪-১৫ । উদ্ধৃত, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০৪৮ ।

৩. বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ১০৪৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মিত পাত্রে খাদ্য গ্রহণ করতেন । এবং তাদের মধ্যে একটি নিয়ম ছিল যে, যে ব্যক্তি কোন উৎসব বা ভোজানুষ্ঠানে যত বেশী স্বর্ণের থালা পরিবেশন করতে পারতেন, তিনি সমাজে তত বেশী উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হতেন ।[১] মাহুয়েন বঙ্গের শহর গুলিতে অনেক মদের দোকান দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন । বিত্তশালী মুসলমানেরা মাঝে মাঝে সামাজিক উৎসবের আয়োজন করতেন । এবং একে প্রানবন্ত করে তুলার জন্য নৃত্য গীতেরও ব্যবস্থা করতেন । মাহুয়েন অবসর বিনোদন ও আমোদ প্রমোদের উপকরণ হিসেবে এক শ্রেণীর পেশাদার সঙ্গীত শিল্পীর কথা উল্লেখ করেছেন এ সকল শিল্পীরা অভিজাত এবং বিত্তশালীদের ঘরে প্রত্যহ ভোরে (৪টা হতে) এবং মধ্যাহ্নে সঙ্গীত পরিবেশন করত । মাহুয়েন গানের সুরের কথা উল্লেখ করেননি । তবে বর্ণনানুসারে গজল ও কাওলী বলে অনুমান করা হয় । তিনি সঙ্গীত চর্চার কথা উল্লেখ করে তৎকালীন সাংস্কৃতিক জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন ।[২]

উচ্চশ্রেণী ব্যতীত বুদ্ধি বৃত্তিমূলক পেশার কাজে নিয়োজিত লোকদের সমন্বয়ে সুলতানী আমলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল । বর্তমানকালে মধ্যবিত্ত বলতে আমরা সমাজের যে অংশকে নির্দেশ করি, সুলতানী আমলে সেটা অবিকল একই অর্থে বুঝাত না । বস্তুত সে যুগের মধ্যম শ্রেণী বর্তমান যুগের ন্যায় ততটা সোচ্চার ছিল না । মোটা মোটি নিম্নপদস্থ কর্মচারী কেরানী, চিকিৎসক, শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, কবি, সঙ্গীত শিল্পী, স্থপতি, শিল্পী, কারিগর, এবং উৎপাদনকারী ব্যক্তিরাও মধ্যবিত্ত শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল । ইনশা-ই-মাহরু, থেকে জানা যায় যে, সুলতান ফিরোজশাহ তুগলকের রাজত্বকালে প্রাচুর্য ও সস্তার সময় একজন তাতী এক খন্ড কাপড় বুননের জন্য ৩০ জিতল পেত ।[৩] এতে প্রতীয়মান হয় যে, এই কারিগরও উৎপাদনকারীগণ তাদের কাজের জন্য উত্তম

---

১. রিয়াজ, পৃঃ১৩২ । ফিরিস্তা, ২য় খন্ড, ৩০১-২ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৫ ।

২. মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৩ ।

৩. ইনশা-ই-মাহরুহ, উদ্ধৃত, ডঃ আই,এইচ,কোরেশী, 'টেক্সটাইল ইন ইনডো পাকিস্তান ডিউরিং মিডল এইজ,' জার্নাল অব দি পাকিস্তান, হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ১ম খন্ড, ২য় অধ্যায় ১৯৫৩ পৃঃ১০৪ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৯৮-৯৯ । উল্লেখ্য যে ৪৮ জিতল =১ টাকা, তৎকালীন মুদ্রামান এই রূপ ছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

পারিশ্রমিক লাভ করত । এবং উচ্চমানের জীবন যাত্রার ফলে তারা সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছিল ।

চৈনিক দূত এবং ইউরোপীয় বণিকরা বাংলার পোশাক পরিচ্ছদ ও চাল চলন সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় যে, মধ্যবিত্ত ,. শ্রেণীর লোকেরা স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করত । কৃষক, তাঁতী, ছোট ছোট কারিগর, উৎপাদক, বিভিন্ন শ্রমিকদের সমন্বয়ে তৃতীয় শ্রেণী তথা সমাজের সাধারণ অধিবাসী বলে গণ্য হত । কৃষকদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু । সাধারণ মুসলমান সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কেরানী হিসেবে অথবা সৈনিক হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী ছিল । কতকগুলি পেশা মুসলমানদের জন্য একচাটিয়া ছিল । নাবিক হিসেবে তাঁরা অত্যন্ত পারদর্শী ছিল এবং তাদের অনেকেই এই পেশা গ্রহণ করত, দরজীর কাজ মুসলমানের একচাটিয়া ছিল । হিন্দুরা ও তাদের পোশাক নির্মানের জন্য মুসলমান দর্জির নিকট আসত । ইহা ছাড়াও মুসলিম সমাজে পিঠারী, কাবারী, তীরকার, কাগজী, হাজম, কশাই, প্রভৃতি পেশাগত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল । মুসলিম বঙ্গে মুসলমান তাঁতীদের দক্ষতাও নিপুনতার জন্য বস্ত্র শিল্পে বিশেষ সুনাম করেছিল ।[১] শুধু তাই নয় সুলতানী আমলে বঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ ও ধর্মীয় গাম্ভীর্য সহকারে পালন করা হত । যেমন ঈদুল ফিতর, এবং ঈদুল আযহা মুসলিম সমাজের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হত ।

সমসাময়িক বাঙালী কবিদের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, মুসলমান সমাজ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য খ্যাত ছিল এবং কুরান ও হাদিস অনুযায়ী জীবন চালাত । ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি যথারীতি পালন করিত, এমন কি পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার আচরণে তারা মুসলমানদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলত । মুকুন্দ রামের বর্ণনা থেকে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় । কবি উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানেরা প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে এবং প্রত্যহ পাঁচ বার নামাজ, পড়ে । সোলেমানী মালা গুনে তারা পীর পয়গম্বরদের ধ্যান করে এবং পীরের

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

দরবারে প্রদীপ জ্বালায় । মুসলমানরা সর্বদা কুরআন পাঠ করে ।[১] কবি আরও উল্লেখ করেন ..সকল সৈয়দ, মোল্লাহ ও অন্যান্যরা আল্লার নাম জপ করে এবং সর্বক্ষন কুরআনের উল্লেখ করে তারা হিন্দুদের নিকট কলেমা পাঠ করে এবং তাদেরকে দৈনিক অজু ও নামায শিক্ষা দেয় ও মণ্ডবের কাজে নিয়োজিত থাকে ।[২]

তবকাত-ই-নাসিরীতে উল্লেখ হয়েছে যে, তৎকালীন সময়ে সুলতান রমযান মাসে ধর্মীয় কার্যাদি পালনের জন্য সকল রকম ব্যবস্থা নিতেন । খোলা ও প্রসস্থ স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করা হত । নামায শেষে একে অন্যকে আলিঙ্গন করত । তাই সুলতানী যুগে বাংলার মুসলিম সমাজের জন্য প্রতি বছর এক মহান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে ঈদ পালিত হত । এ ছাড়া বিশেষ আড়ম্বরের সাথে মুসলমানগণ রাসুল (সঃ) এর জন্ম দিন পালন করত । শবে বরাত বাংলার মুসলিম সমাজের জন্য ছিল আরেকটি ধর্মীয় উৎসব । এ উৎসব উপলক্ষ্যে গরীব দুঃখীদের দান করা হত । মুসলিম সমাজে বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের নিকট মহররম উৎসব ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সে সময়ে বাংলায় অনেক শিয়াদের বাস ছিল । ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্য শিয়াদের ইমাম বাড়ার প্রসংশা উল্লেখ হয়েছে, এ থেকে মনে করা হয় যে, সুলতানী যুগে বঙ্গে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মহররম পালিত হত ।[৩]

বাংলার মুসলিম সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল । র‍্যালফ ফিচ উল্লেখ করেছেন যে, আট, দশ বছরের বালকের সাথে পাঁচ, ছয় বছরের বালিকার বিয়ে চালু ছিল ।[৪] অনেক সময় অল্প বয়সেই ছেলে মেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হত কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বিয়ে হত না ।

----

১. মুকুন্দ রাম চন্ডীকাব্য, পৃঃ৩৪৪ । উদ্ধৃত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ৩০৫ ।

২. বিপ্রদাস, মনসা মঙ্গল, এস,কে,সেন,সম্পাদিত এশিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা,১৯৫৬) পৃঃ৬৭ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ৩০৬ ।

৩. অধ্যাপক কে,আলী, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত,পৃঃ২৮৯-৯০ ।

৪. ইংল্যান্ডস পাইয়োনার্স ইন ইন্ডিয়া, সম্পাদনা,জে,হর্টন,লিলি, পৃঃ৯৫-৯৬, উদ্ধৃতঃবাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য,২য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ১০৫০ ।

Dhaka University Institutional Repository

বর ঘোড়ায় চড়ে শোভা যাত্রা করে কনের বাড়ীতে যেত সেখানে কাজীর সামনে মোল্লা বিবাহ দিতেন। বিয়ে উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হত। বিত্তশালীদের বাড়ীতে এ উপলক্ষে আমোদানুষ্ঠান, নৃত্য গীতি একাদিক্র দিন চলত এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হত।[১] মুসলমানদের বিয়েতে কয়েকবার ভোজ উৎসবের পালা ছিল। ঘড় বাড়ি দেখা, বর দেখা, কনে দেখা, গায়ে হলুদ বিবাহ বাসর, ওয়ালিমা, ইত্যাদি। এ ছাড়া মেহদী লাগানো, বাজি পোড়ানো, মেয়েলি নাচ গান, পুতুল নাচ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। দরিদ্রদের ভোজ উৎসবের সাধ্য ছিল না বলে তারা খই, কলা, পায়েশ, ফিরনী, শিরনী, পান সুপাড়ী ইত্যাদি দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করত।[২] সুলতানী শাসনামলে বাংলায় দাস প্রথা ও ব্যবসার বিশেষ প্রচলন ছিল। চতুর্দশ শতকে ইবনে বতুতা বাংলায় আসেন। তিনি এ-খানকার দাস প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বিবরণ দিয়েছেন যে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে একটি সুন্দরী মেয়ে ক্রয় করা যেত। অধিকাংশ দাস দাসী আবিসিনিয়া হতে আমদানী করা হত। প্রত্যেক বিত্তবান ব্যক্তিরা দাস দাসী ও নপংশুকদের প্রতিপালন করত।[৩]

অতএব সবশেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর এ দেশে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন হতে থাকে। দীর্ঘ দিনের হিন্দু বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের সামাজিক অনুশাসন ও . অমানবিকতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে, ইসলাম বাংলার মানুষের মাঝে এক নতুন ধর্ম, আচার অনুষ্ঠান, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক তথা ইসলাম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার এক আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়। কেননা এ সময় সুলতানী আমলে বহু সংখ্যক বহিরাগত মুসলমানের বাংলায় আগমন ঘটে। তারা এ দেশে স্থায়ীভাবে বসতি করে ও এ দেশীয় মেয়েদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। যারফলে তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার ও ধর্মীয় অনুশাসন এ দেশের মানুষের উপর প্রভাব পড়ে। শুধু তাই নয় পীর দরবেশদের ধর্ম প্রচারের

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩৮-৩৯।

২. বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০৫১।

৩. অধ্যাপক কে, আলী, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৯১।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এ দেশের মানুষের মাঝে সাড়া জাগায় । তাঁরা বিভিন্ন দরগাহ খানকাহ স্থাপন করে । এতে সেখানে প্রতি নিয়ত অসংখ্য লোকের সমাগম হত । এ সব লোকজন পীর দরবেশদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মুসলমান হত এবং ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করত । এভাবে সমাজ পরিবর্তন হয়ে এ দেশে ইসলামী সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠে । সুলতানী আমলে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল যেমন, উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন । এ ছাড়া বিভিন্ন গোত্র ও পেশা জীবি হিসেবেও বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তবে এ সব শ্রেণী বা গোষ্ঠি হিন্দু ধর্মের গোত্র বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার মত কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল না । আমোদ প্রমোদের জন্য গান বাজনা ও বিভিন্ন শিল্প সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের চর্চা হত । এ ছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালিত হত । সুতরাং এ সব কিছু মিলিয়েই তৎকালীন সুলতানী আমলে মুসলিম সমাজ অনেক উন্নতর ছিল এবং আলাদা এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল ।

হিন্দু সমাজ ঃ-

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে জন সাধারণের অধিকাংশ ছিল হিন্দু । তবে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ও ছিল । বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদের ব্যাপক প্রসার ও প্রভাব হিন্দু সমাজের উপর সুদুর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন গোত্র, বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দু কর্তৃক নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচারের ফলে তারা ক্রমশ বিদ্রোহীভাবাপন্ন হয়ে উঠে । অপরদিকে মুসলমানদের সামাজিক সাম্য,ভ্রাতৃত্ব উদারতা, ইত্যাদি নানাভাবে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের জীবনে চেতনা ও কর্মক্ষেত্রে জাগরণের সৃষ্টি করে । এ ছাড়া মুসলিম শাসন কর্তাদের সভাসদ ও কর্মচারী হিসেবে অথবা মুসলিম প্রতিবেশী হিসেবে হিন্দুরা তাদের সংস্পর্শে আসে । স্বভাবতই এ কারণে হিন্দুরা মুসলমানদের মহত্তর আদর্শ, শিষ্টাচার ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে । এভাবে হিন্দু ধর্মের অমানবিক বর্ণ প্রথা এবং সামাজিক নির্যাতন ও অস্থিরতা তথা কথিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য অনেকাংশে উৎসাহিত করে এবং মুসলমান হতেও থাকে । এরফলে হিন্দু সমাজে ভাঙ্গন দেখা দেয় ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে । এরই প্রেক্ষিতে আমরা হিন্দু সামাজিক অবস্থার সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করব ।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সুলতানী শাসনামলে হিন্দু সমাজ জাতি , গোত্র ও বর্ণ প্রথার দিক দিয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল । বিভিন্ন পেশা ও কর্মের ভিত্তিতে এ অমানবিক বর্ণ প্রথার উদ্ভব হয়েছিল । হিন্দু সমাজ চার বর্ণে বিভক্ত ছিল যেমন-ব্রাহ্মন, কায়স্থ, বৈশ্য, শুদ্র । এই বর্ণগুলোর মধ্যে কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রন ও বাধা বিদ্যমান ছিল, ফলে এক বর্ণ অন্য বর্ণের সাথে সামাজিক সম্পর্ক, লেন দেন ও মেলামেশা করতে পারেনি ।[১] বৃহদ্ধর্ম পুরান[২] ও ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরানে উল্লেখিত তিনশত বছর আগের যে সকল জাতির উল্লেখ আছে সে সকল জাতি পরে তিন শত বছরেও বিদ্যমান ছিল । মুকুন্দ রাম রচিত 'কবি কংকন চন্ডী' ও বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল হতে জানা যায় যে, মধ্য যুগের সমাজে ব্রাহ্মন, কায়স্থ, ও বৈদ্য এই তিন জাতির প্রাধান্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল । মুকুন্দরাম তার জন্ম স্থান 'দামুন্যার' বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, ঐ স্থানের গুণ বান ব্যক্তিরা ব্রাহ্মন, কায়স্থ, ও বৈদ্য এই তিন জাতিভুক্ত ছিল । বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায় যে, এই তিন জাতিই সমাজে প্রভাবশালী ছিল ।[৩] ব্রাহ্মন উচ্চতম বর্ণ, কিন্তু অপর দুটি বর্ণের অর্থাৎ কায়স্থ ও বৈশ্যের তুলনায় শুদ্রের স্থান সমাজে অতিশয় নিম্নে ছিল ।[৪]

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বকাল হতেই ব্রাহ্মনগণ সমাজে সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং সমাজে দাপটের সাথে বিচরণ করতে থাকে । কিন্তু মুসলিম শাসনামলে জনসাধারনকে ব্রাহ্মনদের একাধিকত্য ও অধীনতার শৃংখল হতে অনেকটা মুক্তি দিতে সাহায্য করে এবং সমাজে জীবন ও মর্যাদার উন্নতি বিধানের জন্য তাদেরকে অনেক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করে ।

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৯২ ।

২. বৃহদ্ধর্ম পুরান খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে বা তার কিছু পরবর্তীকালে বাংলাদেশে রচিত বলে বিবেচিত । রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৪৭ ।

৩. ডঃ অতুল সুর, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস', (কলিকাতা ১৯৭৬) ১ম প্রকাশ, পৃঃ৮৩ ।

৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৪৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মনেরা তাদের একচেটিয়া অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ক্রমশ হারিয়ে ফেলে । যদিও তারা তখনও সমাজ জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিল । কিন্তু বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তারা বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অন্যান্য বর্ণের হিন্দুদের সংগে প্রতিযোগীতামূলক অবস্থার মুখমোখী হয় ।

কেননা মুসলিম শাসনামলে সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মোচিত হয় । এই সুযোগ বুদ্ধিমান ও চতুর কায়স্থরা পুরাপুরি কাজে লাগায় এবং তারা অল্প কালের মধ্যেই মান মর্যাদা ও ধন সম্পদে খ্যাতি লাভ করে । মুসলিম শাসকগণ তাদের গুণাবলী, উন্নতিও কৃতিত্বের যথাযথ স্বীকৃতি দেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন । তাদের স্বীয় প্রতিভা এবং রাজন্য বর্গের পৃষ্ঠ পোষকতার ফলে বাংলার কায়স্থ সম্প্রদায় সাহিত্য বিষয়ে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে দ্রুত উন্নতি সাধন করে এবং সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিতে ব্রাহ্মনদেরকে অতিক্রম করে । মুসলিম শাসনের উদার নীতি ও অনুকূল পরিবেশের কারণে কায়স্থরা শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগী হয় । সাহিত্য সংস্কৃতি ও কাব্য প্রতিভা প্রদর্শন করে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উন্নতির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে । মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, যশোরাজ খান, কাশীরামদেব, বিজয়গুপ্ত, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং গোবিন্দ দাস প্রভৃতি সুপরিচিত কবিদের প্রায় সকলেই কায়স্থ অথবা বৈদ্য ছিলেন ।[১]

কায়স্থদের প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ মুসলিম শাসন কর্তাগণ তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিযুক্ত করেন । এ সমস্ত হিন্দুরা তাদের প্রতিভা ও কর্ম দ্বারা উন্নতি করে প্রভাবশালী হয়ে উঠে । শিক্ষা-দীক্ষায় ও সরকারী পদে উন্নীত করার ফলে কায়স্থরা সমাজে খুবই সমৃদ্ধ ও প্রতাপশালী হয়ে উঠে । তারা সকল পর্যায়ে এবং স্বীয় প্রভাব ও মর্যাদা কাজে লাগিয়ে উন্নতির পথ প্রশস্ত করে । মুসলিম শাসকদের নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে অথবা পুরানো ও ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের নিকট হতে জমিদারী ক্রয় করে তারা জমিদারীত্ব অর্জন করে । বিশেষ করে রাজস্ব

---

১. এস,কে,সেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ২২৩ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ৩৫১ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের কায়স্থ কর্মচারীরা ইজারাদার অথবা রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এ রকম অনেক সংখ্যক রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন, যারা চৌধুরী, মজুমদার, অধিকারী নিয়োগী, অন্যান্য উপাধি ধারন করেন। এ সকল উপাধিধারী বাংলাদেশে বহু কায়স্থ পরিবার দেখা যায়। এ সব রাজস্ব উত্তোলনকারীরা তাদের পেশা বংশগত করে ও জমিদারীর আয়তন সম্প্রসারিত করে। এভাবে তারা ইজারার জমি বংশগত জমিদারীতে পরিনত করে।[১] সুতরাং এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, মুসলিম শাসনামল ছিল, অবহেলিত হিন্দু এবং হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী কায়স্থদের জন্য বিরাট আর্শিবাদ স্বরুপ। কেননা ব্রাহ্মনদের একচেটিয়া আধিপত্য ও প্রভুত্ব খর্ব হওয়ায় কায়স্থরা তাদের প্রতিভা ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পায়। এই প্রতিযোগীতামুলক অবস্থায় কায়স্থদের বিদ্যা বুদ্ধি ও কৃতিত্বের কাছে ব্রাহ্মনরা ক্রমশ হেরে যায়। এর ফলে কায়স্থরা সমাজ ও রাষ্ট্রে সম্মান, সম্পদ ও প্রভাবের দিক থেকে উচ্চতরে পৌছতে সমর্থ হয়। কায়স্থদের মধ্যে যাদের উপাধি ছিল ঘোষ, বসু, মিত্র, তারাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ কায়স্থ। এ ছাড়া অন্যান্য যে সকল উপাধি গ্রহণ করত সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, নাগ,কর, কুন্ড, সোম, চন্দ্র বিষ্ণু, রাহা,বিন্দ ইত্যাদি।

ধর্ম কর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মনদের কর্তৃত্ব থাকলেও এভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের একাধিপত্য ও সুযোগ সুবিধা হারিয়ে গেলে জীবন ও জীবিকার তাগিদে তারা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে। এরুপ ব্রাহ্মনগণ তাদের পেশার ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কবি মুকুন্দ রাম তাঁর চন্ডী কাব্যে ব্রাহ্মন সমাজের একটি চিত্র তুলে ধরছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, একটি মহল্লাকে বলা হয় কুলস্থান বা অভিজাত এলাকা, যেখানে রাঢ় ব্রাহ্মন অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মন যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও চর্চা করত এবং মন্দির ও টোল নিয়ে জীবন যাপন করত। আর এক শ্রেণী ছিল অশিক্ষিত ব্রাহ্মন যারা এখানে বসবাস করে। তারা পুরোহিত হিসেবে কাজ করে এবং পূজার আচার অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা দেয়। তারা তাদের কপালে চন্দন ফোটা বা তিলক চিহ্ন দেয়।

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পুর্বোক্ত, পৃঃ৩৫১, ৩৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

তারা পুতুল পূজা করে এবং কাপড়ের আঁচলে ভিক্ষা প্রাপ্ত চালের পুটলি নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ইত্যাদি ।[১]

বর্তমান কালের মত তৎকালীন যুগের বৈদ্যরা সেন, গুপ্ত, দাস, দত্ত, কর, কুন্ড প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করত । বৈদ্যদের এ প্রধান পেশা ছিল চিকিৎসা । তবে তারা অন্য কাজ কর্ম করত এবং শাস্ত্রাদিও অধ্যাপনা করত ।[২] বৈশ্যরা ছিল সধারণত কৃষক ও ব্যবসায়িক । গ্রাম বা শহরের এক পার্শ্বে তাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল । যে সকল বৈশ্যরা কৃষিকাজ করত তাদের বাসস্থানের পাশেই ব্যবসায়ী শ্রেণীর বৈশ্যরা ও বসবাস করত । এদের সম্পর্কে মুকুন্দ রাম উল্লেখ করেন যে, এদের মধ্যে কেউ জমি চাঁষ করে, অন্যরা গাভী চড়ায় । কেউ গরুর গাড়ী পরিবহনের কজে করে, কেউ মৌসুমের সময় ফসল ক্রয় করে এবং যখন মূল্যবৃদ্ধি পায় তখন বিক্রয় করে । আবার কেহ মূল্যবান পাথর ক্রয়ের জন্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায় । কেউ নৌকায় করে নানা রকম পন্য নিয়ে দীর্ঘ দিনের ভ্রমনের আয়জন করে এবং কর্পূর কাঠ, শাল, কোট ইত্যাদি নিয়ে ফিরে আসে । তারা সব সময় বেচা কেনায় ব্যস্ত থাকে ।[৩] হিন্দু সমাজে সবচেয়ে নীচু জাতি হল শূদ্রা । তারা ছিল কৃষক কিংবা শ্রমজীবি । পেশাগত কারণে তারা বিভিন্নভাগে বিভক্ত ছিল । এক শ্রেণী জমি চাষ করে ও অন্য শ্রেণী মাছ ধরে । এ ছাড়া তাঁতী, নাপিত, কামার, কুমার, সূত্রধর, কুম্ভকার, ধোপা, অন্যান্য শ্রেণীর শূদ্র ছিল । তারা গ্রাম বা শহরের শেষ প্রান্তে বাস করত ।[৪]

এ ছাড়া অর্থ নৈতিক কারণেও সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল । যেমন-গন্ধবনিক, তেলি, কামার (কর্মকার), কুম্ভকার, তাম্বুলিক, মালাকার, শংখবনিক, জেলে, নাপিত, চাড়াল, চামার, মোদক, কিরাত, কোল, ছুতার, পাটনী ইত্যাদি ।[৫] এই বর্ণ প্রথা সমাজে অত্যন্ত কঠোর

---

১. মুকুন্দরাম, চন্ডীকাব্য, পৃঃ ৪৭ । জে,এন,দাস,গুপ্ত বেঙ্গল ইন দি সিক্সটিনথ্ সেঞ্চুরী পৃঃ ১৫৫-৫৬ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ ৩১২-১৩ ।বাংলার সামাজিক ইতিহাস,পূর্বোক্ত,পৃঃ ৮৩ ।
২. বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত,পৃঃ৮৪ ।
৩. মুকুন্দ রাম চন্ডী কাব্য, পৃঃ৩৫২ ।উদ্ধৃত,বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড পূর্বোক্ত,পৃঃ ৩১৭ ।
৪. মুকুন্দরাম, চন্ডিকাব্য, পৃঃ৩৫৭-৫৯ ।উদ্ধৃত,বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত ,পৃঃ৩১৮ ।
৫. রমেশ চন্দ্র মজুমদার,বাংলাদেশের ইতিহাস,২য় খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ২৮৬-৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে পালিত হত। ফলে এক বর্ণের সাথে অন্য বর্ণের বিবাহ, আদান প্রদান ও সামাজিক যোগাযোগ ছিল না।[১] ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজহরি রামের চন্ডীকাব্য ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারত চন্দ্রের অন্নদা মঙ্গল, কাব্যেও আমরা এই সকল জাতির উল্লেখ দেখতে পাই। এদের মধ্যে সুবর্ণ বণিক ও গন্ধবণিক, জাতি ছিল ধনবান শ্রেণী। তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে বহু অর্থ উপার্জন করে সমাজের উচ্চ স্থান অধিকার করে। মধ্য যুগে যদিও স্মৃতিকার রঘু নন্দন হিন্দুদের সমুদ্র যাত্রা নিষেধ করে ছিল। তা সত্ত্বেও বণিক সম্প্রদায় তাদের সমুদ্র পথে বাণিজ্য ভ্রমন ত্যাগ করেনি। গন্ধবণিক ও সুবর্ণ বণিক সমাজে উচ্চ শিক্ষার প্রচলন দেখা যায়। এ থেকে বুঝা যায় যে, শিক্ষার প্রসার ব্রাহ্মনেতর অন্যান্য জাতির মধ্যেও ছিল।[২]

পূর্বে উল্লেখিত চারটি প্রধান বর্ণ ছাড়াও বাংলাদেশে বহু সংকর বর্ণের উদ্ভব হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে বা তার কিছু পরবর্তীকালে বাংলাদেশে রচিত বলে বিবেচিত 'বৃহদ্ধর্ম পুরানে' ৩৪ টি সংকর বর্ণ বা মিশ্র বর্ণ বা জাতির উল্লেখ হয়েছে। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এমনিভাবে তৎকালীন সুলতানী শাসনামলে হিন্দু সমাজে বিভিন্ন জাতি গোত্র বর্ণ ও উপবর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্ণ বৈষম্য ও কৌলিন্য প্রথার মত জঘন্য বর্ণবাদী ধ্যান ধারনা সমাজের প্রতিটি স্তরে ঢুকে পড়ে। মানুষে মানুষে ভেদনীতি উচ্চ নীচু ব্যবধান সৃষ্টি করে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে হিংসা বিদ্বেষ ও ঝগড়া বিবাদের বীজ রোপন করে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হয় প্রভু ভৃত্যের ন্যায়। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার অবিচার ইত্যাদি সামাজিক প্রথায় পরিনত হয়। এ সময় হিন্দু সমাজে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। দাস দাসীরা গৃহ কার্যে নিযুক্ত থাকত। অনেক সময় যুবতী দাসীদেরকে উপপত্নীরূপে ও জীবন যাপন করতে হত। এ সময় দাস ব্যবসা ব্যাপক প্রচলন ছিল, বহু বালক বালিকা এবং বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা অপহৃত হয়ে দাস রূপে বিক্রয় হত এবং এরূপ ক্রয় বিক্রয় প্রকাশ্য বাজারেই হত। অনেক সময় লোক অভাবের কারণে নিজেকেই বিক্রয় করত।[৩] দাস দাসী কেনা বেচার ব্যবসা মধ্য যুগ

---

১. বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪-৮৫।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৪৮। ১ম খন্ড, ৩য় সংস্করণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৭৬।

৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৮৮-৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

তথা দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। গৃহ কর্তার অধীনে থেকে তারা তার জমি চাষাবাদ ও গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ কর্ম করত। কখনো বা গৃহ কর্তারা দাসীদেরকে উপপত্নী হিসাবে ব্যবহার করত। দাস দাসী রাখার প্রচলন ঋগ বেদের আমল থেকেই ভারত বর্ষে প্রচলন ছিল। তবে মধ্যযুগে এ প্রথা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। হিন্দু সমাজে দাস দাসী রাখা কেবল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় বরং কৃষকদের ঘরেও দাস দাসী থাকত।[১] সাধারণত লোক দাসীদের সংগে মেয়ের মত আচরণ করত। অনেকে আবার নিজের ছেলের সংগে দাসীর বিয়ে দিত। তখন সে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করত। অনেকে আবার যৌন লিপসা মিটাবার জন্য দাসীদের ব্যবহার করত।[২] দাস প্রথা এ দেশে যে প্রচলিত ছিল তা আমরা চতুর্দশ শতকের আফ্রিকার বিশিষ্ট পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমন বৃত্তান্ত হতেও জানতে পারি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মাত্র ১৫ টাকা দিয়ে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুনীকে ক্রয় করে তিনি দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।[৩] ওয়াকিল আহমদ তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে বতুতা তৎকালীন সময়ে বাজারের পন্য মূল্য তালিকায় দেখিয়েছেন যে, একটি সুন্দরী বালিকা দাসী মাত্র এক স্বর্ন দিনার পাওয়া যেত। তিনি উক্ত মূল্যে আশুরা নামে জনৈকা এক সুন্দরী বালিকা ক্রয় করেছিলেন। তাঁর জনৈক সহ যাত্রী লুলু নামে একটি অল্প বয়সী ছেলেকে দুই স্বর্ন দিনারে ক্রয় করেছিলেন।[৪] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। তবে এ প্রথা সাধারনত দুর্ভিক্ষ কালীন অবস্থায় বেশী দেখা যেত।

----

১. চাষা এবং কৃষকরা দাস দাসী রাখত, এ সম্পর্কে অনুমান করে হিসাবে বলা যেতে পারে যে, তারা দাস দাসীদেরকে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করাত। অর্থাৎ জমি চাষাবাদ ও ফসল উৎপাদন করাই ছিল এদের মুখ্য কাজ। বর্তমানে যেমন, রাখালরা জমি চাষ করে ফসল ফলায় অতীতেও হয়তো এমনিভাবে তারা উৎপাদনে শরীক হত।

২. বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০০।

৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ১০০।

৪. ওয়াকিল আহমদ, "সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য", (ঢাকা ১৯৬৮) ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী আমলে বাংলায় হিন্দু সমাজে নারীদের তেমন কোন অধিকার ছিল না। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে বা পূজার্চনায় হিন্দু রমনীরা অংশ গ্রহণ করতে পারত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত হত। জীমুত বাহনের 'দায়ভাগ' এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিধবাদের সম্পত্তি বিক্রয় করা বন্ধক দেয়া বা দান করার কোন অধিকার ছিল না, নারীদেরকে সম্পত্তির একটা নির্দিষ্ট অংশ ভোগ করার অধিকার দেয়া হত।[১] সতীদাহ প্রথার ন্যায় বর্বরোচিত প্রথা তখন সমাজে প্রচলিত ছিল। কোন কোন নারী স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় সহমরনে আত্ম বিসর্জন দিয়ে সতী হত। কোন বাধা তাদেরকে ফিরাতে পারত না জলন্ত চিতায় ঝাপ দিতে কোন প্রকার কাতরতা প্রকাশ করত না। আবার অনেকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই নারীদের জোর করে চিতায় উঠাতো এবং মরতে না চাইলেও তাদেরকে জোর করে পুড়িয়ে মারা হত।[২] মানিক চন্দ্র রাজার গানে হিন্দুদের এই সতীদাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে যে, রাজা মানিক চন্দ্রের মৃত্যুর পর ময়না নামে তার এক রানী সহমরনের জন্য নিজকে চিতায় সমর্পন করেন। কিন্তু তিনি অর্ধদগ্ধ অবস্থায় চিতার আগুন হতে ফিরে আসেন এবং যথা সময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই সন্তান হলেন গোবিন্দ চন্দ্র।[৩] ময়নার এই সহমরনের ব্যাপার হতে আমরা প্রমাণ পাই যে, সুলতানী আমলে এই সতীদাহ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। তবে সতীদাহ প্রথা খুব প্রবল না হলেও চালু ছিল।[৪] বিভিন্ন রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, বাংলাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী সতিদাহ হত।[৫]

----

১. বিজয় গুপ্ত মনসা মঙ্গল। উদ্ধৃত, অধ্যাপক কে, আলী, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৩।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০২।

৩. এস, বি, দাস গুপ্ত, অবসকিউর রিলিজিয়াস কলট্স, পৃঃ৩৭৯। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০৯।

৪. বার্নিয়ার, বেঙ্গল ইন দি সিক্সটিনথ সেঞ্চুরী, সম্পাদনা জে, এন, দাস গুপ্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৪) পৃঃ ৪৪-৪৫। ক্ষেমা নন্দ, মনসা মঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৯, পৃঃ৬১। উদ্ধৃত, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০৪৯।

৫. ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গল কাব্যগুলিতে তৎকালীন সময়ের বিয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও অর্থাৎ আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত রক্ষনশীল হিন্দু পরিবারে যে সব অনুষ্ঠান প্রচলন ছিল তা এখনও বর্তমান। তবে একটি বিষয়ে বিবাহ প্রথা বর্তমান যুগের সাথে ভিন্ন ছিল। যেমন, এখন কন্যার পিতা বরপন দেন তখন বরের পিতা কন্যাপন দিতেন। এখনও এই প্রথা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে।[১] হিন্দু সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে গৌরী দান প্রথার প্রচলন ছিল অর্থাৎ মেয়েদেরকে আট বছর বয়সের পূর্বেই বিয়ে দেয়া হত। মেয়েদের বয়স দশ অতিবাহিত করলে বার বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে দেতেই হত। অন্যথায় সামাজিক নিন্দা, পাপ ও অকল্যাণের ভয় ছিল এবং পরিবার পরিজনকে এক ঘরে হয়ে থাকতে হত। ইহা সামাজিক শাস্তি ছিল। এর পরেও হিন্দু কুলীন ঘরে বয়স্কা অনূঢ়া মেয়ে দেখা যেত।[২] পুরুষের বহু বিবাহ তখন সমাজে খুবই প্রচলিত ছিল। সতীনের অত্যাচার হতে প্রতিকার পাওয়ার জন্য নানা প্রকার ঔষধ সেবন করত ও বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে স্বামী বশ করত, যা মঙ্গল কাব্যে উল্লেখ হয়েছে। এই বহু বিবাহের ফলে পারিবারিক অশান্তির কথা সমসাময়িক সাহিত্যেও উল্লেখ হয়েছে।[৩] ম্যানরিকের মতে হিন্দু সমাজে এক পত্নী গ্রহণ। সাধারন নিয়ম থাকলেও বহু পত্নী লোকের সংখ্যাও নেহায়েত কম ছিল না। বিশেষ করে কুলীনরা বহু পত্নী গ্রহণ করত।[৪]

বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকার কারণে সমাজে বাল্য বিধবার সংখ্যাও প্রচুর ছিল। বাল্য বিধবাদের পোশাক, বেশ ভূষা, খাদ্য প্রভৃতি কঠোর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। যে কোন বয়সেই বিধবা হলে তাকে বৃদ্ধার মত থান কাপড় পরতে হত এবং যাবতীয় অলংকারাদি পরিত্যাগ করতে হত। আহারের দিক দিয়ে মাছ, মাংশ, ও অন্যান্য অনেক কিছুই বর্জন করতে হত এবং একাদশীর দিন উপবাস থাকতে হত। সধবা নারীদের পর্দাবলম্বন করতে হত।[৫] এই প্রথা বিংশ

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০০। বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৮।
২. বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০৪৯। বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৭।
৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০১।
৪. বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪৯।
৫. বর্ণ হিন্দুরা ও মুসলিম প্রভাবে পর্দা করত। দ্রষ্টব্য- বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দীর প্রথম দিকেও প্রচলিত ছিল। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, তৎকালীন সুলতানী আমলে সমাজে হিন্দু নারীদের কোন স্বাধীনতা, অধিকার ও ইচ্ছার স্বকীয়তা ছিল না। তারা ছিল অবরোধ বাসিনী। তারা সমাজ পতিদের হাতের পুতুল ছিল। হিন্দু নারীরা শাস্ত্রীয় বিধানের আবরণে কিংবা কুলিন ব্রাহ্মনদের কর্তৃত্বের কারণে সমাজে সর্বদা নিগৃহিত হত। সে সময়ে তাদের ধর্মীয় কাজে কোন স্বাধীনতা এবং সম্পত্তিতে কোন অধিকার ছিল না। সতীদাহ প্রথার মত সর্বযুগের জঘন্যতম প্রথা এই অবলা নারীদের উপরই আরোপিত হত। অতএব আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, তৎকালীন সমাজে হিন্দু নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় অমানবিক ও পাশবিক।

সুলতানী শাসনামলে বাঙ্গালী হিন্দু পুরুষের পোশাক ছিল চটক ধুতি ও গরদের ধুতি এবং চাদর। গরীবের ছিল গামছার মত খাট কাপড়। মাথা খালি রাখা এবং খালি গায়ে চলাই ছিল তাদের রীতি। কেবল সম্ভ্রান্ত এবং ব্রাহ্মন শ্রেণীর লোক কেবল কাঠের পাদুকা পরতেন।[১] বিলাসীদের রুপাও ভেলভেটের জুতা, কানে সোনার অলংকার, পরিধানে তসরের বস্ত্র থাকত। ধনী পুরুষেরা বর্তমান কোটের ন্যায় অঙ্গরাখা ও পাগড়ী পরত। কোমরে পুরুষরা পটুকা ও স্ত্রীলোকেরা নীবিবন্ধ পরত। দরবারের পোশাক ছিল ভিন্ন ধরনের যেমন ইজার, কোমর বন্ধ কাবাই প্রভৃতি। ধনী ঘরের মেয়েদের নানা রঙের রেশমের শাড়ীর বিবরণ পাওয়া যায়।[২] ময়ুর পেখম, আগুন পাট, কাল পাট, আসমান তারা, হীরামন, নীলাম্বুরী, যাত্রা সিদ্ধি, মুক্তাফুল, অগ্নিফুল, মেঘ ডুমুর, মেঘনাল, গঙ্গাজলি, প্রভৃতি শাড়ী ব্যবহার করত। এ ছাড়া বেলন পাটের শাড়ি, নেতের শাড়ি, প্রভৃতি মূল্যবান শাড়ী কোন অনুষ্ঠানে, পার্বনে পরত। আরো অনেক নামের শাড়ী যেমন মুক্তামান, কনকলতা, আনন্দ, ধুপছায়া, পবন বাহার, লক্ষ্মী বিলাস, বসন্ত বাহার, উদয়তারা, বালুচরী প্রভৃতি নাম না জানা অসংখ্য রকমের শাড়ীর প্রচলন ছিল।[৩] র‍্যালফ ফিচ ও বাঙ্গালীদের সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি উল্লেখ

---

১. বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০৪৫।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০৭।

৩. নওয়াজিস খান, মধ্য যুগের কাব্যসংগ্রহ, পৃঃ১৯৭। অসপেক্টস অব বেঙ্গলী সোসাইটি পৃঃ২৭০, ২৮০। উদ্বৃত, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন যে তারা শরীরের সম্মুখ ভাগে সামান্য কাপড় পরে এবং তাদের দেহের অন্যসব অংশ নগ্ন থাকে ।[১] সমসাময়িক সাহিত্যে বাঙালী মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের অলংকার-এর কথা উল্লেখ হয়েছে । যেমন, সিঁথি পাট, বেশর (নথ) কুন্ডল (কানবালা,দুল) হার, চন্দ্রাবলী, অনন্ত, বাজু, কেয়ূর, তাবিচ, কবচ, জসম, রতন চূড়, শাখা, খাড়ু, টিকলী, হাসুলি, নাকমাছি, কানফুল, হাত পদ্ম ইত্যাদি । এ সব অলংকার সোনা, রুপা ও হাতীর দাতের তৈরী ও মনিমানিক্য খচিত হত ।[২]

উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুদেরকে মুসলমানদের মত পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে দেখা যায় । মুসলিম পোশাক পরিধান করা সে সময় তারা বিরাট সম্মানজনক বলে মনে করত । হিন্দু কবি কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, ও বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হিন্দু রমনীরাও মুসলিম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিল । তারা ঘাঘরা,ওড়না এবং কাচুলি ব্যবহার করত । ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন যে, মুসলিম আমলে হিন্দু রাজন্যবর্গ ও জমিদারগণ মুসলিম অভিজাত ব্যক্তিগণের মত পোশাক পরিধান করতেন । এবং তারা শুধুমাত্র কপালে চন্দন ফোটা ও উৎসর্গীকৃত চিতা ভস্মের চিহ্ন দ্বারা হিন্দুরূপে চিহ্নিত হতেন ।[৩] অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, হিন্দুরা মুসলিম প্রভাবে এতটা প্রভাবিত হয়েছিল যে, তাদের বেশ ভুষা পোশাক পরিচ্ছদ দেখে বুঝা যেত না যে তারা হিন্দু ঘরের সন্তান । শুধু মাত্র কপালে সিঁদুর ও চন্দন ফোটা দ্বারা বুঝতে হত যে তারা হিন্দু । অন্যথায় মুসলমান বলেই ভ্রম হত ।

সুলতানী শাসনামলে তৎকালীন হিন্দু সমাজের আহার ও খাদ্য দ্রব্যের সাথে বর্তমান বাঙালীর খাদ্য দ্রব্যের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তারতম্য ছিলনা । ভাত,মাছ ছিল প্রধান খাদ্য । মানরিক উল্লেখ করেছেন যে, গরীব লোকেরা ভাত,লবন ও শাক এবং সামান্য পরিমান তরকারীর ঝোল খেত । কদাচিৎ দই ও সস্তা মিষ্টি জোগাড় হত । মাছ খুব সস্তা ছিলনা । সকালের নাস্তা

----

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,২য় খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ৪০৮ ।
২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস,২য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ৩০০ ।
৩. দ্রষ্টব্যঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ১৫৬ ।উদ্বৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ৩৪৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে পান্তা ভাত গরীবের প্রধান খাদ্য ছিল । সে সময়ে আহারের শেষে পান, সুপারি, হরিতকী প্রভৃতি খাওয়ার প্রচলন ছিল । অতিথীদের পান সুপারি দিয়ে অভ্যর্থনা করা হত ।[১]

হিন্দু সমাজের মধ্যে এক শ্রেণী ছিল যারা কঠোরভাবে নিরামিষ ভোজী ছিল । খিচুড়ী হিন্দুদের প্রিয় খাদ্য ছিল । সোনার গাঁও -এর অধিবাসীদের সম্পর্কে ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ উল্লেখ করেছেন যে, তারা মাছ মাংস খায় না । পশু হত্যা করে না, তারা কেবল ভাত, দুধ ও ফলমুল খেয়ে জীবন ধারন করত ।[২] সাধারন মানুষের খাদ্য তালিকায় ভাত, মাছ, শাক-সবজি থাকত । বিজয়গুপ্তের মনসা মঙ্গল এবং নারায়ন দেবের পদ্ম পুরানে নানা প্রকারের মাছ মাংসের তরকারী এবং সুস্বাদু খাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় । এ ছাড়া সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী হিন্দুর আহার দ্রব্যের পরিচয় পাওয়া যায় । ভাড়ু দত্ত রাজাকে ভেট (উপঢৌকন) দেওয়ার জন্য কাঁচ কলা, পুই শাক, কদলীর মোচা, বেগুন, কচু ও মুলা দিয়ে ছিলেন ।[৩] অতএব তৎকালীন সুলতানী শাসন যুগে হিন্দু সমাজে যে খাদ্য দ্রব্য ও আহারের বিবরণ পাই তা বর্তমানকালে হিন্দু সমাজে পূর্ব সামাজিক প্রথানুযায়ীই আহারের সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায় ।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে জন্ম, বিবাহ, এবং মৃত্যু উপলক্ষ্যে হিন্দুরা বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি পালন করত । সন্তান জন্মের পর তাকে প্রথমত গঙ্গাজল দিয়ে ধৌত করত । ৬ষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীপূজার আয়োজন করা হত । ব্রাহ্মনেরা নবজাতকের কোষ্ঠী গননা করত । এরপর অন্ন প্রাশন পর্ব পালন করা হত । এই উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মনদের নিমন্ত্রন করে খাওয়ানো হত । যাত্রা, বিবাহ প্রভৃতি দিন ক্ষন নির্ধারনের ব্যাপারে শুভ দিন দেখতে হত । পঞ্চদশ শতকের চীনা পর্যটকদের বর্ণনায় বাঙালী হিন্দুদের কিছু সামাজিক বৈশিষ্ঠ্যের কথা বলা হয়েছে যে, হিন্দুদের একটি সম্প্রদায় গোমাংস আহার করত না, স্ত্রী পুরুষ একত্রে আহার করত না । স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০৭ ।
২. নারায়ন দেব, মনসা মঙ্গল, পৃঃ৪৮ । বিজয়গুপ্ত, মনাসা মঙ্গল, পৃঃ৯৬-৯৭ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪০৮ ।
৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

এবং স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামী পুনরায় বিয়ে করত না। ব্রাহ্মনদের মত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। এমন কি কুলীন কায়স্থরাও একাধিক স্ত্রী রাখত।[১]

তৎকালীন সুলতানী শাসনামলে সাধারণ লোকের মাঝে বিভিন্ন কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। ঝাড় ফুক, মন্ত্র তন্ত্র ইত্যাদিতে মানুষের খুব বিশ্বাস ছিল। মুহম্মদ খানের 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ' এবং মুজাম্মিলের 'সায়াৎনামায়' তৎকালীন সমাজের লোকাচার, নানা কুসংস্কার, আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, গৃহ নির্মান, গৃহে প্রবেশ, নতুন কাপড় পরিধান, ওঝা তন্ত্র মন্ত্র পড়ে রোগ পীড়া, ভূত প্রেত তাড়াইত, ব্যবসা বাণিজ্যের শুভাশুভ, ঋতু, মাস, দিনক্ষন, তিথি, নক্ষত্রের শুভাশুভ প্রভৃতি বাঙ্গালী সমাজের প্রাত্যাহিক জীবনের আচার বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] নববর্ষে অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ মাসে আচার্য গনকেরা, ব্রাহ্মনেরা ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবারের সকলের ভাগ্য গননা করত এবং বিনিময়ে অর্থ, ধান চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করত। তারা সত্য নির্ণয়ের জন্য পানি পড়া, চাল পড়া, নলচালান, বাটি চালান প্রভৃতি মন্ত্র চালিত পদ্ধতির প্রতি অনুরাগী ছিল। ডাকিনী, যোগিনী, ঝাড় ফুক, বান, মন্ত্র বা ঔষধ দ্বারা উচাটন, বশীকরন, বন্ধ্যার সন্তান লাভ, তাবিজ কবচ, তাগা, মাদুলী, যাদু টোনা, বশীকরন, প্রভৃতি বাঙ্গালীর বিশ্বাস ছিল সুপ্রাচীন।[৩] এবং তৎকালীন সময়ে মানুষের মাঝে এ সব কুসংস্কার একদম আষ্টে পিষ্টে বেধে গিয়ে ছিল। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তৎকালীন হিন্দু সমাজ জীবন নানা দিক থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অজ্ঞতা মুর্খতার দরুন তারা প্রকৃতির অনেক কিছুকেই শুভ অশুভ বলে মনে করে, কিংবা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন কাজ উদ্ধারের জন্য তন্ত্র মন্ত্র ঝাড় ফুক, যাদু টোনার আশ্রয় নেয়, এভাবে সামাজিক জীবন কলুষিত হয়ে পড়ে।

----

১. অধ্যাপক কে, আলী, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯২।

২. মুহাম্মদ খান, সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ, পৃঃ ২১৭। মুজাম্মিল, সায়াৎনামা, পুথি পরিচিত, পৃঃ ১৪৩, ১৪৬। উদ্ধৃত, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬৫।

৩. বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০৬৫-৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে হিন্দু সমাজ অধপতিত ছিল। এ সময় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি, অনাচার, হিন্দু সমাজ জীবনকে কলুষিত করেছিল। তান্ত্রিক সাধনা এবং শক্তিবাদ হিন্দু সমাজের নৈতিক অধপতনের বিশেষ কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। কবি ধুয়ীর 'পবন দূত' ও কবি সন্ধাকর নন্দীর 'রামচরিত' থেকে জানা যায় যে, সেন রাজারা মন্দীরের সেবায় জন্য দেবদাসী ও যুবতী ব্রাহ্মন বিধবাদের নিয়োগ করার প্রথা প্রবর্তন করেন। এতে উচ্চ শ্রেণীর ও প্রভাবশালী হিন্দুরা তাদের সাথে হয়ে পড়ে। এরফলে হিন্দু সমাজে নৈতিকতার বিপর্যয় ঘটে এবং দুর্নীতি, অনাচার, সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাহ্মনগণ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু রমনীদের সাথে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে পাড়ত, কিন্তু তাদেরকে বিয়ে করার অধিকার ছিল না। বর্ণভেদের কঠোরতাই ছিল এর প্রধান কারণ।[১] কাল বিবেক গ্রন্থ ও কালিকা পুরানের বর্ণনায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দু সমাজের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান গুলিতে যেমন দুর্গা পূজা, হোলি ইত্যাদি উপলক্ষ্যে মেয়ে পুরুষের উভয়ের ইন্দ্রিয় পরায়নতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি চলত। কাম মহা উৎসব নামে পরিচিত একটি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে হিন্দু নারী পুরুষেরা দেবতাকে খুশী করে পুত্র সন্তান ও সম্পদ লাভের জন্য এক ধরনের যৌন নৃত্য করত।[২] জয়দেবের গীত গোবিন্দ, চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারত চন্দ্রের অন্নদা মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত শৃঙ্গার রসের যে উৎকট বর্ণনা আছে, আদর্শ অনুসারে তা সুরুচি ও নীতির দিক থেকে খুব অধপতিত অবস্থার পরিচয় বহন করে। সুতরাং মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে নীতি ও আদর্শ যে খুব উচ্চ ছিল তা বলা যায় না।[৩]

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন সুদৃঢ় হলে হিন্দুগণ এক মানুয়ে মুসলিম সমাজের সংস্পর্শে আসতে থাকে। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাবের ফলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এবং এতে হিন্দু সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধিত হয়।

----

১. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৫২৫। উদ্ধৃত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩১৮।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩১৯।

৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসনে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মনদের কর্তৃত্ব লোপ পায় এবং সকল শ্রেণীর হিন্দুদের বুদ্ধি বৃত্তিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পথ উম্মুক্ত করে দেয়। মুসলিম সংস্পর্শে সাধারন হিন্দুরা তাদের সমাজের লালিত অনাচার এর বিরুদ্ধে মাথা তুলতে থাকে। এরফলে তারা জীবন ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ সময় ব্রাহ্মনদের মধ্যে কয়েকটি সংস্কার আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। সমাজ সংস্কারের এই উপলব্ধির কারণে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মে হিন্দু সমাজে একটি বড় ধরনের ধর্মীয় বিপ্লবের সূচনা করে এবং চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম হিন্দু সমাজে একটি উন্নত ধরনের নৈতিক জীবনের আদর্শ তুলে ধরে। ইহা ছিল হিন্দুর সমাজ জীবনে প্রচলিত দুর্নীতি অনাচার ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ।[১] এমনিভাবে মুসলিম শাসন ও প্রভাবের দরুন হিন্দু সমাজের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয় এবং ক্রমশ এই ... সামাজিক অবস্থা থেকে মুক্তির স্বাদ পেতে থাকে। শুধু তাই নয় মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের সংস্পর্শ বিশেষ করে গোঁড়া ব্রাহ্মনদের একাধিপত্য ও কর্তৃত্ব খর্ব হয়।

হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক :-

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম ও হিন্দু এই দুটি জাতি পরস্পর ধর্ম বিশ্বাসে পার্থক্য থাকা সত্বেও সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে সহবস্থান করতে থাকে। কোন প্রকার বড় ধরনের সামাজিক সংঘাত হয়েছে বলে মনে হয়না। তবে ধর্মগত ব্যাপারে পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকাটা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু গুরুতর ছিল না। মুসলমান ও হিন্দু এ দুটি ভিন্ন ধর্ম, বিশ্বাস, শিক্ষা, সংস্কৃতিক আচার ব্যবহার চালচলন, সামাজিক অবস্থা, তথা উভয়ের মধ্যে মতও আদর্শগত বিরাট পার্থক্য থাকা সত্বেও এ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ছিল। হিন্দুরা মুসলমানদেরকে তাদের সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে আমন্ত্রন জানাত। আবার মুসলমানরাও তাদের আনন্দ উৎসবে অংশ গ্রহণ করত।

কবি বিজয় গুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে, চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষীন্দরের বিয়েতে নয় শত মুসলমান গায়ক ও সঙ্গীত শিল্পী যোগদান করেছিল। হিন্দুরাও মুসলমানদেরকে তাদের

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৯৯। ৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসবাদিতে উপহার, উপঢৌকন দিত । চাঁদ সওদাগর তার পুত্রের বিয়ের সময় হাসান হাটির কাজীর নিকট পান প্রেরণ করছিলেন ।[১] মুসলমানগণ তাদের সামাজিক উৎসবাদিতে হিন্দুদের নিমন্ত্রন করত । উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমানদের বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করত । সামাজিক আদান প্রদান ও লেন দেনের ফলে হিন্দু ও মুসলমানেরা একে অপরকে ভালভাবে জানার সুযোগ পায় । একে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পথ প্রসস্ত হয় ।[২]

সে সময়ের সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের কুরআন ও পীর দরবেশদের প্রতি হিন্দুদের যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ ছিল । একজন হিন্দু বণিক শুভ যাত্রা কামনায় প্রার্থনার জন্য ব্রাহ্মনদের আমন্ত্রণ করেন । ব্রাহ্মনগণ কুরআন আলোচনা করেন । এবং তাকে বাণিজ্যে যাত্রার সময়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করার জন্য পরামর্শ দেন । অনেক সময় ব্রাহ্মনগণ যাত্রার শুভদিন অনুসন্ধান কল্পে কুরআন আলোচনা করতেন এবং হিন্দু বণিকরা তাদের বাণিজ্য যাত্রায় নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যাত্রা করতেন । কবি ক্ষেমানন্দ তার মনসা মঙ্গলে উল্লেখ করেছেন যে, লখীন্দরের জন্য নির্মিত লোহার ঘরে মনসা দেবীর রোষানল এড়ানোর জন্য অন্যান্য পবিত্র রক্ষা কবচের সাথে এক খন্ড কুরআনও রেখে দিয়েছিলেন ।[৩] মুসলমানদের পীর দরবেশের দরগাতে শিরনী বা উপঢৌকন প্রদান হিন্দুদের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত ছিল । হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় সামাজিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য একটা দিক এই যে, হিন্দুরা মুসলিম আদর্শ, ভাবধারা ও চিন্তা চেতনা দ্বারা অনেক বিষয়ে প্রভাবিত হয়েছিল । শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং এ সবের সংস্পর্শে এসে হিন্দু সমাজ সামাজিক দূষন অবস্থা হতে মুক্তি পেয়ে সুস্থ্য সামাজিকতার সন্ধান পায় । কিন্তু মুসলমানগণ হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি । সরল ধর্ম বিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্যের সামাজিক কাঠামো মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ছিল । কাজেই জটিল বর্ণ বিদ্বেষ ও পুরহিত শাসিত

---

১. বিজয় গুপ্ত, মনসা মঙ্গল, পৃঃ১৭৯ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৭৬ ।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ,১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৭৬ ।

৩. দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক উদ্ধৃত, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য', পৃঃ৩১৯ । টি,সি,দাস গুপ্ত, সাম আসপেকটস্ অব বেঙ্গলী সোসাইটি, পৃঃ১০৩ ।উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ৩৭৬-৭৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু সমাজের নিকট হতে মুসলমানদের গ্রহণ করার মত কিছু ছিল না । তথাপি বহু শতাব্দী এক সাথে বসবাস ও সংস্পর্শের ফলে মুসলমানদের সামাজিক জীবনের উপর যে হিন্দুর সামাজিক প্রভাব কিছু পড়েনি তা অস্বীকার করা যায় না । তবে এ প্রভাবটা খুবই বাহ্যিক ও লৌকিকতা বিশিষ্ট ছিল । মুসলমানদের মৌলিক বিশ্বাসের মুল নীতি ও ভিত্তিতে কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে পারেনি ।

মুসলিম সমাজ হিন্দু সমাজের ভাষা, সাহিত্য, পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার আচরনেণ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয় অপর দিকে হিন্দুরা মুসলিম ললিতকলা, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা ও স্থাপত্য শিল্প ইত্যাদি মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয় ।[১] তবে এখানে লক্ষ্যনীয় যে, মুসলমানের ধর্ম ও সমাজ সমস্ত মৌলিক বিষয়ে এত স্বতন্ত্র ছিল যে, তারা কোন দিন হিন্দুদের সাথে মিশে যেতে পারেনি । এর কারণ দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক বিধান সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এ সমস্ত পার্থক্য লক্ষ্য করেই মুসলিম পন্ডিত আল বেরুনী উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দুরা যা বিশ্বাস করে আমরা তা করি না, আমরা যা বিশ্বাস করি হিন্দুরা তা করে না ।[২]

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, সে সময় হিন্দু মুসলিম পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল । সাম্প্রদায়িকতার কোন নাম গন্ধ ছিল না । হিন্দু মুসলিম উভয়ে সমাজে পাশাপাশি অবস্থান করেও তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাস সামাজিক বিধি বিধান অনুসারে স্বাতন্ত্র বোধ বজায় রেখেছিল । তারা একে অপরের সাথে একীভূত হয়ে মিশে যেতে পারেনি । তবে বাংলায় মুসলিম প্রভাব হিন্দু সমাজের উপর ব্যাপকভাবে পড়েছিল, যারফলে হিন্দু সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল সুতরাং এভাবে যুগ যুগধরে বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে পাশাপাশি অবস্থান করেও স্বাতন্ত্রবোধ বজায় রেখে চলেছে ।

----

১. পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৪০ ।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত ,পৃঃ২৩০-৩১ ।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) সুলতানী আমলে বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা (হিন্দু ও মুসলিম) :-

সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশে হিন্দু মুসলিম এ দুটি ধর্মেরই প্রভাব ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য তথা ধর্ম বিশ্বাস, শিক্ষা সংস্কৃতি, সামাজিক আচার আচরন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। হিন্দু ধর্মে যা কিছু স্বাভাবিক ও বৈধ কিন্তু ইসলাম ধর্মে তা অস্বাভাবিক ও অবৈধ। তাই হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা কিরূপ ছিল নিয়ে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হল।

হিন্দু ধর্মীয় অবস্থা :-

মধ্যযুগে বাংলাদেশে যে হিন্দু ধর্ম প্রচলিত ছিল তা প্রাচীন যুগের পৌরানিক ধর্মেরই স্বাভাবিক বিবর্তন। বাংলাদেশের স্মৃতি নিবন্ধগুলি হতে মনে করা হয় যে, হিন্দু বাঙ্গালী জীবনে বার মাসই বিভিন্ন পূজা পার্বন লেগেই থাকত। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে মধ্যযুগে বৈদিক যাগ যজ্ঞের বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। সমাজে ব্রতানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই ব্রত সংক্রান্ত আচার আচরণে, বিশেষত: স্নানাদির ক্ষেত্রে পুরানের যথেষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় স্মৃতি নিবন্ধসমূহে, বিশেষত "শূলপানি" হতে রঘুনন্দন ও গোবিন্দা নন্দনের কাল পর্যন্ত রচিত গ্রন্থগুলিতে তন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন পূজা পার্বনে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ, তান্ত্রিক মন্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার একটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।[১] তৎকালীন সুলতানী আমলে বাংলায়, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বনে তন্ত্র ও মন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ধর্মীয় গুরুগণ এই মন্ত্র পাঠ করে পূজার অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এক সময় এই তন্ত্র মন্ত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাড়ায়। তাই এই তন্ত্র ও মন্ত্র ব্যতীত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সমাধা হত না।

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণে দ্বাদশ শতাব্দীর সময়কাল হতেই বাংলায় বেদের পাঠন ও পঠন এবং বৈদিক ক্রিয়া কর্মের প্রচলন অনেকাংশে কমে গিয়েছিল এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমন কি এই সকল মতের সমর্থনে পুরানের অনুকরণে তান্ত্র, ব্রাহ্মন্য, আগ্নেয়, বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে কৃত্রিম পুরান গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এরপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলমানদের আগমনে হিন্দু সমাজে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে। এরফলে অনেক লৌকিক ধর্ম প্রভাবশালী হয়ে উঠে এবং এ সকল লৌকিক ধর্মের অনেক অনাচার সমাজে প্রবেশ করে।[১] অর্থাৎ ধর্মের উপর যে তন্ত্র ও মন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল, তা এ থেকে বুঝা যায়।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে হিন্দু সমাজ নানাবিদ বর্ণ, উপবর্ণে বিভক্ত ছাড়াও বহু ধর্মীয় দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকেই প্রধানত এক দেবতা বা এক দেবীর আরাধনা করত, যদিও সকল দেব দেবীর প্রতি তাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল কিন্তু তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হত এবং এতে বিভিন্ন ধর্মীয় শ্রেনীর উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে শৈব, শাক্ত ও অন্যান্য প্রধান। কিছু সংখ্যক হিন্দু নারী দেবতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করত এবং বিশ্বাস করত যে, তিনিই সমস্ত শক্তির উৎস। এরা শক্তিরূপে পরিচিত হত।[২] বাংলার হিন্দু সমাজ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, সাধারণভাবে ব্রাহ্মন, কায়স্থ এবং বৈদ্যরা শক্তি ধর্মাবলম্বী ছিল।[৩] আর অন্য জাতি গুলি গৌড়ীয় অর্থাৎ চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। আবার তথা কথিত অস্পৃশ্য জাতিগুলি ধর্ম পূজা করত এবং ক্রমশ চৈতন্য ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। অনুমান করা হয় যে, বৌদ্ধ রাষ্ট্রের পতনের সাথে সাথে বাংলায় শ্রেনী বিভাগের আবির্ভাব ঘটে, তারই পথ ধরে। ধর্মেও এ বিভাগের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মন্য ধর্ম সাধারণত অভিজাতদের মধ্যে

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭৫।
২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০১।
৩. শিশির কুমার ঘোষ, "অমিয় নিমাই রচিত", ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ২৬৯। উদ্ধৃত, ডঃভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবদ্ধ ছিল । সেই ব্রাহ্মন্য ধর্মই শৈব, শাক্ত, প্রভৃতি সম্প্রদায় রূপে বাংলায় দেখা দেয় । অনেকের মতে মুসলিম শাসনামলেই শাক্ত পূজা বাংলায় প্রাধান্য লাভ করেছিল ।[১] এদের প্রত্যেকেরই আচার আচরন পূজা পদ্ধতি নিজস্ব প্রকৃতির ছিল, ধর্মীয় ভাবে হিন্দু হলেও, তারা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও ভিন্ন প্রকৃতির ছিল ।এভাবে ধর্মীয়ভাবেই বর্ণ প্রথার সৃষ্টি হয় । আর এই বর্ণ গোত্র ও সম্প্রদায়গত বিভক্তি প্রাচীনকাল হতেই হিন্দুদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছিল,। তা হলে আমরা বলতে পারি যে, মধ্যযুগে সুলতানী আমলে যে হিন্দু ধর্ম প্রচলিত ছিল তা প্রাচীন যুগের পৌরানিক ধর্মেরই স্বাভাবিক বিবর্তন মাত্র ।

ধর্মীয় সম্প্রদায় ও দল সমূহ ঃ

মুসলিম শাসনামলে সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । বৌদ্ধ ধর্ম যখন পরবর্তীকালে বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রীদেবতা বা তান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তখন এই সহজিয়া মতবাদের উৎপত্তি হয় । বৌদ্ধ সংঘ প্রথমে একান্তভাবে পুরুষদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । কিন্তু বুদ্ধদেবের পালিতা মাতা মহা প্রজাপতির ঐকান্তিক অনুরোধে বুদ্ধদেব তাকে এবং আরো কয়েকজন মহিলাকে সংঘে যোগদানের অনুমতি দেন । এরফলে বৌদ্ধদের মধ্যে হিন্দুদের প্রভাব পড়ে, বিশেষ করে তান্ত্রিকতা যৌনতা ও অশ্লীলনতার প্রভাব ব্যাপকতর হয় । যার দরুন বৌদ্ধরা হীন যান ও মহাযান এই দুই শ্রেনীতে বিভক্ত হয়ে যায় । হিনযান পন্থীরা তাদের ধর্মের পুরানো ঐতিহ্য বজায় রাখে । মহা যান পন্থীরা হিন্দুদের তান্ত্রিক দেব দেবতা ও তান্ত্রিক মতবাদ তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সংগে মিশিয়ে ফেলে । এরফলে বুদ্ধ তাদের নিকট দেবতায় পরিণত হয় ।[২]

---

১. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দ বাজার পত্রিকায় উদ্ধৃত, প্রবন্ধ,১৯৪০ সাল, চারু চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, কবি কংকন চন্ডী, ২য় ভাগ, পৃঃ৯২৯-৩০ । উদ্ধৃত, ডঃ ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭৫ ।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪০১-২ ।

Dhaka University Institutional Repository

কালক্রমে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে যথা বজ্র যান, কাল চক্রযান ও সহজযান । বজ্রযানীরা উপাসনার আচার অনুষ্ঠানাদি সমূহ বিধিবদ্ধ করে দেয় । সহজযানীরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জটিলতাসমূহ পরিত্যাগ এবং তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যৌনতা ও অশ্লীল ক্রিয়া কর্মের পদ্ধতি অনুসরন করে । তাদের মতে পরম সুখ, শান্তি আনন্দ লাভের ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা । পন্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, বিখ্যাত কবি চন্ডিদাস সহযযান ও সহজিয়া মতবাদের প্রধান মুখ পাত্র ও পৃষ্ঠ পোশক ছিলেন ।[১]

সহজিয়ারা অনেক শাখায় বিভক্ত ছিল যেমন-আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেড়া, সহজিয়া প্রভৃতি। এ ছাড়া কর্তাভজা, স্পর্শ দায়ক, সখীভাবক, কিশোরী, ভজনী, রামবল্লভি, জগমোহিনী, গৌড়বাদী, সাহেবধানী, পাগলনাথি, গোবরাই প্রভৃতি সম্প্রদায় ও সহজিয়া শ্রেনীর অর্ন্তভুক্ত হয় । এ সকল বিভিন্ন সহজিয়াদের ধর্মমত, সামাজিক প্রথা ও সাধন ভজন প্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও গুরুবাদ, স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করে । এদের উৎসবে স্ত্রী লোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় বহু স্ত্রীলোক এতে যোগ দেয় ।[২] এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত পরিচিত ছিল । বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে এ সকল সম্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবস্থা আপত্তিজনক ও অশ্লীল বলে মনে হলেও এদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্যনীয় । মধ্যযুগে কবির নামক প্রভৃতি সাধু সন্নাসীরা যেমন প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের বিধি ও হিন্দুর প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান ও সামাজিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এক উদার ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন এবং এর মূল ভিত্তি ছিল কেবল মাত্র ভগবান ও ভক্তের মধ্যে ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তি । বাংলার সহজিয়াদের মধ্যে সেই ভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় ।[৩] সহজীয়া ধর্মাবলম্বীরা ধর্মের নামে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা

---

১. দীনেশ চন্দ্র সেন, গ্লিমসেস অব বেঙ্গল লাইফ, পৃঃ১২৯ । হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ১ম খন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ৪১৯, ৪২১ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪০২ ।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬৭-৬৮ ।

৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭০ ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম গুরুর সাধন ভজনের জন্য অথবা আত্মিক ,আধ্যাত্মিক, দৈহিক, ও মানুষিক সাধনা ও উন্নতির জন্যে কামাচার ও নানা অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে । তারা এসব কিছুই ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মীয় অর্থ বলেই মনে করে । সম্ভোগ, পরস্ত্রিয়া প্রেম ইত্যাদির মাধ্যমে মনের দুঃখ কষ্ট ভুলে, আনন্দ ও খুশীর মধ্যে দিয়ে সাধন ভজনের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যায় বলে বিশ্বাস করে । এভাবে তৎকালীন ধর্মীয় সমাজের কিছু অংশ কলুষিত হয়ে পড়ে । এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষনে চৈতন্যদেব সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে এক নতুন ধর্ম মত প্রচার করেন, যার নাম বৈষ্ণব ধর্ম ।

চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে মুসলিম চিন্তা ধারার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায় । মুসলিম সমাজ জীবনের আদর্শে হিন্দু সমাজ পুনর্গঠিত করে এর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হিন্দু সংস্কারকদের চিন্তা ভাবনা, বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে । কেননা, রক্ষনশীল ব্রাহ্মন সম্প্রদায় প্রতিদিন ইসলামের নিকট পরাজিত হচ্ছিল । ইসলামের গনতান্ত্রিক চিন্তাধারা, গতিশীল সমাজ ব্যবস্থা, ইত্যাদি দেখে নির্যাতিত হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । তাই নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণ ইসলামের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং হিন্দু ধর্মের পরাজয়, তাদের সমাজ ও ধর্মকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । তাই চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম ছিল প্রধানত একটি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা । মুসলমানদের ধর্ম ও জীবনের আদর্শে হিন্দু সমাজ সংস্কার করে ইসলাম প্রচার রোধ করার জন্য বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব হয় ।[১] চৈতন্য ইসলামের অগ্রগতির মুখে হিন্দু সমাজ রক্ষার জন্য তিনি ব্রাহ্মন ও হিন্দু সমাজের অন্যান্য শ্রেনীর মধ্যকার সব রকম ধর্মীয় বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করেন । ধর্মীয়ভাবে সবাইকে সমান মর্যাদা দেন এবং দাসকে সেবক এই উপাধি দেন । চৈতন্য শিক্ষা দেন যে, "চন্ডাল"(নিম্ন বর্ণের হিন্দু) সে চন্ডাল নয়, যদি সে কৃষ্ণ নাম জপ করে, ব্রাহ্মন সে ব্রাহ্মন নয় , যদি সে অধর্মের কাজ করে ।"[২]

---

১. ডঃ আই, এইচ, কোরেশী,'' মুসলিম কমিউনিটি অব ইন্দো পাকিস্তান সাব কনটিনেন্ট" দ্রষ্টব্য- পৃঃ১২১ । উদ্দৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৪-৬৫ ।

২. বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভগবত, পৃঃ ১২৬ । উদ্দৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

চৈতন্য দেব আনুষ্ঠানিক বিধি বিধান বাদ দিয়ে স্ত্রী পুরুষ ও উচ্চ নীচ জাতি নির্বিশেষে সকলকে কেবল প্রেম ভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা দেয়ার যে প্রথা প্রচলন করেছিলেন তাতে তৎকালীন সময়ে হিন্দুদের মাঝে এক বিপ্লবের সূচনা হয়। বহু শূদ্র এবং অত্যন্ত অল্প হলেও কিছু মুসলমান ও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে।[১] অনেকে অনুমান করেন যে,

এ সময় যে সব সহযানী বৌদ্ধ ছিল তারাও বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে মিশে যেতে থাকে চন্ডীদাস প্রভৃতি কবিরা পূর্ব হতেই সহজিয়া ধর্ম প্রচার করে বৈষ্ণব ধর্মের পথ আরো প্রশস্ত করে দেয়। "গুরুই একমাত্র সত্য" যখন একথা প্রচার হলো তখন সহজান পন্থীরা যারা প্রথমে এই কথা বলেছিল, তাদের আর এদের সাথে মেশে যেতে আপত্তি রইল না। কেবল মাত্র নিজের গুরু (বুদ্ধ) নামের পরিবর্তে হিন্দু 'হরি', নতুন গুরু নামে সংযোজিত হতে লাগত। একথা অনুমান করা হয়ে থাকে যে, যেসব বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায়, রাজনৈতিক বিপ্লবজনিত কারণে মুসলিম শাসনের প্রবর্তন এবং ব্রাহ্মন্যবাদীয় হিন্দুদের কঠোর নির্যাতনের জন্য সমাজের কোথাও আশ্রয় ও সাহায্য পেল না, তখন তারা দলে দলে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল।[২] তবে এ কথা পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না যে, ব্রাহ্মনদের নির্যাতন ও অত্যাচারে বৌদ্ধরা দলে দলে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে। বরং ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করতে থাকে। কেননা তৎকালীন সমাজ যখন হিন্দু ব্রাহ্মন্য বাদীদের অত্যাচার অবিচার, কৌলিন্য প্রথা, জাতি, গোত্র, বর্ণ ভেদের নিষ্পেশনে জর্জরিত তখন মুসলিম আগমনকে সৃষ্টার আশির্বাদ বলে মনে করেছে এবং মুসলিম শাসনকে তারা স্বাগত জানিয়েছে। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম অধিকারে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামও গ্রহণ করেছে।

চতুর্দশ শতকের ইউরোপীয় পর্যটক বার্বোসা এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, বাঙালীরা হুড় হুড় করে মুসলমান হচ্ছিল।[৩] ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, বিপ্লবের ফলে বাংলার সমাজ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে যায়। জন সাধারণের মধ্যে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে।

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬৩।

২. ডঃ ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১-৮২।

৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

অবশিষ্টের অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে বা পুরাতন হীন যান বৌদ্ধকেই আকড়ে থাকে। তারপর যারা থাকে তারা অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মন্যবাদীয় তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী হয়েই থাকে, কিংবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়।[১] এ থেকে বুঝা যায় যে, কিছু অংশ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলেও বেশিরভাগই মুসলমান হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। কাজেই দলে দলে সবাই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এ কথা বলা যায় না। বাংলায় এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব হিন্দুদের উপর ব্যাপক বিস্তার লাভ করে, এবং কিছু মুসলমান ও তাতে সাড়া দিয়েছিল বলে মনে হয়। বার্বোসার মতে, যখন ব্রাহ্মন্যবাদীদের অত্যাচার, গোড়ামী ও কৌলিন্য প্রথা, তান্ত্রিকদের ব্যভিচার ও যৌনতায় ভরে যায় তখন মুসলিম রাজ শক্তির সহায়তায় ইসলামের সাম্য ভ্রাতৃত্ব ও সম অধিকারের বাণী ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে, তখন স্রোতের ন্যায় হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ঠিক তখন এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চৈতন্য দেবের প্রেমের ধর্ম বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ার আসে। এতে অনেক হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের অবশিষ্টাংশ নাথ ধর্মীয়রাও ভেসে যায়। । ইহা সত্য যে, ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পর বৌদ্ধ ধর্মের আর সংবাদ পাওয়া যায় না, তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারা ব্রাহ্মন্যবাদীয় সমাজে কিংবা ইসলাম ধর্মে আশ্রয় নেয়। উত্তর বাংলায় ও পূর্ব বাংলায় বেশীর ভাগ মুসলমানই হয় বৌদ্ধ, না হয় নাথ ধর্মীয় যুগী বংশ সম্ভূত।[১]

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই হিন্দু সমাজে তন্ত্র ধর্ম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং বহু অনাচার মূলক অনুষ্ঠানাদিতে ভরে গিয়েছিল। কিন্তু পরস্পরের প্রতি প্রেম স্থাপন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা ছিল। এই ধর্মে জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষ ও অবিচার এবং এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের বিভেদের কোন স্থান ছিল না। চৈতন্য বিশ্বাস করতেন যে, প্রেম ও ভক্তিমূলক নৃত্য গীতির মাধ্যমে মানুষ এমন এক আনন্দ জগতে পৌছাতে পারে যেখানে সে ভগবানের সাক্ষাৎ পেতে পারে।[২] এ সময় রাধা কৃষ্ণের আদর্শানুযায়ী ভগবৎ ভক্তি ও প্রেম সমগ্র দেশে এক উম্মাদনার

------ ------ -----

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪

২. ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৭।

৩. বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করল। রাধা কৃষ্ণের লীলা ও হরি নাম কীর্তনে প্রভাব বাংলাদেশে এ সময় বিস্তৃতি ঘটে। এতে হিন্দু ধর্মের আচার অনুষ্ঠান ও জাতি ভেদের কোন চিহ্ন ছিলনা। স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং আচন্ডাল সকলকেই প্রেমের ধর্মে দীক্ষিত করে তাদের মনে ভগবৎ প্রেম এবং সাত্বিক ভাব জাগিয়ে তুলায় ছিল বৈষ্ণব ধর্মের লক্ষ্য। রাধা কৃষ্ণের প্রেম চৈতন্য এর পূর্বেও এ দেশে ছিল। কিন্তু তা সাত্বিক ভাব শূন্য হয়ে নর নারীর দৈহিক সম্ভোগের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।[১] এই কলুষতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন চৈতন্য। তিনি রাধা কৃষ্ণের প্রেম মূলক বৈষ্ণব ধর্মকে এক অতি উচ্চ সুরে নিয়ে যান। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্য অনুভূতি, প্রাণোন্মাদকারী কীর্তন এবং রাধা কৃষ্ণের প্রেমের যে আদর্শ তা দিয়ে তিনি সমস্ত কলুষতা দুর করার চেষ্টা করেন। বৈষ্ণব ধর্ম তখন নতুন করে আবার প্রাণ পায়।[২] তিনি বৈষ্ণব ভক্তগণের নারীর সাথে কথপোকথন নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু চৈতন্যের এই আদর্শ বাঙ্গালীর চঞ্চল চিত্তে স্থায়ীভাবে আসন গড়তে পারেনি। কারণ বৈষ্ণবেরা নারী সম্ভোগ ও মাধুর্য আস্বাদনেই বিভোর ছিল। তারা ক্রমশ চৈতন্যের আদর্শ হতে বিচ্যুত হতে লাগল, তাই তাঁর এ আদর্শ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

চৈতন্য উত্তর কালে চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম বিকৃত হয়েছিল, সহজযানের গুপ্তি গন্ধময় নিয়ম কানুন দ্বারা, বৈষ্ণবী শক্তির উত্থান ও বিকৃত হয় মাধুর্য আস্বাদনের দ্বারা। সতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, বৈষ্ণবী শক্তি তত্ত্ব পরিবর্তিত ও বিকৃত হতে হতে মাধুর্য আস্বাদনে এসে দাড়ায়। কিন্তু সে মাধুর্য আস্বাদনের উপকরণ ও আধার হল নারীদেহ, কিন্তু সে নারীও আবার স্বকীয়া নয়, পরকীয়া।[২] কিন্তু বস্তুতপক্ষে চৈতন্য এর আদর্শ ও প্রভাব কোন দিক দিয়েই বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। বরং নতুনভাবে নানা প্রকার কলুষতার আবির্ভাব হয়।

চৈতন্য প্রেম ও ভক্তির সমন্বয়ে পৌরানিক রাধা কৃষ্ণের দেহবাদী প্রেম লীলার পরিবর্তে যে দেহাতীত প্রেম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা অতি সত্ত্বর দেহবাদী প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

---

১. ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার, "ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য", পৃঃ ২৮৪, উদ্ধৃত, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস," ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৫৮-৫৯।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস", ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৫৯-৬০।

৩. বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুরা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে মনে করত । কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা তাঁর সত্তা থেকে মানবরূপী চৈতন্যবাদকে পরিত্যাগ করে অবতাররূপী কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং খুব শীঘ্রই রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলায় মত্ত হয়ে উঠে । বলা বাহুল্য এ প্রেম লীলা সম্পূর্ণ দেহ সম্ভোগ নির্ভর ছিল ।[১]

বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিক দল এ দেশে পূর্ব হতেই ছিল । বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের ফলে এগুলির প্রভাব অনেকটা কমে গিয়েছিল । কিন্তু সত্তর বৈষ্ণব সহজিয়ারা তাদের সাথে যোগ দিয়ে দল বৃদ্ধি করে । এদের ধর্মাচরনের বিশেষ পদ্ধতি ছিল পরকিয়া প্রেম । বৈষ্ণবরা এই অবৈধ পরকীয়া প্রেমের সাথে মিশে যায় । চৈতন্যদেব যে সাত্ত্বিক প্রেম ও ভক্তিবাদের উপর বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কালক্রমে তা এই রকম চরম নৈতিক অধপতন হয়েছিল । তবে ইহা কেবল সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্মেই সীমা বদ্ধ ছিলনা । তান্ত্রিক ধর্মেও এর বীভৎসতা চরমে উঠে এবং আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মন্য ধর্মেও এর প্রভাব বিস্তৃত হয় ।[২] চৈতন্যদেব যে তাত্ত্বিক প্রেম ও ভক্তিবাদের আদর্শের উপর বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে, সমাজকে সকল অনাচার, ও অশ্লীলতা হতে মুক্তি দিয়ে সুন্দর করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা তিনি করতে পারেন নি । তার মতবাদ বাঙালী মনন শীলতায় বেশী দিন স্থায়ী হয়নি । চৈতন্য উত্তর তাঁর প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব ধর্ম ও অশ্লীলতায় ভরে যায় । মানুষ এই ধর্মীয় আবরণে এ সমস্ত জঘন্যতম কাজ অবলিলাক্রমে চালিয়া যেতে থাকে । তাই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সুলতানী যুগে কিছু সংখ্যক হিন্দুদের মধ্যে এ সব ধর্মীয় অনাচার ,সামাজিক ও ধর্মীয় আবরণে ব্যাপক হারে চলতে থাকে । কিন্তু চৈতন্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয় । শুধু তাই নয় সে সময় ধর্মীয় সমাজতন্ত্র সাধনার নামে যে মারাত্মকভাবে কলুষিত হয়ে পড়ে তার ও প্রমাণ পাওয়া যায় ।

তান্ত্রিক সাধনা প্রণালী আমাদের দেশে বহু প্রাচীন এবং একটি পৃথক ধর্ম সাধনা । পরবর্তীকালে বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই এর প্রভাবে এক বা একাধিক

---

১. বাংলাদেশে ইসলাম , পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৪ ।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস" , ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৪-৬৫ ।
বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

ছোট খাট দল গড়ে উঠে। সাধারণত তান্ত্রিক সম্প্রদায় শাক্ত বলে গণ্য হলেও তান্ত্রিক শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে। তন্ত্র শাস্ত্রের তান্ত্রিকদের বেদাচারী, বৈষ্ণবচারী, শৈবাচারি, দক্ষিনাচারী, রামাচারী সিদ্ধান্তচারী এবং কৌলাচারী প্রভৃতি ক্রমোন্নত পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে কৌলচারীই শ্রেষ্ঠ ছিল। তৎকালীন হিন্দু তান্ত্রিক সমাজ ও ধর্ম তখন কত নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সে সময়ে হিন্দু সমাজে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই তিনটি ধর্মের প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশে বিশেষত বৈষ্ণব ধর্মই প্রভাব বিস্তার করে। বিষ্ণুর স্থলে তাঁর অবতার শ্রীকৃষ্ণের পূজা অধিক প্রসার লাভ করে।

বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন করে। প্রেমের দ্বারা ভগবানকে লাভ করাই তাদের উদ্দেশ্য। তবে প্রথমে নর নারীর দৈহিক প্রেমের মধ্য দিয়ে এই প্রেমের আস্বাদ পেতে হবে। নিজের স্ত্রীর চেয়ে অন্যের স্ত্রীর প্রতি আসক্তিই বেশী প্রবল হয় তাই এটিই এ প্রেমের প্রথম ধাপ। কিন্তু ইহা স্থূল দেহজাত ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হলেও ক্রমে তা ভগবানের প্রেমে রূপান্তরিত হয়। কেউ কেউ আবার এর সংগে আরো যোগ করেন যে, মানুষের মন কাম প্রবৃত্তির দ্বারা চঞ্চল হয়। উহা চরিতার্থ হলে মন শান্ত হয় এবং তাকে ভগবানের ধ্যানে সমাহিত করা যায়।[১] এ সব অবস্থা দেখে মনে হয় যে পরকীয়া প্রেমের ভিত্তিতে ভগবান পাওয়া এবং তাকে খুশি করার পদ্ধতি ও সাধনা প্রাচীন সাধনা পদ্ধতির একটি ধারা। সুলতানী যুগেও সে ধারার ধারাবাহিকতা অনুকরণ হয়েছে মাত্র। তাই বৈষ্ণব ধর্ম সংস্কারের কর্ম-সূচী নিয়ে আসলেও কৃতকার্য হয়নি, এবং এই পরকিয়া প্রেমকেও বাদ দিতে পারেনি বরং তার সাথে চরমভাবে মিশে গেছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্ম নিয়োগ করেছে।

সুলতানী শাসনামলে নাথ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়। নাথ সম্প্রদায় অনেকটা সহজিয়াদের মত। কেহ বৌদ্ধ ধর্ম হতে কেউ বা হিন্দু ধর্ম হতে নাথ পন্থা অবলম্বন করেছে। এই নাথ বা যুগী সম্প্রদায় ও বাংলাদেশে খুব প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল এবং ক্রমে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কায় সাধন হঠযোগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নানা রূপ অলৌকিক শক্তি অর্জন

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস", ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬৭। বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

এবং মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাওয়াই ছিল এদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । এ সম্প্রদায় এখন কানফাটা যোগী নামে পরিচিত । এবং বাংলার বাইরে বিহার নেপাল উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে, এখনও তারা বিদ্যমান ।[১] এ যুগেই নাথ পন্থা শিব সংপৃক্ত হয়ে বৌদ্ধতান্ত্রিক, ব্রাহ্মন্যতান্ত্রিক, নাথ পন্থ, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া মতরূপে বিকাশ পেয়েছে । শৈব মত ও নাথ পন্থে পার্থক্য সামান্য । শিবত্ব, অমরত্ব, ঈশ্বরত্ব ও তত্ত্বের দিক দিয়ে এক অভিন্ন। আজীবিক, জিন, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী এবং ফকির এ যৌগিক সাধনাকে অবলম্বন করে বৈরাগ্যবাদকে অদ্য ও চালু রেখেছে । আলেকজান্ডার, হিউয়েনসাং, জালাল উদ্দীন, আলবেরুনী, মার্কোপলো, ইবনে বতুতা প্রভৃতি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যোগীরা ।[২]

হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম পূজা নামে পরিচিত আর একটি লৌকিক ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর মুসলমান প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব এই যে, এরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং ধর্ম ঠাকুর নামে অভিহিত একেশ্বরের পূজার অনুসারী । এই ধর্ম মত মানুষের সাম্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং হিন্দু সমাজের বর্ণ বৈষম্য বিরোধী ভূমিকা পালন করে । মন্ত্রযান, অথবা সাধারণভাবে বজ্রযান নামে পরিচিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতের কিছু উপাদান থেকে এবং তান্ত্রিক হিন্দু মতের কিছু প্রথা থেকে ধর্ম পূজা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । বাংলাদেশে হিন্দু আমলের শেষ ভাগে মহাযান বৌদ্ধ মত হিন্দু তান্ত্রিকদের কিছু ধর্মীয় আচার পদ্ধতি এবং মিশ্র লৌকিক বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয় । বৌদ্ধ সিদ্ধাদের চর্যাপদ এই প্রভাবের স্বাক্ষর বহন করে ।[৩] ধর্ম পূজা পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষক, তাঁতী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে । এ সমস্ত লোকেরা হিন্দুদের পুরোহিত শ্রেণীর লোকের কাছে অমানুষিকভাবে নির্যাতিত হয়েছিল ।[৪]

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস', ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭৪ ।

২. আহাম্মদ শরীফ, 'মধ্য যুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ রেখা' (ঢাকা১৯৭৭) ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৫৫ ।

৩. দীনেশ চন্দ্র সেন, গ্লিমসেস অব বেঙ্গলী লাইফ, পৃঃ৮৫,১০৫,১১৬ । বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৩৮ । বাঙ্গালীর ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৬২৭ । উদ্বৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ৩৬১-৬২ ।

৪. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৬২ ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম পূজা পদ্ধতিতে ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তা ধারার সাথে এই ধর্ম পূজার প্রায় মিল দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় একেশ্বরবাদী চিন্তা ধারা ও বর্ণহীন সমাজ ব্যতীত ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু প্রথা আছে যা একান্তভাবেই মুসলমান সমাজের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরুপ বলা যেতে পারে যে, ধর্ম ঠাকুরের সম্মুখে একটি বিশেষ রীতিতে গলা কেটে, ছাগল, হাঁস ও কবুতর জবেহ করা একান্ত ভাবেই মুসলমান প্রথার ও রীতি, উপরন্ত মুসলমানদের মত ধর্ম পন্থীদের পশ্চিম দিকের প্রতি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে। তারা পশ্চিম দিকে মুখ করে পশু পাখী জবেহ করে।[১] কাজেই দেখা যাচ্ছে ধর্ম পূজা পদ্ধতি তৎকালীন সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশে প্রচার লাভ করেছিল এবং জনগণের মধ্যে সাড়া ও জাগিয়েছিল। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, এ ধর্ম পূজার মতবাদটি সম্পূর্ণভাবে ইসলামী প্রভাবে প্রভাবিত। ইসলামের একেশ্বরবাদ, মৌলিক নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস বিধি বিধান ইত্যাদি সব কিছুই এই ধর্ম পূজা পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এ কারণেই এদের মধ্যে হিন্দু সহজিয়া বৈষ্ণব সহজিয়া ও তান্ত্রিকদের মত কোন প্রকার অনাচার, পাপাচার, যৌনতা, অশ্লীলতা, স্পর্শ করতে পারেনি।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান :

সাধারনত : দেবতাগণের উপাস্য হিসাবে হিন্দুদেরকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। বৈষ্ণব শৈব, শাক্ত, সৌর ও গানপত্য। যদিও অনেকে আলাদাভাবে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য ও গন পতিকে ইষ্টদেব জ্ঞানে পূজা করত, তথাপি সাধারনত ব্যবহারিক জীবনে প্রায় সকলেই স্মৃতি শাস্ত্রেয় নিয়ম অনুযায়ী একত্রে এই পাঁচ দেবতাকে পূজা করত। এদের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত এই তিনটি প্রধান এবং সৌর ও গান পত্য এ দুটি অপ্রধান সম্প্রদায়ে থাকলেও সাধারণত হিন্দুদের বেশীর ভাগকেই পঞ্চোপাসক বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম কার্যে মন্ত্র পাঠ করে ফুল, জল, অর্ঘ ইত্যাদি দ্বারা পঞ্চ দেবতার পূজা করত। সাধারণত ইষ্ট দেবতার মূর্তি বা প্রতীক, কেন্দ্র

১. এস,বি,দাস গুপ্ত, কর্তৃক উদ্ধৃত, অবসকিউর রিলিজিয়াস কলস, পৃ ঃ৩৮৮,৩৮৯,২৬৬-৬৭। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্থলে এবং অন্য আর দেবতার মূর্তি ও প্রতীক চার কোনে রেখে পূজা করা হত । সাধারণভাবে এই ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি সকল হিন্দুর বেলায় প্রযোজ্য ।[১]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার সমাজ, ধর্ম বিশ্বাস, শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশৃংখলাপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয় । এ অবস্থার মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল অনেক লোকায়ত দেব দেবীর ইতিপূর্বে এ সকল দেবদেবী সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের কর্তৃক পূজিত হত । মুসলিম শাসনামলে ব্রাহ্মন শাসিত সমাজের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দেয় এবং নিম্নশ্রেণী কর্তৃক পূজিত বহু দেব দেবী প্রাধান্য লাভ করতে থাকে । তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, মনসা, শীতলা, বাশুলী, চন্ডী, ষষ্ঠী, কালিকা, কমলা, গঙ্গা প্রভৃতি । এ ছাড়া আরো দেব দেবী ছিল যেমন-শিব লিঙ্গ, দূর্গা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, সূর্য, মদন, নারায়ন, ব্রহ্ম, অগ্নি, ইত্যাদি । এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এ সময়ের হিন্দু সমাজে গৃহীত এ সকল দেব দেবী বাংলাদেশে প্রাচীনকাল হতেই পূজিত হয়ে আসছিল । কিন্তু সমাজের নিম্ন শ্রেণীর দ্বারা পূজিত হওয়ায় এ সকল দেব দেবী ব্রাহ্মন্য ধর্মের কৃপা লাভ করতে পারেনি । সম্ভবত এর কারণ ছিল আর্য সমাজের দেবতা ছিল পুরুষ এবং আর্যেতর সমাজের দেবতা ছিল নারী দেবী । আর্য দেবতারা যতই প্রাধান্য লাভ করতে থাকে, আর্যেতর নারী দেবতারা ততই পরাজিত হয়ে পর্বত গুহা, বন জঙ্গল, গাছ তলায় আশ্রয় লাভ করে । কিন্তু সুলতানী যুগে যখন ব্রাহ্মন্য ধর্মের ভিত্তি কেঁপে উঠলো তখন এই সকল নারী দেবতারা ক্রমশ হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্ম সংস্কারের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে এবং পৌরানিক মাতৃ দেবীর সাথে অভিন্ন হয়ে যায় ।[২] নিম্নে বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা পদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল ।

শিব পূজা বাংলাদেশে প্রাচীনকাল হতেই চলে আসছে । এই পূজা সাধারণত সন্তান লাভ ও ভূমি উর্বরতা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত । সন্তান কামনায় বিশেষ করে পুত্র সন্তান লাভের আশায় শিব পূজাও শিব মন্দিরে হত্যা (বলি) দেয়ার প্রথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল । বাংলাদেশেও

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৫৪-৫৫ ।

২. বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭০ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল । এ ছাড়া শিব লিঙ্গে জলদান এবং কুমারী ব্রতে লিঙ্গ পূজার গুরুত্ব থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, প্রজনন শক্তির দেবতা হিসেবে শিব লিঙ্গের পূজা করা হয় । পশ্চিম বঙ্গে বিভিন্ন শিব মন্দিরে বন্ধ্যানারীগণ সন্তান কামনায় হত্যা দিয়ে থাকে, তাদের বিশ্বাস শিবের অনুগ্রহে সম্ভব হলে তারা সন্তান লাভ করতে পারবে । ফরিদপুর জেলার কোটালী পাড়ার বুড়ো শিবের গাজন এক সময় বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গাজন হিসেবে বিখ্যাত ছিল । এই গাজনকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান উদযাপিত হত । এর মধ্যে একটি 'পাট স্নান'। এই পাট স্নানে অনেক বন্ধ্যানারী আসত । তিন ফুট লম্বা ৮ হতে ১০ ইঞ্চি চওড়া পাটটিকে উপস্থিত বন্ধ্যা নারী মাথার উপর রেখে গোসল করানো হত । বিশ্বাস এক বছরের মধ্যে বন্ধ্যানারী সন্তান লাভ করবে ।[১] সুতরাং বুঝা যায় যে, বাংলাদেশে প্রজনন দেবতা হিসেবে শিবের একটা বিশেষ স্থান ছিল । বস্তুত মধ্য যুগে তথা সুলতানী যুগে হিন্দু সমাজে শিবই ছিল প্রধান উপাস্য দেবতা । বাংলায় শিব মন্দিরের আধিক্য দেখে তাই মনে হয় ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরানের কাহিনী অনুযায়ী মনসা হল সাপের দেবী । ব্রহ্মার আদেশে কশ্যপ মুনি সর্প মন্ত্রের সৃষ্টি করেন ও তপোবনে 'মন' দ্বারা সৃষ্টি করে তাকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করেন এ জন্যই তার নাম মনসা । কুমারী অবস্থায় মনসা মহাদেবের নিকট যান এবং তার কাছ হতে .. পূজা ও মন্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা করে সিদ্ধ হন এবং সর্প দংশনের মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে পরিগনিত হন । সে থেকেই দেবতা মনু, মুনি, নাগ, মানুষ, সকলেই মনসা দেবীর পূজা করতে থাকে ।[২] মনসা প্রাচীন ও পৌরানিক যুগের দেবী নয় । সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় যে, পঞ্চদশ শতক থেকে হিন্দু সমাজে মনসা দেবী পূজা ও চন্ডী পূজা বিশেষ স্থান দখল করেছিল । চন্ডী ছিল ধন সম্পদ দান করার দেবী । মনসা ছিল হিন্দুদের সর্পের দেবী ।

---

১. অধ্যাপক, প্রদ্যোত কুমার মাইতি," বাংলার লোক ধর্ম ও উৎসব পরিচিতি" (কলিকাতা১৯৮। ১ম প্রকাশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮,৯,১০ ।

২. বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭১ ।

৩. এস,কে,সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১৫৫-৫৬ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

কতকগুলি প্রচলিত বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মনসা পূজার উদ্ভব হয়েছিল । সন্তান লাভ কিংবা রোগ মুক্তির জন্য হিন্দুরা তাঁর পূজা করত । তবে সাপের দেবী মনসা প্রজনন শক্তির দেবী হিসেবেই পূজিত হত । সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেই মনে হয় প্রাচীনকাল হতে সাপকে যৌন প্রতীক কল্পনা করে যে পূজা করা হত সেই ধারাটি সুলতানী যুগে মনসাদেবীর সংগে মিশে যায় । বাংলাদেশেও আসামে বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্য মনসা আজও পূজিত হয় ।[১] আনুমানিক নবম ও দশম শতক হতেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পূজিত হয়ে আসছিল । সুলতানী শাসন যুগেও আমরা তারই ধারাবাহিকতা দেখতে পাই । এ সময় হিন্দু সমাজে সন্তান লাভের আশায় মনসা পূজা করত এবং সমাজে ইহা সাড়াও জাগিয়েছিল ।

প্রাচীনকাল হতেই বাংলাদেশে ষষ্ঠী দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল । ত্রয়োদশ শতকে এমনকি বর্তমানে ও এ পূজার প্রচলন দেখা যায় । ষষ্ঠীদেবীর পূজা সাধারনত নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । অনেকে মনে করেন যে প্রাচীন কালে এই পূজা কৌম সমাজের মধ্যে প্রথম প্রকাশ পায় পরে ব্রাহ্মন্য ধর্মে প্রবেশ করে । বাংলাদেশে বহু প্রকারের বা বহু নামে ষষ্ঠী পূজার প্রচলন রয়েছে । ষষ্ঠী পূজার উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন রকমের । তবে ষষ্ঠী দেবী সন্তানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাই সন্তানদের কেন্দ্র করে ইহা পালিত হয় । সন্তান কামনায় যে ষষ্ঠী দেবী পূজিত হয় তিনি হলেন অরন্য ষষ্ঠী, তবে ইহা জামাই ষষ্ঠী বলে বেশী পরিচিত । বগুড়া ও পাবনা জেলায় ইহা আম ষষ্ঠী নামে পরিচিত । তার কারণ এসব জেলায় আম এই পূজার বিশেষ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।[২]

বাংলাদেশে শীতলা দেবী মুলত বসন্ত রোগের হাত হতে বাঁচার জন্য পূজিত হলেও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ও এ পূজা করা হয়ে থাকে । বাংলাদেশের অনেক গ্রামেই স্থায়ী শীতলা মন্দির আছে । বিশেষ একটা নির্দিষ্ট দিনে বা প্রাত্যহিকভাবেও পূজার ব্যবস্থা আছে । এ সকল মন্দিরে শীতলা কেবল যে বসন্ত রোগের দেবী বলেই পূজিত হয় তা নয়, অন্যান্য কারণেও শীতলা পূজা পেয়ে থাকে । নারীর বন্ধ্যাত্ব মোচন তাদের মধ্যে অন্যতম । অনেকেই মনে করেন যে,

---

১. বাংলার লোক ধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩১,৩২ ও ৩৩ ।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৮, ১৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধদের "হরীতী"ই বাংলার লোক সমাজে শীতলার রুপ নেয় এবং 'হরীতী' বৌদ্ধ সাহিত্যে সন্তানের দেবী হিসেবে পরিচিত । হরীতী থেকে শীতলার উৎপত্তি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না । তবে মনে হয় হয়ত হরীতীর ধারণাটি ও গুণটি পরবর্তীতে শীতলা দেবীর মধ্যে প্রবেশ করেছে ।[১] এ ছাড়া হিন্দু সমাজে লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, বাসলী পূজা, ইত্যাদি ও প্রচলিত ছিল । ভাগ্যের উন্নতির জন্য ও ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য হিন্দুরা লক্ষ্মী পূজা করত । সরস্বতীকে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী বলে পূজা করত । সে কালে হিন্দুরা গঙ্গাঁও ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত । এই স্নান প্রথমে দশাহারা ও পরবর্তিটি অষ্টমী স্নান রুপে পরিচিত হিয় । এবং মাঘ মাসের সাত তারিখে কোন পবিত্র নদীতে মাঘী সপ্তমী স্নানকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করত ।[২] দোল যাত্রা, রথ যাত্রা ও হোলি উৎসব খুবই প্রচলিত হয় এ সময় । দ্বাদশ শতকের পূর্বে হোলি উৎসবের উৎপত্তি হয় । প্রচুর ফসল কামনা করে হিন্দুরা দেবীকে প্রসন্ন করতে নর বলির মাধ্যমে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত । এর সাথে যৌন আবেদন মুলক নৃত্য ও গীত থাকত । হোলির সাথে কাম দেবতার উৎসব জড়িত ছিল । ষোড়শ শতাব্দীতে কাম উৎসবের স্বাতন্ত্রবোধ হারিয়ে ফেলে এবং হোলি অনুষ্ঠানের সাথে মিশে যায় ।[৩]

চতুর্দশ ,পঞ্চ দশ শতাব্দীর স্মৃতি প্রণেতা শূলপানির 'ব্রতকাল বিবেক' গ্রন্থে কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে উদযাপিত কার্তিক পূজার উল্লেখ হয়েছে । সাধারণ মেয়েরা সন্তান কামনায় ও মঙ্গলের জন্য কার্তিক পূজা করে থাকত । তাদের বিশ্বাস যে, কার্তিক পুত্র সন্তান দান করেন । উচ্চ নীচু নির্বিশেষে সকল নারী কার্তিক ঠাকুরের পূজা করত বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । কার্তিক ঠাকুর সন্তান দান করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু সন্তান দাতা হিসেবে কখন কার্তিক পূজা বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না । তবে স্মৃতি প্রণেতা শূল পানির গ্রন্থে কার্তিক পূজার উল্লেখ থেকে অনুমান করা হয় যে, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে সন্তান কামনায় কার্তিক ঠাকুরের পূজা বাংলাদেশে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ।[৪]

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৫ ।

২. হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ১ম খন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ৬০৮ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪০৫ ।

৩. নারায়ন দেব মনসা মঙ্গল,পৃঃ৪৮ ।বিজয় গুপ্ত মনসা মঙ্গল, পৃঃ৯৬-৯৭ । উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪০৭ ।

৪. বাংলার লোক ধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, পূর্বোক্ত,পৃঃ১২, ১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

নানা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই দেশে কালী দেবী পূজিত হয়ে আসছে। সাধারণত বিশেষ কোন মনোবাসনা পূরণের আশায়, সন্তান লাভের অভিপ্রায়ে, মৃত বৎসা নারীর সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনায়, ওলা উঠা বা কলেরা, মহামারী প্রভৃতি রোগ দেখা দিলে সে রোগ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, কিংবা চোর ডাকাতের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষ সাধারণত তাঁর পূজা করত।[১] অর্থাৎ যাবতীয় অনিষ্টকর বস্তু হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই কালী পূজা করা হত।

মধ্য যুগে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে দুর্গা পূজাও প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমান কালে যে পদ্ধতিতে দুর্গা পূজা করা হয় চতুর্দশ শতাব্দী বা তার কিছু পূর্বে এর সূত্রপাত ও প্রচলন হয় বলে মনে করা হয়। তৎকালীন সময়ে এই পূজা অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই দুর্গা পূজা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই দুর্গা পূজা বর্তমানকালেও অত্যন্ত জাক জমকপূর্ণ ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করা হয়।

কৃত্তিবাসী রামায়নে হিন্দু সমাজে দুর্গা পূজার উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতকে হিন্দুদের মধ্যে দুর্গা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে যায়। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভগবত' থেকে জানা যায় যে, তার সময়ে দুর্গা পূজা প্রতি ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হত।[২] দুর্গা পূজা প্রথম কে কিভাবে প্রচলন করে সে সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে যে, মনুসংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কুল্লুপ ভট্টের পুত্র রাজা কংস নারায়ন নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে দুর্গা পূজা করেন এবং রাজশাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজ পুরোহিত পন্ডিত রমেশ শাস্ত্রী যে দুর্গা পূজার পদ্ধতি রচনা করেন তাহা এখন পর্যন্ত প্রচলিত হয়ে আসছে। অবশ্য এর পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে দুর্গা পূজা প্রথম হতে সাত্ত্বিক সাধনা অপেক্ষা অত্যন্ত জাক জমকপূর্ণ উৎসব বলেই মনে হত।[৩] এ থেকে বুঝা যায় যে, মিথিলায় চতুর্দশ শতকে বাংলার অনুরূপ দুর্গা পূজার প্রচলন ছিল। কিন্তু ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে এ রূপ দুর্গা পূজার প্রচলন ছিল কিনা তার কোন তথ্য জানা যায় না।

---

১. বাংলার লোক ধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৪।

২. বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভগবত, পৃঃ ৩৭, ৩৮। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪০৫।

৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস' ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্গা পূজার মধ্যে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার পূজাই বাংলাদেশে স্মৃতিকারগণ অনুমোদন দিয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁদের মতে সাত্ত্বিকী পূজায় জপ, যজ্ঞ, নিরামিষ ইত্যাদি পূজার উপকরণ থাকবে। রাজসী পূজাতে পশুবলী হবে এবং পূজার উপকরণ হবে আমিষ। তামসী পূজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নেই এবং পূজার উপকরণ মদ, মাংস ইত্যাদি কালিকা পুরানের প্রমাণ বলে শূল পানি এক প্রকার সংক্ষিপ্ত দুর্গা পূজার ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মাত্র পাঁচ প্রকার উপকরণ দ্বারা দেবী পূজা হতে পারে যেমন-ফুল, চন্দন, ধূপ, দ্বীপ, ও নৈবদ্য। অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না হলে সে কেবল ফুল জল অথবা শুধু জল দ্বারা পূজা করতে পারে এ বিধান আছে।[১] অতএব, সব শেষে আমরা বলতে পারি যে, প্রাচীন কালে এই শারদীয় দুর্গা পূজার অস্তিত্ব থাকলেও বর্তমান পদ্ধতিতে প্রচলিত এই পূজা মধ্যযুগে তথা চতুর্দশ শতকে সুলতানী শাসনামলে বাংলায় প্রথম সূত্রপাত হয়। তবে ষোড়শ শতাব্দীর দিকে বাংলায় এর ব্যাপক প্রচলন হয় ও সাড়া জাগায়, জনগণ একে অত্যন্ত অনুগ্রহ ভরে গ্রহণ করে। তৎকালীন সময়ে ইহা অত্যন্ত রাজকীয়ভাবে ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করা হত।

বাংলার স্মৃতিকারগণের মতে হিন্দু সমাজে বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন রকমের ধর্মানুষ্ঠান ও আচারাদি পালন করা হয় যেমন-বৈশাখ মাসে, প্রাত স্নান, ব্রাহ্মনকে জল ঘট দান, মশুরসহ নিমপাতা ভক্ষন, বিষ্ণুকে ঠান্ডা পানিতে স্নান করান ইত্যাদি। জ্যৈষ্ঠ মাসে অরন্য ষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠী, সাবিত্রী ব্রত ও দশহারা। আষাঢ় মাসে চাতুর্মাস্য ব্রত। শ্রাবন মাসে, মনসা পূজা ভাদ্র মাসে, জন্মাষ্টমী ব্রত ও অনন্তব্রত। আশ্বিন মাসে, দূর্গা পূজা ও লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি। কার্তিক মাসে, প্রাত স্নান, দিনে উপবাস ও পার্বন শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যায় পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে উল্কা দান ইত্যাদি। অগ্রহায়ন মাসে নবান্ন শ্রাদ্ধ। পৌষ মাসে উল্লেখযোগ্য কোন অনুষ্ঠান নেই। মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীতে সুরস্বতী পূজা, মাঘী সপ্তমীতে প্রাত স্নান ও সূর্যদেবতা উপাসনা, বিধান সপ্তমী ব্রত, আরোগ্য সপ্তমী ব্রত, ইত্যাদি। ফাল্গুন মাসে, শিব রাত্রি ব্রত। চৈত্র মাসে শীতলা পূজা, বারুনী স্নান, অশোকাষ্টমী রাম নবমী ব্রত, মদনত্রোয়োদশী ও মদন চতুর্দশী তিথিতে পুত্র পৌত্রদের

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস' ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৪১-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

সৌভাগ্য কামনায় এবং সকল প্রকার বিপদ আপদ হতে মুক্তি লাভের আশায় মদন দেবের পূজা ইত্যাদি।[১] এমনিভাবে বাংলাদেশে সুদূর অতীত কাল হতে নানা ধরনের পূজা পার্বন লেগেই থাকত। প্রবাদে আছে যে, হিন্দুদের "বার মাসে তের পূজা" অর্থাৎ প্রতিদিন প্রতিমাসে কোন না কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব, পূজা পার্বন ইত্যাদি লেগেই থাকত। সুতরাং এ সব কিছুই মধ্যযুগের বাংলার হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশে লৌকিক পূজা পার্বনের মধ্যে বৃক্ষ পূজা অন্যতম। বাংলাদেশে বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে এর বহুল প্রচলন দেখা যায়। প্রাচীনকাল হতেই বৃক্ষ পূজা বাংলাদেশে চলে এসেছে। তাই সেই ধারাবাহিকতার পথ ধরেই সুলতানী শাসন যুগেও এই বৃক্ষ পূজার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। এই বৃক্ষ পূজাও মধ্যযুগে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। যে সব বৃক্ষ পূজা করা হত তাদের মধ্যে কয়েকটির বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে অশ্বত্থ বৃক্ষকে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের প্রতীক এবং শিবের প্রিয় জ্ঞানেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে পূজা করা হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম পুস্তকে এই গাছের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত বিশ্বাস হিন্দু ত্রিমূর্তী ব্রাহ্ম, বিষ্ণু, শিব, অশ্বত্থ গাছে অবস্থান করেন। বাংলাদেশে যে পরিমান বৃক্ষটি পূজা পায় তা থেকে মনে হয় প্রাচীনকাল হতেই অশ্বত্থ গাছ বাঙ্গালীর কাছে পূজা পেয়ে আসছে। বাঙ্গালী মেয়েরা বর্তমানে সমৃদ্ধি, বন্ধ্যাত্ব মোচন ও আয়ু বৃদ্ধির জন্য উক্ত গাছকে পূজা করে থাকে।[২] বট গাছের পূজাও বাংলাদেশে বেশ সমাদৃত। বট গাছের সংগে ব্রহ্ম, লক্ষ্মী, ও ষষ্ঠী দেবীর সম্পর্ক রয়েছে। এ গাছের সাথে কৃষ্ণের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। তুলসী গাছ পূজা কেবল বাংলাদেশেই নয় সমগ্র ভারত বর্ষে এর পূজা হয়ে থাকে। বৈষ্ণবদের কাছে তুলসী গাছ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিষ্ণুর প্রিয় জ্ঞানেই এই গাছকে বিষ্ণু প্রিয়া বা হরিপ্রিয়া বলা হয়।

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪২-৪৩।

২. বাংলার লোক ধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরানে পাওয়া যায় যে, তুলসী দেবী শ্রী কৃষ্ণের অন্যতম গোপীনী ছিলেন, রাধিকার অভিশাপে পুনরায় তুলসী গাছ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সাথে তুলসীর যোগ থেকেই এই গাছের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে প্রায় সব হিন্দু বাড়ীতেই তুলসী গাছ রোপন করে ছোট মন্ত্র করা হয়। বেল গাছ ভারতবাসী মাত্রেরই কাছে পবিত্রতার প্রতীক। শিবের সংগে এর ঘনিষ্ঠতা সর্বজন স্বীকৃত। লক্ষ্মীদেবীর সংগেও এই গাছের ঘনিষ্ঠতার কথা জানা যায়। শৈব ধর্মে বেল গাছের এক বিশেষ স্থান রয়েছে এবং শিবের সাথে একত্রে বেল গাছের পূজার প্রচলন বাংলাদেশে লক্ষ্য করা যায়। তাদের বিশ্বাস বেল গাছকে পূজা করলেই শিবের পূজা করা হয়। বাঙ্গালী হিন্দু মেয়েরা তাই স্বামীর সোহাগ পাওয়ার জন্য এক দিকে যেমন শীব পূজা করে তেমন বেল গাছ ও তারা পূজা করে। বেল গাছের পূজা বাংলাদেশে প্রাচীন কাল হতেই চলে এসেছে তা বুঝা যায়।[১] শেওড়া গাছের সাথে বন দুর্গার ঘনিষ্ঠতা বাংলাদেশের কোথাও কোথাও দেখা যায়। বন দুর্গার পূজা বাংলাদেশের অনেক স্থানে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় প্রচলিত ছিল। শেওড়া গাছ বন দুর্গার অনুষ্ঠান ময়মনসিংহ জেলায় বহুল প্রচলিত ছিল। বন দুর্গার পূজায় কোন মূর্তি ব্যবহৃত হয় না, শেওড়া গাছের তলায় দেবীর পূজা আয়োজন করা হয়।[২] এ ছাড়া দূর্বা, কুল, কলা, কদম, শাল, খেজুর, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে বিভিন্নভাবে পূজিত হয়ে আসছে।

অতএব, সব শেষে আমরা বলতে পারি যে, বৃক্ষ পূজা আদিম যুগের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে এমনভাবে জড়িত যে, আধুনিক কালেও এ বিশ্বাস নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। কেননা এ মানুষে এসব বৃক্ষের অধিকাংশের সাথে দেব দেবীর সংযোগ কল্পনা করে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে মিশিয়ে ফেলে। বাংলাদেশের বৃক্ষ পূজার রীতি নীতি দেখে তাই বুঝা যায়। এই বৃক্ষ পূজা বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মীয় একটি বৈশিষ্ট্য ও বটে।

---

১. বাংলার লোক ধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১, ৭২, ৭৩ ও ৭৪।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা সবশেষে বলতে পারি যে, বাঙালী হিন্দুর যোগ তান্ত্রিক জীবন তত্ত্ব ও বাঙালীর জনজীবন মানসে এসব প্রকৃতি পূজা দেবতা পূজা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এরফলে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য মত এখানে কখনো সম্পূর্ণভাবে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এ দেশীয় দীর্ঘ দিনের লৌকিক বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার আচরণ বিভিন্ন ধর্ম মতের উপর ভর করেই বিকশিত হয়েছে। তাই এভাবে বৌদ্ধ ধর্ম বিকৃতির ফলে, মন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, নাথ পন্থা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিকৃতির ফলে লৌকিক দেবতা ও তান্ত্রিক সাধনা পদ্ধতির উদ্ভব হয়। কিন্তু এভাবে মধ্য যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যবস্থাদি বিকৃতির ফলে ধর্ম ও সমাজ হয়ে পড়ে কলুষিত। তান্ত্রিক সাধনায় যোগ হয় অনাচার, অশ্লীলতা ইত্যাদি। এগুলি ব্যতীত সাধন ভজন পরিপূর্ণতা হয় না, চঞ্চল মন সংযত রাখা যায় না, তাই এসব অশ্লীল কাজ এর মাধ্যমে চঞ্চল মনকে সংযত করে দেবতার সান্নিধ্য লাভই হল উদ্দেশ্য। এভাবে সুলতানী যুগে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর কিছু অংশ কলুষিত হয়ে পড়ে। এই ধর্মীয় অশ্লীলতা দূর করার জন্য চৈতন্য তার বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হন। চৈতন্য সমাজ ও ধর্মকে এ সমস্ত পাপাচার হতে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। চৈতন্য উত্তর সময়ে আমরা দেখতে পাই যে, বৈষ্ণব সহজিয়ারাও তান্ত্রিক সাধনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনি করে বিভিন্ন ভাবে হিন্দু ধর্মের কিছু অংশ কলুষিত হয়ে পড়ে। সুতরাং মধ্যযুগে তথা সুলতানী শাসনামলে এসব কিছু সম্মিলিত আচার অনুষ্ঠান হিন্দু ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়ায় এবং অসামাজিকতায়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কলুষতায় ভরে যায়।

মুসলিম ধর্মীয় অবস্থা ঃ

ইসলামের মূল নীতি ও বিশ্বাস কুরআন ও হাদিস প্রভৃতি ধর্মীয় শাস্ত্রের আইন কানুন ও বিধি বিধান দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাই পৃথিবীর যেখানেই বাস করুক না কেন সর্বত্রই মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস ধর্মাচারণ ও মৌলিক নীতিতে ঐক্য দেখা যায়। বাংলাদেশের মুসলমান ও এর থেকে আলাদা নয়। বঙ্গ বিজয়ের পর এখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এবং ইসলামী আইন কানুন প্রচলিত হলে এ দেশীয় হিন্দুরা ক্রমশ মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে এবং মুসলমানদের ঔদার্য, আচার ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কৌলিন্য, জাতি, গোত্র ও বর্ণভেদ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথায় নির্দেশিত ও অত্যাচারিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধরা অতিষ্ঠিত ও বীত শ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল তাই তারা এই অত্যাচার হতে বাঁচার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বাংলায় তখন হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানরাও ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং ইসলাম ধর্ম তখন বাংলাদেশে নিজস্ব ও সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজে অন্যান্য ধর্মের মুখোমুখি হয়। শুধু তাই নয় স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিশ্বাস, আইন কানুন, নিয়ম পদ্ধতি, আচার অনুষ্ঠান, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠা করে। মুসলমানদের মূল ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি নীতি, অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস হতে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ায় মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। তবে যার যার ধর্ম নিয়েই তারা বসবাস করতে থাকে। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের ধর্মীয় নীতি ও মৌলিক বিশ্বাসে স্বকীয়তা থাকলেও নিম্ন শ্রেণীর বৌদ্ধ ও হিন্দুরা যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা তাদের দীর্ঘ দিনের ধর্মীয় পুরানো কিছু কিছু অভ্যাস, সংস্কার পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেনি। তাই বিজাতীয় ও বিধর্মীয় কিছু রীতি নীতি, কুসংস্কার, তাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করে। তবে মৌলিক বিশ্বাসের উপর কোন এ্যটি দেখা দেয় নি।

প্রাচীন কালের ঋষিরা একদিন যে সাত্ত্বিক উপাধি লাভ করেছিল, তাদের জীবন, চিন্তা ও দর্শনে স্রষ্টা জীবন ও জগত সম্পর্কে যে সংশয় বাদ জন্ম নিয়েছিল তা থেকেই ভোগবাদের সৃষ্টি হয়। তাই প্রাচীনকাল হতেই কাম ও যৌন সম্ভোগ ভারতীয় ধর্মের একটি অংশে পরিনত হয়েছিল কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে মুসলমানদের নিকট যাবতীয় আইন কানুন ও বিধি বিধানের জন্য কুরআন ও হাদীসে থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সুলতানদের অদূরদর্শিতা ও অবহেলার কারণে হিন্দু ধর্মের এসব অশ্লীল আচার অনুষ্ঠান পৌরানিক রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলা তাদের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করে।[১] কেননা নতুন মুসলমান হিসেবে হয়ত তারা ইসলামের এই সামাজিক নিয়ন্ত্রন হঠাৎ করে মেনে নিতে পারেনি, কিংবা সঠিক শিক্ষার অভাবে হয়ত তারা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা তাদের মধ্যে ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ভুল করে সাময়িকভাবে পাপে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু যখন ইসলামী অনুশাসন তাদের নিয়ন্ত্রনে আসে তখন তারা ক্রমশ এ থেকে বিরত হতে থাকে।

---

১. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু মুসলিম জনসাধারণ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইসলাম বিরোধী এমন এক কলুষিত পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করতে ছিল যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় হতে ধর্মান্তরিত এ সমস্ত নতুন মুসলমানদের পক্ষে ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার কোন উপায় ছিল না। তাই কোন সময় সরাসরিভাবে কিংবা কোন সময় আরবী ফার্সী নামের আবরণে তারা হিন্দু ও বৌদ্ধদের কুসংস্কার সমূহকেই তাদের সামনে দেখতে পায় এবং এ সমস্ত আবার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তদুপরি শাসক গোষ্ঠীরা যে সমস্ত মত বিশ্বাস প্রচার করেন তা অন্যান্য মুসলমানদের মনকেও দ্বিধাহীন ভাবে পুরাতন বিশ্বাস, ক্ষতিকর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং যৌন উশৃংখলতাকে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য অনেকাংশে আগ্রহী করে তোলে। মুসলিম জনসাধারন কিভাবে হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা দেখানোর জন্য ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন যে, গাজী ও দক্ষিণা রায়ের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ বিষয়ে রচিত 'কালুগাজী ও চম্পাবতী' নামক পুঁথি এবং অনুরূপ অন্যান্য পুঁথি কাব্যে বাঘ সম্পর্কিত গীতি কবিতা বা বাঘের পাঁচালীতে আমরা দেখতে পাই যে, হিন্দু দেবী গঙ্গাকে গাজীর মাসী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ছেবুল মুলক শামা রুহু' কাব্যে দেখা যায় যে, মুসলিম কবি হিন্দুদের দেবীগণকে মুসলমানদের পীর রূপে দেখাবার চেষ্টা করেছেন।[১] তাই মুসলমান শাসক গোষ্ঠীর অবহেলা এবং হিন্দু কবি সাহিত্যিক ও ধর্ম পুরহিতগণের দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় যে পৌত্তলিকতাপূর্ণ আবহাওয়া এখানে সৃষ্টি হয়েছিল তার অনিবার্য পরিনতি হিসেবে বাংলার কিছু মুসলমান হিন্দু কুসংস্কারের প্রতি ক্রমে আকৃষ্ট ও বিশ্বাসী হয়ে উঠতে থাকে।[২]

বাংলার মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ও তামুদ্দুনিক এরূপ অধপতনের দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে। তাই মুসলমান নামধারী কিছু সংখ্যক নবাগত মুসলমানদের এরূপ ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস রাখা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার ছিল, কিন্তু সকল মুসলমানদের বেলায় ইহা প্রযোজ্য ছিলনা

১. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৮৩।

২. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ধর্ম ও সাংস্কৃতিকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করার এবং এই আদর্শের আদলে নিজেদেরকে গড়ে তুলার এই প্রবণতা শুধু মধ্য কবি সাহিত্যিকদের মধ্যেই সীমা বদ্ধ ছিল না, মুসলমানদের সামাজিক ক্রিয়া কলাপে ইহা প্রচলিত ও ক্রমশ প্রসার লাভ করছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিনতি হিসেবে জল দেবতা বরুন- পীর বদরে, গৌর চন্দ্র-চৈতন্য-গোরা চান্দ পীরে, ওলাই চন্ডী-ওলা বিবিতে, সত্য নারায়ন-সত্য পীরে, লক্ষীদেব মানিকতে রূপান্তরিত হন। আর এই রূপান্তরিত দেব দেবীগণ কতিপয় মুসলমানের নিকট তাদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা অব্যাহতভাবে পেতে থাকে।[১] তাই দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এভাবে হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে কিছু মুসলিম ইসলামী আকীদা বহির্ভূত ধ্যান ধারনা বিশ্বাস করতে থাকে। ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবের কারণে কিছু সংখ্যক মুসলমান হিন্দুদের দেব দেবীদেরকে মুসলিম পীরের সাথে মিশিয়ে ফেলে এবং তাদের অজ্ঞানতা প্রসূত এ সকল দেব দেবীর স্মরণ ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে কলুষিত করে তোলে। তাই বাংলায় ইসলাম ও মুসলমান নবাগত হওয়ায় বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

অপরদিকে চৈতন্যের প্রেম ও ভক্তির বৈষ্ণব ধর্ম দুদিক থেকে বাংলার মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্থ করে। প্রথমত সাম্প্রদায়িক পরিবেশকে বিনষ্ট করার কারণে পারস্পরিক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন হয়। ফলে ইসলাম প্রচারের গতিতে ও অগ্রযাত্রায় মন্থরতা দেখা দেয়। সাধারণ হিন্দুরা মুসলমানদেরকে শত্রু মনে করতে থাকে। এ অবস্থা একদিকে হিন্দুদের মধ্যে যেমন জাগরণের সৃষ্টি করে তেমনি অপর দিকে সাধারণ শ্রেনীর মুসলমানদের মধ্যে একটা হীনমন্যতা ভাবের সৃষ্টি করে। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রসারিত করার ব্যাপারে শাসক গোষ্ঠীর অবহেলা ও অনীহা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব থেকে বিদ্যমান ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করতে সক্ষম হয়নি। এদিকে সুফীদের প্রেম ও ভক্তির সাথে চৈতন্যের কৃষ্ণ প্রেম ভুল বশত মিশিয়ে ফেলে। তাই অচিরেই মুসলমানদের মধ্যে আউল, বাউল, কর্তাভজা, তান্ত্রিক সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্মের চর্চা শুরু হয়ে যায়।[২]

১. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৬।
২. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৭-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

এরফলে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের ফকীর সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তারা মারেফতকে শরীঅত হতে পৃথক করে ফেলে এবং শরীঅতের বিভিন্ন ব্যাপারে আরেকটি অর্ন্তনিহিত অর্থ বের করে

অতএব উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সহজিয়াদের প্রভাবে কিছু কিছু মুসলমানেরা নানা পাপ পংকিলতায় ডুবে যায়। নবাগত মুসলমানরা তাদের পূর্ব পরিচিত ও পূর্ব বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে পুনরায় বাউল তান্ত্রিক, সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্ম চর্চা শুরু করে। এরফলে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের সাধক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তারাই তান্ত্রিক সাধনায় প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে থাকে। শুধু তাই নয় তান্ত্রিকদের অশ্লিল ও অপরাধমূলক জঘন্য সাধন পদ্ধতি, বামাচারীদের নোংরা আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার, বিশ্বাস ও রীতি নীতি ইত্যাদি বাংগালী হিন্দু ও তান্ত্রিকদের প্রভাব বাংলায় প্রসার লাভ করে। এরফলে মুসলমানদের কিছু অংশ তাদের সংস্পর্শে আসলে তাদের মধ্যেও অশ্লীলতা, পরকীয় প্রেম, মাদক দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি প্রবেশ করে। সুতরাং এভাবে সুলতানী আমলে মুসলিম ধর্ম ও সমাজ কিছু সংখ্যক নামধারী নবাগত অশিক্ষিত মুসলমানদের অসামাজিক কার্যকলাপে মুসলিম সমাজ সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং মুসলিম অগ্রযাত্রায় বাধাগ্রস্থ হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু ইহা সমগ্র মুসলিম জাতিকে গ্রাস করতে পারেনি। অধিকাংশ মুসলমান তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূলনীতি, আদর্শ, শিক্ষা হতে বিন্দু মাত্র ও বিচ্যুত হয়নি। তারা তাদের ইসলামী আদর্শ ও আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাসকে সর্বদা সমোন্নত রেখেছে এবং ইসলামের জয় যাত্রাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক কতিপয় বিপথগামী, স্বার্থান্বেষী, উশৃংখল মুসলমান ইসলামী আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে, বিজাতীয়, বিধর্মীয় প্রভাবে লোভ লালসায় বিভ্রান্ত হয়ে, পাপাচার ধর্মীয় আচরনে টেনে এনে ইসলামের উপর কলংক লেপনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের এ চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়।

মুসলিম ধর্মীয় সমাজে এ সময় আরেকটি কুসংস্কার প্রবেশ করে তাহল সত্য পীর ভক্তি। এই ভক্তি পদ্ধতি ও মুসলমানদের পথ ভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। তাই সত্য পীর ভক্তি ও মতবাদ মুসলিম বাংলায় একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় কুসংস্কার। বাংলার দুটি সম্প্রদায়ের তথা হিন্দু ও

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের সামাজিক মেলামেশার ফলে এই মতবাদের উদ্ভব হয়। কিন্তু এতে ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সামাজিক সাম্যের প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পন্ডিতগণ মনে করেন যে, বাংলাদেশে সত্য নারায়ন বা সত্য পীরের পুথিগুলি আলোচনা করলে একথা বুঝা যায় যে, হিন্দুদের সত্য নারায়ন ও মুসলমানদের সত্যপীরের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলিম উভয় শ্রেণীর দ্বারাই এরা ভক্তি শ্রদ্ধা পেত।[১] ঐতিহাসিকরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, আনুমানিক ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের মধ্যে বাংলায় সত্যপীরের উদ্ভব হয়েছিল এবং হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কিছু লোকের যৌথ প্রচেষ্টায় যে সত্য পীরের উদ্ভব হয় তা অস্বীকার করা যায় না। এ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় "সত্যপীর নারায়ন দ্বি অংশ প্রকার"। মুসলমানদের ফকীর তত্ত্ব ও হিন্দুদের সত্য নারায়ন এই উভয় ধারণার সমন্বয়ে সত্য পীরের উৎপত্তি।[২]

কিন্তু রমেশ চন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে সত্যপীর ভক্তির প্রচলনের কোন প্রমাণ নেই।[৩] এ প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, সত্যপীর ভক্তি ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতকে উদ্ভব হলেও তৎকালীন সমাজে তেমন প্রচার ও প্রসার লাভ করেনি। হয়ত দুই শতাব্দীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় পরিশ্রমে ও প্রচারের ফলে ষোড়শ শতাব্দীর দিকে এর প্রচলন ব্যাপকতা লাভ করে। এরফলে হিন্দু ও মুসলিম সমাজে এর গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। তাই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ইহার উদ্ভব হলেও প্রচারের অভাবে কিংবা লোকের অগ্রহণ ও অনিহার কারণে হয়ত ইহা লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। তাই বলা যায় যে চতুর্দশ কিংবা ত্রয়োদশ শতকের দিকে সত্যপীর ভক্তির উদ্ভব হলেও কোন প্রচলন না থাকায় ষোড়শ শতাব্দীর দিকে এর প্রচলন শুরু হয়।

----

১. বাংলার লোক ধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯। বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩০।

২. বাংলার লোক ধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০।

৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগে হিন্দুরা যেমন সাধু সন্ন্যাসীদের ভক্তি শ্রদ্ধা করত এবং কখনো কখনো পূজা করত মুসলমানরাও অনুরূপভাবে সুফী দরবেশদেরকে ভক্তি করত এবং কোন কোন স্থানে তাদেরকে অলৌকিক ক্ষমতাবান মনে করে পীর আখ্যা দিয়ে ভক্তি করত । মধ্যযুগে সত্যপীর ভক্তি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল ।[১]

সমসাময়িক সাহিত্যে সত্যপীরের অলৌকিক ক্ষমতায় হিন্দু মুসলমানের সাধারণ বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায় । সাধারণ বিশ্বাস এই যে, সত্যপীরের আরাধনা করে ভক্ত যা চাবে তা সে পাবে । অন্য কথায় আরাধনার পূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে হিন্দুরা সত্যপীরকে গ্রহণ করে এবং এভাবে মূলত তারা মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব ও একেশ্বরবাদের আদর্শ অনুসরণ করে ।[২] সত্যপীরের ভক্তি অনুষ্ঠানে লোকেরা কাঠ দিয়ে পীরের আসন তৈরী করে এবং ফুল দিয়ে সাজায় । পূর্ণিমার দিন সত্যপীরের উদ্দেশ্যে তারা নানা ধরনের শিরনী দেয় । সাধক মন্ত্র পাঠ করে এবং এর পর লোকদের মধ্যে শিরনী বিতরণ করা হয় । বাংলাদেশে অনেক সত্যপীরের আস্তানা আছে, যেখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা নানা কারণে শিরনী মানত করে । সন্তান কামনায় অনুরূপ মানতের কথা কোথাও কোথাও শুনা যায় । সত্যপীর বা সত্য নারায়ন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম বাংলায় আজও পূজিত হয় ।[৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সত্যপীর ভক্তি তৎকালীন সময়ে মুসলিম বাংলায় বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল । সত্যপীরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে তাকে অর্ঘ দেয়া হত এবং তার দরবারে শিরনী মানত করা হত । ইহা ইসলামী দৃষ্টি কোন হতে সম্পূর্ণ অবৈধ এতে কিছু মুসলমান বিভ্রান্ত হয়েছে । এভাবে সত্যপীর পূজা বাঙ্গালী মুসলমানদের সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করার প্রয়াস পেয়েছে ।

----

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস", ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩০ ।

২. প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৩২০, পৃঃ ২৪, ২৮,৮১৯, উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮৯ ।

৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৮৯ । বাংলার লোক ধর্ম ও উৎসব পরিচিতি পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository

তবে ইসলামের অগ্র যাত্রাকে ব্যাহত করতে পারেনি । শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেই সে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে । অতএব সব শেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে, বিশ্বাস, মত ও আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ই যুগ যুগ ধরে এ দেশে সহাবস্থান করছে । এ দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে দীর্ঘ দিনের কুসংস্কার কৌলিন্য প্রথার দুর্বিসহ যন্ত্রনা, পাপ পংকিলতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলনে জাগরণ সৃষ্টি করে । ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় মুসলমানদের উচ্চতর মর্যাদা সাম্য ও আদর্শ হিন্দু সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে এবং এরফলে হিন্দুদের ধর্মীয় আবরণে বর্ণ প্রথার কিছুটা রহিত হয় । শুধু তাই নয় সে সময় হিন্দু ব্রাহ্মন্যবাদী বৌদ্ধ সহজিয়া বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকদের পাপাচার হিন্দু ধর্মীয় সমাজের কিছু অংশ যে ব্যাপকভাবে কলুষিত করে ফেলিছিল তাও মুসলমানদের প্রভাবে ও সংস্পর্শে তাদেরকে কিছুটা নাড়া দিতে সমর্থ হয় এবং কিছুটা দূরি করার প্রয়াস পায় । এ ছাড়া মুসলিম শাসনামলে অনেক প্রকার কুসংস্কার দেশ হতে দূরীভূত হয় । মদ্য পান জুয়ো খেলা, প্রভৃতি খারাপ কাজ বেআইনী ঘোষিত হয়, মুসলিম আইনের কঠোর বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় । আবার অপরদিকে হিন্দু বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকদের সংস্পর্শে মুসলমানরাও সাময়িকভাবে বিভ্রান্তি মূলক অবস্থায় পড়ে । অধিকাংশ মুসলিমদের আকীদা, বিশ্বাস, আদর্শ ও ধর্মকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারেনি । তারা সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে বরং বিপথগামীদের মুকাবেলা করেছে । তাই কিছু সংখ্যক নামধারী মুসলিম বিপথগামী হলেও তা সকল মুসলমানের উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি । সমগ্র মুসলিম সমাজের কিছু সংখ্যক বিপথগামীদের কারণে অধপতিত হয়েছে বলা যায় না এবং তাদের দোষে দুষ্ট হয়েছে মেনে নেয়া যায় না ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ-মুগল আমলে (১৫৭৬-১৭১৭) বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা (হিন্দু ও মুসলিম) ঃ-

বাংলাদেশে সুলতানী শাসনামলে ধর্মান্তরীকরণের ফলে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার, অমানুষিক ব্যবহার এর কারণে ইসলাম ধর্মের উদারতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, পীর, ফকির, দরবেশদের আধ্যাত্মবাদ ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দু সমাজের মধ্যে ধর্মান্তরীকরণের যে ধারা চলছিল তা মুগল যুগেও অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে পূর্ব বঙ্গকে মুগল শাসনের অন্তর্ভুক্ত করার কারণে ঢাকা মুগল সুবাদারের রাজধানী ও সরকারী কর্মকান্ডের কেন্দ্রে পরিনত হয়। এ সময় হতে পূর্ব বঙ্গে ধর্মান্তরিকরণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বৌদ্ধ ধর্ম ও তন্ত্র মন্ত্রের দেশ পূর্ব বঙ্গের হিন্দু সমাজে ইসলাম ধর্ম প্রবল বেগে প্রচার ও প্রসার লাভ করতে থাকে ফলে মুসলমানদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১] শুধু তাই নয় অসংখ্য বহিরাগত মুসলমান ও এই সময় বাংলাদেশে আসতে থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই সরকারী চাকুরী নিয়ে, কেউ বা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, কেউ সৈনিক হয়ে এখানে আগমন করত। পীর, ফকির, দরবেশদের সাথে যেমন অসংখ্য মুসলিম শিষ্য বাংলায় আসত, তেমনি আসত রাজ শক্তির সাথে। অনেকে দিল্লী ও আগ্রা এবং অন্যান্য স্থান হতে বিতাড়িত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করত। মুসলিম বিজয়ের সাথে সাথে অসংখ্য মুগল, পাঠান ও অন্যান্য জাতির মুসলমানরা বাংলায় প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস শুরু করে। ঐতিহাসিক বেনী প্রসাদ ও ইংরেজ লেখক হান্টার উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ব বাংলা এক সময় পাঠানদের আড্ডায় ভরে যায়। আরব, ইরান, এশিয়া মাইনর, আবিসিনিয়া ও মধ্য এশিয়া হতে অসংখ্য রাজ দরবারে রাজকীয় পদ লাভের জন্য আগমন করে। তারা স্থানীয় অধিবাসিদের সাথে মিশে এক নতুন জাতি (মুসলিম) ও সমাজ সৃষ্টি করেছিল।[২]

---

১. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" (কলিকাতা ১৯৮৩) ৩য় খন্ড, ১ম পর্ব, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩২।

২. পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙ্গালী, জাতীয়তাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩২-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুগল আমলে বাংলার সমাজ ধর্মীয় ভিত্তিতে দুভাগে বিভক্ত ছিল, যেমন-হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দু আইন অনুসারে হিন্দু সমাজ এবং মুসলিম আইন অনুসারে মুসলিম সমাজ শাসিত হত। সমাজে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা মুগল শাসনের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।[১] সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগ হতে অষ্টাদশ শতকের শুরু পর্যন্ত বাংলার সামাজিক জীবন বিকাশের ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।[২] নিম্নে মুগল আমলে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

হিন্দু সমাজ :-

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামল ছিল হিন্দু সমাজ জীবনের গঠন পর্ব। মুসলমানদের ঔদার্য, ভ্রাতৃত্ব ও সরলতার প্রভাব হিন্দু সমাজে বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলে এবং কুসংস্কারের মূলে আঘাত করে। তাই ইসলামের প্রসার রোধ করে স্বীয় সমাজকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দুগণ স্বীয় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এরফলে তাদের মধ্যে দু ধরনের সংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠে। একদল পুরানো ঐতিহ্যকে আকড়িয়ে ধরে, অপর দল উদার নৈতিকভাব ধারায় সামাজিক পূর্নবিন্যাস এর মত গ্রহণ করে। বাংলার মুসলিম শাসনামলের প্রাথমিক যুগে এই সংস্কার কাজ শুরু হয় এবং মুগল আমলে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করে।[৩]

এ সময় হিন্দুগণ ব্রাহ্মন, কায়স্থ, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত ছিল। এ ছাড়া হিন্দু সমাজ বহু বর্ণে ও উপবর্ণে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন বর্ণে ও উপবর্ণের মধ্যে আচার আচরণে, মেলা মেশায় সামাজিক বাধা নিষেধ থাকায় পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিকতা নিষিদ্ধ ছিল।

---

১. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ৫৫৩।
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খন্ড, ১ম পর্ব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২।
৩. ডঃ আব্দুর রহিম, "বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস" (১৫৭৬-১৭৫৭) (ঢাকা-১৯৮২), ২য় খন্ড, অনুবাদক, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি, ১ম প্রকাশ বাংলা একাডেমি, পৃঃ ৪১২।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে ব্রাহ্মনদের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার ছিল । তবে মুসলিম শাসকদের উদারতার জন্য সকল শ্রেণীর হিন্দুর সমান সুযোগ সুবিধা,অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ব্রাহ্মনদের একচেটিয়া প্রাধান্য খর্ব হয় । হিন্দু শাসনকালে ব্রাহ্মনগণ ধর্ম শিক্ষা, উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্তির ক্ষেত্রে একচেটিয়া সুযোগ লাভ করত । কিন্তু মুগল শাসকগণ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা ও চাকুরীতে সমান সুযোগ প্রদান করে । এই প্রতিযোগীতায় বিশেষ করে হিন্দু কায়স্থরা তাদের শিক্ষা দীক্ষা, অর্থ ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রীয় উচ্চ পর্যায়ে চাকুরী পেতে থাকে ও সাথে সাথে অবস্থার ও উন্নতি করে । এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্রাহ্মনরা টিকতে না পেরে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে থাকে ।তাদের পেশা সমাজে তাদের স্থান নির্দেশ করত ।[১] সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একাধিপত্যের সুযোগ সুবিধা হারিয়ে ব্রাহ্মনরা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে । তাদের পেশার ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে । কবি মুকুন্দ রাম উল্লেখ করেছেন যে, একটি মহল্লাকে বলা হয় কুলস্থান(অভিজাতদের স্থান) যেখানে রাঢ় ব্রাহ্মনগণ তাদের টোল ও মন্দির নিয়ে জীবন যাপন করতে থাকে ।অশিক্ষিত ব্রাহ্মনরাও এখানে বসবাস করে । তারা পুরহিত হিসেবে কাজ করে এবং পূজার আচার অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা দেয় । তারা তাদের কপালে চন্দন ফোটা ও তিলক চিহ্ন দেয় । তারা মূর্তি পূজা করত । মৃতদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে গ্রাম্য পুরোহিতরা প্রতিনিধিত্ব করত । বিবাহ উৎসবাদিও পরিচালনা করত । মন্ত্র পাঠ শেষে ব্রাহ্মন দক্ষিনা দাবী করত । কাপড়ের আচলে ভিক্ষাপ্রাপ্ত চালের পুটলি নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরত । বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত এই ব্রাহ্মনগণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বাধা নিষেধ ছিল

আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মন ছিল দৈবজ্ঞ গণক শ্রেণীর । তারা শিশুর কোষ্ঠী তৈরী করত এবং গ্রহ দোষ কাটাইবার জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করত । তারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে লোকদের ভাগ্য এবং কুষ্ঠী গননা করত । পেশাগত দিক থেকে আরেক শ্রেণী ব্রাহ্মন ছিলেন চিকিৎসক যারা বৈদ্য নামে পরিচিত । তারা সাধারণত ঔষধপত্র সেবনের ব্যবস্থা করতেন । আবার কেহ ঝাড় ফুক ও তন্ত্র মন্ত্রের সাহায্যে রোগের উপশম করতেন । বৈদ্যদের মধ্যে বর্তমান কালের মত সে সময় দাস, গুপ্ত, দত্ত, কর ইত্যাদি পদবী গ্রহণ করত ।[৩] মুগল শাসনামলে শ্রেণীগত দিক হতে বৈদ্যগণ

---

১. ডঃআব্দুর রহিম,বাংলার সামাজিকও সাংস্কৃতিক ইতিহাস(১৫৭৬-১৭৫৭)(ঢাকা-১৯৮২)২য় খন্ড অনুবাদক,মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি,১ম প্রকাশ বাংলা একাডেমি,পৃঃ৪১২ ।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ৩৯২-৩৩৯। ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪১৩ ।

৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস,২য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ২৮২-৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান চর্চা ও মনন শীলতার ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ করে । বস্তুত জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তির জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে ।[১] মুকুন্দরাম তৎকালীন সময়ের আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মনের উল্লেখ করেছেন । তাদেরকে অগ্রদানী ব্রাহ্মন বলা হত । তারা নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মন,তারা শহরে এক কোনায় বৈদ্যদের আবাস স্থলের জায়গায় বাস করত । অগ্রদানী ব্রাহ্মনেরা শ্রাদ্ধের সময় পৌরহিত্য করত । কবি মুকুন্দরাম আরো উল্লেখ করেছেন যে , তার মতে রাঢ় ও বরেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মনগণ সমাজে কুলীন বলে বিবেচিত হতেন । রাঢ়ীয় ব্রাহ্মনগণ রাঢ় নামে আখ্যায়িত পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী । কুলীন ব্রাহ্মনের মধ্যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মনগণ সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করত ।[২]

সামাজিক মর্যাদানুসারে হিন্দু ব্রাহ্মন সমাজ কুলীন ও অকুলীন এই দুইভাবে বিভক্ত ছিল । কুলীন ব্রাহ্মনগণ চট্টপাধ্যায়, চক্রবর্তী, মুখোপাধ্যায়, মুখার্জী, বন্দোপাধ্যায়, ব্যানার্জী,গাঙ্গুলী, ঘোষাল, প্রভৃতি পদবী গ্রহণ করত ।[৩] এদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মন ছিলেন যেমন-চৌচার্সী, পমাসী, দিঘারী, মতিলাল, পিপলাই, পীতমাউন্দ, ঝিকরারী, পালধি, মাগচটক সামামান্দ, ঘুমন্দি, বরাস, করিয়াম, সিনামার, কুলিয়াম ইত্যাদি । বাংলায় কর্ণাটক ও দাক্ষিনাত্যে, দিনগাছী, কারাঠী, দানবী, ভুরিস্থল, নান্দগে, শীতামসী প্রভৃতি আরো অনেক ব্রাহ্মন ছিল ।[৪] অকুলীনদের মধ্যে কুম্ভকার, কর্মকার, চামার, মুচি, ডোম,চাষা সূতার,প্রভৃতি ছিল ।[৫] অষ্টাদশ শতকের কবি ভারত চন্দ্রের লেখাতেও ব্রাহ্মন সমাজের পেশা ও জীবনের অনুরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে । নবদ্বীপের অধিবাসীদের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ব্রাহ্মনগণ নগরের এক অঞ্চলে বাস করত এবং পঠন পাঠন ও ধর্ম সংক্রান্ত নানা পেশায় নিযুক্ত থাকত । কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মন দেব দর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষা লাভ করত এবং কেউ কেউ

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,২য় খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ৪১৪ ।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৪-১৫ ।
৩. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫৩ ।
৪. মুকুন্দরাম, মনসা মঙ্গল, পৃঃ ৩৪৭-৪৮ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস. ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত পৃঃ ৪১৫ ।
৫. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি পরিচালনা করত । বৈদ্যগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে মনোনিবেশ করত ।[১]

ব্রাহ্মনদের মত কায়স্থদের মধ্যেও কুলীন ও শ্রেণীভেদ প্রথা ছিল । কায়স্থদের মধ্যে সকল পরিবার ঘোষ, বসু, মিত্র, উপাধি ধারন করত । তারা কুলিন বলে বিবেচিত হত । এ ছাড়া যে সমস্ত কায়স্থরা পাল, পালিত নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, বিষ্ণু, রাহা, বিনদ, উপাধি ধারণ করত তারা নিজকে গৌরব বোধ করত ।[২] মুগল শাসনামলে বাংলায় কায়স্থরা বিদ্যাবুদ্ধির দিক দিয়ে সমৃদ্ধ জীবন যাপন করত । সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুগল যুগ ছিল কায়স্থদের জন্য প্রকৃত পক্ষে উত্থান ও অগ্রাধিকারের যুগ । সে সময় তুলনামূলকভাবে ব্রাহ্মনগণ প্রতিযোগিতায় কিছুটা পিছনে পড়ে যায় । বাংলায় স্বাধীন সুলতানদে আমল হতে কায়স্থদের উত্থানের সূচনা হয় ।[৩] সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কায়স্থ দের প্রভাব ও প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় । বড় বড় জমিদার ভূস্বামী প্রায় সকলেই কায়স্থদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।[৪] তবে মুগলদের দীর্ঘ শাসনকালের শেষ দিকে তাদের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পায় । তার কারণ মুগল বাদশাগণ এই প্রদেশের শাসন কাজের জন্য মুসলিম কর্মচারী নিয়োগের নীতি অনুসরণ করেন । ফলে উচ্চ পদে নিযুক্ত কর্মচারী তালিকায় হিন্দু বা কায়স্থদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়তে পরিণত হয় ।[৫] এবং মুসলমান দের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । এভাবে কায়স্থরাও রাজ কার্য ও উচ্চপদ হতে তথা রাজন্য বর্গের আশীর্বাদ হতে দূরে সরে যায় ।

মুগল শাসনামলে দেখা যায় যে, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা যারা সমাজের এক বৃহদাংশ তারাও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল । তারা শহর বা পল্লী অঞ্চলে নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করত । স্বীয় পেশার ভিত্তিতে সমাজে তাদের স্থান নির্ধারিত হত । গোপগণ কৃষি কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ

---

১. ভারত চন্দ্র, অন্নদা মঙ্গল, উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৫ ।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৩ ।

৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৬,৩০৯ । ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৬ ।

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪ ।

৫. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

করত । গোয়ালা জাতীয় এক শ্রেণীর গোপ, তারা দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা করত । গোয়ালাদের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী তেলীরা তৈলের ব্যবসা করত । অনুরূপভাবে কাঁসার, কুম্ভকার, তাম্বুলী (পান, সুপারীর ব্যবসায়ী) তন্তুবায় (বস্ত্র বয়নকারী) মালী, বারুই এবং নাপিতরা বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করত ।[১] ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, বৈদ্য ও কায়স্থরা বাংলার হিন্দু সমাজের একটি পৃথক স্তর তৈরী করেছিল । এরা তখন ও শুদ্র বলে বিবেচিত হত ঠিক, তবে এরূপ স্বর্ন বণিক ও কারিগর থেকে কিছুটা দূরে সরে এসেছিল । বাংলার হিন্দু সমাজে শুদ্ররাই সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল । এদেরকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় যেমন, উত্তম সংকর বা জলচর শুদ্র, মধ্যম সংকর বা জল অচল শুদ্র এবং অধম সংকর বা অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য শুদ্র । উত্তম সংকর শুদ্রের মধ্যে গন্য করা হয় বৈদ্য, কায়স্থ ও নব শাখ । এই নব শাখরা নয়টি ব্যবসায়ী ও কারিগর বর্গে বিভক্ত যথা-গোপী, মালী, তাম্বুলী, তাঁতী, শাখারী, কাঁসারী, কুম্ভকার, কর্মকার ও নাপিত । গঙ্গারাম ও ভারত চন্দ্র উভয়ই নবশাখদের কথা উল্লেখ করেছেন । এদের নিম্নে ছিল মধ্যম সংকর বা জল অচল শুদ্র । এরা হল যেমন কৈর্বত, মহিষ্য, আগুরি, সুবর্ণ বণিক, সাহা, শুড়ি, গন্ধ বণিক, বারুই, ময়রা, বা মোদক, তেলি, কলু, জেলে, ধোপা ইত্যাদি । অধম শুদ্র বা সমাজের একে বারে সর্বনিম্নে ছিল যুগী, চন্ডাল, নমশুদ্র, পোদ, চামার, মুচি, হাড়ি, ডোম, বাউরি, বাগদি, প্রভৃতি জাতি এরা সংকর জাতি বা অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতি ।[১] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মুগল শাসনামলে হিন্দু সমাজে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ছিল । এদের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ছিল না । এভাবে শ্রেণীভেদ প্রকট হয়ে দাঁড়ায় ।

চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের ফলে সমাজের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রন ভার অনেকাংশে ব্রাহ্মনদের হাতে চলে যায় । কিন্তু পরবর্তী মুগল শাসনামলে বৈষ্ণব সমাজে যারা গুরুর আসন অধিকার করেছিলেন তাদের কেউ কেউ ব্রাহ্মন ছিলেন না । যেমন- নরোত্তম ও শ্যামানন্দ । হিন্দু সমাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এই যুগে অনেক কুলশ্রী বৈষ্ণব .. গুরু বলে গৃহীত হয়েছিলেন । অদ্বৈত গৃহিনী, সীতা দেবী, নিত্যানন্দের ছোট পত্নী, জাহ্নবী দেবী, শ্রী নিবাস আচার্যের কণ্যা হেমলতা ঠাকুরানী-ইত্যাদি বৈষ্ণব সমাজে

---

১. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, "প্রাক পলাশী বাংলা সামাজিক ও আর্থিক জীবন (১৭০০-১৭৫৫ (কলিকাতা ১৯৮২) ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

এক বড় অংশ এ সময় এদের নির্দেশেই পরিচালিত হত । এরা বৈষ্ণব সমাজের যেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করেছিলেন তেমনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাইরেও সম্মান লাভ করে অবরুদ্ধ হিন্দু সমাজকে মুক্ত করেছিলেন । এরফলে হিন্দু সমাজে বৈষ্ণব প্রভাবের কারণে শ্রেণীভেদ প্রথা অনেকাংশ শিথিল হয়ে পড়েছিল ।[১]

সুলতানী শাসনামলে যেমন জাতী, গোত্র, বর্ণ ও কৌলিন্য প্রথার দ্বারা হিন্দু সমাজ নিমজ্জিত ছিল, তেমনি মুগল শাসনামলেও এসব হিন্দুদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন ছিল । জাতি ভেদ প্রথাও সে সময় হিন্দু সমাজকে পঙ্গু করে দিয়েছিল ।[২]

অতএব আমরা বলতে পারি যে, মুগল শাসনামলে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজ বিভিন্ন বর্ণে উপবর্ণে ও শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল । ব্রাহ্মন, কায়স্থ, বৈশ্য, শুদ্র এরাই ছিল উচ্চশ্রেণীর এবং নিম্ন শ্রেণীর যারা ছিল তারা সবত্র অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হত । হিন্দু সমাজ তখন বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে তথা বৈষ্ণব, সহজিয়া, তান্ত্রিক মতবাদের চর্চা করে সামাজিক অবস্থাকে কলুষিত করে ফেলে । অর্থাৎ সুলতানী শাসনামলের ন্যায় পরকীয়া প্রেম, অশ্লীলতা ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানাদির অঙ্গ হয়ে পড়ে । এ সমস্ত কুসংস্কার ও অশ্লীল কাজ হতে মুক্তি দিতে যদিও সুলতানী যুগে আবির্ভূত চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মমত প্রবর্তন করে সংস্কার আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে আসে এবং মুগল যুগেও যা অব্যাহতি ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই কলুষিত হয়ে পড়ে ও নৈতিক চরিত্রের সংখলন ও শৈথিল্য দেখা দেয় । মুগল শাসনামলে তাই সংস্কার আন্দোলন খুব একটা ফলপ্রসু হয়নি ।

সুলতানী শাসনামলের ন্যায় মুগল শাসন যুগেও হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এরফলে বালবিধবার সংখ্যাও অনেক ছিল । হিন্দু সমাজে গৌরীদান অর্থাৎ অনূর্ধ আট বছরের মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু ছিল । বার বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে দিতেই হত, অন্যথায় সামাজিক নিন্দা, পাপ ও অকল্যানের ভয় ছিল । তবু কুলীন ঘরে বয়স্কা মেয়ে দেখা যেত ।

---

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪,৩৬ ।
২. সুন্দর বনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১০ ।

Dhaka University Institutional Repository

র‍্যালফ ফিচ উল্লেখ করেছেন যে, দশ বছরের বালকের সাথে পাঁচ বছরের বালিকার বিয়ে চালু ছিল।[১] সামাজিক বিধি অনুসারে বয়স্কা নারীর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং এই সকল নারীদের পিতা মাতা সমাজে ঘৃনিত ও নিন্দিত হত। বিবাহের ব্যাপারে মেয়েদের কোন প্রকার সম্মতির বা মতামতের গুরুত্ব দেয়া হত না। বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রীয় মতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সমাজে বিধবাদের কোন মর্যাদা ছিলনা। কোন অনুষ্ঠানে তারা উপস্থিত হলে তাদেরকে কুলক্ষন ও অপাংক্তেয় বলে মনে করা হত। বিধবা নারীদের পদে পদে যাতনার স্বীকার হতে হত। হিন্দু সমাজে মেয়েদের পৈতৃক কিংবা স্বামীর সম্পত্তির উপর কোন প্রকার অধিকার ছিল না, ফলে তাদেরকে পিতা, স্বামী, ভাই কিংবা সন্তানের অনুগ্রহের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে হত।[২] বাল্য বিবাহের কারণে সমাজে বিধবার সংখ্যা অনেক ছিল। বর্তমান কালের বিধবাদের মত তাদের বেশ ভূষায় নিয়ন্ত্রণ ছিল। একাদশীতে বৃদ্ধা, বালিকা সকল বিধবাদেরকেই একেবারে উপবাসী থাকতে হত এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রনের কঠোর বেড়া জালে আবদ্ধ থাকতে হত। তবে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বিধবাদের সম্পর্কে দুটি সামাজিক সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল।

কুলীনদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। জনৈক কুলনী সম্পর্কে একটি কথা প্রচলন আছে যে, তার তিন পুত্রের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে পঞ্চাশ, পয়ত্রিশ, ও চল্লিশ জন। এক্ষেত্রে স্ত্রীরা প্রায়ই পিত্রালয়ে বাস করত।[৩] কোন কোন কুলীন পঞ্চাশ, ষাট, বা ততোধিক বিয়ে করত। অথবা অশতিপর বৃদ্ধের সাথে পিসী, ভাইঝী, সম্পর্কিত দশ হতে ষাট বছরের বয়স্কা বিশ হতে পঁচিশটি অনূঢ়া মেয়ের সাথে বিয়ে হয়েছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিংশ শতাব্দীতেও দেখা গেছে।[৪]

---

১. ইংল্যান্ড পায়নার স ইন ইন্ডিয়া, সম্পাদনা জে, হার্টন, লিলি, পৃঃ ৯৫-৯৬। উদ্ধৃত, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০৪৯-৫০।
২. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ৫৫৩-৫৪।
৩. সুন্দর বনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯০।
৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকেও এই বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল । এ থেকে বুঝা যায় যে, মুগল শাসনামলে হিন্দু সমাজে নারীদের কোন মর্যাদা ও অধিকার ছিল না । তারা সর্বদা অবহেলিত ও অধপতিত ছিল । নারীরা দাসীদের মত ব্যবহৃত হত । স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে মনে করত । তাদের কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না ।

ভারত বর্ষে হিন্দু সমাজে নারীদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল । স্বামীদের চিতায় হিন্দু রমনীদের সহমরন প্রথার সন্ধান বাংলাদেশেও পাওয়া যায় । এ ক্ষেত্রে কোন কোন নারী স্বেচ্ছায় তার স্বামীর চিতায় ঝাপ দিয়ে মরত । আবার অনেক সময় ধর্মের নামে জোর করে বাধ্য করে চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারত । সতী প্রথাটি বাংলাদেশে নিয়মিত সামাজিক প্রথা হিসেবে ছিল না । ইহা ছিল অনেকটা স্বেচ্ছামূলক । সুলতানী শাসনামলে এই প্রথার প্রচলন ছিল ।

মুগল শাসনামলে বিশেষ করে সম্রাট শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সময় এই সতীদাহ প্রথার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় । ১৬৬৯ সালে টমাস বাউরী বাংলা ভ্রমনে এসে তিনি হুগলী নদীর তীরে দুজন নারীকে তাদের স্বামীদের চিতার আগুনে জবর দস্তী মূলক পোড়াতে দেখেছেন । তিনি এ রকম একটি ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, চিতার আগুনে অগ্নি সংযোগের পূর্বে এ সমস্ত দুর্বৃত্ত দুরাত্মাগন নারীকে তার মৃত স্বামীর দেহের উপর জোর পূর্বক শুইয়ে দিত । সে মহিলা উঠে আসার চেষ্টা করত এবং অগ্নিদগ্ধ হতে নিদারুনভাবে অস্বীকার করত। কিন্তু তারা শুইয়ে রাখা নারীকে কঠোর ভাবে দাবিয়ে রাখে যতক্ষন পর্যন্ত তার সমস্ত দেহে আগুন না লাগে এবং সে উঠতে অসমর্থ না হওয়া পর্যন্ত তারা তাকে পোড়াতে থাকে । অতপর বেচারা মহিলা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করে । আর একটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, স্ত্রী লোকটি তার স্বামীর চিতার আগুনে প্রবেশ করতে দারুনভাবে অস্বীকার করে, এতে ব্রাহ্মনগণ শক্তি প্রয়োগ করে । কিন্তু সে প্রথম ব্রাহ্মনকে ধরে ফেলে যে তার উপর বল প্রয়োগের চেষ্টা করেছিল । অতপর সে ব্রাহ্মন সহ আগুনের মধ্যে ঝাপ দেয় এবং তারা উভয়েই আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করে ।[১]

---

১. টমাস বাউরী, ডায়েরী, পৃঃ ২০৪, উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৬-৩৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

মুগল সম্রাটগণ এই নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথা তুলে দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রজাগণের দীর্ঘ দিনের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি নীতিতে সরাসরি বাধা দিতে চাননি । তবু ও মৃত স্বামীর চিতায় নারীদেরকে জবর দস্তীমূলক মরনকে বাধা দেওয়ার নীতি অনুসরন করেন । সম্রাট নির্দেশ জারী করেন যে, সরকারের বিনানুমতিতে সতীদাহ করা যাবেনা । কোন রমনীকে তার সম্মতি ব্যতীত সহমরণে বাধ্য করা যাবে না । স্থানীয় প্রশাসনকে সিদ্ধান্ত নিতে হত যে মহিলাটি কি স্বেচ্ছায় সতী হওয়ার ইচ্ছা করছে না তাকে বাধ্য করা হচ্ছে । অতএব সতীদাহ প্রথার মত নিষ্ঠুর ও অমানবিক প্রথা যা সুলতানী শাসনামলের মত মুগল শাসনামলে ও সংঘটিত হয়েছে । মুগল সম্রাটগণ এই নিষ্ঠুর ও অমানবিক প্রথা দূর করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রহিত করতে পারেন নি । হিন্দু সমাজ এমনভাবে কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিল যে, হত্যার মত জঘন্যতম কাজ তারা সামাজিক আবরণে ও সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েই করে এসেছে । কিন্তু প্রতিকারের কোন চিন্তা করেনি বরং এর দ্বারা সতী রমনীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিরাট সামাজিক মর্যাদাই লাভ করত । তাই হিন্দু সমাজ তখন এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল যে হত্যার মত জঘন্যতম অপরাধ বিনা দ্বিধায় করত ।

দাস প্রথা হিন্দু ও মুসলিম আমলে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশেও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । মূর ল্যান্ড উল্লেখ করেছেন যে, দাস প্রথাকে অবশ্যই হিন্দুদের একটি প্রথা বলে মেনে নিতে হবে । সুলতানী শাসনামলে তথা চতুর্দশ ,পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয় নগর রাজ্যে দাস প্রথার প্রচলন দেখা যায় এবং পর্যটক আবদুল রাজ্জাক ও বারবোসার বর্ণনায় ও এর সমর্থন পাওয়া যায় । আবুল ফজলের আকবর নামা ও আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ হয়েছে যে, মুগল আমলে বাংলাদেশে দাসত্ব প্রথার প্রচলন ছিল । সম্রাট আকবর ও অন্যান্য সম্রাটদের সময় অনেক হিন্দু রাজা জমিদার ও অভিজাত ধনী ব্যক্তিদের গৃহকাজে ক্রীত দাস রাখতে দেখা যায় ।[১] অনেক সময় কোন কোন যুবতী মেয়েদেরকে গৃহ কর্তার উপপত্নী হিসেবেও জীবন যাপন করতে হত ।[২] যুদ্ধ বন্দীদেরকে দাসে পরিনত করা ছিল একটি প্রচলিত রীতি

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৮ ।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আকবর তাঁর শাসনামলে প্রথম দিকে এরূপ ধৃত লোকদেরকে দাসত্বে পরিনত করার রীতি বন্ধ করতে আদেশ দেন । আবুল ফজলের মতে আকবরের এই আদেশ দ্বারা দাসত্ব প্রথা রহিত হয় ।[১] কিন্তু অন্যান্য সূত্র হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ধৃত ব্যক্তিদেরেকে দাসত্বে পরিণত করার রীতি তাঁর উত্তরাধিকারীদের সময়েও প্রচলন ছিল । এ ছাড়া চরম আর্থিক সংকটে পড়ে পিতা মাতা তাদের সন্তানদেরকে দাস রূপে বিক্রয় করত ।

পোশাক পরিচ্ছদের দিক দিয়ে বাঙালী হিন্দু পুরুষেরা ধুতি ও চাদর পরত । মেয়েরা সাধারণত খালি গায়ে শাড়ী পরিধান করত । বিলাসী হিন্দু পুরুষগণ রূপা ও ভেলভেটের জুতা, কানে সোনার অলংকার এবং তসরের বস্ত্র পরিধান করত । ধনীরা বর্তমানে কোটের ন্যায় অঙ্গরাখা ও পাগরী পরত । কোমরে পুরুষেরা পটুকার ও স্ত্রী লোকেরা নীবি বন্ধ পরত । দরবারের পোশাক ছিল ইজার, কোমর বন্দ, কাবাই ইত্যাদি । গরীবেরা কোমরে নেংটি পরত । অবস্থা সম্পন্ন ঘরের মেয়েরা বিভিন্ন রঙের রেশমী শাড়ী পরত । কোন কোন মেয়েরা পৌরানিক পালার ছবি আঁকা কাঁচুলি ও ওড়না পরত । গোসলের সময় মেয়েরা হলুদ, কুমকুম দিয়ে শরীর এবং আমলকী দিয়ে মাথা পরিস্কার করত । এরপর ধূপ দিয়ে চুল শুকাইত এবং চন্দন দিয়ে শরীর লেপন করত । সধবা মেয়েরা শাখা, সিঁদুর, কাজল ব্যবহার করত । বাঙালী হিন্দু মেয়েরা বহু বিধ অলংকার ও ব্যবহার করত । যেমন নথ, সিথি হার, কানবালা, অনন্ত, চক্রবল্লী খাড়ু, বাজু, শাঁখা, তাবিচ কবচ, জসম, রতনচূড় ইত্যাদি ধনী ঘরের মেয়েরা ব্যবহার করত । এসব অলংকার স্বর্ণ, রৌপ্য, ও হাতীর দাঁত দ্বারা তৈরী হত এবং তা মনি মানিক্য দ্বারা খচিত হত ।[২] অতএব এতে দেখা যাচ্ছে যে, মুগল শাসনামলে হিন্দু নর নারীরা যে সমস্ত পোশাক পরিচ্ছদ অলংকার অন্যান্য যা কিছু ব্যবহার করত তা সুলতানী আমলের সাথে মিল খুজে পাওয়া যায়, এতদিন পরও এর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না ।

----

১. আকবর নামা ২য় খন্ড, অনূদিত, পৃঃ ২৪৬ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৯ ।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৭-৮ । বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৫৫ । মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০১ ।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সমাজ ঃ

বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পর হতে মুসলিম সমাজের যে জয় যাত্রা শুরু হয়েছিল মুগল শাসনামলে সে জয় যাত্রা আরো ব্যাপকতর হয়। এ সময় মুসলিমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে কেননা এ সময় আরব, ইরান, তুর্কী, আফগান, ইত্যাদি অঞ্চল হতে অসংখ্য ব্যবসায়ী বণিক ব্যবসার উদ্দেশ্যে আগমন করে ও শহর বন্দরে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলে। শুধু তাই নয় পীর, দরবেশ, ফকিরেরা বহু সংখ্যক শিষ্য সমেত এ দেশে খানকাহ, দরগাহ, মসজিদ, মাদ্রাসা, প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম প্রচার করে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে এবং দিল্লী আগ্রা ইত্যাদি অঞ্চল হতে বিদ্রোহী মুসলিমরা বিতাড়িত হয়ে বাংলায় আশ্রয় নিয়েছে, এমনকি বহু সংখ্যক সৈন্য যারা এ দেশে এসেছে, তারা এ দেশের সৌন্দর্য, প্রাচুর্যের লোভে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ইত্যাদি কারণে বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এর সাথে সাথে সামাজিক ক্রিয়া কলাপ ও বিধি বিধান সারা বাংলায় প্রসারিত হয়। মুসলিম সমাজ গঠনের ফলে মুসলিম শাসকগণ দেশে ইসলামী আইন কানুন প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানরা মুসলিম আইন কানুন এর উপর জীবন পরিচালনা করে এবং হিন্দুরা তাদের সাম্প্রদায়িক বিধি বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে থাকে।

ধর্ম, মৌলিক বিশ্বাস, সৃষ্টা, আচার, অনুষ্ঠানাদি, ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম কানুন ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু সমাজ হতে মুসলিম সমাজ সম্পূর্ন পৃথক। মুগল শাসনামলেও মুসলিম সমাজে হিন্দু সমাজের মত কট্টর শ্রেণী বিভেদ ও উচ্চ নীচুর কোন প্রভেদ ছিল না। কৌলিন্য প্রথা ও জাতিভেদের কোন প্রকার প্রশ্রয় ছিল না। মানুষ হিসেবে সকলেই সমান বলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু হিন্দু সমাজ মানুষের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের মত সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিল। উচ্চ নীচের প্রভেদ সৃষ্টি করে মানুষ মানুষকে হেয় করেছে, অত্যাচার, নীপিড়ন করেছে। মুসলিম সমাজ এ সকল গোত্র বর্ণ জাতি কৌলিন্যের অবসান ঘটিয়ে সমস্ত কুসংস্কার, লৌকিকতা, জড়বাদ এবং যুক্তিহীন, অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের সমাজ (ইসলাম) গঠন করেছে। কাজেই পীর দরবেশদের ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্ম ও সামাজিকতা মুগল আমলে আরো পরিপুষ্ট হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ সুলতানী শাসনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে যে সমাজ কাঠামো গড়ে উঠেছিল এবং যে সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণ, অনুষ্ঠানাদি, বিশ্বাস, লৌকিকতা, গড়ে উঠছিল তা মুগল আমলেও অব্যাহত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে মুসলিম বঙ্গের সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজের জাতিভেদের কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ বাংলার মুসলিম সমাজে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। যেমন-উচ্চ, মধ্য, এবং নিম্ন এই তিনটি পৃথক শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। এদের মধ্যে সৈয়দ, আলিম, শেখ, পীর, দরবেশ, মুগল, পাঠান, তুর্কী, আরবী, পার্সিক, প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর ভুক্ত ছিল এবং বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিল। কাজী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মোল্লাগণ জনসাধারণ অপেক্ষা কিছু উচ্চ স্তরে ছিল। কিন্তু এই শ্রেণী বিভেদ হিন্দুদের জাতিভেদের মত কঠোর ছিল না। এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদিও অপ্রচলিত ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে অনেক শ্রেণী বিভাগ ছিল। কবি কংকন চন্ডিতে এর একটি তালিকা পাওয়া যায়। যেমন-গোলা, জোলা, পিঠারী, কাবাড়ি, সানকার, হাজম, তীরকর, কাগজী, দর্জী, রংরেজ, হালান, কসাই ইত্যাদি।[১] তবে এ সকল জাতির সাথে পারম্পরিক সম্পর্ক ছিল হিন্দুদের মত নীচ বলে ঘৃনা করা হত না, মুসলমান হিসেবে সবাই একই সামাজিকতার অধীন ছিল। সামাজিকভাবে মেলা মেশা, বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং পানাহারের ক্ষেত্রে কোন শ্রেণী ভেদ না থাকলেও কোন কোন অঞ্চলে হয়ত কিছুটা পালান করত। যেমন-বিত্তবান গৃহস্থ ঘরের মেয়ে বিত্তহীন আশরাফগণ গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু আশরাফগণ কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষক, জেলে, তাঁতী, ঘরের মেয়েকে গ্রহণ করত না। তবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী মুসলিম সমাজে কোন শ্রেণী ভেদ না থাকায় মুসলিম সমাজে এই শ্রেণীভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের মত কঠোর ছিল না।

মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা না থাকলেও ছোট, বড়, উচ্চ, নীচ, পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। আশরাফ আতরাফ, শ্রেণীভেদ বিদ্যমান ছিল। শেখ, সৈয়দ, মুগল, পাঠান, উচ্চ শ্রেণী ভুক্ত ছিল।[২] মুগল আমলে মুসলমানদের মধ্যে বাংলাদেশে শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য অব্যাহত ছিল। শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররম মাসের দশ তারিখে তাজিয়াসহ মহররম উদযাপন করত। বাংলাদেশের অধিকাংশ সুন্নী মুসলমান ইমাম আবু হানিফা প্রবর্তিত হানাফী

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৫।

২. পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল । তবে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকও ছিল ।[১] হানাফী এবং আহলে হাদীসের মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য ছিল না তবে কোন কোন ক্ষেত্রে, মাসলা মাসায়েলের ব্যাপারে মত দ্বৈততা ছিল । তবে সিয়াদের সাথে সুন্নীদের বড় রকমের পার্থক্য ছিল, কিন্তু একে কেন্দ্র করে কোন প্রকার সংঘাতের সৃষ্টি হয়নি ।

অভিজাত মুসলমানেরা পোষাক পরিচ্ছদ, আহারে, আমোদ প্রমোদে, অতিশয় বিলাস প্রিয় ছিল । অভিজাত মুসলমানেরা পায়জামা, আচকান, ইজার, চোগা ও পাগড়ী ব্যবহার করত । দরবারী পোশাক হিসেবে হিন্দু মুসলিম সকলেই চাপকান, বা আচকান এবং পাগড়ী ব্যবহার করত । মুগল যুগে অনেক মুসলমান ধুতি ও পরত ।[২] মুগল শাসনামলে তুর্কী টুপির বহুল প্রচলন ছিল । আলেম সম্প্রদায় লোকেরা সুন্নাত টুপী পরত । পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে কোন বিলাসিতা ছিল না । লোকে ছোট আকারের ধুতি পরত । গামছারও বহুল প্রচলন ছিল । ধুতির সাথে চাদর ব্যবহার করত । বাড়ী হতে বের হলে অনেকে টুপি জুতা সংগে নিত ।[৩] সুলতানী আমলের মত মুগল আমলেও মহিলারা অনুরূপ অলংকারাদি ব্যবহার করত । যেমন-মাথায় সিথি পাট, টিকলি, বালা, চুড়ি, খাড়ু, অঙ্গদ, নাকে কোর, চাঁদবোলাক, ডাল বোলাক, নাক মাছি, কান ফুল, ঝুমকা, কুন্ডল, কানবালা, মল, বাহুতে বাজু, গ্রীবায় গ্রীবা—পত্র, হাতের পাতার উপর আঙ্গুল সংলগ্ন রতন ছড়, কটিতে নীব বন্ধ, কিংকিনী, চন্দ্রহার, প্রভৃতি ব্যবহার করত ।[৪] সুলতানী শাসনামলের ন্যায় মুগল শাসনামলে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব অত্যন্ত জাকজমক ও ধর্মীয় গুরু গাম্ভীর্য সহকারে পালন করা হত । যেমন-ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা মুসলমানদের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব অত্যন্ত জাকজমকের সাথে পালন করা হত । এ ছাড়া মিলাদুন্নবী শবেকদর, শবে বরাত ইত্যাদিও খুবই জাকজমক সহকারে পালন করা হত । সমসাময়িক বাঙ্গালী কবিদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুসলিম সমাজ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য খ্যাত ছিল এবং কুরআন ও

---

১. সুন্দর বনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১১ ।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১১ ।

৩. পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৩ ।

৪. বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস গ্রন্থ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করত । মির্জা নাথন, গোলাম হোসেন সলিম, প্রমুখের লেখা হতে জানা যায় যে, মুসলমানেরা ঈদুল ফেতর, ঈদুল আজহা, রমজান, শবেবরাত, শবে কদর ইত্যাদি উৎসব এবং মহররম খুবই জাকজমকের সাথে পালন করত । খিজির (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে 'বেরা' অনুষ্ঠান ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় । কলা গাছের বেরাও তার উপর বাড়ি ঘর, মসজিদ তৈরী করে তা আলোক মালায় সজ্জিত করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হত । সাথে আতসবাজি পোড়ানো হত । এই উৎসব ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হত ।[১]

মুগল যুগেও মুসলিম সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল । এ সম্পর্কে র‍্যালফ্ফিচ উল্লেখ করেছেন যে, আট দশ বছরের বালকের সাথে পাঁচ ছয় বছরের বালিকার বিয়ের প্রচলন ছিল ।[২] মুগল শাসনামলে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের নারীদের মর্যাদা প্রদানের কতকগুলো বিশেষ দিক দৃষ্টি গোচর হয় । একজন মুসলিম নারী একেবারে নিজস্ব কিছুটা সঙ্গতি ছাড়া ছিল না, সম্পত্তিতে তার অধিকার ছিল এবং এই আর্থিক সঙ্গতি তাকে পরাধীনতার হাত হতে রক্ষা করেছে, তাছাড়া এই আর্থিক সঙ্গতির কারণে স্বামীর উপর নির্ভর শীলতা কমিয়ে নারীকে সম্মান জনক করে তুলেছিল কিন্তু নারীদের সম্পত্তিতে কোন প্রকার অধিকার ছিল না ।[৩] আর্থিক সঙ্গতি, উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও অপেক্ষাকৃত পরিনত বয়সে বিয়ের ফলে সমাজে মুসলিম মেয়েরা হিন্দু নারীদের মত অতটা সহায় ও পুরুষের উপর নির্ভরশীল ছিল না । নারীদের জন্য পর্দা পালন সমাজে অভিজাত্য ও সামাজিক শালীনতা বলে গন্য করা হত । সে সময় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের মুখে ও মাথায় কাপড় বিহীন অবস্থায় বাড়ি বের হওয়া অসম্মানজনক বলে গন্য করা হত ।[৪] অধিকাংশ মানুষ ভাত আহার করত । উচ্চ শ্রেণী মুসলমানেরা পোলাও, কোর্মা ও মাংসের নানা প্রকার খাবার তৈরী করত । কাবাব কোপতা, মোসাল্লম প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য তৈরী করত । দরিদ্র লোকেরা ভাত, মুড়ি, মুড়কী, চিড়া, মাছ তরকারী ইত্যাদি আহার করত ।[৫]

---

১. বাংলাদেশ ও ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৭ ।

২. ইংল্যান্ড পাইওনার্স ইন ইন্ডিয়া, সম্পাদনা, জে হার্টন, লিলি, পৃঃ ৯৫-৯৬ ।
উদ্ধৃত, বাংগালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০০ ।

৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৬ ।

৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৭-৫৮ ।

৫. সুন্দর বনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, সুলতানী শাসনামলের মত মুগল শাসন যুগেও বাংলাদেশে মুসলিম ধর্মীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে পীর দরবেশ ও ব্যবসায়ী বণিকদের আগমন আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে । পীর দরবেশগণ দরগাহ খানকাহ, মসজিদ মক্তব প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচারের আন্দোলনকে আরো ব্যাপক স্থায়ী ও সুদৃঢ় করেন । ফলে সুলতানী যুগে বাংলাদেশে ইসলামের তথা মুসলিম সমাজের যে ভিত রচিত হয়েছিল সে ভিত্তের উপর দাড়িয়ে ইসলামী আন্দোলনকে আরো প্রবল করেছিল এবং মুসলিম সমাজ কাঠামোরে পূর্বের তুলনায় আরো সুদৃঢ় করেছিল । তাছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিক্ষাকে তারা পূর্বের তুলনায় আরো মজবুত ও সুদৃঢ় ভাবে আকড়ে ধরেছে । সুতরাং সুলতানী যুগে যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মুগল শাসনামলে সে সমাজ ব্যবস্থাই সমগ্র বাংলাদেশে সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং সামাজিক বিধি বিধান সর্বত্র জনগনের দোয়ারে পৌছেছিল । অতএব মুগল শাসন যুগে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে উন্নয়নের ধারার এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছিল ।

হিন্দু ও মুসলিম সম্পর্ক ঃ-

সুলতানী শাসনামলের ন্যায় মুগল যুগেও মুসলিম সম্প্রদায়েরা বাংলাদেশে এক উদার নৈতিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল । মুসলমানেরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক সাম্যবোধ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করে । জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু ও অপরাপর জনসাধারণের প্রতি মুসলিম শাসকদের ও নীতি ছিল উদার নৈতিক । এই হিন্দু ও মুসলিম দীর্ঘ দিনের সহাবস্থানের ফলে, পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে । এই সম্পর্কের কারণে পরস্পরকে জানার সুযোগ হয় । তাই হিন্দুরা মুসলমানদের উদার, সাম্য ও কুসংস্কার মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং হিন্দুরা মুসলমানদের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই গ্রহণ করে । তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানরাও হিন্দু দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে জানা যায় । নিম্নে এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা হল ।

এ প্রেক্ষিতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলিম সংস্কৃতি, পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার আচরণের প্রভাবে প্রভাবিত হয় । সমকালীন সাহিত্যে বর্ধমান ও নবদ্বীপের জমিদারগণের রাজ দরবারে যে চিত্র অংকন করেছেন তাকে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে । হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারগণ তাদের দরবারের রীতিতে মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ করতেন । এবং নবাব দরবারের পদসমূহের সংগে সামঞ্জস্য বিধান করা হত, যেমন-বক্সী, মুন্সী, রানা, সাঁতিব্য, আমিন, এমনি আরো অনেক । অনেক হিন্দু উচ্চ পদস্থ কর্মচারী সমাজ প্রধান এবং শিক্ষক, খান মুস্তফা, মহাল নবীশ, খান সাহেব, সরকার, শিকদার, তরফদার, কানুনগো, মজুমদার, ইত্যাদি মুসলিম পদবী ব্যবহার করত । মুলত এরূপ পদবী গ্রহণকে তারা ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনে বিশেষ গৌরবের বলে মনে করত । হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অনিষ্ঠতর সামাজিক সম্পর্কের কারণে অনেক হিন্দু মুসলমানদের ধর্মাচারনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত ক্ষেমানন্দের মনসা মঙ্গল কাব্যে উল্লেখ হয়েছে যে, সর্পদেবী মনসার রোষানল হতে লক্ষীনদরকে বাঁচানোর জন্য যে লোহার ঘর নির্মান করা হয়েছিল সেখানে অন্যান্য রক্ষা কবচের সাথে এক খন্ড পবিত্র কুরআন ও রাখা হয়েছিল ।[১] অনেক হিন্দু বণিক পুত্র সন্তান লাভের আশায় প্রার্থনা করার জন্য একদল ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে । ব্রাহ্মণগণ তাকে কুরআন পাঠের পর আল্লাহর নাম জিকির করতে উপদেশ দেন । অনেক সময় ব্রাহ্মণগণ যাত্রার শুভ দিন নির্ধারনের জন্য কুরআন আলোচনা করে এবং বণিকগণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করত । হিন্দুগণ কুরআনকে একটি পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে শ্রদ্ধা করত । মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবাদিতে হিন্দুরাও যোগদান করত ।[২] তাই মুগল শাসনামলে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ বিপুলভাবে মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়েছিল এ থেকে তা বুঝা যায় ।

বাংলার সমাজে হিন্দু ও মুসলিম পাশা পাশি বসবাস করার ফলে তাদের আদর্শ ও দৃষ্টি ভঙ্গির প্রসারতা আসে । একে অপরের আদর্শ, আচার অনুষ্ঠান অনুকরণ ও অনুসরণ করতে অভ্যস্থ হয় । হিন্দুগণ মুসলমানদের বিবাহাদি অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে অপর দিকে মুসলমানরাও হিন্দুদের সাথে আত্মীয়তা স্থাপন করতে থাকে । হিন্দুদের দূর্গা পূজা, দোল পূজা, প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলমানেরা যোগদান করত । হিন্দুরা মুসলমানদের মাজারে সিন্নি দিত । আবার তাই কোটা,

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪১, ৪৪৪ ।

২. দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৩১৯ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

অন্নপ্রাসন, দেওয়ালী প্রভৃতি অনুষ্ঠানে[১] মুসলমানদেরকে নিমন্ত্রন করা হত। এভাবে পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে এভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার অনুষ্ঠান ও কৃষ্টির সমন্বয় সাধিত হয় এবং শান্তি শৃংখলার সাথে হিন্দু মুসলিম একত্রে বসবাস করতে থাকে। কোন প্রকার সম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ছিল না এবং সর্বদা সম্প্রীতি বজায় ছিল।

মুসলমানগণ ও হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবাদিতে অংশ গ্রহণ করত। বহু মুসলমান হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিল এবং শুভক্ষন নির্ধারণে হিন্দুদের মত অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে আচারাদি পালন করত।[২] মুগল যুগেও মুসলমান ও হিন্দু উভয়েই উভয় সম্প্রদায়ের সাধু ও পীর ফকিরদেরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত। প্রকৃত পক্ষে এরূপ শ্রদ্ধার কারণ হল অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস। তাই হিন্দু মুসলিম উভয়ই সাধু ও পীরদের সাহায্য কামনা করত এবং তাদের দরগায় শিরনী মানত করত।[৩] এভাবে দেখা যায় যে, হিন্দু মুসলিম পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। সার্বিকভাবে সে সময়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ও সৌহার্দভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু হিন্দু মুসলিম উভয়ই পাশাপাশি অবস্থান করে ও তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাস সামাজিক বিধি বিধান, আইন কানুন ইত্যাদি স্বাতন্ত্রবোধ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

অতএব সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় পারস্পরিক প্রতিবেশী হিসাবে বহু বছর যাবৎ বসবাস করে আসছে। তাই একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষনীয় বিশেষ এই যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মুসলিম সমাজের প্রভাব গভীরতর। হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এপ্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। অপর দিকে ধর্মীয় সরলতা ও উদার নৈতিক সমাজ ব্যবস্থার দরুন মুসলমানদেরকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ থেকে কিছুই গ্রহণ করতে হয়নি। তবুও বহু বছরের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে মুসলিম সমাজে কিছু প্রভাব পড়ে। তবে এই প্রভাব আধ্যাত্মিক ধরনের। মৌলিক ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হানতে পারেনি, বরং আচার আচরণে ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং এভাবে বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় সহাবস্থান করেও সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে স্বীয় স্বাতন্ত্রবোধ বজায় রেখেছে।

---

১. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান ও মাসুদুল মান্নান, 'মুসলিম শাসনে ভারত ও বাংলাদেশ' (ঢাকা ১৯৭৫) পৃঃ ৩৫৭।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৬।

৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

(অ) মুগল আমলে(১৫৭৬-১৭১৭) বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা ঃ-

সুলতানী আমলে বাংলাদেশে ধর্ম প্রচার, প্রসার ও ধর্মীয় বিধি বিধান, আইন কানুন প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বত্র ইসলামের জয় যাত্রা শুরু হয়। এরফলে হিন্দু ধর্মের ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয়। নির্যাতিত ও অবহেলিত হিন্দুরা উদার নৈতিক ধর্ম ইসলামের উপর আস্থা রেখে তার ডাকে সাড়া দেয়, ফলে ইসলাম অতি দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে বিস্তৃত মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পৃথক ধর্মীয় অনুশাসন কায়েম হয়। অপর দিকে ইসলামের জয় যাত্রাকে রুদ্ধ করার জন্য হিন্দুরাও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তারা ইসলামের সংস্পর্শে এসে নিজেদের ভুল এটি শুধরায়ে ইসলামী আদলে সংস্কার করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা ইসলামকে রুদ্ধ করতে পারেনি, বরং ইসলাম তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে

এই গতির ধারাবাহিকতা মুগল যুগেও অব্যাহত থাকে। সুলতানী শাসনামলে সমগ্র দেশে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, মুগল যুগ পর্যন্তও তা সর্বতভাবে বাস্তবে পরিনত হয়। মুগল যুগে বাংলাদেশে তখন মুসলমান ও ইসলাম ধর্ম আত্মনির্ভরশীল, স্বয়ং সম্পূর্ণ ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতানী শাসনামলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মের যে অবস্থা বিরাজ করছিল মুগল যুগেও সে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি বরং ধর্মীয় নৈতিকতা ও অশ্লীলতার দিক দিয়ে আরো অবনতি ঘটে। এ সময় মুসলিম সমাজের ও কিছুটা বাহ্যিক আচার আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তা ছিল অত্যন্ত নগন্য সংখ্যক লোকের মাঝে, তবে অধিকাংশের নিকট ধর্ম সঠিকভাবেই পালিত হত। ধর্মের বাহ্যিক দিক দিয়ে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হলেও মৌলিক ধর্ম বিশ্বাস ও অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। নিম্নে এ সম্পর্কে হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের ধর্মীয় অবস্থার সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

হিন্দু ধর্মের অবস্থা ঃ-

জাতিগত শ্রেণীবিভেদ ব্যতিরেকেও হিন্দু সমাজে সে সময় অসংখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ও গোত্রে বিভক্ত ছিল। এ সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো বিশেষ দেব দেবীর পূজার প্রতি গুরুত্ব প্রদানের কারণে গড়ে উঠে। আবার কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায় স্রষ্টাকে পাওয়ার এবং আত্মার মুক্তি লাভের

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন আদর্শ ও পন্থার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল। অনেকে আবার আনুষ্ঠানিক কৃত্যাদি ও অনুষ্ঠানাদি পালনের গুরুত্ব আরোপ করে এবং কেউ আবার মরমীসংঘ গড়ে তোলে। সাধারণ হিন্দুরা বিভিন্ন দেব দেবতায় বিশ্বাস করত। তবে বহু হিন্দু ছিল যারা আদর্শগতভাবে এক দেবদেবীর পূজা করত। যদিও তাদের সকল দেব দেবীর প্রতিই বিশ্বাস ও ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল ফলে অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যেমন-শৈব, শাক্ত ইত্যাদি।[১] শিব ছিলেন শৈবদের (হিন্দুদের) প্রধান দেবতা এবং শৈব ধর্মের মূল উৎস। এই ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যোগাভ্যাস। শিব সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী দেবতা রূপে পূজিত হতেন। শিব ও বিষ্ণু ছিলেন ঋগ বৈদিক যুগের দুজন দেবতা। সে যুগে ঝড় ও বিদ্যুৎ দেবতা রুদ্র ছিলেন প্রধান দেবতা। রুদ্র শিবরূপেও পরিচিত ছিলেন। বিষ্ণু ছিলেন সূর্য দেবতা। পরবর্তী বৈদিক যুগে কিছু সংখ্যক আর্য দেবতা প্রাধান্য লাভ করে এদের মধ্যে একজন ছিলেন শিব। যিনি মহাদেব এবং প্রাণী জগতের দেবতা রূপে পরিগনিত হতেন। সূর্য দেবতা বিষ্ণু ও এ সময় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মহাজাগতিক ও নিয়ম নীতির উৎস স্বরূপ বিপদে মানুষের মুক্তিদাতা এবং দেবতাদের ত্রান কর্তা বিষ্ণু বরুনের স্থান দখল করেছেন। শিব তার ধ্বংসাত্মক ও প্রসন্ন প্রকৃতি দিয়ে জনসাধারণের মনোহরণ করেন। শিব বিভিন্ন মূর্তিতে জনসাধারণ কর্তৃক পূজিত হতেন। এছাড়া শিবের লিঙ্গ পূজা হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[২] এভাবে শিব পূজা বৈদিক উত্তর যুগ তথা সুলতানী যুগ ও মুগল যুগেও হিন্দুদের ধর্মীয় জীবনের একটি সাধারন বৈশিষ্ট্যে পরিগনিত হয় এবং মুগল যুগে শিব ও শিবের লিঙ্গ পূজা জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে।

ধর্মীয় জীবনে স্ত্রী দেবতার প্রাধান্য থেকে শাক্ত সম্প্রদায় প্রাচীনকালেই উৎপত্তি হয়েছে তা বুঝা যায়। পন্ডিতদের ধারণা প্রাচীনকাল হতে এই উপমহাদেশ শক্তি ও প্রকৃতি পূজার কেন্দ্র ভূমি ছিল। বৈদিক ধর্মের একটা প্রধান দিক ছিল পুরুষ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব। আর্য ধর্ম বিশ্বাসে স্ত্রী দেবতাদের মর্যাদা বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে অবশ্য মাতৃ দেবতা রূপে স্ত্রীদেবতার প্রভাব প্রতি পত্তির উপর জোর দেয়া হয়। অর্থভেদে শক্তি বা ক্ষমতার ধারণার প্রভাব প্রকাশ পায় কোন

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৪। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫৪।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

কোন পন্ডিত অর্থববেদকে শক্তি পূজার আদি উৎস রূপ বলে গন্য করেন ।[১] শক্তি ধর্মমতে মৌলিক ভাবধারার পূজা পদ্ধতি এ ধর্ম মতে প্রবেশ, বিয়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বলিদান, তন্ত্রমন্ত্র এবং ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ইত্যাদি অর্থববেদে উল্লেখ রয়েছে । প্রাচীন আর্যদের নিকট শিব ও শক্তি দেবতার প্রভাব উপনিষদে দেখা যায় । এ সময়ের প্রধান প্রধান দেবতা ছিল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এবং শক্তি । কিন্তু শক্তির সর্বত্র শ্রেষ্ঠত্ব বজায় ছিল । শক্তি হচ্ছে ব্রহ্মানী, ব্রহ্মের শক্তির উৎস স্বরূপ । স্ত্রী দেবতা শক্তির প্রভাবে তন্ত্র শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । মাতৃ দেবতা তান্ত্রিকদের প্রধান আর্য ও অনার্যদের ধর্মীয় চিন্তা ধারার স্রোত এই তান্ত্রিক ধর্মমতে এসে সম্মিলিত হয়েছে । এতে অনার্যদের ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র তন্ত্রের সংগে আর্যদের চমৎকার আধ্যাত্মিক দর্শনের সম্মিলন দেখা দেয় । পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় । আর্য, অনার্য, তান্ত্রিক মতবাদ, এবং বৌদ্ধ বজ্রযান ও সহজিয়া সম্প্রদায় প্রভৃতি ভাবধারার অনুপ্রবেশ বাংলার শক্তি মতবাদের উন্নতিতে সহায়তা করে । বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে শক্তি সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল ।[২] সুতরাং শক্তি ধর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শক্তির উপাসনা বা তান্ত্রিকতা ও নরবলী ।[৩]

সাধারনত তান্ত্রিক সম্প্রদায় শাক্ত বলে গন্য হলেও তান্ত্রিকদের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ও আছে । তন্ত্রশাস্ত্রে তাদেরকে বেদাচারী, বৈষ্ণবচারী, শৈবচারী, দক্ষিনাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তচারী, কৌলাচারী, প্রভৃতি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে । এদের মধ্যে কৌলাচারীই সর্বশ্রেষ্ঠ ।[৪] তান্ত্রিকরা তাদের সাধনার জন্য অত্যন্ত নির্লজ্জ, অশ্লীল কাজ করত । তারা যে নৈতিক দিক দিয়ে কত অধঃপতিত ছিল তা আমরা কিছু আলোচনা করলেই বুঝতে পারবো । যেমন -

---

১. জে,এন,চক্রবর্তী, শক্তি পদাবলী ও শাক্তসাধনা, পৃঃ ১৭,৩০ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৭ ।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪২৭,৪২৮,৪২৯ ।

৩. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫৫ ।

৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ যদি তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তা হলে তাকে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত একজনের নিকট দীক্ষা নিতে হয় এবং দিনের বেলা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পর ঘোষণা করতে হয় যে, সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার পরিত্যাগ করল। রাতের বেলা গুরু ও শিষ্য আটজন বামাচারী তান্ত্রিক এবং আটজন মেয়েলোক যথা নর্তকী, তাঁতীর মেয়ে, গণিকা, ধোপানী, নাপিতের স্ত্রী বা কন্যা, ব্রাহ্মণী, একজন ভূস্বামীর কন্যা ও গোয়ালিনীসহ একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের পাশে একজন স্ত্রী লোক বসে। গুরু তখন শিষ্যকে উপদেশ দেন-যে, আজ হতে লজ্জা ঘৃণা শুচি, অশুচি জ্ঞান, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি ত্যাগ করতে হবে। মদ, মাংস, স্ত্রী সম্ভোগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয় বৃত্তি উপভোগ করবে, কিন্তু ইষ্ট দেবতা শিবকে সর্বদা স্মরণ করবে এবং মদ, মাংসকে ব্রহ্ম পদে লীন হয়ে যাওয়ার উপাদান হিসেবে মনে করবে। মদ পান করতে করতে শিষ্যরা সব বেহুশ হয়ে পড়ে। তারপর গুরু ও অন্যান্যরা চলে গেলে কেবল মাত্র শিষ্য ও একটি স্ত্রীলোক থাকে। এছাড়া তান্ত্রিকরা অনেক বীভৎস আচরণ করে যেমন মানুষের মৃতদেহের উপর বসে মড়া মাথার খুলিতে উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষেরা মদ পান করে, ইত্যাদি। তান্ত্রিকরা তাদের এ ধরনের আচার অনুষ্ঠানের যে দার্শনিক তথ্যের অবতারনা করে তার সারমর্ম এই যে, কাম, ক্রোধ, ইত্যাদি মানুষকে পাপের পথে চালিত করে। এ সমস্ত রিপুর তাড়নাযুক্ত বিষয়গুলিকে দূর করতে না পারলে মোক্ষ লাভ হয় না। শাস্ত্রকারেরা এ জন্য কঠোর তপস্যা ও ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলেছেন। তান্ত্রিক বামাচারীরা এ জন্য প্রলোভন পরিহার ও ইন্দ্রিয় নিরোধের পরিবর্তে অপরিমিত ও যথেচ্ছা ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থ দ্বারা মানুষের মনকে ইহা হতে বিমুখ করার কথা বলেন।[১] এই তান্ত্রিক দর্শনের উপর ভিত্তিকরেই পরকীয়া প্রেম ও পরনারী সম্ভোগের উদ্ভব হয়। তারা পরকীয়া প্রেম, অবাধ নারী সঙ্গম, যৌনতা ইত্যাদির মাধ্যমে চঞ্চল মনকে দমন করার উপায় বলে মনে করে। অর্থাৎ নর নারীর প্রেমের মধ্য দিয়ে ভগবানের প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় ও চঞ্চল মনকে শান্ত করা যায় এবং মোক্ষ লাভ হয়। তাই এই পরকীয়া প্রেমের ভিত্তিতে অশ্লীলতা সমাজ জীবনে, ধর্মীয় জীবনে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে ধর্মীয় জীবন হয়ে পড়ে অত্যন্ত কলুষিত। তাই দেখা যায় যে, মুগল আমল তথা অষ্টাদশ শতকের প্রথমে এই তান্ত্রিক মতবাদ তথা শাক্ত মত বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে।

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাক্ত ধর্মের মধ্যে পৌরানিক তন্ত্রাশ্রয়ী উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজ এবং অলৌকিক শাক্ত মতের অন্তর্ভুক্ত চন্ডী, মনসা, বাসুলী প্রভৃতি কাব্যের দেবীরা ও গৃহীত হয় । নাথ ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম অনেক স্থলে প্রায় মিশে গিয়েছিল । ইতিমধ্যে চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার হিন্দু সমাজকে প্রভুত পরিমাণে প্রভাবিত করে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দু ধর্মীয় সমাজে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল । ফলে নাথ ধর্ম কোন কোন স্থলে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে ।[১]

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মও এর আচার আচরণ হিন্দু সমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্রাহ্মনদের একাধিপত্যের ও হিন্দু ধর্মের গোড়ামির মূলে আঘাত করে ।[২] গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মূলত আবেগকেন্দ্রিক । বাঙালী মানস ও মননশীলতা ও আবেগদ্বারা নিয়ন্ত্রিত । তাই চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালী মনকে সহজেই উদ্বুদ্ধ করেছিল । সমগ্র বাংলাদেশে এই বৈষ্ণব ধর্ম বিস্তার লাভ করার কারণ হিসেবে মুগল শাসনকে পরোক্ষভাবে দায়ী করা যায় ।কেননা মুগল আধিপত্যের কারণে সপ্তদশ শতকের দুই তিন দশকের মধ্যেই পূর্ব ও উত্তর পূর্ব বঙ্গের ভূঁইয়াদের বিদ্রোহ লোপ পায় । চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, আসাম, কুচবিহার, প্রভৃতি অঞ্চল মুগল শাসন ও আধিপত্য স্থাপিত হলে পশ্চিম বঙ্গের সাথে উপরোক্ত অঞ্চল সমূহের ব্যবধান ঘুচে যায় । যার ফলে পশ্চিম বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম ও এ সমস্ত এলাকায় বিস্তার লাভ করতে থাকে ।[৩] মুগল শাসনামলে তাই বৈষ্ণব ধর্ম বাংলাদেশে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে । সে সময়ের বৈষ্ণব গুরুগণ যেমন শ্রেণী বাস, নরোত্তম, ও শ্যামানন্দ, বৈষ্ণব ধর্মে নতুন জীবন দান করেন এবং এই ধর্ম মতকে জনপ্রিয় করে তোলেন । বৈষ্ণব ধর্মের দ্বিতীয় পর্যায়ে (মুগল শাসন) উন্নতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল পরকীয়াদের আচার আচরণ রীতি নীতি ও আদর্শের জনপ্রিয়তা ।[৪] এ কারণে এই পরকীয়া প্রেমের আদর্শকে মানুষ অত্যন্ত আগ্রহভরে গ্রহণ করে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মে এই পরকীয়া প্রেমের মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে ।

---

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খন্ড, ১ম পর্ব, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩ ।
২. ড: আ: রহিম, ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস(ঢাকা ১৯৮১) ২য় সংস্করণ পূর্বোক্ত, পৃ: ৪১৮ ।
৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খন্ড, ১ম পর্ব, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৬ ।
৪. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০২ ।

Dhaka University Institutional Repository

বৈষ্ণব সহজিয়ারা তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতে পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা করে। প্রেমের দ্বারা ভগবানকে লাভ করাই তাদের লক্ষ্য। তাই নরনারীর অবাধ প্রেমের মধ্যে দিয়েই এই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। নিজের স্ত্রী অপেক্ষা অন্য নারীদের প্রতি এই প্রেম ও আসক্তি বেশ প্রবল হয়, কাজেই ইহাই প্রেমের প্রথম ধাপ, কিন্তু প্রথমে ইহা স্থূল দেহগত ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মনে হলেও ক্রমশ ইহা ভগবানের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়।[১] অর্থাৎ অবাধ নারী দেহ সম্ভোগ, যৌন মিলনের মাধ্যমে ভগবানের প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এরূপ নির্লজ্জ, পাপাচার, তান্ত্রিকদের নিকট হতে বৈষ্ণবরাও গ্রহণ করে এবং ধর্মীয় সমাজের কিছু অংশকে মারাত্মকভাবে কলুষিত করে।

বৈষ্ণব সহজিয়ারা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল। যেমন-আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, নেড়া, সহজিয়া প্রভৃতি। এ ছাড়া কর্তাভজা, স্পষ্টাদায়ক, সখীভাবক, কিশোরী, ভজনী, রাম বল্লভি, জগমোহিনী, গৌড়বাদী, সাহেবধানী, পাগল নাথি, গোবরাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ও সহজিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব বিভিন্ন শাখার সহজিয়াদের ধর্মমত, সামাজিক প্রথা ও সাধন প্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ থাকলেও গুরুবাদ, নারী পুরুষের অবাধ মিলনও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য সকলেই স্বীকার করে।[২] এতে বুঝা যায় যে, মুগল শাসন যুগে বৈষ্ণব ধর্ম ভজন সাধন ও ভগবানের নৈকট্য ও আশির্বাদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরকীয়া প্রেমের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়। যারফলে কিছু বিভ্রান্ত হিন্দু তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থাকে কলুষিত করে ফেলে। এই পংকিলতার কারণে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেই বৈষ্ণব ধর্ম ও সমাজ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর একশত বছরের মধ্যে বাংলার জনজীবন আলোচনা করলে বুঝা যায় যে, হিন্দু জনসাধারণ বৈষ্ণব প্রভাবে ব্যাকুল চিত্ত হলেও ধর্মানুশাসনে যারা শাক্ত ছিলেন, তারা কোন কোন দিক দিয়ে সমাজে ও পরিবারে বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় আচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, যদিও বৈষ্ণব শাক্তদের মধ্যে তত্ত্বের দিক দিয়েও আচার আচরণের দিক দিয়ে বিশেষ পার্থক্য ছিল। সমাজে বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রবেশের ফলে এবং তাদের যৌনাচারী সাধন প্রক্রিয়ার প্রতি

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬৭।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৭-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ হিন্দুদের বিরাগ ছিল বলে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই হিন্দু সমাজে বৈষ্ণবের প্রভাবের প্রতি কোথাও ঔদাসীন্য, কোথাও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছিল[1] এবং এর প্রভাবে ক্রমশ বাংলাদেশে উহা হ্রাস পাচ্ছিল এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও সম্প্রদায় প্রতিবাদের মুখে ক্রমশ শিথিল ও সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল ।

এই বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের কয়েকটি শাখা প্রশাখা মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত বাংলায় বিদ্যমান ছিল । তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে নদীয়ার আউল চাঁদ নামক একজন ফকীর কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন । তার প্রধান শিষ্য ছিলেন সদগোপ সম্প্রদায়ের রাম শরন পাট । আউল চাঁদ কোন প্রকার জাতি ধর্মের পার্থক্য করতেন না এবং হিন্দু মুসলিম ধর্মের বহু সংখ্যক লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল । তিনি দশটি অনুশাসন জারি করেছিলেন যেমন-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া যাবেনা, চুরি করা মহাপাপ, হত্যা করা মহাপাপ, ব্যভিচারের চিন্তা ভাবনা করা যাবেনা, অন্যের সম্পত্তি প্রতি লোভ করতে পারবে না । কাউকে হত্যা করার মনোভাব মনে পোষণ করা যাবেনা, মিথ্যা কথা বলা যাবে না, বৃথা কথা বলা যাবেনা ইত্যাদি । কর্তা ভজাগন মুসলমানদের মত শুক্রবার দিন টিকেও পবিত্র দিন হিসেবে পালন করত ।[2] এ থেকে বুঝা যায় যে, কর্তাভজাগণ মুসলমানদের নিকট হতে বহু সামাজিক আইন কানুন, বিধি বিধান গ্রহণ করে ।

কিন্তু কর্তাভজাসম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম থেকে বিধি বিধান গ্রহণ করলেও তারা কর্তা ও গুরুকে স্বয়ং ভগবান বা কৃষ্ণ বলে মনে করত এবং তাকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করত । ক্রমশ এই সম্প্রদায়ের উন্নতি হতে থাকে ও ভক্তের সংখ্যাও অসম্ভব বৃদ্ধি পেতে থাকে । এ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্ন জাতীয় নারীদের সংখ্যাই ছিল খুব বেশী এবং গোপীরা কৃষ্ণকে যেমন মনে প্রানে ভজন সাধন করত এরাও অনুরূপভাবে ভজন সাধন করত ।[3]

----

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খন্ড, ১ম পর্ব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮ ।

২. আই, এইচ,কুরেশী, দি মুসলিম কম্যুনিটি অব ইন্দো পাকিস্তান সাব কন্টিনেন্ট, পৃঃ১১৮ উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০৪ ।

৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬১ ।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে যখন তারা হিন্দু আচরণে ও সামাজিকতায় অভ্যস্থ হয়ে পড়ে নানা প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে তখনই তারা বিপথগামী হয়েছে ও সকলের কাছে নিন্দিত হয়েছে। এভাবে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজে নষ্ট হয়ে যায়।

হিন্দু ধর্মের আরেকটি শাখা স্পষ্টদায়ক সম্প্রদায় ছিল কর্তাভজার ঠিক উল্টা। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরুকে ভগবানের অবতার মনে করত না এবং তার কর্তৃত্ব ও খুব সীমাবদ্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষ্ণ চন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য রূপরাম কবিরাজ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কর্তাভজাদের মত এরা ও বহু সংখ্যক শিষ্যত্ব প্রদান করেছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব ছিল একদল সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদের হাতে। এরা এক মঠে ভাই বোনের মত বসবাস করত, এরা কৃষ্ণ ও চৈতন্যের স্তুতিমূলক গান গেয়ে নৃত্য করত। এ ছাড়া সখী ভাবক সম্প্রদায়ের পুরুষ ভক্তরা নারীদের পোষাক পরিধান করত। মেয়েদের নাম ধারণ করত এবং মেয়েদের মত কৃষ্ণ ও চৈতন্য এর নামে নৃত্য গীত করত। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু লোকেরা এদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করত।[1] দরবেশিয়া নামে অভিহিত হিন্দু সমাজের আর একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। গৌড়ের অধিবাসী সনাতন গোস্বামী ছিলেন এই মরমী ধর্ম পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা এবং বৈষ্ণব ও বাউলদের সংগে এর সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। দরবেশিয়াগণ তসবিহ মালা নামে অভিহিত এক ধরনের জপমালা ধারণ করত এবং আলখাল্লাহ নামে পরিচিত মুসলিম ফকীরদের পরিধেয় পোষাক পরিধান করত। তাদের গানের মধ্যে আল্লাহ্ খোদা ও বিভিন্ন সাধু পুরুষদের নাম উচ্চারিত হত।[2] এ সময় ভক্তি আন্দোলন এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার একটি উল্লেখ যোগ্য দিক ছিল। ভক্তিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ঈশ্বরের ভক্তি। শ্রীচৈতন্যের প্রচেষ্টায় বাংলায় ইহা প্রসার লাভ করে। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের নিপীড়ন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভক্তি বাদে আকৃষ্ট হয় এবং স্বাধীন চেতনার উপলব্ধি করে।[3] এ ভাবে মুগল শাসনামলে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল।

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৯।
২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৪-৩৫।
৩. মুসলিম শাসনে ভারত ও বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুগল শাসনামলে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তারা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ধ্যান ধারনা ও কর্ম কান্ডের মাধ্যমে ভগবানের কৃপা লাভে সচেষ্ট হয় কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়া তান্ত্রিকরা ভগবানের কৃপা লাভে পরকীয়া প্রেমের আবরণে যৌনতা ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা মনে করে যে, পরকীয়া প্রেমের মধ্য দিয়েই ভগবানের প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় এবং ভগবানের আশির্বাদ পাওয়া যায়। তাছাড়া মানুষের মন সর্বদা অতৃপ্ত, কামনা, বাসনা দ্বারা পরিপূর্ণ তাই এই অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করতে হলে পরকীয়া প্রেমের দ্বারাই সম্ভব এবং তৃপ্ত আত্মা দ্বারা সাধন ভজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং মুক্তি লাভ করা যায়। এভাবে মুগল শাসনামলে হিন্দু ধর্মীয় সমাজের কিছু অংশ অত্যন্ত কলুষিত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও উপ বর্ণের ফলে সামাজিক ঐক্যতা ও বিনষ্ট হয়, ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়শ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দেয়। অতএব সব দিক দিয়ে দেখা যায় যে, মুগল শাসনামলে হিন্দু ধর্মীয় অবস্থা এক বিশৃংখলা পূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছিল।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান :-

সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে যে সকল দেব দেবীর পূজা অর্চনা করা হত, যেমন মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, চন্ডী, দূর্গা, কালী, ইত্যাদি। তেমনি-মুগল শাসন যুগেও হিন্দু সমাজে অনুরূপ দেব দেবীর পূজা অর্চনা সমভাবেই গুরুত্ব সহকারে করা হত। অর্থাৎ পূজা পদ্ধতি ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদী ধারাবাহিকভাবে সনাতন পদ্ধতিতেই পালন করা হয়েছে। নিম্নে মুগল শাসন যুগের বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

স্ত্রী দেবতাগণের শক্তির প্রাবল্যে ষোড়শ শতাব্দী হতে শিব পূজার ভাটা পড়তে শুরু করে। শিব অবশ্য হিন্দুদের একজন প্রধান দেবতা হিসেবে অব্যাহত থাকে। কিন্তু সেখানে নতুন দেবদেবী ও ধর্ম বিশ্বাসের জন্ম হয় যেমন-মনসা, শীতলা, চন্ডী, ষষ্ঠী, এবং অন্যান্য স্ত্রী দেবতা হিন্দু সমাজে স্থান পায় এবং স্ত্রীদেবতারা বিশেষ করে বাংলার সাধারণ হিন্দুদের জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে। এ সমস্ত ধর্ম পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল এই বিশ্বাসের সমর্থনে যে, স্ত্রী দেবতা বা

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃ দেবতাই হচ্ছেন ক্ষমতার উৎস । এ সকল ধর্ম পদ্ধতিগুলো শক্তির প্রতীক স্বরূপ প্রকৃতির বিভিন্ন দিকে স্থানীয় বিশ্বাসের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ।[১]

মনসা ধর্ম বিশ্বাস ও পদ্ধতিতে ছিল বাংলাদেশের জীবনের এক অদ্ভুত ধর্মীয় বিশ্বাস । এ দেশের জঙ্গল ও জলা ভূমিতে অসংখ্য সর্পাদি বিদ্যমান ছিল । এই সাপ ছিল মানুষের গোপন শত্রু । তাই ভয়ে মানুষ শক্তির উৎস স্বরূপ স্ত্রীদেবতার কল্পনা করে এবং তাকে খুশী রাখার জন্য পূজা করতে শুরু করে, যাতে তারা সাপের অত্যাচার ও দংশন হতে রক্ষা পেতে পারে । তাই মনসা সর্পদেবী হিসেবে বিভিন্ন স্থানে পূজিত হতে থাকে ।[২] সর্পদেবী মনসা প্রজনন শক্তির দেবী হিসেবেও পূজিত হয় । পশ্চিম বাংলার মালদহ, হুগলী, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় এবং আসামে মনসাকে সন্তান লাভের জন্য পূজা করা হত । পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মনসা মঙ্গল কাব্যে উল্লেখ হয়েছে যে, মনসা দেবীর পূজা করলে নিঃসন্তান পুরুষ ও নারী সন্তান লাভে সমর্থ হয়[৩] । বাংলাদেশ ও আসামে আজও বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্য মনসা দেবীর পূজা হয়ে আসছে ।

প্রাচীন কাল হতেই বাংলাদেশে ষষ্ঠীদেবীর পূজা হয়ে আসছে । মুগল আমলেও এ পূজার প্রচলন ব্যাপক ছিল । ষষ্ঠীদেবীর পূজা নারী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । বাংলাদেশে বহু প্রকারের তথা বহু নামে ষষ্ঠী পূজা হয়ে থাকে । যেমন সন্তান কামনায় যে ষষ্ঠীদেবী পূজিত হয় তিনি হচ্ছেন অরন্য ষষ্ঠী, কিন্তু ইহা জামাই ষষ্ঠী নামে সর্বাধিক পরিচিত । তবে বগুড়া ও পাবনা জেলায় উহা আম ষষ্ঠী নামেও পরিচিত । কেননা ঐ সব জেলায় আম এই পূজার একটি বিশেষ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় । জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে অরন্য ষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠীর অনুষ্ঠান হয় ।[৪]

---

১. দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, পৃ: ৬৩ ,১০৩ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪২৬, ৪২৯ ।

২. দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পূর্বোক্ত পৃঃ৬৩,১০৩ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৯ ।

৩. বাংলার লোক ধর্ম, ও উৎসব পরিচিতি , পূর্বোক্ত, পৃঃ৩১ ।

৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সন্তান কামনার উদ্দেশ্যে এই ষষ্ঠী পূজা অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এই জামাই ষষ্ঠী ব্রত উদযাপিত হয়ে আসছে। এই ষষ্ঠীদেবীকে শিশুদের অভিভাবক দেবতা হিসেবেও কল্পনা করা হয়।

সুলতানী শাসনামলের ন্যায় মুগল যুগেও শীতলা দেবী বাংলাদেশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশের অনেক গ্রামেই স্থায়ী শীতলা মন্দির আছে। এ সকল মন্দির কেবল বসন্ত রোগের দেবী হিসেবে শিতলা পূজিত হয়ে আসছে তা নয় বরং অন্যান্য কারণেও দেবী পূজা পায়। তন্মধ্যে বন্ধ্যত্ব মোচন অন্যতম।[১] অর্থাৎ শীতলা দেবী শুধু মাত্র বসন্ত ও মহামারীর হাত হতে বাঁচার জন্য পূজা করা হয় না, বরং সন্তান কামনায় ও এর পূজা করা হয়।

বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও প্রধান ধর্মীয় উৎসব হল দুর্গা পূজা। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে দুর্গা পূজা করা হয় চতুর্দশ শতাব্দীর বা তার কিছু পূর্বে এর সূত্রপাত হয় বলে মনে হয়। একাদশ শতক হতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত জিমূতবাহন, শূলপানি, বৃহস্পতি, বিদ্যাপতি, রঘুনন্দন ও অন্যান্য পন্ডিতেরা দুর্গা পূজার উপর বিভিন্ন পুস্তকাদি রচনা করেছেন। কৃত্তিবাসের রামায়নেও দুর্গা পূজার উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতকের মধ্যে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে দুর্গা পূজা জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। চৈতন্য ভগবত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সে যুগে দুর্গা পূজা প্রত্যেক বাড়ীতেই উদযাপিত হত। তবে ষোড়শ শতকের পূর্বে বর্তমানের মত ব্যাপক আকার ধারন করেনি।[২] তাই ষোড়শ শতাব্দী হতে দুর্গা পূজা নতুনভাবে নতুন আড়ম্বরে পালিত হতে থাকে। সুলতানী শাসন আমলে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দুর্গা পূজা পালন করা হত, মুগল যুগেও হিন্দু সমাজে ততোধিক উৎসাহ উদ্দীপনা ও অত্যন্ত রাজকীয় ও জাকজমকের সাথে বাংলাদেশের প্রতিটি হিন্দু ঘরে এই দুর্গা পূজা উৎসব পালন করা হত। এ ছাড়া গনেশ, সরস্বতী, কালী, লক্ষ্মী ইত্যাদি বাঙালী হিন্দুদের বাৎসরিক ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়।

----

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৩১। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে লৌকিক পূজা পার্বনের মধ্যে বৃক্ষ পূজা অন্যতম। বিশেষ করে এ দেশে মেয়েদের মধ্যে বৃক্ষ পূজার বহুল প্রচলন দেখে মনে হয় যে, এখানে প্রাচীনকাল হতে বৃক্ষ পূজা পালিত হচ্ছে। সুলতানী শাসনামলের ন্যায় মুগল যুগেও বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ পূজা হত। যেমন-অশত্থ বৃক্ষ, তুলসী, বেল গাছ, শেওড়া। এছাড়া নিম, দুর্বা, কুল কলা, কদম, শাল, খেজুর, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ বাংলাদেশে মুগল শাসন যুগেও সুলতানী শাসন যুগের ন্যায় পূজা করা হত।

অতএব সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, এভাবে হিন্দুরা বিভিন্ন দেব দেবীতে বিশ্বাস স্থাপন করে ও অত্যন্ত আগ্রহভরে তাদের পূজা করে। হিন্দুরা প্রকৃতি পূজায় ও লিপ্ত ছিল। বিভিন্ন বৃক্ষকে তারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। এমনিভাবে মুগল শাসন যুগে হিন্দু ধর্মীয় অবস্থা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

মুসলিম ধর্মীয় অবস্থা :

সমসাময়িক বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ গভীর ধর্মীয় অনুভূতি, সততা, সরলতা, ইত্যাদি গুণাবলী বাংলার মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল। এরপর থেকে অর্থাৎ মুগল শাসনামলে হতে বাংলার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চরিত্রের অধঃপতন শুরু হয়। তখন থেকেই শুরু হয় হিন্দুদের সাংস্কৃতিক বিজয়। মুসলমানেরা বিজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে তাদের ধ্যান ধারণায় ইসলামের মহান শিক্ষা ও পরিবর্তন হতে থাকে। বিশেষ করে শাসক গোষ্ঠীর অবহেলা ও অনৈসলামিক কাজ কর্ম এবং প্রভাবশালীদের দুর্বলতা ইত্যাদি মুসলিম সমাজে প্রভাব ফেলে। ইত্যাদি কারণে মুগল শাসন যুগে বিজাতীয়, বিধর্মীয়, শিক্ষা সংস্কৃতি ও বেদাআতী প্রবেশ করে। তবে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও মৌলিকতা দৃঢ়ভাবে বজায় থাকে। এ সম্পর্কে নিম্নে আমরা কিছুটা জানার চেষ্টা করব।

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাংলায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিতি পর হতে বাংলার মুসলমানদের উপর 'আকবরী ইসলামের' প্রভাব পড়তে থাকে, যার প্রধান অর্থ বিশ্বাস ও অন্যান্য কার্যক্রম ছিল অংশীবাদীতে পূর্ণ । শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক এরূপ অনৈসলামিক মতবাদ প্রবর্তনের কারণ হল, মুসলমান সুলতানরা যখন বিদ্রোহ দমন কিংবা রাজ্য জয় করেছে তখন অনেক হিন্দু নর নারী বন্দী হয়েছে, এদের মধ্যে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে । এসব অসহায়, অনাথা,অনাশ্রিতা মহিলারা বিভিন্নভাবে হেরেমে আশ্রয় নিয়েছে । তাদের অনেকে রাজ দরবারে কিংবা হেরেম বিভিন্ন কাজেও নিযুক্ত হয়েছে । আবার তাদের মধ্যে অনেক সুন্দরী যুবতী অনেক সময় পত্নী বা উপপত্নী হিসেবে গৃহীত হয়েছে । এভাবে মুগল অন্তঃপুরে অমুসলিম বেগমদের প্রবেশের কারণে বিধর্মীয় শিক্ষা সংস্কৃতি বাদশাহদের উপর প্রভাব বিস্তার করে । এছাড়া প্রভাবশালী মুসলমানদের বেলায় ও অনুরূপ ঘটনা ঘটে ।[২] যেভাবেই হোক না কেন মুসলিম বাদশা ও প্রভাবশালী মুসলমানেরা অমুসলিম মহিলা ও বেগমদের প্রভাবে বিজাতীয় ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এতে ক্রমান্বয়ে তাদের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় হতে থাকে এবং ধর্মীয় বন্ধন ও শিথিল হয়ে পড়ে । এবং ধীরে ধীরে ইসলামের মহান আদর্শ হতে দূরে সরে পড়ে । এভাবে শাসক গোষ্ঠী ও প্রভাবশালী মুসলিমদের ইসলামের প্রতি অবহেলা, মুসলিম সমাজকে সামগ্রিকভাবে বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে ।

মুগল শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের অনুকরণে বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায় । মহররমের উৎসব এর একটি বড় দৃষ্টান্ত । মুহম্মদ আব্দুল হাই, মুসলিম সমাজে হিন্দুদের অনুকরণে প্রচলিত বিভিন্ন দেব দেবীর ভক্তি, পীর ভক্তি ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিয়েছেন । তিনি উল্লেখ করেছেন যে ,

----

১. সম্রাট আকবর হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদি ধর্মের সমন্বয়ে এক নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন, যার নাম দেন 'দিন-ই-ইলাহী' । ইহাই আকবরী ইসলাম নামে পরিচিত । সম্ভবত আকবর ইহা বিধর্মী বেগম অথবা হেরেমের অন্তঃপুরের অসংখ্য আশ্রিতা, পত্নী, উপপত্নীদের প্রভাবে কিংবা তাঁর হিন্দু সভাসদদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন ।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস,২য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ২৮৮ । উদ্ধৃত, বাংলাদেশের ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৪২ ।

Dhaka University Institutional Repository

মহররমের তাজিয়া নির্মান এবং দশম দিবসে মজ্জিল মাটি, ইহা হিন্দু ধর্মের অনুকরণ বলে মনে হয়। হিন্দুদের গুরু পূজা ও মুসলমানদের পীর ভক্তি, পীর দরবেশদের দরগায় উরস, অলি আল্লাহদের মাজারে অতি মাত্রায় জিয়ারত ও মানত ইত্যাদি হিন্দুদের তীর্থ স্থানের মত করে তোলে। বাংলাদেশের অশিক্ষিত ও গ্রাম্য মুসলিম সমাজে হিন্দুদের পৌরাণিক সমুদ্র দেবতার মত খাজা খিজিরকে মেনে চলা, তাকে উদ্দেশ্য করে ফাতেহা পাঠ করা প্রভৃতি রীতি নীতি বাঙালী গ্রাম্য মুসলিম সমাজ জীবনে হিন্দু প্রভাবে প্রভাবিত।[১] অর্থাৎ হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের মত মুসলমানদের মধ্যেও সে সময় পীর দরবেশদের মাজারে গিয়ে তার কাছে কিছু চাওয়া মানত করা ইত্যাদি বেদাআতী কাজ কর্ম শুরু হয়েছিল। শুধু তাই নয় পীর দরবেশদের কৃপায় বিপদ আপদ, দুঃখ কষ্ট দূর হওয়া এবং তাদেরকে সকল মুশকিল আশানের একমাত্র উপায় হিসেবে মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা, কবরে ধূপ বাতী জ্বালানো, কবরে সিজদা করা ইত্যাদি রেওয়াজ ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল।

এসময় মুসলিম সাধু পীরদের সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের দয়া ও অনুগ্রহে রোগ ব্যাধি আরোগ্য লাভ হতে পারে এরূপ বিশ্বাস ও প্রচলিত ছিল। এ ধরনের বিশ্বাস ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবে ইহা হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল।[২] এইরূপ ভাবে অনেক কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী ভাবধারা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে। এদের কিছু আসে ইসলামে নব দীক্ষিত হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছ হতে। এ সকল নব দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে তাদের কিছু পুরাতন বিশ্বাস, ধ্যান ধারনা ও রীতি নীতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে পারেনি। যখন মিশ্র ভাবধারার অনুপ্রবেশের ফলে ধর্মের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে তখন পুরাতন বিশ্বাস ও রীতি নীতি এ সকল নব দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে জাগরিত হয়ে উঠে। এসব রীতি নীতির মধ্যে ভক্তি ছিল একটি। পীরকে নৈবেদ্য দেয়া হত এবং তাদের সকল বিষয়ে ও সকল সমস্যার সমাধানের জন্য তার আশীর্বাদ কামনা করা হত। দরগাহগুলি তীর্থ স্থানে পরিনত হয় এবং

------ -----------

১. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', (ঢাকা-১৯৬৪) পৃঃ ৭,৮। উদ্ধৃত, বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৩।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

শিরনী ও বাতি দেয়া হয়। এ ধরনের অনৈসলামিক প্রথা স্বাভাবিকভাবে মুসলমান সমাজের কিছু অংশকে কলুষিত করে। উপরন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধদের অনেক স্থানীয় মতবাদ ও কুসংস্কার ধর্মানু-করণের পরও তাদের মধ্যে থেকেই যায় . এবং কালক্রমে এগুলিও তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গীভূত হয়।[১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এভাবে মুসলমানদের কিছু অংশকে পীর ভক্তি এবং পীরের কবরে সিজদা, মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের উদাসীনতা, ও শৈথিল্য সামাজিক জীবনে আঘাত হানে এবং কিছু মুসলমানদের নৈতিক চরিত্রকে দুর্বল করে ফেলে। প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষাও আদর্শ হতে বিচ্যুত হওয়ার কারণে তারা সত্য ধর্ম, জীবনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা হতেও দূরে সড়ে যায় এবং সর্বোপরি নৈতিক চরিত্রের দারুন অবক্ষয় হয়।

উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের মত মুগল শাসনামলে বাংলার জীবন ধারায় ও বিভিন্ন মতের সংমিশ্রন দেখা যায়। এরফলে ধর্ম মতের বন্ধন এবং মুসলমানদের ঐক্য শিথিল হয়ে পড়ে। ফকিরী মতবাদ নামে পরিচিত একটি অদ্ভুত মরমীবাদ সমাজে প্রচলিত হয় এবং এই ফকিরী মতবাদের সংগে হিন্দু যোগীদের অশ্লীলতাযুক্ত হয়। এর ফলে নৈতিক চরিত্রের অবনতি হয় এবং সমাজ জীবনে কিছু লোক অনাচার, ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে।[২] যারফলে সমাজ হয়ে পড়ে কলুষিত। এই কলুষিত পরিবেশের প্রভাবে মুগল শাসন যুগে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ নৈতিক অধপতনের ও সামাজিক বিশৃংখলায় পতিত হয়। এই অধপতনের উদাহরণ হিসেবে এখানে মুসলমান মারফতী ফকীর অর্থাৎ মরমীবাদী ভিক্ষুদের কয়েকটি মত, বিশ্বাস ও সাধন পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সমস্ত ফকীরের দল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। যেমন- আউল, বাউল, কর্তভজা, ও সহজিয়া, ইত্যাদি এরা হিন্দু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুসলিম সংস্করণ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না।[৩] উপরোক্ত আউল, বাউল, কর্তাভজা, হিন্দু বৈষ্ণব, সহজিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের প্রভাবে কিছু মুসলিম মারফতী ফকীর ও মরমীবাদীরা পাপাচার, অশ্লীলতা, ইত্যাদি

----

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৮।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৭।

৩. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ইসলামবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে । এসব মরমীবাদী ফকীরেরা অনেক সময় পবিত্র কুরআনের ভুল অর্থ ও অপব্যাখ্যা দিয়ে বাংলার সাধারণ মুসলমানদের সরলতার সুযোগ নিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে । কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় । কেননা অধিকাংশ মুসলমান ইসলামের বিভিন্ন আকীদার উপর সুদৃঢ় থাকে ।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মুগল শাসনামলে বাংলার মুসলমান সমাজের কিছু অংশ বিভিন্ন ধর্ম, বিশেষ করে বৈষ্ণব, সহজিয়া ও তান্ত্রিকদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দিশাহারা ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । কিছু সংখ্যক মুসলমান এভাবে তাদের খপ্পরে পড়ে দীর্ঘ সময় বিভ্রান্তির বেড়াজালে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল, মুসলমানদের সকলেই যে, এই ইসলাম বিরোধী জঘন্য পাপাচারে গা ভাসিয়ে দিয়ে ছিল, এমন ভাববার কোন কারণ নেই । কেননা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশই একে অত্যন্ত ঘৃনা করত । কতিপয় বিপথগামী, ইসলাম নামধারী মুসলমানেরা এ ধরনের কাজ করত । কেননা তারা এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হোক কোন দিন সমর্থন করেনি । তাই অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় আবরণে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দিয়ে বিভ্রান্ত করে ইসলাম হতে দূরে সরিয়ে দিয়ে পুনরায় হিন্দুয়ানী করার চেষ্টা করেছে । ইসলামের অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে ধর্ম বিমুখ করার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করেছিল । কিন্তু এদের এ প্রচেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ হয় । সত্যিকারের ধর্ম প্রাণ মুসলমানদের আন্তরিক সহযোগিতা,তাদের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের কারণে ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারেনি । সুতরাং তৎকালীন মুসলিম সমাজে কিছু সংখ্যক ভ্রান্ত ফকীর দলের উদ্ভব হয় । তারা হিন্দু ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । এতে তাদের কিছু সংখ্যক অনুসারী সাধারণ মুসলমান ও জড়িয়ে পড়ে । যার ফলে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার সাধারন মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু কতিপয় মুসলমান নামধারী নব দীক্ষিত মুসলমানদের এরূপ আচরণ অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি এবং কোন ক্ষতিও করতে পারেনি । বরং এই বিপথগামী ও কপটচারীরাই প্রকারন্তরে সমাজের কাছে, মানুষের কাছে ঘৃনার পাত্র হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ।

কাজেই দীর্ঘদিন হিন্দু মুসলিম একই সাথে বসবাসের ফলে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানের কিছুটা প্রভাব পড়ে এবং এরফলে কিছু সংখ্যক মুসলিম বিভ্রান্ত হয়ে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক টিটাস উপমহাদেশে ইসলামের উপর হিন্দুদের প্রভাবের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দু মুসলিম বিবাহ, মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীদের মুসলমান শিষ্য গ্রহণ, মুসলিম মানসে হিন্দু চিন্তাধারা ও লৌকিক সংস্কৃতিক প্রভাব এবং ধর্মান্তকরণের অসম্পূর্ণতা।[১] তবে তার এ অভিমতকে আমরা অনেকটা সঠিক বলে মেনে নিতে পারি। কেননা মুসলিম রাজা বাদশাহগণ এবং অন্যান্য প্রভাবশালী মুসলমানেরা অনেক সময় হিন্দু মহিলাদের পত্নী বা উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিংবা অনাথা, অসহায়া, বিধবা হিন্দু মহিলাদের তাদের হেরেমে আশ্রয় দিয়েছে। অমুসলিম বেগম ও হেরেমে আশ্রিতা বিপুল সংখ্যক অমুসলিম মহিলাদের আচার অনুষ্ঠান বেশ ভূষা, শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি মুসলমানদের অত্যন্ত কাছ হতে দেখার সুযোগ হয়েছে এবং এর ফলে দুর্বল নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মুসলিমরা তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে হিন্দু শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্টা হয়ে পড়েছে। যার ফলে কতিপয় মুসলিম বিভ্রান্ত হয় ও ইসলামের প্রতি অনীহা দেখায়। তাছাড়া মুসলমান পীর ফকীরদের হিন্দু শিষ্য গ্রহণ বা যোগী সন্যাসীদের মুসলমান শিষ্য গ্রহণ ইত্যাদিও কিছু সংখ্যক মুসলমানদের উপর প্রভাব ফেলে। সব কিছু মিলিয়েই বলা যায় যে কিছু সংখ্যক বিপথ গামী মুসলমানেরা অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দ্বারা সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং হিন্দু লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তবে সকল মুসলমান সম্প্রদায় যে হিন্দু লৌকিক আচার অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। বরং অধিকাংশ মুসলমান তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ধর্মীয় অনুভূতি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শ নিয়ে তথা ইসলামের মৌলিকতা নিয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ছিল।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় :-

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু মুসলিম ও অপরাপর প্রজা সাধারণের প্রতি মুসলিম শাসক গোষ্ঠীর নীতি ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট, পক্ষপাতহীন, উদার ও সহনশীল। মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন নামক একজন পর্যটক উল্লেখ করেছেন যে,

---

১. এম, টি টিটাস, "ইন্ডিয়ান ইসলাম", দি রিলেজিয়াস ওয়েজ অব ইন্ডিয়ান সিরিজ, পৃঃ ৫৬। উদ্ধৃত, ডঃ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', (১৭৫৭-১৯১৮) বাংলাদেশে ১ম প্রকাশ, (ঢাকা, ১৯৬৪)। পৃঃ ১৬। পুনঃ উদ্ধৃত, বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম বাংলার আইন স্বীকৃত ধর্ম হলেও একজন মুসলমানের অনুপাতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা হচ্ছে একশত জন। সরকারী কাজে কর্মে উভয় সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম কর্ম করতে পারে এবং ধর্মের নামে তাদের মধ্যে কোন প্রকার নির্যাতন ছিলনা।[১] এ থেকে বুঝা যায় যে, মুসলমান শাসকগণ মুসলমানদের জন্য কোন পক্ষপাতিত্ব করেন নি, সকল সুযোগ সুবিধা তাদের প্রদান করেন নি। ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপর জুলুম নির্যাতন করেছেন এর কোন অভিযোগও নেই, বরং মুসলিম শাসকগণ হিন্দুদেরকে রাজ কার্যে মুসলমানদের চেয়ে বেশী বেশী নিয়োগ করেছেন এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদেও তাদেরকে নিযুক্ত করেছেন। তাই মুসলমানদের সরলতা ও আন্তরিকতা হিন্দুদের সংগে তাদের সম্পর্ক আরো জোরদার করে।

বহু শতাব্দী ব্যপী হিন্দু ও মুসলিম একত্রে বসবাস করার ফলে উভয়ের মধ্যে এক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম পরস্পর সংস্পর্শে আসার ফলে এবং দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী ধরে উদার নৈতিক ধর্ম আন্দোলনের ফলে উভয় ধর্ম পরস্পরকে জানে।[২] কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মুসলমানদের প্রভাব গভীরতর ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদেরকে কুসংস্কারাপূর্ণ ও জটিল বর্ণবাদী হিন্দু সমাজ থেকে কিছুই গ্রহণ করতে হয়নি। তা সত্ত্বেও বহু শতাব্দীর পারস্পরিক সহাবস্থানের ফলে মুসলিম সমাজে কিছু হিন্দু প্রভাব পড়ে। তবে এই প্রভাব কিছুটা অধ্যাত্মিক স্তরের এবং কিছুটা বাহ্যিক আচার আচরণে সীমিত। কিন্তু মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিতে কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে পারে নি। তবে বাহ্যিকভাবে কিছু আচার আচরণ মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে।[৩] এভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের বিনিময় থেকে বাংলাদেশে সত্যপীরের পূজা ও উপাসনার উদ্ভব হয়।

বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলিম কবিরা সত্য পীরের পাঁচালী রচনা করেছেন। হিন্দুরা সত্য পীরকে সত্যনারায়ন বলে পূর্ণিমা রাত্রিতে পূজা করে। রাজা রামমোহন রায়ের বালাকাল হতে

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪১।
২. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫১।
৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

রামকৃষ্ণ পরম হংস দেবের জন্মকাল অবধি পর্যন্ত হিন্দুর শ্রাদ্ধকালে সত্যপীরের পাঁচালী ঠাকুরেরা পাঠ করত। ডঃ এনামুল হক উল্লেখ করেছেন যে, এমন দিন ছিল যখন বাংলার প্রায় সর্বত্রই হিন্দু মুসলিম উভয় জাতির মধ্যে সত্যপীর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলার হিন্দু ও মুসলিম কবিরা এই পীরের অবলম্বনে একটি বিরাট পীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন। এই সাহিত্যকে সত্য পীর সাহিত্য নামে অভিহিত করা যায়। উপরোক্ত মুসলমান পীরেরা বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের কাছে আজও শ্রদ্ধা ও পূজা পায়।[১] এভাবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মধ্যে সত্যপীরের পূজা ও উপাসনা চলত এবং আউল, বাউল ও সহজিয়াদের দ্বারা উভয়ের মাঝে একটা সম্পর্কেরও সৃষ্টি হয়েছিল।[২]

অতএব সব শেষে আমরা বলতে পারি যে সপ্তদশ শতকের বাঙালী হিন্দু সমাজ মুসলমানদের সহচার্য্য ও সংস্পর্শে এসে ইসলামী বিধি বিধান আইন কানুন ও ধ্যান ধারণা সম্পর্কে কম বেশী অবহিত হয়েছে এবং তারা মুসলমান কর্তৃক প্রভাবিত হয়। উভয়ের মাঝে কখনো ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কখনো বা সম্পর্কের ফাটল ধরেছে। তবে এ সময় উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে একটা সমঝোতা ও সৌহার্দ বিরাজ করছিল। কিন্তু এখানে একটি কথা বলা দরকার, যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ কখনো মুসলমানদের মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি এবং তারা স্বেচ্ছায় স্বত স্ফূর্তভাবে ইসলাম ও মুসলিম শাসনকে স্বাগত জানায় নি। তারা সর্বদা মুসলমানদের পতন ও ক্ষতি কামনা করত। কিন্তু মুসলমানেরা তাদের ধর্মীয় ও উদারতা দিয়ে সর্বতভাবে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

---

১. ডঃ ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২।

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খন্ড, ১ম পর্ব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় :-(ক) নবাবী ও বৃটিশ শাসনামলে (১৭১৭-১৯০০) বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা (হিন্দু ও মুসলিম) :-

সামাজিকতার দিক হতে নবাবী ও বৃটিশ শাসনামল অতীতের ধারাবাহিকতায়ই রক্ষিত হয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এ সময় অতীতের সামাজিকতার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে যে সামাজিক রীতি,নীতি ও আচার অনুষ্ঠান ছিল, তা অপেক্ষাকৃত উত্তর আধুনিক যুগে চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক উন্নততর সামাজিক অবস্থার দিকে ধাবিত হয়। এ পরিবর্তন হয়ত সময়ের দাবীতে কিংবা মনন শীলতার পরিবর্তন অথবা মানুষের মানষিক, চাওয়া পাওয়ার সাথে সামাজিক পরিবর্তন, এবং ইহাই স্বাভাবিক। এদেশে হিন্দু, মুসলিম জাতির বসবাসই অধিক এবং এদের সামাজিক প্রভাবও অনেক বেশী ছিল। নিম্নে আমরা হিন্দু ও মুসলিম সমাজের সামাজিক অবস্থান কি ছিল এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করব।

হিন্দু সমাজ :-

সুলতানী ও মুগল শাসনামলে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজ বিভিন্ন জাতি, গোত্র, বর্ণ ও উপবর্ণ ছিল। ব্রাহ্মন, কায়স্থ, বৈদ্য, শুদ্র সাধারনত এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে ব্রাহ্মনেরা সবার উর্দ্ধে ছিল। তবে নবাবী শাসনামলে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে দুটি বর্ণই প্রধান ছিল। ব্রাহ্মন এবং শুদ্র। দুই বর্ণের মধ্যে সর্বমোট ৩৬ জাতি ছিল। গঙ্গারাম 'মহারাষ্ট্র পুরানে' ৩৬ জাতির কথা উল্লেখ করেছেন। চতুর্বর্ণের মাঝে দুটি সুর, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে পাওয়া যায় না।[১] দ্বাদশ ও এয়োদশ শতাব্দী হতে বাংলাদেশের হিন্দু

---

১. উইলিয়াম হান্টার, দি এ্যানলস অব রুরাল বেঙ্গল, ১ম খন্ড, পৃ: ১১১-১২। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, দি ট্রান্স ফরমেশন অব ক্যাস্ট মর্ডান বেঙ্গল, সম্পাদনা, এস,পি,সেন, পৃ:৬৮। ভারত চন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃ: ১০। উদ্ধৃত, প্রাকপলাশী বাংলা সামাজিক : ও আর্থিক জীবন, (১৭০০-১৭৫৭) পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে বর্ণ বিন্যাস এরকমই । ছোট খাট দু একটি গোষ্ঠীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থান থাকলেও সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে এরা গণ্য হয়নি । বর্ণ ও জাতির মধ্যে কোন বড় ধরনের পরিবর্তন হয়নি । ঐ সময়ের লিখিত 'বৃহদ্ধর্ম পুরান' এবং 'ব্রহ্ম বৈবর্ত' পুরান' বাংলার হিন্দু সমাজে দুই বর্ণের কথাই উল্লেখ করেছে । বৈদ্য এবং কায়স্থরা বাংলার হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মনদের নীচে স্থান লাভ করেছিল । উল্লেখিত দুখানি গ্রন্থের মতে এরা হলো সৎ শূদ্র এবং উত্তম সংকর । বাংলার হিন্দু সমাজে শূদ্ররাই সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল । এদেরকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে , যেমন-উত্তম সংকর বা জলচর শূদ্র, মধ্যম সংকর বা জল অচল শূদ্র এবং অধম সংকর বা অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য শূদ্র । উত্তম সংকর শূদ্রদের মধ্যে ছিল বৈদ্য, কায়স্থ ও নব শাখরা । এই নব শাখরা আবার নয়টি ব্যবসায়ী এবং কারিগর বর্ণে বিভক্ত যেমন-ধোপা, মালি, তাম্বুলী, তাঁতী, শাঁখারী, কাঁসারী, কুম্ভকার, কর্মকার, ও নাপিত ইত্যাদি । এর নিম্নে ছিল মধ্যম সংকর বা জল অচল শূদ্র । এরা হল কৈর্বত, মাহিষ্য, আগুরি, সুবর্ণ বণিক, সাহা, শুড়ি, গন্ধ বণিক, রারুই বা ময়রা বা মোদক, তেলী, কলু, জেলে, ধোপা ইত্যাদি এবং সমাজ কাঠামোর এক দম নিম্নে ছিল যুগী, চন্ডাল, নমশূদ্র, পোদ, চামার, মুচি, হাড়ি, ডোম, বাউরি, বাগদি, প্রভৃতি জাতির মানুষেরা এরা ছিল অধম বা অস্পৃশ্য জাতি ।[১]

নবাবী শাসনামলে বাংলাদেশে ব্রাহ্মন সমাজ ও পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল । যেমন-রাঢ়ী, বারেন্দ্রী, বৈদিক, সপ্তশতী, এবং কন্যাকুব্জ । বাংলাদেশের বৈদ্যরাও পাঁচ গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল যেমন-পঞ্চকোটি, রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, ও পূর্বকূল । কায়স্থদের মধ্যেও ছয়ভাগ ছিল যেমন- উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিন রাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র ,শ্রীহট্টবাসী ও দাস কায়স্থ । এদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা নিষেধ ছিল । কৌলিন্যের দিক দিয়ে ব্রাহ্মনরা আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল যেমন-কুলীন, শ্রোত্রীয় , গৌনকুলীন, বংশদ ও সপ্তশতী কুলীন । পূর্ববঙ্গে 'গুহরাও' কুলীন ছিল । এ যুগে কৌলিন্য নিয়ে উচ্চ জাতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ ছিল । এই কৌলিন্য প্রথা হতে পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিকৃতি ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । হিন্দু সমাজে সাধারণত সুর নির্দিষ্ট হয় তার বর্ণ ও

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা : সামাজিক ও আর্থিক জীবন, (১৭০০-১৭৫৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

জাতির পেশা দিয়ে। বর্ণ ও জাতির এই বৃত্তিগত চরিত্র নবাবী আমলে ছিল অত্যন্ত পরিস্কার।[১]

রায়গুনাকর, ভারত চন্দ্র ও গঙ্গারাম হিন্দু বাঙ্গালীর বর্ণ ও জাতি ভিত্তিক সমাজের অনেক তথ্য আমাদের অবহিত করেছেন। এদের বিস্তৃত বিবরণ হতে তৎকালীন বাংলার প্রধান প্রধান বর্ণ ও জাতিগুলির বৃত্তি বা পেশার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাম্মনরা সাধারণতঃ বেদ, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায় দর্শন, চর্চা, এবং পুজার্চনা, নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সমসাময়িক বিবরণ হতে জানা যায় যে, একজন ব্রাম্মন প্রয়োজনবোধে সামান্য কেরানীর কাজ করতেন, কিন্তু সেনাবাহিনীর নাজির বা জমাদারের পদ গ্রহণ করতেন না। বৈদ্যরা তাদের জাতিগত পেশা চিকিৎসাতেই নিয়োজিত থাকত। চিকিৎসা ব্যতিত তারা কাব্য, ব্যাকরণ ও আয়ুর্বেদ চর্চা করত। কায়স্থরা একচাটিয়া কেরানীর কাজ করত। রাজস্ব বিভাগের চাকুরী তাদের জন্য নির্ধারিত থাকত। নব শাখেরা তাদের স্বীয় জাতিগত পেশা বা বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। এরা সাধারণতঃ ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণী ছিল। তাম্বুলী তেলি ও গোপ এরা ছিল ব্যবসায়ী, অন্য সাত জাতি কারিগর ছিল যেমন-কাসারী, শাঁখারী, তাঁতী, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, ও নাপিত প্রভৃতি। দ্বিতীয় শূদ্রুরা প্রধানত চাষাবাদ ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। অন্যসব তৈল বানানো, মাছ ধরা, কাপড় কাচা, প্রভৃতি জাতিগত বৃত্তিধারী ছিল। অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা ছিল যেমন চাষী শ্রমিক, পশু পালক, শিকারী, লাঠিয়াল, পাইক ও বরকন্দজ ইত্যাদি। এ সময় বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে ক্ষত্রিয় বর্ণ ছিল না। তাদের কাজ করতে গোয়ালা, বাগদি, হাড়ি, ডোম, প্রভৃতি উপ বর্ণের লোকেরা নিয়োজিত ছিল। স্বর্ন বনিকদের অনেকে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, সরকার, গোমস্তা ইত্যাদি হিসাব নিকাশের কাজ করত।[২] তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নবাবী শাসনামলে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের মধ্যে বর্ণ, উপবর্ণ জাতির মধ্যে বৃত্তি বা পেশা পরিবর্তন নিয়মিতভাবে ও অহরহ ঘটত। তবে পেশার পরিবর্তন হলেও তারা উচ্চ জাতে উঠতে পারত না।

----- -----------

১. প্রাক পলাশী বাংলা : সামাজিক ও আর্থিক জীবন (১৭০০-১৭৫৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ১৭-১৮।

২. গঙ্গারাম মহারাষ্ট্র পুরান, পৃঃ ২১-২২। ভারত চন্দ্র বিদ্যা সুন্দর, ভারত চন্দ্রের গ্রন্থাবলী পৃঃ ৬৯। উদ্ধৃত, প্রাক পলাশী বাংলা: সামাজিক ও আর্থিক জীবন ১৭০০ - ১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এভাবে হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতি, গোত্র ও বর্ণ বিদ্বেষের কারণে সমাজ শতাধিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ছিল না। বিভিন্ন সামাজিকতা, অনুষ্ঠান, উৎসবাদিতেও বাধা নিষেধ ছিল। একের সাথে অপরের স্পর্শ ও দুষনীয় ছিল। পারস্পরিক বিবাহ সাদী ও সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাম্মনরা কৌলিন্যের দাবীতে সমাজের উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হয় এবং তারা নিম্ন স্তরের মানুষদেরকে অত্যন্ত ঘৃনার চোখে দেখত। তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীরা সমাজের এ সমস্ত অন্ত্যজ শ্রেণীদের পদচারনাও সীমিত করে দেয়। এভাবে তারা সমাজে উচ্চ নীচের ব্যবধান সৃষ্টি করে।

সুলতানী ও মুগল শাসনামলের ন্যায়, নবাবী শাসনামলেও হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনুর্ধ ৮ বছরের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার প্রথা চালু ছিল। তবে ১২ বছরের মধ্যে বিয়ে দেয়া অত্যাবশ্যক ছিল। অন্যথায় সামাজিকভাবে নিন্দা ও ঘৃনার পাত্র হতে হত, তাছাড়া পাপ ও অকল্যাণ এর ভয় ছিল। এজন্য বাল্য বিবাহের কারণে সমাজে বিধবাদের সংখ্যা প্রচুর ছিল। এই বিধবাদের কঠোরভাবে সামাজিক বিধি নিষেধ পালন করতে হত। একাদশীতে বৃদ্ধা, যুবা সকল বিধবাদেরই উপবাস থাকতে হত। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে বিধবাদের সম্পর্কে সামাজিক সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানো হয়। প্রথমত নাটোরের রানী ভবানী বিধবাদের একাদশী ব্রত পালনের কঠোরতা দূর করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাংলাদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতদের প্রবল বিরোধিতার মুখে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত ঢাকার রাজা বল্লভ বিধবা বিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক পন্ডিত সমর্থন ও করেছিলেন। কিন্তু নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের তীব্র বিরোধিতার মুখে ইহাও বাতিল হয়ে যায়।[১]

হিন্দু সমাজে মেয়েদের স্বামী ও পৈত্রিক সম্পত্তিতে কোন অধিকার ছিল না। কুলীনদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা এ সময়ও প্রচলিত ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে এই বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। এই বহু বিবাহ সম্পর্কে অনেক কাহিনী, গল্প শুনা যায়। যেমন-একবার এক

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৭-৩৮। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০০-৩০১।

Dhaka University Institutional Repository

কুলীন ব্রাহ্মন একশত স্ত্রী গ্রহণ করেছিল । গ্রামবাসীদের অনুরোধে সে একই সংগে তার সকল স্ত্রীদের ঘরে আনে । গ্রামবাসীরা সকলে মিলে চাঁদা তুলে স্ত্রীদের জন্য একশত পাছা পেড়ে শাড়ী এবং একশতটি পিতলের কলসী উপহার দেয় ।[১] এ থেকে বুঝা যায় যে, এ সময় বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে মেয়েদের সামাজিক কোন মর্যাদা ও অধিকার ছিল না । তারা সর্বদা অবহেলিত ছিল ।

নবাবী শাসনামলে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল বলে প্রমান পাওয়া যায় । মিঃহলওয়েল কাসিম বাজারের জনৈক রাম চাঁদের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১৭৪৭ সালে মৃত্যু বরণ করেন । তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সতী হওয়ার ইচ্ছা পোষন করে । যদিও তার আত্মীয় স্বজন এতে বাধা প্রদান করেন কিন্তু সে ফৌজদারদের অনুমতি নিয়ে সহমরনে ঝাপিয়ে পড়ে ।[২] ইউরোপীয় বিবরণী হতে ও অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে সতীদাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় । স্ক্রাফ্টন নামক জনৈক ইংরেজ লেখকের মতে সতীদাহ প্রথা শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে সীমা বদ্ধ ছিল বলে উল্লেখ করেন ।অপর এক ইংরেজ গ্রন্থকার ষ্টাভোরিনাস মত প্রকাশ করেন যে, এই প্রথা কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল ।[৩] অতএব এমন এক নিষ্ঠুর ও অমানবিক প্রথা নবাবী আমলে তথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও প্রচলিত ছিল । সতীদাহ প্রথা নিঃসন্দেহে ধর্মীয় ছত্র ছায়ায় ও আবরণে জঘন্য হত্যা কান্ড ছাড়া কিছু নয় । যদিও হিন্দু শাস্ত্রে সতীদাহ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নেই,তথাপি যুগ যুগ ধরে ইহা সামাজিক বৈধতায় সংঘটিত হয়ে আসছে । সুতরাং হিন্দু সমাজ যে মারাত্মকভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং নবাবী শাসনামলেও এর কোন পরিবর্তন হয়নি তা বুঝা যায়। তবে এ সময় সতীদাহ প্রথার ব্যাপকতা কমে আসছিল ।

অতীতের মত অষ্টাদশ শতকেও বাংলাদেশে দাসত্ব প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল । দুর্ভিক্ষ, দারিদ্রতা ও অভাব অনটনের কারণে নিজকে অথবা নিজ সন্তানদেরকে বিক্রি করত । তখনকার

---

১. সুন্দর বনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩১১ ।
২. কে,কে,দত্ত, 'আলী বর্দী এন্ড হিজ টাইমস', পৃঃ ২৫০ । উদ্বৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৭ ।
৩. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরোসিয় সমাজে দাস রাখা একটা ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়ে ছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল।[১] বাংলার হিন্দু সামাজিক জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক হল, বিভিন্ন ধরনের মেলার অনুষ্ঠান। এ সময়ে চড়কের মেলা, রথের মেলা, বারুনীর মেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চড়ক ও রথের মেলা সারা বাংলাদেশে হত। অবশ্য পূর্ব বঙ্গে চড়কের মেলা এবং পশ্চিম বঙ্গে রথের মেলার সংখ্যা বেশী ছিল।[২]

কোম্পানী বা বৃটিশ শাসনামলে (১৭৬৫-১৯০০) বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা :

হিন্দু সমাজ : নবাবী আমলে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মন, বৈদ্য, কায়স্থ, প্রভৃতি উচু নীচু নানা জাতি ও স্তরের পার্থক্যের উপর সামাজিক মর্যাদা নিরুপিত হত। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে শিক্ষা, শিল্প সাহিত্য, বাণিজ্য প্রভৃতি নতুন রীতি নীতি এবং ইংরেজ শাসনের প্রভাবে জাতি বর্ণ শ্রেণী বিভেদের বৈষম্য অনেকটা ঘুচে যায় এবং নতুন সামাজিক স্তর গড়ে উঠতে থাকে। এ সময় জমিদারী প্রথার ফলে এক নতুন অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইংরেজ শিক্ষার ফলে একদল চাকুরী পায় বা অন্য কোন নতুন ভাবে জীবিকা অর্জনের উপায় করে। জমিদারদের অধীনস্থ কর্মচারী ও মধ্যসত্বভোগীগণ ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প বাণিজ্য দ্বারা মোটামুটিভাবে জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করে। তাই এ সব কিছু মিলেই সমাজে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। মধ্য বিত্ত শ্রেণীর আনুকূল্যে নগরে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ছোট ছোট দোকানদার, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন প্রকার ছোট খাট শিল্পের উপর জীবিকা নির্বাহী, ধনীদের অধীনস্থ কর্মচারী প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। এদের নিম্নে হল পারিবারিক ভৃত্য, কুলি, মজুর দপ্তরি ইত্যাদি নিম্নশ্রেণী। গ্রামাঞ্চলে কৃষি বা কুটির শিল্পের সাহায্যে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা না হওয়ায় মানুষ ক্রমশ এই সব কাজের জন্য শহরে আসতে থাকে। বাঙ্গালী সমাজ ও আর্থিক অবস্থার উপর এর যে প্রভাব পড়ে তার পূর্ণ বিকাশ হয় বিংশ শতকে। এরফলে ক্রমাগত সবার অলক্ষ্যে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ গ্রাম ও পারিবারিক কেন্দ্রিক ছিল তা পুরোপুরি শহর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। মুসলিম সমাজে এর প্রভাব ও পরিবর্তন এতটা মারাত্মক হয়নি।[৩]

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৮৯।

২. প্রাক পলাশীর বাংলা সামাজিক ও আর্থিক জীবন- ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৭।

৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', (কলিকাতা, ১৩৮১)বাংলা)৩য় খন্ড, পৃ: ২৫৮-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

অতীতে যে সকল নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এ দেশে রাজ মিস্ত্রী ও শ্রমিকের কাজ করেছে, এ সময় তারা তা পরিত্যাগ করে কাগজ কলম হাতে নিয়েছে । ধোপা, নাপিত, সুতার, মেথর, ইত্যাদি তারাও কেরানি, সরকার, মোট দালালীর কাজে নিয়োজিত হয়েছে । এরফলে হিন্দু সমাজে দীর্ঘ দিনের জাতি ও বর্ণ ভেদের কঠোরতা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসতে থাকে । উঁচু নীচু জাতি ও বর্ণ গত বৃত্তি ও পেশার অনুসরন যেমন হ্রাস পায়, জন্মগত জাতির মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা তেমনি ক্রমশ হ্রাস পায় । ব্রাহ্মনগণ আর জন্মগত অধিকারের কারণে সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করতে পারত না, তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পায় । ব্রাহ্মন, বৈদ্য, কায়স্থ, প্রভৃতি তথাকথিত উঁচু শ্রেণী এবং গোপ, কর্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, প্রভৃতি তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর স্তর ভেদের পরিবর্তে শিক্ষা, অর্থ, পেশা, ইত্যাদি সমাজে মর্যাদার মানদন্ড হয়ে দাঁড়ায় । তবে হিন্দু সমাজে একমাত্র বিবাহের বিষয়ে প্রাচীন জাতি ভেদের কঠোরতা ও নিয়ম কানুন উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত অটল থাকে । কিন্তু বিশ শতকে এ কঠোরতা ও হ্রাসের সূচনা দেখা দেয় । এবং এ সময় হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশ প্রচলিত হতে থাকে এবং এর আইন গত বাধা বিপত্তি দূর হয়ে যায় ।[১]

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইংরেজ প্রভাবে ও শিক্ষার কারণে নাগরিক ও গ্রাম্য সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল । আর এই পরিবর্তনের কারণ হল নব্য শিক্ষিত ও চাকুরী জীবি সম্প্রদায় । কেননা এ সময় অর্থ ও প্রতিপত্তিই প্রাধান্য পায় । এ ছাড়া গ্রামের শিক্ষিত মহল সরকারী চাকুরী বা অন্য কোন চাকুরী গ্রহণ করে শহরের দিকে ধাবিত হয় । এতে গ্রামে শিক্ষিত লোকের বাস ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, অপর দিকে শহরে শিক্ষিত ও চাকুরী জীবির স্বামী-স্ত্রীক বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । এতে পাশ্চাত্য সমাজের প্রভাব ও সমস্ত পরিবারের উপর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন শিথিল হয়ে আসে । উনিশ শতকের শেষের দিকে এই অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং বিশ শতকের প্রথম হতে এই পরিবর্তনের ধারা সমাজ জীবনে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় ।

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৩-৬৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যের আধুনিক সমাজের প্রভাব, শিক্ষা দীক্ষা, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি এ দেশের নাগরিক জীবনকে প্রভাবিত করলেও গ্রাম্য জীবনকে তখনো এতটা প্রভাবিত করতে পারেনি । তাই হিন্দু সমাজে এ সময় গ্রাম্য জীবনের অনেক কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয় । কেননা দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ও বিশ্বাস ইংরেজ প্রভাবে হ্রাস পেলেও পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি । তাই স্বভাবতই কুসংস্কার তখনো ছিল ।

সতীদাহ প্রথা প্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশে চলে এসেছে । ইংরেজ শাসনের আধুনিক যুগেও এরূপ নিষ্ঠুর প্রথা হিন্দু সমাজে বিরাজমান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । ১৭৯৯ সালে নদীয়ার এক কুলীন ব্রাহ্মনের ২২টি স্ত্রী ছিল । তার মৃত্যুতে সব স্ত্রী তার সাথে সহমৃতা হয় । ঐ সময়ই শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী সুকচরা গ্রামে এক কুলীন ব্রাহ্মনের মৃত্যু হয় । তার ৪০ জন স্ত্রীর মধ্যে ১৮ জন স্ত্রী জীবিত ছিল এবং সকলেই তার সাথে সহমৃতা হয় । ১৮০৪ সালে কলিকাতার চর্তুদিকে ৩০ মাইল বিস্তৃত সীমার মধ্যে প্রায় তিনশত বিধবা সহমৃতা হয় । ১৮১২ সালে কালিঘাট বাজার হতে গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে প্রায় ৭০ জন বিধবা সহমৃতা হয়েছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় ইংরেজ শাসনামলে শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা ও আধুনিকতার যুগেও ধর্মের নামে বর্বরও নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল । কিন্তু এরূপ নৈতিকতা বিরুধী প্রথা দূর করনের তেমন কোন জোড়ালো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি । ইংরেজ সরকার ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না এই নীতির কারণে শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় বিধি অমান্য করে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের মত স্পর্শকাতর ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেননি । কেননা সরকার অনুধাবন করেন যে, এতে তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হবে ও সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি হতে পারে । তাই এই আশংকায় সরকার ধর্মীয় অনুভূতিতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয়নি । তবে ইংরেজ সরকারের ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি থাকা সত্ত্বেও কিছু সাহসী অফিসার শতাব্দীর এই নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করেছেন ।

এই প্রথা রহিত করার জন্য তাই ১৮১৩ সালে প্রাথমিকভাবে এক নির্দেশ জারী করা হয় যে মাদক দ্রব্য দ্বারা বিধবাকে অজ্ঞান করে এবং গর্ভিনী বা ঋতুবতী হওয়ার পূর্বে কোন বাল বিধবার

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সহমরন ম্যাজিস্ট্রেট রহিত করতে পারবেন । ১৮১৭ সালে অপর এক আদেশ জারী হয় যে, যে সব বিধবার স্তন্যপায়ী শিশু অথবা ৭ বছরের ছোট সন্তান আছে অথচ তাদের পালন করার কেহ নেই, তারা সমমৃতা হতে পারবেন না । উপরন্তু সহমরনের পূর্বে অভিভাবকেরা পুলিশকে অবহিত না করলে দন্ডনীয় অপরাধ বলে গন্য হবে । কিন্তু এতে বিশেষ কোন লাভ হয়নি । ১৮১৮ হতে ১৮২৮ সালে মধ্যে কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বেনারস ও বেরিলী এই ছয়টি বিভাগে গড়ে প্রতি বছর ছয় শতেরও বেশী বিধবা সহমৃতা হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । বাংলাদেশে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা সহমরনের হার বেশী ছিল ।১৮১৫ ও ১৮১৭ সালে সতীদাহ প্রথা নিয়ন্ত্রন ও রহিত করার জন্য যখন হিন্দুরা সরকারের নিকট আবেদ করেন তখন রাম মোহন রায় এবং তার সহযোগীরা এর বিরুদ্ধে সরকারের নিকট পাল্টা আবেদন করেন । এ সময় হতে রাম মোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন করেন এবং শশ্মান ঘাটে গিয়ে সহমরনার্থী বিধবাদেরকে বহুভাবে একাজ হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন ।[১]

ঊনিবিংশ শতাব্দীর ৩য় দশকে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠে । কিন্তু পন্ডিতদের মধ্যে দুটি দল ছিল । এক দলের অভিমত ছি, সরাসরি আইন করে এই নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদের করা হোক । অপর দলের মতে এ বিষয়ে আন্দোলনের ফলে জনগণ এই প্রথার নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করবে এবং আপনা আপনিই এই প্রথা রহিত হবে । রাম মোহন রায় এই মতেরই সমর্থক ছিলেন । লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং সতীদাহ প্রথা নিষেধের আইন জারি করা স্থির করে রাম মোহনের সহিত পরামর্শ করেন, তখন রাম মোহন ইহা সমর্থন করেন নি । তবে তিনি লর্ড বেন্টিংকে পরামর্শ দিলেন যে, আইন না করে এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানা বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে পুলিশের সাহায্যে ইহা উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে । কেননা তাদের আশংকা ছিল, এতে হয়ত হিন্দু জনসাধারণ এবং বিশেষ করে দেশীয় সৈন্য বিদ্রোহ করতে পারে । অবশেষে বেন্টিং সামরিক কর্মচারী ও অন্যান্যের সংগে আলোচনা করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ১৮২৯ সালে ৪ঠা

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর এক আইন পাশ করে সতীদাহ প্রথা দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন । এই আইন পাশ হওয়া মাত্রই প্রাচীন পন্থি ও মৌলবাদী হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে । অনেক উচ্চ পদস্থ ও প্রভাবশালী হিন্দু এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন । এদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধা কান্ত দেব, মহারাজা কালী কৃষ্ণ ঠাকুর বাহাদুর, গোপীমোহন দেব, প্রমুখ ব্যক্তি বর্গ । আইনের দ্বারা সতীদাহ প্রথা রহিত করায় রাম মোহন প্রথমত আপত্তি করলেও আইন পাশ হওয়ার পর তিনি তা পুরোপুরি সমর্থন করেন ।[১]

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রাচীন কালের বর্বর সহমরন প্রথা ইংরেজ শাসন তথা আধুনিক যুগেও বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল । কিন্তু ইংরেজ সরকার যখন এই অমানবিক প্রথা রহিত করার জন্য আইন প্রণয়ন করেন, তখন এ দেশেরই সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালী শিক্ষিত হিন্দু সমাজ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেন । অবশ্য সামাজিক সচেতনতার কারণে ও সরকারী পদক্ষেপে পরবর্তীতে এ প্রথা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায় ।

প্রাচীন কাল হতে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথা পালিত হয়ে এসেছে । কিন্তু আঠার ও উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের আধুনিক যুগেও সাধারণত রজস্বলা হওয়ার পূর্বে এবং অনেক স্থলে এর বহু পূর্বেই এমনকি তিন চার বছর বয়সেও কন্যার বিবাহ হত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । বাল্য বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে অবশ্য প্রগতিবাদী কিছু কিছু হিন্দু আন্দোলন শুরু করে । ১৮৮৯ সালে হরিমাইতি তার বালিকা স্ত্রী ফুল মনির সংগে বল পূর্বক সহবাস করার পর তার মৃত্যু হয় । এতে বাল্য বিবাহে বিরুদ্ধে বাংলায় ও বাংলার বাইরেও আন্দোলন তীব্রতর হয় । কলিকাতার হেলথ সোসাইটি এবং ৫৫ জন মহিলা চিকিৎসক মহারানী ভিক্টোরিয়ার নিকট এ সম্পর্কে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন । অবশেষে মালাবির প্রচেষ্টায় ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি বয়স সম্বন্ধে এক আইন পাশ করা হয় । এতে ১২ বছরের কম বয়সে বালিকা বধুর সাথে সহবাস করলে স্বামীর দন্ডনীয় অপরাধ বলে গন্য হবে ।[২] এতে বুঝা যায় যে, বিংশ

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৪১

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল । তবে সরকারী আইন প্রণয়নের ফলে এবং এ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতার বৃদ্ধি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলনের কারণে বাল্য বিবাহ প্রথা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, তবে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি ।

প্রাচীন কাল হতে বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল । ইংরেজ শাসনামলে বিধবা বিবাহের প্রচলনের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালায় । ১৮৫৫ সালের ১৭ই নভেম্বর এক সভায় বিধবা বিবাহ আইনের খসড়া পেশ করা হলে সমগ্র ভারতে এর পক্ষে বিপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় । রাজা রাধা কান্তদেব এর বিরুদ্ধে প্রায় ৩৭ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদ লিপি ভারত সরকারকে প্রদান করেন । নবদ্বীপ, ত্রিবেনী, ভটপল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রসিদ্ধ পন্ডিতগণ বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আবেদন পাঠান । অপর দিকে বাংলাদেশের বহু স্থান হতে বিধবা বিবাহ আইনের সমর্থনে সরকারের নিকট এক আবেদন পত্র পাঠানো হয়েছিল । দীর্ঘ আন্দোলন ও তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে ১৮৫৬ সালে ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয় । কিন্তু আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও সমাজে বিধবা বিবাহ খুব প্রসার লাভ করেনি ও ততটা কার্য কারিতাও হয়নি ।[১]

বাল্য বিবাহের মত বহু বিবাহ প্রথাও বাংলাদেশে প্রাচীন হিন্দু যুগ হতে প্রচলিত ছিল । উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে বাংলাদেশে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয় । কেননা এ সময়ও বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে বহু বিবাহ প্রথা ব্যাপকতর ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । ১৮৩৬ সালে ২৩শে এপ্রিল তারিখে "জ্ঞানান্বেষন পত্রিকায়" প্রকাশিত এক পত্রে ২৭জন ব্রাহ্মনের নাম ও স্ত্রীর সংখ্যা পাওয়া যায় । এদের মধ্যে ৩জনের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৬০ বা তার চেয়ে বেশী, ৩ জনের ৫০ হতে ৬০ জন, ২ জনের যথাক্রমে ৪৭ ও ৪০ জন, ২ জনের যথাক্রমে ৩৪ ও ৩৭ জন, ৭ জনের ২০ হতে ৩০ জন, ৯ জনের ১০ হতে ২০ জন এবং ১ জনের মাত্র ৮ জন স্ত্রী ছিল । উক্ত পত্রের লেখক আরো উল্লেখ করেন যে, আমার বাল্যকালে আমাদের গ্রামের ২ কুলীন ভাইয়ের প্রত্যেকের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৫০ হতে ৬০ জন ।

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও এই কুপ্রথার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি বলে মনে হয়। বিদ্যাসাগর "বহু বিবাহ" নামক গ্রন্থে বহু বিবাহ প্রথার নিন্দা করে লিখেছেন যে, এদেশে ভন্ড ব্রাহ্মন কুলীনদের মত পাষন্ড ও পাতকী ভূমন্ডলে আর নেই। তারা দয়া ধর্ম, চক্ষু লজ্জা ও লোক লজ্জায় একবারে বর্জিত। বাংলাদেশের আধুনিক প্রগতীবাদী সভ্য সম্প্রদায় সতী দাহ প্রথার ন্যায় বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করে। ১৮৫৫ সালে 'বন্ধুবর্গ সমবায়" বা সুহৃদ সমিতি নামক সভা হতে ভারতীয় ব্যাবস্থাপক সভায় বহু বিবাহ রহিত করনের জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়। এর কিছুদিন পরেই ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারত সরকারের নিকট এ বিষয়ে এক আবেদন করেন এবং এর পরে বাংলাদেশ হতে কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষরিত ১২৭টি আবেদন পত্র ভারত সরকারের নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু এখানেও রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা সমুচিন কিনা সে বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে এই আন্দোলন সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে পূর্ব বঙ্গের জনৈক রাস বিহারী মুখপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর ও বর্ধমানের মহারাজা বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য আইন সভায় আবেদন করেন। অপর দিকে রাধাকান্ত দেব এর বিপক্ষে আবেদন করেন। তবে বিভিন্ন কারণে এ সম্পর্কে আলোচনা বহু দিন যাবত স্থগিত থাকে। অবশেষে ১৮৮৬ সালে বাংলার গর্ভনর এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য বাঙ্গালী ও ইংরেজ সদস্য নিয়ে এক কমিটি গঠন করেন। বিদ্যাসাগর ব্যতীত আর সকল বাঙ্গালী সদস্যই এ বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বংকিম চন্দ্র চট্টপাধ্যায় ও এই মতের সমর্থন করেন। সুতরাং গভর্নর অবশেষে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে অস্বীকার করেন।[১]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বহু বিবাহ প্রথার পক্ষে বিপক্ষে তীব্র তর্ক বিতর্ক ও বিরোধীতার কারণে ইংরেজ সরকার আইন প্রণয়ন করতে সাহসী হননি। কেননা এতে সামাজিক অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে বলে গর্ভনর নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ও চুপ থাকার নীতি গ্রহণ করেন

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৯-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এতে এদেশে বহু বিবাহের ক্ষেত্রে যে অবস্থা বিরাজ করছিল তা সেভাবেই থেকে যায়। তবে বিভিন্ন সময় সামাজিক আন্দোলন ও সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বহু বিবাহের ব্যাপকতা হ্রাস পায়। কিন্তু ইংরেজ সভ্যতা ও আধুনিকতার যুগেও বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে বিভিন্ন ধরনের এসব সামাজিক কুসংস্কার ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ কর্ম বহাল থেকেই যায়।

পূর্ব বাংলার হিন্দুদের মধ্যে নারীদের পর্দা পালনের ব্যাপারে খুব একটা দৃষ্টি দেয়া হত না। এক মাত্র যারা নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্গত কেবল তারাই সর্বদা প্রকাশ্যে চলাফেরা করত। ইহা উল্লেখ্য যে, নিম্ন শ্রেণীর মহিলাদের কিছু সংখ্যক মহিলা পুরুষদের মত পরিশ্রমের কাজ করত বিশেষ করে, কুটিয়াল শ্রেণীর মহিলাগণ ধান ভানা, দালান নির্মানের জন্য ইট ও অন্যান্য উপকরণ বহন করা ইত্যাদি কাজ করত। এ ছাড়া যারা জেলে ও বেদে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তারাও নৌকা চালানো, মাছ ধরা ইত্যাদি মত দৈহিক শ্রমের কাজেও নিয়োজিত হত। এ অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর মেয়ে ও পুরুষেরা পশ্চিম বাংলার জেলা সমূহে বসবাসকারী একই অবস্থার ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক উন্নত পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করত। এদের খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিকেই দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র বস্ত্র ছিলনা। শহর ছাড়া চামড়ার জুতা খুব বেশী প্রচলন ছিল না। গ্রামে কাঠের জুতা বা খড়ম ব্যবহৃত হত।[১] হিন্দু মুসলিম নারীরা একই ধরনের কাপড় পরিধান করত। পার্থক্য ছিল শুধু আচলের রঙে। হিন্দু নারীরা সাধারণত লাল রং এর আচলের শাড়ী এবং মুসলিমরা কাল আচলের শাড়ী পড়ত। হাতের বালাও কাপালের উপর ডোরা কাটা সিঁদুর হিন্দু নারীর স্বামী জীবিত থাকার চিহ্ন বহন করত। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, ও ছোট ছোট মুক্তা, ইত্যাদি নির্মিত অলংকার এবং গরীবদের মধ্যে টিন, পিতল, সীসা ও দস্তা নির্মিত বস্তু দ্বারা তৈরী অলংকারাদী ব্যবহার করত।[২]

বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের আনন্দ উৎসব অনেকটা ধর্মকেন্দ্রীক। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার পার্বনাদি পালন করতে গিয়ে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হত। গ্রামগঞ্জ, শহর বন্দরে এসব

---

১. কোম্পানী আমলে ঢাকা, পূর্বোক্ত, পৃ ২০৮-৯।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসবাদি পালিত হত । বিভিন্ন উৎসবাদির মধ্যে হিন্দুদের মধ্যে দুর্গা পূজা উৎসবই সবচেয়ে বড় ও ব্যাপকতর হয়ে থাকত । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা অত্যন্ত আমোদ প্রমোদের ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালিত হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ।

মিঃ হল ওয়েল ১৭৬৬ সালে প্রকাশিত এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, দুর্গা পূজা হিন্দুদের একটি প্রধান উৎসব । এ উপলক্ষ্যে সাহেব, মেমদের দাওয়াত করা হত এবং প্রতি সন্ধ্যায় ভোজ, খানা পিনা, নৃত্য গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হত । ১৭৯২ সনের কলিকাতা ক্রোনিকাল পত্রিকায় জনৈক সুখময় রায়ের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত নৃত্য গীতির বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে । ১৮২৬ সালে ১২ই অক্টোবর তারিখে গভর্নমেন্ট গেজেট পত্রিকায় দুর্গা পূজার ব্যয় বহুল ও বিচিত্র আমোদ প্রমোদের বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে । জনৈক গোপী মোহন দেবের বাড়ীতে অনেক উচ্চপদস্থ সাহেব মেমের সমাগমে, মদ্য পান খানা পিনা ও ভোজের উৎসব হয়েছিল । মুসলিম বাঙালী ব্যতীত ব্রাহ্মদেশ হতে কয়েকজন নর্তকী ও গায়িকার আমদানী করা হয়েছিল ।[১]

দুর্গা পূজা ব্যতীত শ্যামা পূজা, সুরস্বতী পূজা, হংসশ্বরী, চড়ক পূজার উৎসব ইত্যাদি বাঙালী হিন্দু সমাজ অত্যন্ত জাক জমকের সাথে পালন করত । তবে চড়ক পূজার উপলক্ষ্যে অনেক অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও ঘটত । ১৮৫৬-৫৭ সালে বাংলার গভর্নরের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং বিলাতের ডিরেক্টর সভাও এ বিষয়ে আলোচনা করেন । কলিকাতায় খৃষ্টান মিশনারীরা এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করনের ব্যাপারে সরকারের নিকট অনুরোধ জানায় । কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে কোন আইন প্রণয়ন না করে মিশনারী ও শিক্ষকদের এই সমুদয় নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে উপদেশ দেন । এই প্রথা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকলেও একেবারে সমাজ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি । অবশেষে ছোট লাট বিডন হিন্দু নেতাগণের ও বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্মতিক্রমে ১৮৬৫ সালে ১৫ ই মার্চ মাসে এক ইশতেহারে চড়ক পূজার মত নিষ্ঠুর প্রথা আইন অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে এই প্রথা বন্ধ করার জন্য কড়া নির্দেশ প্রদান করেন ।[২]

---

১. সিলেকসনস ফ্রম কলিকাতা গেজেট, ১৮২৪-১৮৩২, সম্পাদনা অখিল চন্দ্র গুপ্ত, পৃঃ১৫৫-৫৬ । উদ্ধৃত, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭৮ ।

২. সি, এফ, ব্যাকল্যান্ড, 'আন্ডার দি লেফটেন্যান্ট গভর্নর', ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭৭ । আর, সি, মজুমদার, গ্লিমসেস অব বেঙ্গল ইন দি নাইনটিথ সেনচুরি, পৃঃ১৫, ৬৯-৭০ । উদ্ধৃত, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৮৫, ২৯৫-৯৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ বিভিন্ন ভাবে অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। তাদের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সামাজিক রীতি নীতি অত্যন্ত অমানবিক ও নিষ্ঠুর ছিল। তবে বৃটিশ শাসনামলে এর কিছুটা পরিবর্তন হলেও এভাবেই চলে আসছিল। ইংরেজদের শিক্ষা দীক্ষা, চাল চলন, সভ্যতা ইত্যাদির সংস্পর্শে আসার কারণে এদেশের হিন্দু সমাজ অভ্যন্তরে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কথায় বার্তায়, আচরনে বেশ ভূষায়, গৃহ সজ্জায় ইত্যাদি জীবন যাত্রায় প্রায় সকল পর্যায়ে ইংরেজী সভ্যতা ও সমাজের অন্ধ অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা এত প্রবল রূপ ধারণ করেছিল যে, উচ্চ পদস্থ ইংরেজগণ ও এর নিন্দা করেছেন। বাড়ী ঘর আসবাবপত্র, গৃহ সাজ সজ্জায় ইত্যাদি, ইউরোপীয়দের অনুকরণে ও অনুসরণে নির্মিত হত। এভাবে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজদের সমাজ সভ্যতার প্রভাবে হিন্দু সমাজে দীর্ঘ কালের বহুবিধ কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, কৌলিন্য, প্রথা ও উচ্চ নীচের প্রভেদ ইত্যাদি দূর করে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা প্রাধান্য পায় এবং এসব কিছু বহুলাংশে দূর হয়ে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পলাশির যুদ্ধের পর দুইশত বছরের মধ্যে বাংলায় হিন্দু সমাজে কয়েকটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। এর পূর্বে প্রায় ছয়শত বছরের স্বাভাবিক পরিবর্তন ও মুসলিম আগমনের ফলে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, ইংরেজী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তজ্জনিত পাশ্চত্যভাব ও সামাজিক রীতি নীতির সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে পূর্বোক্ত, দুইশত বছরের পরিবর্তন অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ১২০০ সালের হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ১৭৫৭ সালের হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির যে পার্থক্য ও প্রভেদ দেখা যায়, ১৭৫৭ সনের হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি হতে ১৯৫৭ সালের হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির পার্থক্য অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী।[১]

মুসলিম সমাজ :

ধর্মীয় বিশ্বাস আচার অনুষ্ঠান সামাজিক রীতি নীতি ইত্যাদির দিক থেকে মুসলিম সমাজ হিন্দু সমাজ হতে সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দু সমাজে ধর্মীয় দৃষ্টিতে যা বৈধ কিন্তু মুসলিম সমাজে

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় দৃষ্টিকোন হতে তা অবৈধ । হিন্দু সমাজে সাকারে বহু দেবতার পূজা অর্চনা পূন্যের কাজ কিন্তু মুসলিম সমাজে ইহা সম্পূর্ণ হারাম, অবৈধ, ও মহাপাপ । তাই ধর্মীয় ভাবেই উভয় সম্প্রদায় পৃথক সমাজের অধিকারী । মুসলিম সমাজে হিন্দু সমাজের মত কট্টর শ্রেণীভেদ প্রথা ও উচ্চ নীচের কোন প্রভেদ নেই, কৌলিন্য প্রথার কোন প্রশ্রয় নেই । মুসলিম সমাজ এ সমস্ত অমানবিক জাতি, গোত্র, বর্ণ ও কৌলিন্য প্রথার অবসান ঘটিয়ে সমাজের যাবতীয় কুসংস্কার, জড়বাদ দূর করে সমাজকে সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব বোধের বন্ধনে আবদ্ধ করে, সকলের প্রতি সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে একটা শোষনমুক্ত সমাজ গঠনে প্রয়াসী হয়েছে ।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার মুসলমান সমাজের গড়ন হিন্দুদের থেকে বেশ পার্থক্য রয়েছে । একথা অবশ্য ঠিক যে ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের অনেকখানি সাহায্য সহযোগিতা করেছে এবং এ কারণে বাংলার মুসলমান সমাজ কাঠামো-গতভাবে হিন্দু সমাজ হতে আলাদা । মুসলিম সমাজে হিন্দু সমাজ হতে স্তর অনেক কম । এক স্তর হতে অন্য স্তরে যাওয়া অনেক সহজ । খাওয়া দাওয়া মেলা মেশা ও বিবাহ শাদি ইত্যাদি ব্যাপারে কোন ধর্মীয় বা সামাজিক বাধা নিষেধ নেই বল্লেই চলে । মুসলিম সমাজে আশরাফ আতরাফের বা বর্ণের মারাত্মক কোন প্রভেদ নেই । তাই মুসলিম সমাজে হিন্দু সমাজের মত গোত্র, বর্ণ, জাতি ও কৌলিন্য প্রথা দেখা যায় না ।[১] তবে নবাবী আমলে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার কিছু প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় । এ সময় কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল । যেমন উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন । তাই এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে । আশরাফ, আতরাফ ও আরজল । আশরাফ উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান, যেমন- শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মুগল, ইত্যাদি । আতরাফ সাধারন শ্রেণীর যেমন-কৃষিক, শ্রমিক, অন্যান্য বৃত্তিধারী কারিগর, শিল্পী, দোকানদার, তাঁতী ইত্যাদি । আরজল বা পতিত শ্রেণীর মুসলিম, যেমন-চামার, বেদে, বাজীকর, প্রভৃতি । তবে এদের সংখ্যা সমাজে খুবই অল্প । মুসলিম সমাজে সৈয়দদেরকে অভিজাত, ও সামাজিক মর্যাদায় প্রাধান্য দেয়া হয় । শেখদের মধ্যে সমাজে কোরেশী শেখেরাই অগ্রাধিকার পায় । এর প্রধান কারণ হল

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা : সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০ -১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃ:২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (স:) এই কোরেশী বংশেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবে এর অনেক শাখা প্রশাখা আছে, যেমন-সিদ্দিকী, ফারুকী, আশমানী, আব্বাসী, খালেদী, ইত্যাদি। এথেকে বুঝা যায় যে, সৈয়দ এবং শেখরা আরব দেশ হতে এদেশে উদ্ভুত হয়েছে। মধ্য এশিয়ার চঘতাই তুর্কীরা এদেশে মুগল নামে পরিচিতি লাভ করে। এদের মধ্যে মির্জা, বেগ, ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেন। আফগানীরা বাংলাদেশে পাঠান নামে পরিচিত। নবাবী যুগে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে পাঠানদের সংখ্যা বেশী। এরা খান উপাধি ধারন করে। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী আতরাফদের একটি অংশ ধর্মান্তরিত। হিন্দুরা সাধারনভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর মুসলিম সমাজের আতরাফদের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১]

উনিশ শতকের প্রথম দিকে শ্রেণী বৈষম্য এবং বংশ মর্যাদাবোধ মুসলমানদের মধ্যে প্রসার লাভ করে। ফলে তারা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। পরস্পরের মধ্যে বিবাহ শাদী অনুষ্ঠিত হয় না, এমনকি খাওয়া দাওয়া ও চলাচলের ব্যাপারেও তারা অত্যন্ত সচেতন হয়ে পড়ে।[২] মুঘল, পাঠান, সৈয়দ নিজেদেরকে অতি উচ্চ মনে করত। তাদের এ অহংকারবোধ হতে বাংলাদেশে আশরাফ গোষ্ঠী বলে এক শ্রেণী গড়ে উঠে। অনেক সময় দেখা যায় তারা তাদের নিজেদের মধ্যেই পরস্পর বিবাহ সম্পর্ক গড়ে তুলে না।[৩] সৈয়দগণ কিছুতেই ভিন্ন পরিবারে বা ভিন্ন বংশে কন্যাদান করত না। তাই অনেক সময় দেখা যায় যে, উপযুক্ত বংশ ও বরের অভাবে সৈয়দের অনেক কন্যা চিরকুমারী থাকত। হিন্দুদের বৈষম্য নীতির প্রভাবেই মুসলমানরা এভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৪] এভাবে নবাবী ও ইংরেজ শাসনামলে মুসলিম সমাজে হিন্দু সমাজের মত জাতি, বর্ণ ও কৌলিন্য প্রথা অল্প হলেও অনুপ্রবেশ ঘটে, এবং মুসলিম সমাজকে উচচ নীচের প্রভেদ সৃষ্টি করে। কিন্তু ইসলামে জাতি, গোত্র, বর্ণ ও কৌলিন্য প্রথার কোন স্থান ছিল না এবং

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা : সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩-২৪।

২. ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৫৩। উদ্ধৃত ড: আজিজুর রহমান মল্লিক, অনুবাদ দিলওয়ার হোসেন, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮২, পৃ: ২৪।

৩. ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ১ম খন্ড, পৃ: ২৪৫। জে, এ, এস, বি, ১ম খন্ড, ১৮৩২, পৃ: ৪৯৪। উদ্ধৃত, পৃ: ২৪।

৪. ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৫০-৫২। উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পৃ: ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইহা কোনভাবেই স্বীকৃতি দেয়নি । তবে হিন্দু মুসলিম দীর্ঘদিন সহাবস্থানের কারণে হিন্দু প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম সমাজেও উচ্চ নীচের ব্যবধান সংক্রমিত হয় । তবে ইহা তেমন প্রকট ছিল না । বরং সামাজিক সম্পর্ক পারস্পরিক মেলামেশা, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে পরস্পরের সহযোগীতা ও ঐক্যতা বিদ্যমান ছিল ।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে বাংলাদেশে সুফী মতবাদ প্রবেশ করতে থাকে । এর অন্তর্নিহিত বাংলাদেশে মুসলিম শক্তির প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হলে এই প্রভাব ব্যাপকভাবে হয়ে উঠে । নবাবী শাসনামলে সুফী প্রভাব আরো বেড়ে গিয়েছিল । ইরানের সাফাভি বংশের পতনের পর বহু ধর্ম তাত্ত্বিক ও সুফী মতানুসারী সাধু পুরুষেরা বাংলাদেশে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিল ।[১] সারা দেশে যে সব পীর ফকির দরবেশদের মাজার ছড়িয়ে ছিল । তাদেরকে মনে করা হত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী । মৃত্যুর পরও তিনি জীবিত থাকেন । তাদের আস্তানায় মানত, জীবিতও মৃত পীরের নিকট ইচ্ছা পূরনের প্রার্থনা, পীরের কবরের উপর সৌধ নির্মান এবং সেখানে আতর গোলাপ পানি ও লোবান দেয়া, ফুল ও বাতী রাখা, শিরনী মানসিক করা এবং পীরের নামে উৎসর্গকৃত বস্তুকে তবারুক বা প্রসাদ বলে গ্রহণ করা ইত্যাদি এসব প্রচলিত ছিল ।[২]

উনিশ শতকে মুসলমানদের মধ্যে আরো এক ধরনের পীর ভক্তি প্রচলিত হয় । ভক্তেরা মুক্ত হস্তে সে সব পীর ফকীরদের দান করত । তারা আউলিয়া ও সাধু সন্ন্যাসীদেরকে অত্যন্ত বিশ্বাসের চোখে দেখত এবং তাদের সমাধি স্থানে দরগায় রীতিমত শ্রদ্ধা নিবেদন করত ।[৩] সর্বভারতীয় পীর ছাড়াও প্রত্যেক প্রদেশে এমনকি প্রত্যেক জেলাতেও পীরের আস্তানা ছিল । পূর্ব বাংলায় ও পীরের সংখ্যা ছিল প্রচুর । যাদের দরগায় অসংখ্য ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষন করত । এসব পীরের মাজারে নানাভাবে উপাসনা করা হত । কোন ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে বৃহস্পতিবার

----

১. জে,এন,সরকার, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় খন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২, পৃঃ২২৩ । উদ্ধৃত, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮) পূর্বোক্ত, পৃঃ২৮ ।

২. এনামুল হক, মুসলিম বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃঃ ২১১,২২৫,২২৬,১৮৪-৮৬ । উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ২।

৩. টি,এন,টিটু, ইন্ডিয়ান ইসলাম, পৃঃ ১৩১ । উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ১৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা শুক্রবারে মিছিল বের করা হত । সাধারণত মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে দরগায় আসে । অনেকে তাদের মানৎ পুরণের জন্য ও দরগায় আসে, আবার কেউ আসে পুন্য লাভের আশায় ।[১]

উনিশ শতকে বাংলাদেশে এ পর্যায়ে চার প্রকার ফকিরের অস্তিত্বের কথা জানা যায় । যেমন-অর্জুনশাহী, জালালী, মাদারী এবং বেনওয়াজ ইত্যাদি । এরা আবার ১৪ ভাবে বিভক্ত এবং তারা আরো বহু সংখ্যায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল ।[২] জাফর শরীফ, সহজিয়া, সম্প্রদায় নামে আর এক শ্রেণী ফকিরের কথা উল্লেখ করেছেন । তারা মেয়েদের মত পোষাক ও অলংকার পরত । তারা তামবুরা, সেতার ও সারেং বাজাতো এবং আধ্যাত্মিক গুরুরূপে মুর্শিদের সামনে নাচত, গান গাইত ।[৩] এভাবে নবাবী ও বৃটিশ শাসনামলে কিছু মুসলিম অনুসারী পীর ফকীর দরবেশদের অতি ভক্তির কারণে বিভিন্ন ধরনের বেদাআতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং এসব কেন্দ্র করে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে । কিন্তু এসব সূফী দরবেশদের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে তাদের অনুসারিরা বিভিন্ন প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম হতে অনেক দূরে সরে পড়ে এবং তারা ইসলামী শিক্ষা ও তাত্ত্বিকতা বাদ দিয়ে বেদআতী ও কুসংস্কারে ডুবে গিয়েছিল ।

নবাবী শাসনামলে মহানবী (সঃ) এর দৌহিত্র হযরত হোসেন(রাঃ) এর শাহাদৎ বরণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মহররম উৎসব ,মহরম মাসের দশ তারিখে অত্যন্ত জাক জমকের সাথে ও বিলাস বাসনের মাধ্যমে উৎযাপন করা হত । এ উৎসবে হোসেন (রাঃ)এর পবিত্র কবরের প্রতীক সরূপ যে তাজিয়া বা তাবু নির্মিত হত, তা অতি মূল্যবান জিনিষ পত্র দিয়ে অলংকৃত করা হত ।তাজিয়া সংগে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করত । মহরম মাসের দশ তারিখে এর ভক্ত অনুসারীরা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে বিলাপ করত । উৎসব শেষে তাজিয়া,নদী অথবা পুকুরে ফেলে দিত এবং মূল্যবান তাজিয়াগুলি ইমাম বাড়ায় ফিরিয়ে নিত । বাংলাদেশে প্রত্যেক মুসলিম গ্রামাঞ্চলে তাজিয়া নির্মিত হত।

----

১. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান,(১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত,পৃঃ ১২,১৪ ও ১৫ ।

২. ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০৮,১১০ । উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩ ।

৩. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান ১৭৫৭-১৮৫৬, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ বুকানন উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানদের মহরম উৎসব অতি জাকজমক ও আড়ম্বরতার সাথে অনুষ্ঠিত হত। মিছিলের প্রধান আকর্ষন ছিল ঢাক ঢোল ও অন্যান্য বাদ্য বাজনা সহকারে মিছিল। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত হত মেলা ও প্রদর্শনী। সেখানকার বাদ্য বাজনা ও অন্যান্য শব্দের তীব্রতার কানে তালা লেগে যেত।[১]

সমকালীন ব্যক্তিদের লিখনী হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশের মুসলমানরা ধর্মীয় মতে দুভাগে বিভক্ত ও ছিল। শিয়া ও সুন্নী। গোলাম হোসেন তার রিয়াজ উস মুতাক্ষেরীন উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের মুসলমানদের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ সুন্নী এবং একভাগ ছিল শিয়া।[২] বাংলা ও বিহারের মুসলমানরা প্রধানত সুন্নী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় কর্তাভজা নামে হিন্দু মুসলমানের মিলিত এক গোষ্ঠী নিজেদের ধর্মচারকে সত্য ধর্ম বলে উল্লেখ করেছে।[৩] বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এই ধর্মাচার সম্পর্কে মানুষের সাধারণ বিশ্বাস ছিল। এখানকার খৃষ্টানদের মধ্যেও এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।[৪] দেশের ভিতরে লৌকিক প্রভাবে হিন্দু মুসলমানদের সংস্কৃতির সমন্বয়ের কাজটা বেশ দূর অগ্রসর হয়েছিল। নবাব পরিবারে হিন্দু আচার অনুষ্ঠান যে ভাবে প্রবেশ করেছিল, তা থেকেও এ সমন্বয়ের ব্যাপারটা উপলব্ধি করা যায়। মতিঝিল প্রাসাদে শাহামত জঙ্গ ও সাইলত জঙ্গ এবং মনসুর গঞ্জ প্রসাদে সিরাজউদদৌলা সানন্দে হোলি উৎসব পালন করে ছিলেন। মীর জাফর ও হোলিতে অংশ গ্রহণ করতেন।[৫] এভাবে দেখা যায় যে, মুসলিম সমাজের উচ্চ স্তরেই হিন্দুয়ানী প্রভাব প্রতি ফলিত হয়েছে। এতে করে সাধারন মানুষেরাও কিছু না কিছু উৎসাহিত ও প্রভাবিত হয়েছে। তাই ইসলামী বিশ্বাস ও ভাবধারার হতে বিচ্যুত হয়ে বিজাতীয় ভাবধারায় গা ভাসিয়ে দেয়া নিতান্তই কিছু সংখ্যক মুসলিমানের জন্য দুঃখজনক ব্যাপার ছিল।

----

১. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮-৯।

২. গোলাম হোসেন, সিয়ার উল মুতাক্ষেরীন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪০৩। উদ্ধৃত, প্রাক পলাশী বাংলা : সামাজিক ও আর্থিক জীবন (১৭০০-১৭৫৭) পৃঃ ২৬।

৩. এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ২য় খন্ড, পৃঃ৪৯১। উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

৪. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

৫. মুসলিম মানস ও বাংলার সাহিত্য, (১৭৫৭-১৯১৮) পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে মুসলিম সমাজে একটি পুরহিত বা যাজক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল । মোল্লা ও মৌলভীরা ছিলেন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অপরিহার্য । এরা পশু,পাখী জবাই এবং বিবাহ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে নেতৃত্ব দিত । এরা গ্রামাঞ্চলে ঝাড় ফোক, মাদুলি দিয়ে শয়তান, জ্বীন তাড়ানো প্রভৃতি কাজগুলিও করত । সুফী দরবেশ ও ফকীরেরা বাংলার মুসলমানদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি ও বিকাশের সাহায্য করতেন । তারা ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শ অনুশাসনগুলি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতেন ।[১] এ যুগে বাংলার মুসলমান মহিলাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে হিন্দু মহিলাদের তুলনায় ভাল ছিল । পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের স্বীকৃতি ছিল । বিধাবা বিবাহে কোন প্রকার বাধা ছিল না । তবে অনেক সময় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাহ বিচ্ছেদ হত ।[২]

এ সময় বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে কতগুলি নতুন প্রথার উদ্ভব হয়েছিল এবং এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটেছিল যা সম্পূর্ণ ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থী । হিন্দু বিবাহ সাদীর অনেক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কর্ম মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছিল । যেমন বিয়ের পূর্বে কন্যার গোসল,নানা কৌতুক ও রং তামাসা, মেয়েদের শাড়ী পরা, চুলের খোপায় ফুল গুজে দেয়া, ধান দূর্বা দিয়ে বর বরণ করা ইত্যাদি উল্লেখ করার মত । কোন কোন মুসলিম সম্প্রদায়ে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় ছিল । এ ছাড়া কোন স্থানে যাত্রাকালে শুভ অশুভ বস্তু দর্শন, ভূত প্রেতে বিশ্বাস জ্যোতিষদের গণনার উপর নির্ভরশীলতা, মাথায় হাত দিয়ে শপথ করা, শিশুর অনু প্রাশন, প্রভৃতি অনেক হিন্দুয়ানী প্রথা বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল । কিন্তু ইহা মুসলিম শাস্ত্র ও ধর্মানুযায়ী অনুমোদিত ও বিধি সম্মত নয় ।[৩] শুধু তাই নয় ইংরেজ শাসন, শিক্ষা দীক্ষা ও তাদের সমাজ ও সভ্যতা, আচার আচরণ ইত্যাদি এ দেশের মুসলিম সমাজেও নানাভাবে প্রভাব ফেলে । মুসলমানরা ক্রমশই তাদের সামাজিক বন্ধন হতে শিথিল হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও আধুনিকতায় ঝুকে হয়ে পড়ে ।

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা : সামাজিক ও আর্থিক জীবন ১৭০০-১৭৫৭ পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬ ।

২. পূর্বোক্ত,পৃঃ ১৩৮ ।

৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার ,'বাংলাদেশের ইতিহাস,৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১১৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় হিন্দুদের সংগে প্রতিযোগীতামূলকভাবে মুসলমানরা তাদের পথ পরিবর্তন করে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান অতি ব্যয়বহুল ও জাঁকজমক ভাবে পালন করত। সঙ্গীত নৃত্য বাদ্য বাজনা এ সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ থাকত। মেয়েরাও তাদের সংগে আনন্দ উল্লাসে শরীক হত। বিবাহ অনুষ্ঠানাদিতেও এসব পরিবেশ সৃষ্টি করা হত।[১] মেয়েদের যৌতুক প্রথা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কিন্তু এ সময় মুসলিম সমাজে যৌতুক প্রথার প্রচলন হয়। ফলে গরীব পিতা-মাতা কন্যাদায়ে গ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে সমস্ত অবিবাহিত কুমারী মেয়েরা আজীবন কুমারীত্ব বরণ করে অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের সাথে জীবন যাপন করতে থাকে। এর ফলে হিন্দুদের মত মুসলমানরাও কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করাকে চরম অভিশাপ বলে মনে করত।[২] হিন্দু প্রভাবে মুসলমানরা বিধবা বিবাহকে অবৈধ ও অসম্মানজনক বলে ভাবত।[৩] অথচ ইসলামে বিধবা বিবাহ কোন ভাবেই নিষিদ্ধ নয়। মিসেস আলী ১২ বছর ভারত বর্ষে অবস্থানকালে একটি বিধবা বিবাহের কথা শুনেননি বলে উল্লেখ করেন এই অনৈসলামিক প্রথা এমনভাবে মুসলিম সমাজে শিকড় গেড়ে ছিল যে, বাগদত্তা মেয়েরাও স্বামীর মৃত্যুর পরে আমৃত্যু নিসংগ বৈধব্য জীবন যাপন করত।[৪] তবে এর বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজে আন্দোলন শুরু হয়। সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভীই প্রথম ব্যক্তি যিনি বিধবা বিবাহ না হওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। তিনি স্বয়ং তার জৈষ্ঠ্য ভায়ের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করে বিধবা বিবাহের প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[৫]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা বুঝতে পারছি, যে, মুসলমানরা এভাবে দীর্ঘদিন অমুসলিমদের সাথে বসবাসের ফলে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবে স্বীয় ঐতিহ্য ও সমাজ ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে পরে। উনিশ শতকে মুসলমানরা যেভাবে বিজাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার আচরনের প্রভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তাতে তাদের পূর্ণগঠন কঠিন হয়ে পড়ে।

---

১. জে,এ,এস,বি,১ম খন্ড, ১৮৩২ পৃঃ৪১২। উদ্বৃত,বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান ১৭৫৭-১৮৫৬, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭।

২. মিসেস, এইচ,আলী,অবজার ভেশনস্ অব দি মুসলমানস অব ইন্ডিয়া,১ম খন্ড,পৃঃ২১৪-২১৮ উদ্বৃত,বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭।

৩. জে,এ,এস,বি,১ম খন্ড,১৮৩২,পৃঃ৪১৩। উদ্বিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৮।

৪. অবজার ভেশনস্অব দি মুসলমানস্ অব ইন্ডিয়া ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৬। উদ্বৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৮

৫. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকেও ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে যে আলোচনা তুলে ধরা হল, পরবর্তী একশত বছরের মধ্যেই তার গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়। ঐ সময়ের মধ্যে স্বদেশ প্রেম, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রেরণা ও উৎসাহ দেখা দেয় এবং এ সময় বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ফলে ঐসব অনৈসলামিক বিশ্বাস, ক্রিয়া কর্মকান্ড ও আচার আচরণের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। যে সমস্ত কারণে এ সব গুরুতর পরিবর্তন ঘটতে থাকে তন্মধ্যে শিক্ষাই প্রধান ভূমিকা পালন করে বলে মনে হয়।

অতএব সুলতানী ও মুগল শাসনামলে দেশে যে সামাজিক অবস্থা বিরাজ করছিল ইংরেজ, নবাবী শাসনামলে মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতিক অবস্থা কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কিন্তু কুসংস্কার হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। মুসলিম সমাজের কিছু অংশ ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থীও গুটি কয়েক মুসলিম নামধারী পথভ্রান্ত এহেন কান্ড জ্ঞানহীন কাজ করেছে। কিন্তু সমগ্র মুসলিম জাতি নৈতিক, সামাজিক আদর্শ ও বিশ্বাসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তারা এহেন ইসলাম বিরোধী অসামাজিক কাজ হতে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। তবে যারা পথভ্রান্ত হয়েছিল তারা একদিনে বিপথগামী হয়নি দীর্ঘ দিনে হিন্দু মুসলিম সহাবস্থান এর জন্য দায়ী। কেননা হিন্দুরা যেমন মুসলিম সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তেমনি মুসলমানরা ও কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে।

এ ছাড়া আরেকটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায় যে, বহুদিন সহবস্থানের ফলে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল না। সর্বদা সুসম্পর্ক বজায় ছিল। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তবে ইহা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দীর্ঘ দিনের সহবস্থানের পরেও উভয় সম্প্রদায়ই সামাজিক বিধি বিধান ও আচার আচরনের স্বতন্ত্রবোধ বজায় রেখেছে এবং স্বীয় বৈশিষ্টকে সমুন্নত রেখেই হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। অতএব সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, সুলতানী ও মুগল শাসনামলে বাংলাদেশে যে সামাজিক অবস্থা বিরাজ করছিল, নবাবী ও বৃটিশ শাসন যুগে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। বৃটিশ সভ্যতা ও শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবে এবং সমাজ ও ধর্ম প্রচারকদের সংস্কার আন্দোলন ও সামাজিক সচেতনতার কারণে মুসলমানদের মধ্যে কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী কাজ প্রবেশ করেছিল তা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি হিন্দু সমাজেও যে অসামাজিক কাজ অশ্লীলতা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, দাস প্রথা, সতীদাহ প্রথা ও গোত্র, বর্ণ ও কৌলিন্য প্রথা ইত্যাদি কুসংস্কার ধর্মীয় আবরণে পালিত হচ্ছিল তা সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতা এবং বৃটিশ সরকারের আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কারণে অনেকাংশে দূর হতে থাকে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইউরোপীয় সভ্যতা, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং সামাজিক সচেতনতা ও আন্দোলনের কারণে উভয় সমাজের কুসংস্কার ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

(খ) নবাবী ও বৃটিশ শাসনামলে (১৭১৭-১৯০০) বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা (হিন্দু ও মুসলিম):-

হিন্দু ধর্মীয় অবস্থা :

আলোচ্য সময়ে হিন্দু ধর্ম ও ধর্মীয় জীবন প্রনালীকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব। এ ছাড়া আদিবাসী সাঁওতাল একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী ও রয়েছে। এ যুগে বাংলাদেশে হিন্দুদের এক তৃতীয়াংশ ছিল বৈষ্ণব ধর্ম বিশ্বাসী। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চৈতন্য দেব (১৪৮৬-১৫৩৩) যে শক্তিশালী সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন এ সময়েও তা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পর বৈষ্ণবদের মাঝে বর্ণভেদ প্রথা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চ সুরে গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্ম উঠে এসেছিল তা ক্রমশ অবনতি শুরু হয়। রামানন্দ, কবীর, নানক উত্তর ভারতে যে ধর্মান্দোলন গড়ে তুলে ছিলেন তার মূল ছিল একেশ্বরবাদ, সার্বজনীন, ভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা এবং সকলের জন্য প্রেম ভালবাসা। এদের মৃত্যুর পর অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে গরীবদাস (১৭১৭-১৭৭৮) শিবনারায়ন (১৭১০) রামচরণ (১৭১৫) এবং প্রাণনাথ (১৭১০-১৭৫০) এই ধারাটি প্রায় অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। বাংলার বৈষ্ণব সহজিয়াদের উপর এদের প্রভাব পড়েছিল। তবে অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধ প্রভাব, তান্ত্রিক মত, এবং সহজিয়া মত ও পথ বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের বৈপ্লবিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।[১]

---

১. ক্ষিতি মোহন সেন, ভারতীয় মধ্য যুগে সাধনার ধারা, পৃঃ ১১২, ১২০। উদ্ধৃত, প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

চৈতন্য পরবর্তী বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের পরিবর্তনের পিছনে সহজিয়া মতের প্রাধান্য ছিল বলে মনে করা হয়। সহজিয়ারা আউল, বাউল, সাঁই, কর্তাভজা, প্রভৃতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এদের ধর্ম জীবনের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন-গুরুবাদ, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, যৌনতা এবং পরকীয়া প্রেমের বৈধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে লেখা কয়েকটি সহজিয়া পুঁথিতে তন্ত্র শাস্ত্র, অর্থব সংহিতা এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পরকীয়া প্রেমকে সমর্থন করা হয়েছে, শুধু তাই নয়, উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ১৭৩১ সালে জয়পুরের মহারাজা বাংলার বৈষ্ণবদের নির্লজ্জ ও জঘন্য পরকীয়া প্রেমের পথ হতে ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশে কয়েকজন পন্ডিত প্রেরণ করেছিলেন। জয়পুরের পন্ডিতগণ স্বকীয় প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলার পন্ডিতদের সাথে জয়পুরের পন্ডিতদের মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রেমের আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব নিয়ে দীর্ঘ ছয় মাস এক বিতর্ক ও বাক বিতন্ডা চলে। অবশেষে গৌড়িয় পন্ডিতেরা তর্কে বিজয় লাভ করে এবং পরকীয়া প্রেম, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মুক্তির পথ বলে স্বীকৃতি পায়।[১] এ থেকে বুঝা যায় যে, গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্ম, ধর্মের নামে ও সাধনার নামে যৌনতা, অশ্লীলতা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজে বৈধতা দিয়েছে। কিন্তু ইহা নৈতিকতা, ও ধর্মের দিক থেকে সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এভাবে তারা ধর্মের নামে পরকীয়া প্রেমের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে কলুষিত করেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই অধপতন ও অবনতি সত্ত্বেও বৈষ্ণব ধর্ম ও জীবন এ যুগে বাংলাদেশে এক অতি শক্তিশালী ধর্ম আন্দোলন গড়ে তুলে। এ সময় বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। যেমন-বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজারা বৈষ্ণব ছিলেন। রাজা গোপাল সিংহ (১৭১২-১৭৪৭) এবং তাঁর পুত্র চৈতন্য সিংহ বৈষ্ণব ধর্মের একনিষ্ঠ ও উৎসাহী প্রচারক ছিলেন এ ছাড়া বাংলাদেশে অনেক জমিদার ও ধনী ব্যক্তি বর্গ বৈষ্ণব ধর্ম পালন ও বৈষ্ণব ধর্মের সহযোগীতা ও পৃষ্ঠ পোষকতা করেছেন।[২]

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬৪। প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন)১৭০০-১৭৫৭ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭।

২. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কয়েকটি শাখার প্রাধান্য ছিল। যেমন-স্পষ্টদায়ক, সখীভাবক, আউল, বাউল, সহজীয়া, সাঁই, নিত্যানন্দের পুত্র বীর ভদ্র প্রবর্তিত ন্যাড়া, সনাতন গোস্বামী প্রবর্তিত দরবেশীয়, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি সাধন অর্থাৎ নারীর সহিত সাধন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শিষ্য গ্রহণ ও তাদের পরস্পরের খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি এদের বৈশিষ্ট্য। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সখীভাবক সম্প্রদায় কলিকাতায় ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং ব্রাহ্মন কায়স্থ, বৈদ্য, সুবর্ণ বণিক ও অপরাপর ধনী ও মধ্যবিত্তরা এই সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠান করত।[১]

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে কর্তাভজা, সম্প্রদায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। আউল চাঁদ নামক একজন সাধক এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 'গুরু সত্য' এই মন্ত্র প্রচার করেন। ইহা বৈষ্ণব ধর্মেরই একটি শাখা। এই ধর্ম মতের বিশ্বাস হল গুরুই পৃথিবীতে ভগবানের একমাত্র প্রতিনিধি। অবিচলিত মন, নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরজ্ঞানে গুরু সেবা করাই এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। গুরু সেবা করাই হল কর্তা সেবা অর্থাৎ কর্তাভজা এবং এ থেকেই এই ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম হয়েছে কর্তা ভজা। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন জাতি, গোত্র শ্রেণী বিভেদ ছিল না। হিন্দু মুসলিম সকলেই একে অন্যের খাদ্য গ্রহণ করত।[২] গুরুবাদ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল। ডব্লু ওয়ার্ড লিখেছেন যে, তাঁর সময়ে (১৮১১) বাংলাদেশের হিন্দুদের এক পঞ্চমাংশ চৈতন্য দেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।[৩] এ সময় বাংলাদেশে আউল সম্প্রদায়ের প্রচলন দেখা যায়। আউল সম্প্রদায় সম্বন্ধে অক্ষয় কুমার দত্ত উল্লেখ করেন যে, এ সম্প্রদায়ের আর একটি নাম হল সহজ কর্তাভজা। প্রকৃতি সাধন বিষয়ে এদের মত অপর কোন ধর্ম সম্প্রদায় উদার মনোভাব দেখাতে পারেনি। এদের পরামার্থ সাধন

---

১. বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র-৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৮৬,১৮৯। উদ্দৃত, বাংলাদেশের ইতিহাস,৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪০।

২. অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারত বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫২,১৬৪। উদ্দৃত, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস,৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩৩।

৩. ডাব্লু ওয়ার্ড,এ,ভিউ অব দি হিস্ট্রি লিটারেচার এন্ড ম্যাথোলজি অব দি হিন্দোস শ্রীরামপুর, ১৮১৮)২য় খন্ড, পৃঃ ২৪৪,২৪৫। উদ্দৃত, বাংলাদেশের ইতিহাস,৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩৩-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

কেবল দুই একটি প্রকৃতি সহবাসে পর্যাপ্ত হয় না। প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে ইচ্ছানুযায়ী বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা এদের সাধন ভজনে নিয়োজিত হয়ে থাকে। অবশ্য ১৮৭০ সালের দিক্ক এ সম্প্রদায়ের লোকদের বাংলা প্রদেশে সচারচর আর দেখতে পাওয়া যায়নি।[১]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দী হতে উনিশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম এবং এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ধর্ম সম্প্রদায়গুলি বাংলাদেশে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এ সব ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধন ভজন ও ঈশ্বরের কৃপা লাভের মানসে ধর্মের নামে অত্যন্ত অশ্লীল কাজ করত। যৌনতা ও পরকীয়া প্রেম দ্বারা মন ও আত্মা শুদ্ধি হয় এবং এই নির্মল আত্মা ও মন নিয়ে সাধন ভজন করলে স্রষ্টার অনুগ্রহ ও কৃপা লাভ করা যায় বলে তারা বিশ্বাস করত। কিন্তু ইহা ছিল তাদের মন গড়া ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বিশ্বাস। কেননা কোন ধর্ম ও বিবেক ইহা সমর্থন করতে পারে না। বরং ধর্ম যৌনতা, ও পরকীয়া প্রেমকে অত্যন্ত কঠোরভাবে ঘৃনা করেছে এবং মহা পাতকের কাজ বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু এসব সম্প্রদায়ের বিপথগামী অনুসারীরা এভাবে সমাজকে ও ধর্মকে কলুষিত করেছে এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করেছে। তবে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে জনগনের প্রতিরোধেও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের মুখে এ সমস্ত জঘন্য অশ্লীল মতবাদ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং মানুষের বিবেক জাগ্রত হলে অতপর এ সব হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পুরোহিতদের মনগড়া ধর্মীয় মতবাদ সমাজ হতে দূর হতে থাকে।

বাংলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ হিন্দু শাক্ত ও শৈব ধর্ম বিশ্বাসী ছিল। বাংলা ১২৭৭ সালে শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত তার সময়কার বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, উনবিংশ শতকে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গানপাত্য এই পাঁচটি ধর্ম সম্প্রদায়ে প্রধান বলে বিবেচিত হত। তথাপি এর প্রতিটির মধ্যেই দুদল ছিল। একদলে ছিলেন ব্রাহ্মন পন্ডিত ও তদীয় মতানুসারী এরা বৈদিক তান্ত্রিক উভয়েরই অনুষ্ঠান করত। অপরদল বিষ্ণু, শিব, শাক্ত, সূর্য ও গনেশকে ইষ্ট দেবতা স্বরূপ আরো ধনা করত। কিন্তু বেদের শাসন ও ব্রাহ্মন গনের আধিপত্য অস্বীকার করত।[২] এ সময় বাংলার হিন্দুদের ধর্মীয় জীবন রীতিনীতি অনুষ্ঠান, পূজা পার্বন,

---

১. সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৭৫। উদ্বৃত, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪১।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ, সব কিছুই স্মৃতি রচনাকার রঘুনন্দের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তত্ত্বগুলি হল শুদ্ধি তত্ত্ব, উদ্বাহ তত্ত্ব, তিথি তত্ত্ব, সংস্কার তত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, ইত্যাদি। এ যুগে বাংলার হিন্দু সমাজে রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলি কঠোরভাবে পালন ও প্রয়োগ করা হত। শক্তির প্রতীক, দুর্গা, কালি, এযুগেও পূর্বের মত পূজিত হত। এ পূজানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ছাগল, মহিষ ইত্যাদি বলি দেয়া হত। এ সমস্ত পূজা অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যায় জনগণ অংশ গ্রহণ করত। দুর্গা পূজা বাংলার হিন্দু সমাজের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। দুর্গাপূজার সময় বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীত, নৃত্য ও আমোদ উল্লাসের ব্যবস্থা থাকত। বাংলার হিন্দু জমিদার ও অভিজাতেরা এ সময় দুর্গা ও কালী পূজা শুরু করে। এযুগেই রাজাকৃষ্ণ চন্দ্র কালী পূজার অনুষ্ঠান করেছিলেন। ইংরেজ কোম্পানীর কাগজপত্রে দুর্গা পূজার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[১]

ঊনবিংশ শতকের লৌকিক ধর্মের বিবরণ দিতে গিয়ে ওয়ার্ড সাহেব নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি পূজার কথা উল্লেখ করেছেন-যেমন-রাধা, সংকানন, কাল ভৈরব, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানেই এই মূর্তির পূজা হত। এছাড়া বর্তমানে প্রচলিত শীতলা, মনসা, ইত্যাদি অনেক পূজা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয় বৃক্ষ যেমন-বট, তুলসী, অশ্বত্থ, বকুল হরীতকী, আমলকী, ইত্যাদি। পশুপাখীদের মধ্যে যেমন-গরু, হনুমান, শৃংগাল, এবং বিভিন্ন দেবতার বাহন পশু পাখী এবং নদ নদীর মধ্যে গঙ্গা, আত্রাই, করতোয়া, প্রভৃতি নদীও শালগ্রাম শিলা এবং ঢেঁকি পূজা বাংলাদেশে এ সময় প্রচলিত ছিল।[২]

এ সময় বাংলার হিন্দুদের এক বিরাট অংশ শিবের উপাসক ছিল। বাংলাদেশের নীচু জাতের হিন্দুরা অধিকাংশই শিবের ভক্ত ছিল। পশ্চিম বাংলা অপেক্ষা পূর্ব বাংলায় শিব বেশী জনপ্রিয় ছিল। বিপদাপদে ও দুর্দিনে এ সব মানুষ আশ্রয়ের জন্য, মুক্তি লাভের জন্য শিবের শরনাপন্ন হত। বাংলার লৌকিক দেবতার সংগে এই শিবের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশে এ সময়ে মহা ধুম ধাম করে শিবের পূজা করা হত। ফাল্গুন মাসে শিব রাত্রির দিনে বা চৈত্র মাসে

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮-১১৯।

২. এ ভিউ অব দি হিস্ট্রি লিটারেচার এন্ড ম্যাথোলজী অব দি হিন্দোস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৫, ২২৪,। উদ্দৃত, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

গাজন ও শিব পূজার সময় আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করা হত। পূর্ব বাংলায় হিন্দুদের শিব পূজা, গাজন, চড়ক, জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল।[১] পূর্ব বাংলার হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাসের আর একটি দিক হল গৃহ দেবতার পূজা। খুব সম্ভবত আদি অধিবাসীদের গৃহ দেবতা পূজা থেকে পূর্ব বাংলার হিন্দুরা এ পূজা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। গৃহ দেবতার সাথে পূর্ব বাংলায় গ্রাম দেবতাও পূজা পেত।[২]

ডক্ ওয়ার্ড বাংলাদেশের বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন অধিকাংশ বৈরাগী চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এদের প্রায় সবার সাথেই একজন করে বৈষ্ণবী থাকে। গোঁসাইরা মালা বদল করে তাদের বিবাহ দেন। এরা গান গেয়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করত। শৈব সন্ন্যাসী সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন যে, এরা শরীরে ছাই ভস্ম মেখে কৌপীন পরে এবং শরীরের উপর একটি রঙিন কাপড় জড়িয়ে রাখে। এদের ময়লাযুক্ত মাথার চুল জট পাকিয়ে অনেক সময় পায়ের গোড়ালিতে পৌঁছে, তবে এগুলির অনেক সময়ই কৃত্রিম পরচুলা পড়ে। এদের মধ্যে কেউ আবার বিয়ে করেনা, মাছ মাংস আহার করে না এবং তেল মাখেনা। বাংলাদেশে শৈব সন্ন্যাসীর সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। এ ছাড়া আরও কয়েক শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিল, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। মৌনী ও উর্ধবাহু সন্ন্যাসীও বাংলায় কিছু কিছু দেখা যেত। দন্ডীদের হাতে লাঠি থাকত, তারা চুল ও দাড়ি মোচ রাখতনা, কোপীন ও লাল রঙের বস্ত্রের উত্তরীয় পড়ত। এরা মাছ মাংস তেল ও সিদ্ধ চাউল বর্জন করত এবং গঙ্গামাটি শরীরে মেখে গোসল করত। এরা ভিক্ষা ও রান্না বান্না করত না। ব্রাহ্মনের ঘরে সম্মানিত অতিথি হয়ে আহার করত।[৩]

---

১. উইলিয়াম হান্টার, 'দি এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল' ১ম খন্ড, ১৮৮৩, পৃঃ ১১, ১৩৩। উদ্ধৃত, প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০।

২. দি এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১। উদ্ধৃত প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন) ১৭০০ -১৭৫৭ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০।

৩. এ, ভিউ অব দি হিস্ট্রি লিটারেচার এন্ড ম্যাথোলোজী অব দি হিন্দোস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭১। উদ্ধৃত বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূজা পার্বন স্ত্রীলোকদের সাক্ষাতে অতিসয় অশ্লীল অঙ্গ ভঙ্গিতে নৃত্যসহ অশ্রাব্য ভাষায় সঙ্গিত পরিবেশন করা হত, হোলি, ঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে বাইজীর গীত ও নৃত্য, গঙ্গার ঘাটে পুরুষদের সামনে যুবতীদের গোসল এবং নিম্ন জাতীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত কালুরায়, দক্ষিন রায়, ওলা বিবি প্রভৃতির পূজা করা হত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] অতএব উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, নবাবী শাসনামল হতে বৃটিশ শাসন তথা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা, পরকীয়া প্রেম ও ভোগ বাদের প্রবেশ ঘটেছিল। এতে ধর্মের বিশুদ্ধতা যেমন বিনষ্ট হয়েছিল, তেমনি নৈতিক ও সামাজিক অবস্থারও চরম অবনতি ঘটেছিল।

আঠার উনিশ শতকে হিন্দু ধর্মে, ধর্মের নামে অনেক পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর প্রথা ও অনুষ্ঠানে প্রচলন ছিল। শতীদাহ প্রথা এবং গঙ্গা নদীতে নীজ সন্তান বিসর্জন তাদের অন্যতম। কোন নারীর সন্তান না হলে এই বলে মানত করত যে, দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদের একটি গঙ্গামাকে উপহার দিবে। অর্থাৎ মা তার নিজ সন্তানকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করবে।[২] কাজেই কতটুকু ধর্মান্ধ ও স্বাভাবিক বিবেক ও জ্ঞানশূন্য হলে এমন অমানুষিক, নিষ্ঠুর, পৈশাচিক কাজ করতে পারে। উনিশ শতকে বহু হিন্দু নারী এভাবে তাদের শিশু সন্তানদেরকে ধর্মের নামে, দেবতাদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজ হাতে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে।

এছাড়া এ যুগে হিন্দু সমাজে ধর্মের নামে অনেক নিষ্ঠুর ও অমানবিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হত। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে চড়ক পূজার উৎসবে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক যন্ত্রনা ধর্মের অংগ বলে বিবেচিত হত।[৩] এই নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক প্রথা দূর করার জন্য সরকারের ইচ্ছা

----

১. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি (জে,এ,এস) ৮ম খন্ড নং ৪,১৮৬৬,পৃঃ২৪৫, উদ্বৃত, বাংলাদেশের ইতিহাস ,৩য় খন্ড,পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৯।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস,৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ২৪২।

৩. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি,১৮৩৩, ২য় খন্ড, উদ্বৃত,বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

থাকলেও বন্ধ করতে পারেন নি । তাই বহু দিন যাবত চেষ্টা করেও সরকার জনমত উপেক্ষা করে এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করতে সাহস করেনি । অবশেষে দীর্ঘ ১০ বছর যাবত নানা আলোচনা, তর্ক বিতর্ক ও আন্দোলনের পর ১৮৬৫ সালে আইন জারী করে ইহা বন্ধ করতে সমর্থ হয় ।[১] উনিশ শতকের শেষের দিকে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও বিভিন্ন অমানবিক প্রথা রহিত করনের পক্ষে বৃটিশ সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন । এতে হিন্দু সমাজ উপরোক্ত অমানবিক কাজ করা হতে অনেকটা সংযত হয় । তাছাড়া পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা ইত্যাদির প্রভাবেও বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ তাদের ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং নিষ্ঠুর পৈশাচিক প্রথা অমানবিক ও বিজ্ঞান সম্মত নয় বলে অনুধাবন করতে থাকে । এরফলে উক্ত অমানবিক ধর্মীয় প্রথাগুলি ক্রমশ দূর হতে থাকে । তবে অশিক্ষিত গ্রামাঞ্চলে ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও নিষ্ঠুরতা তখনো কিছুটা থেকেই যায় এবং আজও তা থেকেই গেছে ।

আলোচ্য ১৭৫৭-১৯০০ সাল এর মধ্যে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় আন্দোলনের এক প্রকার জোয়ার এসেছিল । হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব ও ইংরেজ প্রভাবে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসে শিথিলতা আসে ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি ক্রমশ আকর্ষণ দেখা দিতে থাকে । প্রত্যেক প্রেসিডেন্সি শহরে, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এ প্রবণতা দেখা যায় । তবে কলিকাতায় এ প্রবণতা বেশী দেখা যায় । সেখানে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী হিন্দু ধর্মের সব কিছুই দূষনীয় ভাবতে থাকে এবং প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মের বিরোধীতা করা গর্বের বিষয় মনে করে । তারা দল বেধে ঘরে বাইরে গরুর মাংস খেত ও মদ্য পান করত । মধু সূদন দত্ত ও এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ।[২]

এ সময় খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে অনেক হিন্দুই খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে । হিন্দু ধর্মের এই ক্রান্তিলগ্নে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব থেকে শিক্ষিত হিন্দু সন্তানদেরকে এবং হিন্দু ধর্ম তাদের কবল হতে রক্ষা করার জন্য রাজা রাম মোহন রায় ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে নতুন এক

----

১. সি, এফ বাকল্যান্ড, বেঙ্গল আন্ডার দি লেফটেন্যান্ট গর্ভনরস, পৃঃ৩২, ১৭৭ । আর সি, মজুমদার, গ্লীম-সেস অব বেঙ্গল ইন দি নাইনটিনথ সেনচ্যুরি, পৃষ্ঠ ৬৯-৭০ । উদ্‌ধৃত, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৪৩ ।
২. মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সামাজিক রুপান্তর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মাদর্শ প্রবর্তন করেন । হিন্দু ধর্মের গন্ডির মধ্যেই ইসলামের একেশ্বর বাদের আদর্শে তিনি বৈদান্তিক ব্রাহ্ম্যবাদের আদর্শ প্রচার করেন । নিরাকার পরম ব্রহ্মা উপাসনা করাই এই ধর্মাদর্শের সার কথা । এজন্য কাউকে হিন্দুত্ব ত্যাগ করতে হয় না ।[১] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রাজা রাম মোহন রায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ প্রভাবে হিন্দু ধর্মকে ভাঙ্গনরোধ ও ধর্ম সংস্কার করে নতুন এক ধর্মমত প্রচার করেন, যার নাম ব্রাহ্ম্য ধর্ম ।

রাম মোহনের এই ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও নতুন ধর্মমত প্রবর্তনের মূল সূত্র ছিল প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা । সুতরাং বহুদেব দেবীতে বিশ্বাস ও তাদের প্রতিমা পূজা করা প্রকৃত হিন্দু ধর্মের বিরোধী । এই উদ্দেশ্যে তিনি বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন এবং ঈশ, কেন, কঠ, প্রভৃতি উপনিষদ প্রকাশ করেন । গ্রন্থ রচনা ছাড়াও তিনি ব্রাহ্ম্য ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৮১৫ সালে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন । রাজা রাম মোহনের ধর্ম মতে আকৃষ্ট হয়ে বহু শিক্ষিত ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রথম প্রথম এই সভায় যোগ দিতেন । কিন্তু এরপর রক্ষনশীল হিন্দুরা তা বিরোধীতা মূলক গ্রন্থ রচনা করে এবং তার চরিত্র সম্বন্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করার ফলে যখন তুমুল দলাদলি ও তর্ক বিতর্ক শুরু হয় তখন অনেকেই আর এ সভায় যোগ দিতে সাহস করত না । ১৮২১ সালে রাম মোহন ইউনিটারিয়ান কমিটি নামে আর একটি সভা স্থাপন করলেন । এই সভায় ধর্মমত, খ্রীষ্টান ধর্মমত গৃহীত হয়েছিল এবং এতে ঐ মতেই উপাসনা হত । কিন্তু এ সভাও জনপ্রিয়তা লাভ করেন নি ।[২]

এদিকে ১৮২১ সালে রাম মোহনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ব্রাহ্মন সেবধি' পত্রিকার মৌলিক আবেদন ছিল মিশনারীদের দিক হতে হিন্দু ধর্মের প্রতি আক্রমনরোধ করা । তিনি ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । এরপরে ১৮৩৯ সালে 'তত্ত্ব বোধীনী সভা' স্থাপন করেন এবং

----

১. মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃসামাজিক রূপান্তর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪ । উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৪-৭৫ ।

২. শ্রী ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম মোহন রায়, পৃঃ ১২ । উদ্ধৃত , রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪১ সালে ব্রাহ্ম বিদ্যা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন।[১] এরপর এই ধর্মমত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন, প্রমুখ ব্রাহ্মচারী শিষ্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে ব্রাহ্ম সমাজ সমগ্র ভারত বর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

রাম মোহনের মৃত্যুর পর এ সময় দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্রাহ্ম সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মগ্রন্থ পত্রিকা ও প্রচারকের মাধ্যমে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার ব্যাপকভাবে শুরু হয়। এরপর কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তিনি ১৮৫৭ সালে এই ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্ম সমাজকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কেশব চন্দ্র এই ধর্ম মতকে বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জনপ্রিয় করে তুলেন। কেশব চন্দ্র সম্পাদিত ইন্ডিয়ান মিরারের এক সংখ্যায় (১লা জুন ১৮৬৬) বাংলা ও বাংলার বাইরে মোট ৫৪টি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়েছিল বলে সংবাদ দেন।[২] কিন্তু দেবেন্দ্র নাথের বেদ উপনিষদ প্রীতি ও বেদকে প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ হিসেবে প্রচার, হিন্দু ব্রাহ্মন্য ধর্ম প্রীতি ইত্যাদির ফলে ব্রাহ্ম সমাজে ভাঙ্গন ধরেছিল। কেননা দেবেন্দ্র নাথ ছিলেন প্রকৃত পক্ষে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসী। এই মতানৈক্যের কারণে কেশব চন্দ্র দেবেন্দ্র নাথের দল হতে পৃথক হয়ে নতুন ব্রাহ্ম সমাজ 'নব বিধান' সংগঠন করেন এবং ধর্ম মত প্রচারের আত্ম নিয়োগ করে।[৩]

তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেই পূর্ব বঙ্গে বিশেষ করে ঢাকায় ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার জোরদার করেন। এরই অংশ হিসেবে ১৮৬৫ সালে তিনি ঢাকা আগমন করেন। এরপর ১৮৬৯ সালের মার্চ তিনি দ্বিতীয়বার এবং উক্ত সালে ডিসেম্বরে তিনি তৃতীয় বার ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলে আগমন করেন এবং ব্রাহ্ম সভা ও ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই উদ্যোগেও প্রচেষ্টায় ঢাকায় প্রথম উৎসব পালিত হয়। ১৮৬৯ সালে পূর্ব বঙ্গ ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ঢাকায় দুইদিন ব্যাপী এক আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে ঢাকার নবাব আব্দুল গনি সে উৎসবে অংশগ্রহণ

----

১. উনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭৫।

২. বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃঃ২২৯-৩০। উদ্ধৃত, উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫।

৩. মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সামাজিক রূপান্তর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন ।এ সময় এক উৎসাহী ও সরল হৃদয় সম্পন্ন মুসলিম যুবক ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করে বলে উল্লেখ করা হয় । ১৮৬৯ সালে ৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় এক সভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি ৩৫ জনকে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।[১] সে সময় হতে ব্রাহ্ম ধর্মের কর্মতৎপরতা, প্রচারকার্য ও দীক্ষাদানের উৎসাহ আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পায় । তাদের এ তৎপরতায় অনেক হিন্দুও মুসলিম ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করে । ফলে উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এক বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ।

মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া সমকালীন বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায় 'ইসলাম তত্ত্বের ' (১২৯৫ বাংলা) লেখকগণ যারা পরে সুধাকর (১২৯৬ বাংলা) প্রকাশ করেন, তারা ইসলাম তত্ত্ব ও সুধাকর পত্রিকায় ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারশীল নীতির কথা প্রথম সমাজকে অবহিত করেন এবং সেই সংগে প্রতিরোধের কথা চিন্তা করেন । সুধাকর গোষ্ঠী অপর পত্রিকা ইসলাম প্রচারককেও ব্রাহ্ম ধর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায় ।[২] অর্থাৎ এভাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও বই পুস্তক ইত্যাদি লিখনীর মাধ্যমে এবং সভা সমিতি ইত্যাদি প্রচারনার মাধ্যমে ব্রাহ্ম ধর্মের বিরুদ্ধে মুসলমানরা সামাজিক আন্দোলন ও ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলে । এই ধরনের ব্যাপক প্রচারনায় মুসলিম সমাজ সচেতন হয়ে পড়ে এবং নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বিপথগামীতার পথ পরিহার করে । হিন্দু সমাজ ও বিভিন্নভাবে এর প্রতিরোধে ব্যবস্থা করে ।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ব্রাহ্ম সমাজকে গোঁড়া হিন্দুরা হিন্দুত্বের বাইরেই মনে করত এবং খ্রীষ্টান সমাজের সমতুল্য ভাবত । কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মনদের মধ্যেও হিন্দুত্বের ধ্যান ধারণা আচার আচরণের ও বিশ্বাসে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । বর্তমানে ব্রাহ্ম হিসেবে পৃথক একটা সমাজের অস্তিত্ব দেখা গেলেও প্রকৃত পক্ষে তারা হিন্দু সমাজের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায় ।[৩] অর্থাৎ

---

১. উপাধ্যায়, গৌর গোবিন্দ রায়, আচার্য, কেশব চন্দ্র শত বার্ষিকী সংস্করণ (কলিকাতা ১৯০৮) ১ম খন্ড, পৃঃ ৫২৬-২৭ । উদ্ধৃত,উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬ ।

২. উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৭৬ ।

৩. মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সাংস্কৃতিক রূপান্তর ,পূর্বোক্ত, পৃ। ২৮৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

এখন তাদের আলাদা অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই। ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দু ধর্মেই রূপান্তরিত হয়ে গেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, রাজা রাম মোহন হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, ইত্যাদির হাত হতে রক্ষা করার জন্য একেশ্বরবাদীর ধ্যান ধারণা নিয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তন করেন। প্রাথমিকভাবে ইহা সমগ্র ভারত বর্ষেই আলোড়নের সৃষ্টি করে। বহু প্রভাবশালী হিন্দু ও সাধারণ মানুষ এ ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। অবশেষে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মীয় সমাজ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে এতে ব্রাহ্ম সমাজের গতিরোধ হয় ও এ ধর্মের অনুসারীদের আত্ম বিশ্বাস হারিয়ে যায়। অবশেষে তারা ক্রমশ পুনরায় হিন্দু ধর্মেই বিলীন হয়ে যায়। এভাবে রাজা রাম মোহনের ধর্মীয় সংস্কারও ব্রাহ্ম সমাজ ব্যর্থ হয়ে যায়।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা সবশেষে বলতে পারি যে, সামগ্রিকভাবে আলোচ্য বাংলার হিন্দুদের ধর্মীয় জীবন বিচার বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন (ক) আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় রীতি নীতি, নিয়ম কানুন, সংস্কার, লোকাচার, বাংলাদেশের ধর্মীয় জীবনকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেধে ছিল। (খ) গুরুবাদের প্রাধান্য, গুরুর প্রতি আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, গুরুর আদেশ মান্য করার মানসিক প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। (গ) ইন্দ্রিয় পরায়নতা, পরকীয়া প্রেম এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশা ইত্যাদি আত্মিক উন্নতি এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্যতম পথ বলে মনে করা হত। (ঘ) পীর, সাধু ও সন্যাসীদের উপর বিশ্বাস। রোগ ব্যধি নিরাময়, আশা-আকাংখা ও কামনা বাসনা পূরণ, দূর্যোগ দূর্বিপাক হতে মুক্তির জন্য এ যুগের মানুষ পীরের দরগায় বা সাধু সন্যাসীদের শরনাপন্ন হত। সত্য পীর, মানিক পীর, পীর বদর, ঘোড়াপীর, কুম্ভীরপীর, এবং মাদারী পীর (মাছ ও কচ্ছপের পীর) ইত্যাদি হিন্দুদের পূজা ও মানত পেত। (ঙ) এবং এ সময় হিন্দু ধর্ম জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক হল তীর্থ স্থান ভ্রমন ইত্যাদি।[১]

মুসলিম ধর্মীয় অবস্থা :-

আলোচ্য যুগে বাংলাদেশের অপর প্রধান ধর্ম হল ইসলাম। দ্বাদশ শতাব্দী হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধতা ও স্বকীয়তা বেশ ভালভাবেই ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন

১. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ১২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ও মুসলমানদের স্বাভাবিক সহাবস্থানের ফলে যেমন হিন্দু ধর্মের উপর মুসলিম ধর্মের প্রভাব পড়ে তেমনি আলোচ্য যুগে মুসলিম ধর্মের উপরও হিন্দু ধর্মের প্রভাব পড়ে । এরফলে হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু বিষয় মুসলিম ধর্মে প্রবেশ করে । তাছাড়া মুসলমানরা যখন এদেশ থেকে রাজনৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন হতেই তাদের ইসলামিক ঐতিহ্যের ভাংগন ধরে । তবে ঊনবিংশ শতকে ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে ইসলামের উপর বিজাতীয় যে প্রভাব পড়েছিল এবং বেদাআতের যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা বহুলাংশেই দূর হয়ে যায় । অতএব এ সময়ে মুসলিম ধর্মীয় অবস্থা কি ছিল তাই সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল ।

আলোচ্য যুগে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক হল যাজক শ্রেণীর প্রাধান্য । হিন্দুদের মত মুসলমানদের ধর্ম জীবন, প্রাত্যহিক ও সামাজিক ক্রিয়া কর্ম মৌলবী ও মোল্লাদের দ্বারাই সম্পন্ন হত । এ সময়ে পীরের দরগায় ও মাজারে শিরনী দেয়ার প্রথা বাংলার উচ্চ নীচ সকল শ্রেণী মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । হিন্দু ও ইসলাম পন্থীদের দীর্ঘকাল পাশা-পাশি বসবাসের ফলে নিঃসন্দেহে একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল । সম্রাট আওরংগজেবের পৌত্র বাংলার গভর্ণর আজিমুশশান বাংলাদেশে থাকাকালীন সময় গেরুয়া পরা এবং দোল বা হোলি উৎসবে অংশ গ্রহণ করা শুরু করেছিলেন । নবাব আলীবর্দীর জামাতা নওয়াজেস মুহম্মাদ সৈয়দ আহম্মদ এবং তার দৌহিত্র নবাব সিরাজ উদ্দৌলা ও হোলী উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন ।[১]

মুসলিম জীবনে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বিভিন্নভাবে দেখা দিয়েছিল । মুসলমানেরা ও হিন্দুদের মত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও কাজ কর্মের জন্য যাজক শ্রেণী গ্রহণ করে । হিন্দুদের মত পীর দরবেশ ও সূফীদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও আরাধনা শুরু করে । এছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ও বিবাহ শাদী ইত্যাদিতে হিন্দুদের আচার আচরণ মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে । রক্ষনশীল মুসলমান ব্যতীত মুসলমানদের একাংশ হিন্দুদের অনুসরণ করে গান বাজনায় অংশ নিত । অভিজাত মহল নাচের ও ব্যবস্থা করত ।[২] হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে তাবিজের ব্যবহার,জ্যোতিষ ব

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১২৩-২৪ ।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪-২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস, ভূত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস ইত্যাদি প্রবেশ করে। তাছাড়া হোলী ও দিওয়ালীর মত উৎসবে যোগদান, ইত্যাদি দেখা যেত এবং মুসলমানদের মধ্যে বর্ণপ্রথারও সৃষ্টি হয়। এ সময় হিন্দুদের বন দূর্গার প্রতি পক্ষ হিসেবে মুসলমানদের বন বিবি ফাতেমা, বাঘের দেবতা দক্ষিন রায়ের রূপান্তর হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে গাজী পীরের ... সৃষ্টি হয়। হিন্দুদের সত্য নারায়ন এবং মুসলমানদের সত্যপীরে রূপান্তরিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে খাজা খিজির, বদর পীর, মানিক পীর ও পাঁচ পীরের ভক্তিও দেখতে পাওয়া যায়।[১]

জনৈক ইউরোপীয় গবেষক ভারত বর্ষে মুসলমানদের উপর হিন্দু ধর্মের প্রভাবের চারটি কারণ নির্ণয় করেছেন। তা হল (ক) হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাহ, বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি প্রথা ছিল। (খ) মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্য গ্রহণ। (গ) এবং ধর্মান্তর গ্রহণের অসম্পূর্ণতা। অর্থাৎ ধর্ম শিক্ষার নির্ভরযোগ্য পটভূমি ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি।[২] এখানে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের প্রভাব সম্পর্কে ধর্ম শিক্ষার নির্ভরযোগ্য পটভূমিকার অভাব হিসেবে যে কারণ দেখানো হয়েছে, ইহা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কেননা সমগ্র মুসলিম শাসনামলে মুসলমানগণ শিক্ষা দীক্ষায় প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। তাই সে সময় এই শিক্ষার ব্যাপকতার কারণে মুসলমানরা হিন্দুদের পাশাপাশি অবস্থান করলেও এতটা প্রভাব মুসলমানদের উপর পড়েনি এবং এতটা কুসংস্কারও প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু বৃটিশ শাসনামলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চরম অবনতির কারণে, ধর্মীয় শিক্ষা বিলুপ্তির চক্রান্ত এবং এ বিষয়ে দীর্ঘ শতাব্দীকাল ব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষানীতি, সংস্কার, আইন কানুন ও তর্ক বিতর্কের কারণে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত ক্ষতি সাধিত হয় এবং ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। এই অশিক্ষার সুযোগে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই উপরোক্ত অন্যান্য কারণের চেয়ে কিছু সংখ্যক মুসলমানদের উপর হিন্দুদের প্রভাব বৃদ্ধির কারণ হিসেবে মুসলমানদের শিক্ষার অবনতি ও অভাব জনিত কারণকেই অধিক দায়ী করতে পারি।

---

১. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, (১৭৫৭-১৯১৮), পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সে সময়ের অনেক চিন্তাবিদদের ধারনা হয়েছিল যে, বাংলার মুসলমানের অধঃপতনের প্রধান কারণ হল ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ হতে বিচ্যুতি। ইসলামের শরীয়ত অনুযায়ী ধর্ম কর্ম না করে তারা ইসলামবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন যথাযথভাবে গ্রহণ ও পালন না করার কারণে মুসলিম সমাজে অনৈসলামিক রীতি নীতি প্রবেশ করে ১২৯৯ সনে (বাংলা) আষাঢ় সংখ্যায় ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় লেখা হয় যে, মাওলানা কেরামত আলীর আগমনের পূর্বে বংগের কিছু সংখ্যক মুসলমান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। মুসলমানরা নামাজ, রোজা, প্রভৃতি ধর্ম কর্ম ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন প্রকার হিন্দু আচার অনুষ্ঠানে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। এদ্ব্যতীত পীর ভক্তি, মাজারে দরগাতে বিবিধ বেদাতী কাজ কর্ম, মহররমের সময় তাজিয়াদারী, জারীগান, গাজীর গীত, ইত্যাদি শত শত ধরনের ধর্ম বিরুদ্ধ কাজের অনুষ্ঠান হত। বিবাহ, খাতনা ও স্ত্রী লোকের প্রথম রজস্বলা উপলক্ষ্যে জঘন্য আমোদ প্রমোদ, বাদ্য বাজনা অনুষ্ঠান করা হত ইত্যাদি।[১]

সতের শতকের শেষের দিকে অথবা আঠার শতকের গোড়ার দিকে এদেশে বাউল মতবাদের জন্ম হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে লৌকিক ধর্মমত। ফকীর লালন শাহ এ বাউল মতবাদকে এদেশে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তুলেন। বাউলরা জাতিভেদ বিচার করে না। অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম, জাতিভেদ, উচ্চ নীচ, ধনী গরীব, বর্ণভেদ ও শ্রেনী ভেদ মানেনা। লালনশাহ এবং অন্যান্য বাউলরা শাস্ত্র বা শরীয়তী ধর্মের কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা ভেংগে দিয়ে একটি উদার মানবতাবাদ এবং সহজ পন্থী মরমীবাদের সৃষ্টি করেন। বাউল মতে দেহ সাধনার কথা আছে। এই বামাচারীতান্ত্রিক ধর্মাচরনের কারণে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা বাউলদের সুনজরে দেখতে পারত না। সামাজিক অনাচারের ভয়ে তাদের উৎখাতের চেষ্টা করেছে। অনেক মুসলিম যুবকেরা সংসার ধর্ম ত্যাগ করে বাউল মতে দীক্ষা নিত। শরীয়ত অনুসারী মুসলমানেরা ইহাকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি। তাই মুসলিম ধর্মীয় নেতারা ও আলেমরা বাউল মতবাদকে সমাজ হতে উৎখাত করার জন্য ফতোয়া জারি করেন ও আন্দোলন শুরু করেন।[২]

---

১. ইসলাম প্রচারক, ১২৯৯ আষাঢ় সংখ্যা, উদ্বৃত, উনিশ শতকে বাংগালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭৮।

২. উনিশ শতকে বাংগালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

লালন শাহের মৃত্যুর পর নেতৃত্ব দেয়ার মত যোগ্য লোক না থাকায় বাউলরা আন্দোলনের মুখে সহজেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । তাদের অনেকে শাস্ত্র ধর্মে ফিরে গিয়ে আবার স্বীয় ধর্ম কর্ম শুরু করে । পরবর্তী সময়ে সভা সমিতি, পত্র পত্রিকা ও বই পুস্তকের মাধ্যমে বাউলদের উপর ব্যাপকভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয় । মুন্সী মেহেরুল্লা নামক একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও সংস্কার আন্দোলনের নেতা বাউলদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য শুরু করেন । তিনি সভা সমিতি ও বক্তৃতার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে আপ্রান চেষ্টা করেন এবং সফল ও হন । এ থেকে বুঝা যায় যে, উনিশ শতকের দিকে নানা অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও হিন্দু প্রভাবের কারণে মুসলিম ধর্মীয় সমাজ কলুষিত হয়ে পড়ে । তবে এর মাঝে সংস্কার আন্দোলনের চাপে এসব অনৈসলামিক কাজ অবশ্য বহুলাংশে দূর হয়ে যায় ।

সুতরাং আলোচ্য সময়ে মুসলিম সমাজ কর্মী, চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় নেতাগন ধর্ম সংস্কারের যে দিকটি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন, তা হল মুসলিম সমাজের অনৈসলামিক রীতি নীতির অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার । তাঁরা সমাজের সাধারন শ্রেণীর কিছু মুসলমান হিন্দুদের অনুকরণে পীর পূজা, কবর পূজা, মাজার দরগায় মানত ইত্যাদি শরীয়ত পরিপন্থী ধর্মাচারন , হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক আমোদ প্রমোদমূলক উৎসবে যোগদান, বর্ণভেদ প্রথা, বিধবা বিবাহ রীতি অনুসরন করা হিন্দু নাম গ্রহণ করা ইত্যাদির মধ্যে ধর্মচ্যুতির দোষ এবং সংস্কার ধরেছেন । এসব কিছু একদিকে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘকাল একত্রে বসবাসের ফলে, অপরদিকে প্রকৃত ধর্ম শিক্ষা ও প্রচারের অভাবের কারণে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা পূর্ব পুরুষদের সংস্কার ও বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারেনি । অবশ্য ধর্ম সংস্কারক ও ধর্ম প্রচারকগণের আন্দোলন ও সমাজ চেতনার কারণে এসব অনৈসলামিক কাজ কর্ম সমাজ জীবনে হতে অধিকাংশ দূর হয়েছে ।[১] মুসলমানরা আবার স্বাভাবিক ধর্ম কর্ম করতে শুরু করে ।

----

১. উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, আলোচ্য সময়ে মুসলমানদের উপর হিন্দু ধর্মের প্রভাব ও বেদাআতের অনুপ্রবেশ মুসলমানদের প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রচারনার অভাবেই হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা বৃটিশ যুগে শিক্ষা সংকোচনের ফলে মানুষ যখন ইসলামী জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হয়, তখনই নানা কুসংস্কার ও বিজাতীয় ধর্মীয় প্রভাব মুসলমানদের উপর পড়ে। কিন্তু মুসলিম শাসনামলে কুসংস্কার থাকলেও আলোচ্য সময়ের মত এত ব্যাপক মনে হয় ছিলনা। কেননা সে সময় মুসলিম সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। তাই শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সুবিধা না থাকার কারনে ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে এরূপ হয়েছে বলে ধারনা করা যায়। কেননা এ সময় মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিল। শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা বা সামর্থ তাদের ছিলনা। অথচ মুসলিম শাসনামলে অভিজাত ও ধনীরাই শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করত। তাছাড়া রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই এ সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষায় মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পরে। যারফলে ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্ম সম্পর্কীয় জ্ঞান চর্চার অভাব জনিত কারণে মুসলমানরা ইসলাম সম্পর্কে সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়ে পড়ে। এতে তারা হিন্দু ধর্মের অনেক কিছুই মনের অজান্তে গ্রহণ করে ফেলে। কাজেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির কারণে শিক্ষার প্রসার হ্রাস পেলে ঊনবিংশ শতকে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে এ সময় মুসলমানদের এই অধপতনের হাত হতে রক্ষার জন্য ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের শুরু হয়। যেমন ফারায়েজী, ওহাবী আন্দোলন ইত্যাদি। তাহা ছাড়া ধর্মীয় নেতা ও প্রচারকদের আপ্রান প্রচেষ্টায় মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা ফিরে আসে এবং তাদের ভুল বুঝতে পারে। অবশেষে এভাবে মুসলমানরা হিন্দু প্রভাব হতে বহুলাংশে মুক্ত হয়ে যায় ও বেদাআতে ও অধপতন হতে রক্ষা পায় এবং মুসলিম ধর্মীয় অবস্থা তাঁর স্বকীয় অবস্থায় ফিরে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

(ক) সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ঃ-

জীবন ও জীবিকার মত মানুষের জীবনে শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । খাদ্য মানুষের দেহের পুষ্টি যোগায়, দেহকে সবল ও শক্তিশালী করে । তাই বাঁচার জন্য, দেহ সবল শক্তিশালী রাখার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি জীবন ও মনের খাদ্যের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন । শিক্ষা মানব জীবনের পরিচ্ছন্নতা ও গঠনশীলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । প্রাচীনকাল হতে তাই শিক্ষা মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে । এখানে উল্লেখ্য যে তৎকালীন শিক্ষার মূল বিষয় ছিল ধর্ম অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ধর্ম ভিত্তিক । সে আমলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক কোন শিক্ষাক্রম ছিল না । বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারায় দেখা যায় যে, অতীতে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বৈদিক ও ব্রাহ্মন্য শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল । কিন্তু পরবর্তীতে এর অবক্ষয়ের পর বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে । এরপর দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তার স্বকীয়তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এরপর বৃটিশ শাসনামলে নতুন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা তার আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এভাবেই বাংলাদেশের শিক্ষার ঐতিহ্য বিবর্তনের ধারায় ক্রমশ পরিপূর্ণতা লাভ করে । নিম্নে এদেশের ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তনের প্রক্রিয়া আলোচনা করা হল ।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর এদেশে প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় । এর ফলে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের এক অপূর্ব সুযোগ এসে যায় । তাই বিভিন্ন দেশ হতে বিশেষ করে ইরান, তুর্কী ও আফগানিস্তান হতে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সুফী, দরবেশ এদেশে আগমন করতে থাকে । তাদের সাহচার্যে ও ইসলামের সাম্যের বাণী শ্রবন করে দলে দলে মুসলমান হতে থাকে । তাছাড়া অনেক আরবীয়রা এদেশে বিবাহ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে । এভাবে বিদেশাগত মুসলমান, ধর্মান্তরীত মুসলমান এবং জন্মগত মুসলমানদের সমন্বয়ে এদেশে আলাদা মুসলিম সমাজ গড়ে উঠে । ফলে দেখা যায় যে, মুসলিম বিজয়ের একশত বছরের মধ্যে বাংলাদেশে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা বহুগুনে বৃদ্ধি পায় । বাংলাদেশে তখন হিন্দু ও মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

এ দুটি সম্প্রদায়ই প্রধান ছিল । হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস,আদর্শ, আচার অনুষ্ঠান, শিল্প কলা, সাহিত্য, ধর্মীয় উৎসবাদি যেমন রয়েছে, তেমনি এদের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে । শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানের আলো দেয় ও কুসংস্কার দূর করে, এবং স্রষ্টাকে অনুভব করার, জানার সুযোগ করে দেয় । তাই হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব দেখা যায় । অবশ্য শিক্ষাকে ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় আদেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । তাই মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শিক্ষার প্রসার ও বিকাশের গুরুত্ব দেখা যায় । এই শিক্ষা বিকাশের জন্য রাজা বাদশাহ আলেম, সূফী দরবেশ ও সাধারণ মানুষ বিরাট ভূমিকা পালন করেছে । অপরদিকে হিন্দু সমাজ ও শিক্ষার গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার বিকাশ ঘটিয়েছে । এতে বুঝা যায় যে, সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে । অতএব হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা কি ধরনের ছিল এবং কিভাবে সুলতানী আমলে এর বিকাশ ঘটে তা নিম্নে আলোচনা করা হল ।

সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা ঃ-

বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বিভিন্ন দেশ হতে সূফী দরবেশ আলেম, ব্যবসায়িক ও মুসলিম সৈনিকরা এদেশে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে । এই বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং জন্মগতভাবে এ দেশীয় মুসলমানদের সমন্বয়ে ক্রমেই এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । মুসলমানদের কৃষ্টি সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আচার, অনুষ্ঠান ধর্মীয় বিধি বিধান ইত্যাদি যেহেতু আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সেহেতু মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর অস্তিত্বও স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে । আর এজন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষার । তাই বখতিয়ার খিলজী অনুধাবন করেন যে, এদেশে মুসলমানদের সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলার জন্য তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে যদি সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা না যায়, তবে হয়ত একদিন এদেশে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যাবে . এবং মুসলমানদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শে গড়ে তোলা না যায়, তাহলে এদেশের মানুষের কাছে ইসলাম টিকে থাকবেনা । শুধু ধর্ম প্রচার করে মুসলমান বানানোই শেষ কথা নয়, যদি তারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে না পারে তাহলে তারা একদিন ইসলাম হতে দূরে সরে যাবে

Dhaka University Institutional Repository

তাই তাদেরকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে হলে এবং স্থায়ী ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যাতে কোন চাপের মুখে মানুষ ইসলাম হতে বিচ্যুত না হয়। এ কারণে তিনি শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য বঙ্গ বিজয়ের পর পরই এর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবকাতই নাসিরীর বর্ণনা মতে, তিনি বিভিন্ন স্থানে মসজিদ মাদ্রাসা ও খানকা, তৈরী করেন এবং তাকে অনুসরণ করে তাঁর আমীর ওমরাগণও বিভিন্ন স্থানে এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[১] যাতে মুসলমানরা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ভাবধারায় জীবনকে পরিচালনার জন্য সঠিক শিক্ষা পেতে পারে। তাই বখতিয়ার খিলজী এই মহান আদর্শকে সামনে রেখে বঙ্গ বিজয়ের পরই মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ, প্রতিষ্ঠা করে এদেশে স্থায়ী ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

১২০২-৪ সালে বখতিয়ার খিলজী পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের এক বিরাট অঞ্চল জয় করে নদীয়া পর্যন্ত দখল করেন। তাঁর রাজ্য সীমা লখনৌতি তথা গৌড় শহর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বখতিয়ার খিলজী বাংলার অস্থায়ী প্রাক্তন রাজধানী নদীয়া শহরের বিকল্প হিসেবে রংপুরে নতুন রাজধানী স্থাপন করে সেখানে কয়েকটি মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলি ছিল তদানীন্তন মুসলিম সংস্কৃতির সুতিকাগার, তাই অনুমান করা হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই আরবী ফার্সী শিক্ষা দেয়া হত।[২] আবুল কাশেম ফিরিশতা, তাঁর তারিখ-ই-ফেরেশতা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, নদীয়া শহরের বিকল্প হিসেবে তিনি (বখতিয়ার) বাংলা সীমান্তে রংপুর নামক একটি শহরের পত্তন করে উহা রাজধানী স্থাপন করেন। ইসলামী কায়দায় তিনি সেই শহরটিকে কতগুলি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ দিয়ে সাজিয়ে তুলেন।[৩]

---

১. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১১।

২. এস,এম,একরাম, কালচারাল হেরিটেজ অব পাকিস্তান (লন্ডন,১৯৫৬)। উদ্ধৃত,সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সম্পাদিত,'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা', উনবিংশ সংখ্যা,আষাঢ়, ১৩৯১, জুন,১৯৮৪, পৃঃ ৭৭।

৩. তারীখ-ই-ফেরেশতায়, ২য় খন্ড, এ সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে যেমন-"ওয়াদর দর হদেদ বাংগালাদর, ইওরামে শহরে নদীয়া শহরে-মওসুম ন রংপুর বিনা ফারহাদ দারুল হুকুমতে-খোদ সাখতাহ, ওয়া মাসাজিদ ওয়া খানকাহ ওয়া মাদারিস দরা শহর,ওয়া বিলায়ত ব রসুমে ইসলাম বরওনক ওয়া রিওয়াজে আমাম মুয়াইয়ান ওয়া মুহাল্লা গরদা নীজ।উদ্ধৃত,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা উনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাই বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর পরই মুসলিম শাসন কর্তাগণ বিজিত অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা স্থাপন করে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । ফার্সী ছিল তাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা, আরবী ছিল তাদের কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, আকায়েদ তথা ইসলামী সাহিত্যের বাহন । তাই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই এ সময় মাদ্রাসায় ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাটা ছিল স্বাভাবিক । কাজেই এতে বাংলাদেশে গড়ে দীর্ঘ সাড়ে ছয়শত বছর ধরে চলে আরবী ফার্সী শিক্ষার অনুশীলন ।[১] এভাবে বখতিয়ার পরবর্তী বিভিন্ন সুলতান সুবাদারগণ ও তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ স্থাপন করে প্রচুর সাহায্য ও অর্থ ব্যয় করেছেন এবং সুফী দরবেশদেরকে এসব পরিচালনার জন্য লাখেরাজ ভূমি দান করেন । শাসক বর্গ ব্যতীত ও রাজ কর্মচারী, জমিদার ও সমাজের সচ্ছল বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ ও মক্তব, মাদ্রাসা, খানকাহ, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন ।[২] এভাবে সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

মসজিদ ছিল মুসলিম সমাজের কেন্দ্র বিন্দু । ধর্মীয় ও অন্যান্য সামাজিক দায় দায়িত্ব মসজিদের মাধ্যমেই পালিত হত । শুধু তাই নয় এই মসজিদকে প্রাথমিক শিক্ষায়তন হিসেবেও ব্যবহার করা হত । তাছাড়া মুসলমান ছেলে মেয়েদের জ্ঞানার্জনের ও লেখা পড়ার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় । সুফী দরবেশদের জন্য খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয় । খানকাহসমূহ একদিকে ছিল ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র, অপর দিকে এগুলো বয়স্কদের আবাসিক শিক্ষায়তনের কাজও চলত ।[৩] এ সময় বাংগালী মুসলমানদের মধ্যে লেখা পড়া ও জ্ঞানার্জনের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় । শাসক বর্গ ও সমাজে অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । আলেমগণও তাদের বাড়ীতে মাদ্রাসা ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করতেন । সুফী পন্ডিতেরা তাদের খানকাহসমূহকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলেন । এরফলে মুসলিম

----

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭ ।

২. বাংলাদেশ ও ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০-১২ ।

৩. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয় এবং ধর্মীয় জ্ঞান ও আরবী ফার্সী শিক্ষা ক্ষেত্রে সুলতানী শাসনামল সবিশেষ গুরুত্ব রাখে।[১] এতে দেখা যাচ্ছে যে, শেখ সুফী ও আলেমদের ধর্ম প্রচার এবং মাদ্রাসা ও মসজিদসমূহ ইত্যাদি মুসলমানদের মনে এই উপলব্ধি সৃষ্টি করে যে, শিক্ষা গ্রহণ ইহা ধর্মীয় কর্তব্য, তাছাড়া নৈতিক, চারিত্রিক, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক প্রয়োজনেও ধর্ম শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই এ কারণে বাঙালী মুসলিম সমাজ ধর্ম শিক্ষাকে অতীব গুরুত্ব দিয়ে এর প্রসারের ব্যবস্থা করেছে।

সুলতানী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা ও শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ :-

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে মুসলমানদের গভীর আগ্রহ, অনুরাগ, সুলতানী শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে সুফী, আলেম, দরবেশদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ইত্যাদি বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে জাগরনের সৃষ্টি করে। এতে শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান অঞ্চল সমূহে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদগুলিতে কেন্দ্র করে বহু মাদ্রাসা গড়ে উঠে। সুলতান ও আমীর ওমরাহগণ মাদ্রাসা স্থাপনে সহযোগিতা করেন। এমনকি প্রখ্যাত আলেমগণও মাদ্রাসা ও শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া বিখ্যাত সুফী দরবেশদের কয়েকটি খানকাহ ও শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়।[২] এভাবে তাদের উৎসাহ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংখ্যক মাদ্রাসা, শিক্ষা কেন্দ্র শহরে ও প্রধান প্রধান স্থানে গড়ে উঠে। এদের মধ্যে কয়েকটি উপ মহাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্রে পরিনত হয়েছিল। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্রের আলোচনা করা হল।

লক্ষ্মনাবতী বা গৌড় শিক্ষা কেন্দ্র :

বাংলাদেশে মুসলিম বিজয়ের পর হতে তৎকালীন রাজধানী গৌড় নামে বিখ্যাত লক্ষ্মনাবতী বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৯-৯০।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে পরিগণিত হয় । ঐতিহাসিক মিনহাজের বর্ণনা অনুযায়ী বখতিয়ার খিলজী গৌড়ে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন । তার এই মহান দৃষ্টান্ত পরবর্তী শাসন কর্তাদের দ্বারাও অনুসৃত হয় । কয়েকটি মাদ্রাসা ভবনের ধ্বংশাবশেষ মুসলিম বাংলায় প্রথম যুগের রাজধানী লক্ষ্মনাবতী শহরে সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ।[১] এ থেকে জানা যায় যে, সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইওজ খিলজী (১২১২-১২২৭) বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত হয়েই তিনি বাংলার রাজধানী লক্ষনৌতি (লক্ষ্মনাবতী) শহরে একটি মসজিদ, একটি মাদ্রাসা ও একটি পান্থশালা প্রতিষ্ঠা করেন । এগুলির মধ্যে কেবল মাদ্রাসা ভবনটির ভগ্নাবশেষ বর্তমানে তার অতীত স্মৃতি বহন করে আছে । সুলতান গিয়াস উদ্দীনের মসজিদ ও মাদ্রাসায় আরবী, কুরআন, হাদীস ভিত্তিক ইসলামী জ্ঞান ও ফার্সী আরবী সাহিত্যের চর্চা হত বলে প্রমাণ পাওয়া যায় ।[২]

শামস উদ্দীন ইউসুফ শাহ এর শাসনামলেও অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় । তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত,ও শিক্ষানুরাগী, শাসক ছিলেন । প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক জরিপে এক শিলা লিপি হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ১৪৭৯ সালে মাহদীপুরে ও ফীরোজ পুরের মধ্যবর্তী স্থানে ওমপুরে (গৌড়ে) দরস বাড়ী বলে কথিত একটি মাদ্রাসা ও তৎসংলগ্ন একটি মসজিদ স্থাপন করেন । নরেন্দ্র নাথ দরস বাড়ী মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত অস্থিপুরের মাদ্রাসার অস্তিত্ব যেমন মুছে গেছে এবং টিলা মাদ্রাসা নামটি যেমন তার অতীত স্মৃতি বহন করছে, ঠিক তেমনি দরসবাড়ী মাদ্রাসাও আজ সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হতে বসেছে ।[৩] এখানে বুঝা যায় যে, অস্থিপুরের একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইহা দেশ বিখ্যাত ছিল । কিন্তু কালের বিবর্তনে এ সব ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অযত্নে অবহেলায় হারিয়ে গেছে ।

গৌড়ে সাগর দীঘির উত্তর পার্শ্বে বড় একটি ভবনের ধ্বংসাবশেষ হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল । মাদ্রাসাটির সুন্দর ও প্রসস্ত ভবন ছিল তাতে

---

১. মিনহাজ ,তবকাত-ই-নাসিরী,(অনুবাদ র‍্যাভার্টি),পৃঃ৫৫৯-৬০। উদ্ধৃত,বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,প্রথম খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ ২০৩ ।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত,পৃঃ৭৯ ।মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পৃঃ২৬ ।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,ঊনবিংশ সংখ্যা,পূর্বোক্ত,পৃঃ৮১ ।আবদুল হক ফরীদী,মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ,বাংলা একাডেমী(ঢাকা ১৯৮৫)১ম প্রকাশ, পূর্বোক্ত,পৃঃ ২৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

কোন সন্দেহ নেই । স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ভবনটি "বেড়বাড়ী" মাদ্রাসা নামে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠানের ভবন ছিল ।[১] এই প্রতিষ্ঠানের শিলালিপি হতে অনুমান করা হয় যে, এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলা উদ্দীন হোসাইন শাহ । তিনি ১৪৯৩ সালে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন । তার আমলে ঢাকার সোনার গাঁও অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষা তথা আরবী চর্চার একটি কেন্দ্র গড়ে উঠে । এখানকার মাদ্রাসা মসজিদের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আজও সে যুগের ধর্মীয় জ্ঞানানুশীলনের ও চর্চার সাক্ষ্য বহন করছে । এ ছাড়া আলা উদ্দীন হোসাইন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) গৌড়ের গোরা শহীদ মহল্লায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । উক্ত মাদ্রাসার ফলক লিপি হতে বুঝা যায় যে, উহা সম্ভবত ১৫০২ সালে হুসাইন শাহ প্রতিষ্ঠা করেন । হুসাইন শাহ শিক্ষার উন্নতির জন্য দেশ বিদেশ হতে অনেক পন্ডিতদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন ।[২] তাছাড়া হুসাইন শাহের পুত্র নুসরত শাহ ও অনেক মাদ্রাসা, খানকাহ স্থাপন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । এই মাদ্রাসাগুলি কেবল রাজধানী শহরেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং এর নিকটবর্তী প্রধান প্রধান এলাকা এবং শহরের উপকন্ঠে ও স্থাপিত হয়েছিল । এতে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের কতৃর্ক বাংলা বিজয়ের শুরু হতেই লক্ষনাবতীতে মাদ্রাসা স্থাপনের ফলে একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং বহু পীর দরবেশ আলেম সুফী ও শিক্ষকদের পদচারনায় স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষনাবতী শিক্ষাক্ষেত্রে এক নব জাগরনের সৃষ্টি করেছিল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল ।

মান্দরন শিক্ষা কেন্দ্র :

মান্দরন অঞ্চল (বাকুড়া-বিষ্ণুপুর) সুলতান হোসেন শাহের শাসনামলে থেকে একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রে উন্নীত হয় । এখানকার বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার লক্ষ্যে সুলতান মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান করেন । ১৫০২ সালে উৎকীর্ণ লিপি হতে জানা যায় যে, হোসেন শাহের আদেশে মান্দরণে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ।[৩]

১. মেমোয়ার্স অব গৌড়, পৃঃ৮৬-৮৭ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৪ । মাদ্রাসা শিক্ষা-বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭ ।
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২ ।
৩. জে, এ, এস, বি, ১৮৭৪, পৃঃ৩০৩ , মেমোয়ার্স অব গৌড়, পৃঃ১৫৭-৫৮ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিকও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২০৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাঘা শিক্ষা কেন্দ্র

বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত চিলমারি থানার নির্জন বাঘা গ্রামে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের শুরুতেই শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়। ১৫২৪ সালের তারিখযুক্ত এক শিলা লিপি হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হোসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩৪) বাঘায় একটি জামে মসজিদ তৈরী করেন।[১] বাংলাদেশের জনৈক আবুল হাসানের সেবক ও সাথী আব্দুল লতিফ ১৬০৯ সালে উক্ত স্থানটি পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে শত বছরের বৃদ্ধ হাওদা মিয়া নামের এক দরবেশকে দেখতে পান। তিনি উল্লেখ করেন যে, হাওদা মিয়া একটি বড় মাদ্রাসা পরিচালনা করেন। কুড়ে ঘর ও মাটির দেয়াল বিশিষ্ট ঘরে মাদ্রাসাটি অবস্থিত। খানকাহ মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য হাওদা মিয়াকে গ্রামের জমি দান করা হয়েছে।[২] এ থেকে বুঝা যায় যে, বাঘার মাদ্রাসাটি নুসরাত শাহের সময় হতেই তথা ১৬০৯ সালের পূর্ব হতেই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছিল।

সাতগাঁও শিক্ষা কেন্দ্র :

সুলতানী শাসনামলের শুরু হতেই সাত গাঁও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রভূত উন্নতি সাধন করে এবং বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় অনন্য ভূমিকা ও অবদান রাখে। সাত গাঁয়ের ত্রিবেনীতে দুটো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি সুলতান রুকন উদ্দীন কাই কাউসের সময়(১২৯৩সাল) কাজী আল নাসির মুহাম্মদ কর্তৃক নির্মিত হয়। তিনি মাদ্রাসা তৈরী এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় জাফর খান কর্তৃক সুলতান শামস উদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ১৩১৩ সালে আর একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদ্রাসা দারুল খায়রাত নামে অভিহিত হয়।[৩] অতএব এ দুটি মাদ্রাসায়ই সাতগাঁও এবং তার পার্শ্ববর্তী

---

১. এ,এইচ,দানী, ইনস্ক্রিপশন অব বেঙ্গল নং-১২৭। উদ্ধৃত,পূর্বোক্ত,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত, পৃঃ২১০। ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ৩২৮।

২. আব্দুল লতিফ একাউন্ট (সরকার অনূদিত)বি,পি,পি ১৯২৮,২য় অধ্যায়,এস,এ,ল,৭০ পৃঃ১৪৩।উদ্ধৃত,বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ২১০।২য় খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ ৩২৮।

৩. ইপিগ্রাফিয়া ইন্দো মুসলিম,১৯১৭-১৮,পৃঃ১৩, জে,এ,এস,বি,১৮৭০, পৃঃ২৮৪, ২৮৬। উদ্ধৃত,বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলসমূহে ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় বিরাট অবদান রাখে ।

এছাড়া অন্যান্য অনেক সুলতান মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপন করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো অগ্রগতি করেন । জাফর খান গাজী ১২৯৮ সালে ত্রিবেনী দখল করে সেখানে তিনি যে মসজিদ স্থাপন করেন তা জাফর খান গাজীর মসজিদ নামে পরিচিত । এরপর সিকান্দর শাহ পান্ডুয়ায় একটি মসজিদ, নির্মান করেন । ১৩৬৩ সালে দিনাজপুর জেলায় দেবীকোটে মোল্লা আতার দরগাহে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন । রাজা গনেশের পুত্র 'যদু' (জালাল উদ্দীন) (১৪১৫-১৪৩১) অনেক মসজিদ জলাশয়, সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন ।[১] এরপর নাসির উদ্দীন মহম্মদ শাহ (১৪৪২-১৪৬০) দীর্ঘ ২৪ বছরের রাজত্বকালে বহু সংখ্যক মসজিদ তৈরী করেন । ঢাকার বিনত বিবির মসজিদ ব্যতীত (১৪৫৭) ময়মনসিংহের ঘাগরা, হুগলীর সাতগাঁও, পুরাতন মালদহে মুগল টুলী অঞ্চলে মসজিদ নির্মান করেন । মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র বরবক শাহ (১৪৭৪) সমগ্র বাংলা রাজ্যে ১৪টি মসজিদ তৈরী করেন ।[২] এভাবে সমগ্র বাংলাদেশে বহু সংখ্যক মসজিদ নির্মিত হয় এবং এসব মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা সমানভাবে চলতে থাকে ।

আলেম, সূফী দরবেশদের সহযোগীতায় মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা ও শিক্ষা কেন্দ্র :

মুসলিম শাসকগণ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা খানকাহ নির্মান করে যেমন-শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন, তেমনি সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিত্তশালী, শিক্ষানুরাগী, আলেম, সূফী দরবেশদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ দেশের অধিকাংশ মাদ্রাসা খানকাহ মসজিদ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে । বাংলাদেশে এ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে ও জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে অসামান্য অবদান রাখে । তবে সুলতানী আমলের শেষের দিকের তুলনায় প্রথম দিকেই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপক প্রসার দেখা যায় । বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উৎযোগে আলেম, সূফী দরবেশগণ সে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন তম্মধ্যে কয়েকটি দেশ বিদেশে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করে ।

---

১. সৈয়্যদ মাহমুদুল হাসান, "বাংলাদেশের মসজিদ", (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৭) পৃঃ৩১, ৩৩, ৩
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

যে সমস্ত আলেম এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তন্মধ্যে মাওলানা তকী উদ্দীন আরবী, মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, মাওলানা শায়খ আলাউল হক, মাওলানা শাহিনুর কুতুবুল আলম, শেখ জালাল উদ্দীন তাবরিজী ছিলেন অন্যতম। বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এঁরা একদিকে ইসলাম প্রচার ও অপরদিকে মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ও সমাজ গঠনের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাহি সন্তোষ, পান্ডুয়া এবং সোনারগাঁও এর মাদ্রাসা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বাংলাদেশের বাইরেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ছড়িয়ে পড়ে। যারফলে উপমহাদেশে বিভিন্ন স্থান হতে ছাত্ররা এসে এখানে অধ্যয়ন ও জ্ঞান চর্চা করে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করতে সমর্থ হয়।[১] নিম্নে এসব প্রসিদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রের কিছুটা আলোচনা করা হল।

মাহি সন্তোষ শিক্ষা কেন্দ্র :

বর্তমানে মাহি সন্তোষ নামে পরিচিত রাজশাহী জেলার অন্তর্গত মহিসুন ছিল সুলতানী শাসনের প্রথম যুগের অন্যতম শিক্ষা কেন্দ্র। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে মাওলানা তকী উদ্দীন আরাবী বাংলাদেশে আগমন করেন এবং এই শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাদান কার্যে আত্ম নিয়োগ করেন। খুব সম্ভব তিনি আরব দেশ হতে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই এ দেশে এসেছিলেন। তাই তাঁর এ মাদ্রাসাটিকে বাংলার প্রথম ইসলামীয়া মাদ্রাসা বলা হয়।[২] বিখ্যাত সূফী পন্ডিত মখদুম শরফ উদ্দীনের পিতা এহিয়া মানেরী এই মাহিসন্তোষের শিক্ষা কেন্দ্র হতে জ্ঞান অর্জন করেন।[৩] এতে বুঝা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাহিসন্তোষ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য একটি বিরাট শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং দেশ বিদেশে বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে পান্ডিত্য অর্জন করতে সমর্থ হয়।

---

১. বাংলা দেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১১।

২. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭,১০০। উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭১।

৩. শাহ শুয়েব-মানাকিব আল আসফিয়া, উদ্ধৃত (তদীয় শিষ্য) মখদুম শরফ উদ্দীন মানেরী রচিত, মকতুবাতই সাদী, পৃঃ৩৩৯। পুনঃউদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

সোনারগাঁও শিক্ষা কেন্দ্র ঃ

শেখ শরফ উদ্দীন আবু তাওয়ামা ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের খ্যাতনামা পন্ডিতদের অন্যতম । ইসলামী শিক্ষা ও অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁর বুৎপত্তি ও পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ । তিনি ১২৮৭ সালে সোনার গাঁয়ে আগমন করে এখানে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং ধর্ম প্রচারে ও শিক্ষাদানে আত্ম নিয়োগ করেন । তিনি এখানে ছাত্রদের জন্য একটি মাদ্রাসা ও শিষ্যদের জন্য একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন । জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সোনার গাঁও শিক্ষা কেন্দ্রে হাদীস, তাফসীর তথা আরবী শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন । এ সময় উপমহাদেশে বিভিন্ন স্থান হতে বিপুল সংখ্যক অতি উৎসাহী, অনুসন্ধিৎসু বিদ্যার্থী, অনেক খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ এই বিখ্যাত সূফীর নিকট জ্ঞান লাভের আশায় সোনারগাঁয়ে আসতে থাকেন । এভাবে সোনারগাঁও ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গৌরব উজ্জ্বল শিক্ষা কেন্দ্রে পরিনত হয় । সোনারগাঁয়ে আবু তাওয়ামার মাদ্রাসা, খানকাহ, থেকে একদিন যে শিক্ষা ও জ্ঞান দান করা হত তা শুধু বাংলাদেশই নয় বরং উত্তর ভারত পর্যন্ত তা প্রভাবিত করেছিল । তাই বলা হয় যে, ইতিপূর্বে এত বড় ইসলামী মাদ্রাসা উপমহাদেশের কোথাও স্থাপিত হয়নি । এখানে আবু তাওয়ামা সর্বপ্রথম সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শিক্ষাদান শুরু করেন । অতপর ধীরে ধীরে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, আকায়েদ ইত্যাদি শিক্ষা প্রসার লাভ করে ।[১] এই সোনারগাঁও শিক্ষাকেন্দ্র হতে ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু জ্ঞানী পন্ডিতদের আবির্ভাব হয় । তন্মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন শেখ শরফ উদ্দীন এহিয়া মানেরী ।[২]

অতএব, আবু তাওয়ামা প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁও শিক্ষাকেন্দ্র পূর্ব বঙ্গের ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এমন অবিস্মরণীয় অবদান রাখে যে, তৎকালীন সময়ের জন্য ইহা কল্পনাই করা যায় না । শুধু মাত্র বাংলাদেশেই এর সুখ্যাতি ছিল না, সুদূর উত্তর ভারতেও এর জ্ঞান চর্চার

১. বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮,১০০ । নূর মোহাম্মদ আজমী, 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস' (ঢাকা ১৯৬৬) পৃঃ২৬০-৬১ । মোহাম্মদ এছহাক, 'বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা' সংস্কার সংস্থার ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির যৌথ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষন, আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকা, (৩০শে মাঘ ১৯৮৩), পৃঃ ৪ । উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, উনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১ । বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬ ।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

সুখ্যাতি ছিল । তাই সুলতানী শাসনামলে সোনারগাঁও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে, ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছিল ।

পান্ডুয়া শিক্ষাকেন্দ্র :

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ আলেম সূফী শেখ আলাউল হক ও তদীয় প্রখ্যাত পুত্র শেখ নূর কুতবুল আলমের খানকা ছিল বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান চর্চা ও আধ্যাতিক জ্ঞানের বিখ্যাত কেন্দ্র । কুতবুল আলম পান্ডুয়ায় একটি সুবৃহৎ মাদ্রাসা ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন । এর ব্যয় নির্বাহের জন্য সুলতান আলা উদ্দীন হুসেন শাহ ভূমি দান করেন । এই বিরাট ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রে উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে এখানে ছাত্ররা আসতে থাকে এবং এখানে বহু সূফী সাধকরা শিক্ষা লাভ করেন । তারা কয়েক শতাব্দী ব্যাপী তাদের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের দ্বারা বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করেন ।[১]

নাগর শিক্ষাকেন্দ্র :

বীর ভূম জেলার "নাগর" শিক্ষা কেন্দ্র চতুর্দশ শতাব্দী থেকে একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল । নাগরের বিখ্যাত পন্ডিত হাসিম উদ্দীন একটি বিদ্যালয়ের রক্ষনাবেক্ষন করেন এবং সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ ও শেখ নূরুল কুতবুল আলম এই বিখ্যাত শিক্ষা গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন । সমগ্র মুসলমান আমল নাগর শিক্ষাকেন্দ্র ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখে ।[২]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পর পরই শুরু হয় মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন । সে আন্দোলনে মুসলিম শাসক রাজা বাদশাহ আমীর ওমরাহগণের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগীতায় বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, স্থাপিত হয়েছে । অপরদিকে আলেম সূফী দরবেশদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও কঠোর পরিশ্রমে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপতি হয়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে । এদের সকলের প্রচেষ্টায় সে সময় তাই বিখ্যাত কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র যেমন-লক্ষনাবতী, মাহিসন্তোষ, সাতগাঁও, সোনার গাঁও, মান্দারন, বাঘা পান্ডুয়া, নাগর ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল ।

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৪৭, ১৫৮। ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৬ ।
২. পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮২, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চশিক্ষা ও পাঠ্য-সূচী

সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা তথা আরবী মাদ্রাসা সমূহের শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্য তালিকা কিরূপ ছিল এবং এর পাঠ্যসূচী বা শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন বিধি বদ্ধ নিয়ম কানুন পালন করা হত কিনা তা জানা যায় না। তবে মসজিদ কিংবা মসজিদ সংলগ্ন মক্তবসমূহে কুরআন, শিক্ষা অপরিহার্য ছিল। তার সাথে হয়ত নামাজ, রোজা, অজু,গোসল, ইত্যাদি ইবাদত বন্দেগীর নিয়ম কানুন, অত্যন্ত প্রাথমিক অথচ জরুরী মাসআলা মাসায়েল,শিক্ষা দেয়া হত। এর চেয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে মাদ্রাসা বা উচ্চতর শিক্ষায়তনে গমন করতে হত। কিন্তু এই উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্রের কি ধরনের শিক্ষা, কি পাঠ্যসূচী অথবা কোন সুনির্দিষ্ট সময় সীমা অনুযায়ী কোন পাঠ্যক্রম ছিল কিনা তা জানা যায় না।

তবে এ যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক জ্ঞানের বিকাশ সাধন, সৎজীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করণ, ধর্ম পরায়নতা বোধ জাগরন, পারলৌকিক মুক্তি ও মঙ্গল সাধন এবং স্রষ্টাকে পাওয়ার ও সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় অবলম্বন।[১] এই উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করেই তৎকালীন সময়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য-সূচী নির্বাচন করা হত বলে মনে হয়। অর্থাৎ আল্লাহের সন্তুষ্টি এবং তাঁর সঠিক এবাদত করার নিয়ম কানুন ও পদ্ধতি জানার জন্যই হয়ত সে সময়ের পাঠ্য-সূচীতে কুরআনও হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষাই বেশী গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হত বলে মনে হয়। তবে জাগতিক প্রয়োজনের অন্যান্য বিষয়ের ও শিক্ষা দেয়া হত। যেমন-শুরুতেই আরবী ফার্সী মিশ্রিত ধর্মীয় শ্লোক এবং ধর্ম গ্রন্থের অংশ বিষয়ের মুখস্থ করতে হত। গণিত ও হিসাব রক্ষন শিক্ষার প্রচলন ছিল। সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার ও তর্কশাস্ত্র, আইন, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি মসজিদ সংলগ্ন বড় বড় মাদ্রাসাগুলিতে বিদ্যা চর্চা অনুশীলন করা হত। ফার্সী রাজ ভাষার মর্যাদা পাওয়ায় শিক্ষার মাধ্যম ফার্সী ছিল তবে আরবীও বাধ্যতামূলক ছিল।[২] বাংলাদেশে এইসব উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রে তথা মাদ্রাসা সমূহে কি ধরনের পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল তা যদি আমরা একটু পিছনে ফিরে আলোচনা করি তাহলে বুঝতে পারবো যে, মুসলিম বিশ্বের শিক্ষার ধারা এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

---

১. অধ্যাপক, 'মোহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, "শিক্ষার ইতিহাস" (ঢাকা ১৯৮০) ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২২৮।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

উপর বিরাট প্রভাব পড়েছিল এবং ঐসব মুসলিম দেশের পাঠ্য-সূচী হয়ত এদেশের পাঠ্য সূচীতেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ।

কেননা, এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী তথা আরবী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠে । খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যে মুসলিম দেশগুলিতে মাদ্রাসা বলে অভিহিত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি সুস্পষ্ট ধর্মীয় ভাবানুভূতি সমন্বিত শিক্ষার পীঠ স্থান রূপে গড়ে উঠে । মূলত এগুলি ছিল ধর্ম শাস্ত্রীয় বিদ্যালয় তবে ধর্ম শাস্ত্রের সাথে তাত্ত্ব তত্ত্ব ও শিক্ষা দেয়া হত । মধ্য যুগের চিন্তা ধারার রূপ ধর্ম শাস্ত্রানুগ হওয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য সাধারণ শিক্ষাবলীও এর অন্তর্ভুক্ত হয় ।[১] ঐ সব শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে উপমহাদেশের উপর সবচাইতে বেশী প্রভাব পড়ে বাগদাদের "দরসে নিযামিয়া" মাদ্রাসার ।[২] অর্থাৎ দরসে নিযামিয়া মাদ্রাসাতে যে পাঠ্যসূচী অনুসৃত হত বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলিতেও ঐ পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত হয় বলে মনে করা হয় । কেননা অধিকাংশ আলেম, সূফী দরবেশ ইরান, ইরাক তুর্কী, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশসমূহ হতেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন । তাঁরা হয়ত দরসে নিযামিয়ার শিক্ষাসূচী অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । সেহেতু তাদের দ্বারা দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যসূচী এদেশের পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্ত করা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বাস্তবে তাই ঘটেছিল ।

দিল্লীতে মাওলানা আব্দুর রহিমের মাদ্রাসা শিক্ষা, পরবর্তী সময় শাহ ওলী উল্লাহর শিক্ষা ব্যবস্থা, লখনৌতে নিযামুদ্দীন, সিহালবির দরসে নিযামিয়া প্রবর্তনের পূর্বক্ষন পর্যন্ত উপমহাদেশের

---

১. ডঃ ইউসুফ হোসেন, 'মধ্য যুগের পাক ভারতীয় সংস্কৃতি', অনুবাদক, ফারুক মাহমুদ, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৭) পৃঃ ৭৯ ।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, সম্পাদনা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী । 'দরসে নিযামিয়া বাগদাদ'-অর্থাৎ সিলজুকী আলপে আরসালান ও সালেক শাহের সুনাম ধন্যমন্ত্রী নিযামুল মুলক তুসী (১০৬৫-৬৭ খ্রীঃ) ২ লক্ষ দীনার ব্যয় করে বাগদাদের নিযামিয়া নামে একটি বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । এ প্রতিষ্ঠানটি দশ বছর ব্যাপী ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তারে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে । এতে যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং যে পাঠ্যসূচী অনুসৃত হয়, তাহাই বাগদাদের দরসে নিযামিয়া নামে পরিচিত ।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী শিক্ষার উপর বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার গভীর প্রভাব কার্যকর ছিল ।[১] উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বৃটিশ পূর্বযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে আরবী মাদ্রাসাসমূহে যেসব পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত ছিল, আবুল হাসান নদবী, যুগের ক্রমানুসারে তা পাঁচভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে পাঠ্য গ্রন্থসমূহের নাম ও তিনি উল্লেখ করেছেন । প্রথম যুগ আমাদের আলোচ্য সুলতানী যুগ । অর্থাৎ এ যুগটি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত । মোটামোটি বলতে গেলে আরবী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম যুগটি ২ শতাধিক বছর স্থায়ী ছিল । এ সময়ে বালাগত, সরফ,ফিকাহ, উসুল-ই-ফিকাহ,কালাম, মানতিক,তাসাউফ,হাদীস,তাফসীর ইত্যাদি এসব বিষয়ের উপর শিক্ষা গ্রহণই ছিল সুধী সমাজের মর্যাদা লাভের মাপকাঠি ।এযুগে ফিকাহ,ও উসুলই ফিকাহ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করাই ছিল পান্ডিত্য ও সামাজিক মর্যাদা লাভের মূল মন্ত্র হাদীস বিষয়ে 'মাশারিকুল আন-ওয়ার' অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হত । তবে কেহ যদি মাসারিহ' পড়ার সুযোগ পেত,তবে তাকে হাদীস বিশ্বের ইমাম খেতাবে ভূষিত করা হত ।সাহিত্যের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হত না ।কেবলমাত্র 'মাকামাতই হারীরী'মুখস্ত করানো হত।[২] অতএব সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার অনুকরণেও অনুসরণে অনুসৃত হত বলে উক্ত আলোচনা হতে তাই বুঝা যায় । কিন্তু পাঠ পদ্ধতি কিরূপ ছিল বা শ্রেণী বিন্যাস ও কি সময় সীমার মধ্যে শিক্ষাক্রম শেষ হত সে সম্পর্কে খুব একটা জানা যায় না ।

---

১. দরসে নিযামিয়া লখনৌঃমোল্লা কুতব উদ্দীন শহীদ,(১৬৯১) প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন এই উপমহাদেশের প্রচলিত দরসে নিযামিয়ার উদ্ভাবক । কিন্তু তার পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীনের (১৭৪৮) সময় এ শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর উন্নতি ও প্রসার লাভ করেছিল বলেই তা দরসে নিযামিয়া বলে এদেশে অভিহিত হয় । বাগদাদের দরসে নিযামিয়া লখনৌর দরসে নিযামিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলেও মূলত এ দুটি ছিল স্বতন্ত্র পদ্ধতিভুক্ত । তবে লখনৌর এ পাঠ্যসূচী উপমহাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে ও প্রভাব বিস্তার করে । এই পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের পূর্বে উপমহাদেশের আরবী শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে দেশীয় লেখক রচিত কোন গ্রন্থ পাঠ্যভুক্ত ছিল না ।মোল্লা নিযামুদ্দীনই সর্বপ্রথম উপমহাদেশে রচিত গ্রন্থাদিকে তার পাঠ্যসূচীতে স্থান দেন ।

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা একবিংশ সংখ্যা,পূর্বোক্ত,পৃঃ২৫ ।"

অতএব এখানে দেখা যাচ্ছে যে,লখনৌর দরসে নিযামিয়া পাঠ্যসূচী ১৭৪৮ সালের দিকে এই উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয় । কিন্তু এর পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যসূচী ও পদ্ধতিই এদেশের আরবী শিক্ষার ব্যবস্থায় বা পাঠ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

২. আবুল হাসনাত নাদবী, 'হিন্দুস্তান কী কাদীম দরসে গা'(আযমগড়, ১৯৩৬), পৃঃ৮৯-১০০ উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, মুসলিম শাসক আমীর সুবাদারগণ মাদ্রাসা স্থাপন করে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে যেমন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তেমনি আলেম সূফী দরবেশগণও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র তথা মাদ্রাসা স্থাপন করে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । এ সকল মাদ্রাসা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলি শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে । কিন্তু এই কিছু সংখ্যক উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্র ব্যতীত সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল । কেননা শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান ইহা ধর্মীয় ও সামাজিক সম্মানের বিষয় ছিল বলে প্রতিটি অবস্থাপূর্ণ ধনীক ও বণিক শ্রেণীরা তাদের নিজ বাড়ীতে বা বাড়ী সংলগ্ন স্থানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মক্তব স্থাপন করত । তাছাড়া প্রতিটি মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ছিল । সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা এ সময় সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ ঘটেছিল । তাই সুলতানী আমলে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গৌরব উজ্জল অধ্যায় হয়ে আছে । নিম্নে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা তুলে ধরা হল ।

প্রাথমিক শিক্ষাও পাঠ্য-সূচী :

মুসলিম ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত মক্তবে । এসব মক্তব সাধারণতঃ প্রতিটি মসজিদ বা মসজিদ সংলগ্ন, কিংবা ধনী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের বাড়ী সংলগ্ন ছিল । ফলে প্রত্যেক শহর এমন কি গ্রামে প্রচুর প্রাথমিক মক্তব বা বিদ্যালয় ছিল । হিন্দু কবি মুকন্দ রামের চন্ডী মঙ্গল থেকে জানা যায় যে, "যত শিশু মুসলমান, তুলিল মকতব স্থান, মখদুম পড়ায় পাঠ না" । অর্থাৎ মুসলিম মহল্লায় মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে সমস্ত মুসলমান ছেলে মেয়েদেরকে মৌলভীগণ শিক্ষা দিতেন । তাঁর উক্তি হতে আরো জানা যায় যে, হিন্দু অধ্যুষিত ক্ষুদ্র মুসলমান এলাকায় ও মুসলমান ছেলে মেয়েদের জন্য মক্তবে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ।[১] এই মক্তবে কুরআন পাঠের সাথে কিছুটা ফার্সী সাহিত্য ও পড়ানো হত ।

---

১. মুকুন্দ রাম চন্ডী মঙ্গল কাব্য, পৃঃ৩৩৪ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৩-১৪ । বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত পাঁচ বছর বয়সে মুসলমান ছেলে মেয়েদের শিক্ষা জীবন শুরু হত। ছেলে মেয়েদের এ বয়সের পূর্বে এবং পরেও শিক্ষা শুরু করার উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের বিশেষ করে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চার বছর চার মাস চার দিন বয়সের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা আরম্ভ করার একটা সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল। শিক্ষা জীবনে শিশুদের এই আনুষ্ঠানিক প্রবেশ 'বিসমিল্লাহ খানি' নামে পরিচিত ছিল। একজন জ্যোতিষীর সাথে পরামর্শ করে একটি বিশেষ দিনে নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকের কাছে শিশু তার প্রথম পাঠ গ্রহণ করত। শিক্ষক বিসমিল্লাহ বলে কুরআন হাতে নির্বাচিত একটি আয়াত পাঠ করতেন এবং শিশু তার সাথে সাথে পুনরাবৃত্তি করত। কোন কোন ক্ষেত্রে কাঠের ফলকে দু একটি আরবী হরফ খড়ি মাটি দিয়ে লিখে শিশুর হাত ধরে তার উপর হাত বুলানো হত। তারপর উপস্থিত সকলে শিশু যাতে ভবিষ্যতে বিদ্যা ও বুদ্ধিতে দেশের মুখ উজ্জল করতে পারে তার জন্য দোয়া করত। সাধারণত মিষ্টি মুখ করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হত।[১] এভাবে মুসলমান শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু হত।

এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মসজিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। প্রত্যেক শহরে বহু সংখ্যক মসজিদ ছিল। এমনকি একটি ক্ষুদ্র গ্রামেও যেখানে স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদের বাস ছিল সেখানেও অন্তত একটি মসজিদ থাকত। এই মসজিদ ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা লাভের এক উত্তম স্থান ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য মসজিদের ইমামগণই শিক্ষক ছিলেন। বিশেষ করে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কুরআন পাঠ, ধর্মের মূল নীতি ও ইবাদত বন্দেগীর প্রাসঙ্গিক বিষয় সমূহেও শিক্ষা দিতেন।[২]

প্রাথমিক শিক্ষার মূল ভিত্তি ছিল ধর্মীয় শিক্ষা। ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান শিশু সন্তানদেরকে ধর্মের মূল নীতি ও বিষয়সমূহ এবং নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়নমূলক শিক্ষা দেয়া হত। কবি বিপ্রদাস উল্লেখ করেন যে, মুসলমান বালক বালিকাদের মক্তবে অজু করা ও নামাজ পড়া

----

১. কে,এম,আশরাফ,লাইফ এন্ড কনডিশন অব দি পিপল অব হিন্দুস্তান,পৃঃ১৪৫। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ ২১৪।মাদ্রাসা শিক্ষা, বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৩০-৩১।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ ২১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

শেখান হত । মুকুন্দ রাম আরও উল্লেখ করেন যে, মুসলিম ছেলে মেয়েরা মক্তবে মৌলভীর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত । মক্তবের শিক্ষক একজন মৌলভী বা আলেম হওয়ায় ইসলামী শিক্ষাকে প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল এটা জোর দিয়ে বলা যায় । ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও মক্তবে পাঠ দান করা হত বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । এ সম্পর্কে 'রাউলিনসন' উল্লেখ করেন যে, মক্তবে শিশুরা কালেমা বা ধর্ম বিশ্বাস ও কুরআন থেকে আয়াত মুখস্ত করত যা তার প্রাত্যহিক প্রার্থনায় প্রয়োজন হত । কুরআন মুখস্ত করার একটি সাধারণ রীতি ও প্রচলিত ছিল । এর সাথে রাসূল(সঃ) এর হাদীস, ফার্সী ভাষা, ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত । সুচারু লিখন পদ্ধতি চর্চা করা হত এবং ছাত্র যদি শিল্প কলার শিক্ষা লাভে আগ্রহী হত, তাহলে তাকে একজন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা নবিশীর জন্য পাঠানো হত ।[১]

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদেরকে আরবী, ফার্সী ও বাংলা এই তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে হত । কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য ছিল । সমগ্র মুসলিম শাসনামলে ফার্সী ছিল রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন । বহু মুসলিম ও অমুসলিমদের মাতৃভাষা ছিল বাংলাভাষা তাই বাঙ্গালী মুসলমানেরা মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাকে অবহেলা বা ত্যাগ করতে পারেনি । পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে যে চীন দেশীয় দূত বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি বাংলাদেশে বাংলা ও ফার্সী এ দুটো ভাষাই দেখতে পেয়ে ছিলেন । পর্যটক মাহুয়েন উল্লেখ করেন যে, এ দেশের অধিবাসীদের ভাষা ছিল বাংলা তবে ফার্সীর ও প্রচলন ছিল ।[২] এতে বুঝা যায় যে, এ সময় বিদ্যালয়ে বাংলাও পড়ানো হত । কেননা সাধারণ মনুষেরা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকাদি সহজেই পড়তে ও বুঝতে পারত । তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা যায় ।

----

১. এইচ,বি,রাউলিনসন, "ইন্ডিয়া এ শর্ট কালচারাল হিস্ট্রি", (লন্ডন ১৯৩৭) পৃঃ৩৭২, উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ২১৬ ।

২. মাহুয়েন বলেন, " "The language of the people is Bengali, persian is also sopken here."এন,এন, ল; প্রমোশন অব লার্নিং ডিউরিং মহামেডান রোল, পৃঃ ২০২ । উদ্ধৃত, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১০৩৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে শমসের গাজীর পুঁথি নামক বাংলা কাব্য হতে আমরা প্রমাণ পাই যে, শমসের গাজী "তুলবাই খানা" নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর এই বিদ্যালয়ের জন্য ঢাকা হতে একজন মুন্সী(ফার্সী শিক্ষক) হিন্দুস্থান হতে একজন মৌলভী (আরবী শিক্ষক) এবং জুগদিয়া হতে একজন পন্ডিত অর্থাৎ যথাক্রমে ফার্সী, আরবী ও বাংলা ভাষার শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক আনেন।[১] এ থেকে বুঝা যায় যে, সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশের মুসলিম বিদ্যালয়সমূহে আরবী, ফার্সী ও বাংলা এ তিনটি বিষয়ই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ফার্সীর পাশাপাশি বাংলাও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মুসলিম বিজয়ের পর পরই এ দেশে এক উদার নৈতিক ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। আলেম, সুফী, দরবেশগণ ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে নিজেদের প্রচেষ্টায় বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেন। শুধু তাই নয় এ দেশের অবস্থাপন্ন, ধনিক ও বনিক শ্রেণীরাও নিজ বাড়িতে কিংবা বাড়ী সংলগ্ন মক্তব মাদ্রাসা গড়ে তুলেন। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র বাংলাদেশেই গ্রামগঞ্জের আনাচে কানাচে স্বল্প অধ্যুষিত মুসলিম এলাকাতেও মসজিদ মক্তব গড়ে উঠে। এসব প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষাই প্রধান ছিল। অতএব এভাবে বাংলাদেশে শিক্ষা দ্রুত উন্নতি ও বাঙালী সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং মুসলমানদের শিক্ষাও জ্ঞান নানাভাবে বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করে তোলে।

হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা :

মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব বিস্তৃতি এবং বিপুলভাবে সাড়া জানানোর কারণে শিক্ষার প্রতি হিন্দু সমাজে দৃষ্টিভঙ্গি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিক্ষা প্রধানত ব্রাহ্মনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং যে কোন প্রকার জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মনগণ তাদের শাস্ত্র জ্ঞানের চর্চায় নিরংকুশ আধিপত্য সর্বদাই বজায় রেখেছিল।

---

১. ডি, সি, সেন, টিপিকাল সিলেকশনস ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলী লিটারেচার, ২য় অধ্যায়, পৃঃ১৩৮৪। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু শাসনামলে তাই দেখা যায় শিক্ষা ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষার উপর ব্রাহ্মনদের একচেটিয়া অধিকার ছিল । এই সংস্কৃত ভাষা ছিল ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির একমাত্র বাহন এবং রাজ দরবারের ভাষা হিসেবে এর একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজিত ছিল । জন সাধারণের অধিকাংশই শিক্ষার অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল এবং তাদের উপভাষা বাংলা অবহেলিত ও ঘৃনিত ছিল ।[১] শিক্ষা ও অন্যান্য অধিকার হতে বঞ্চিত করা হিন্দু ব্রাহ্মনদের ইহা একটা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয় বলে মনে হয় । কেননা ব্রাহ্মনরা সমাজে একচ্ছত্র আধিপত্য ও অধিকার বজায় রাখার জন্য কিংবা আরো অধিক সুবিধা ভোগের জন্য ধর্মের দোহায় দিয়ে অনেক কিছু করত । তাই সকলেই যদি শিক্ষিত হয়ে উঠে, তবে তাদের ধোকা ধরা পড়ে যাবে এবং স্বীয় অধিকার সম্মন্ধে সোচ্ছার ও সজাগ হয়ে উঠবে । তাই তথাকথিত সমাজের উচ্চস্তরের হিন্দু ব্রাহ্মনেরা অত্যন্ত সুকৌশলে অধিকাংশ মানুষকে শিক্ষা হতে বঞ্চিত করে । তাছাড়া সমাজে জাতি, গোত্র, বর্ণ ও কৌলিন্য প্রথার উদ্ভবের পিছনে হয়ত এ উদ্দেশ্যই কাজ করছিল । কিন্তু যখন বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন এসব জাতি গোত্র বর্ণ ও কৌলিন্য প্রথার কঠোরতা হ্রাস পায় এবং সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল স্তরের মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় । এভাবে যখন সকল স্তরের মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন মানুষের শিক্ষা লাভেরও অবাধ সুযোগ হয় । শিক্ষাক্ষেত্রে যেহেতু মুসলমান শাসকরা উদার ছিলেন সেহেতু সকল স্তরের হিন্দুরাও শিক্ষাক্ষেত্রে অবাধ সুযোগ গ্রহণ করে । তাই বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নবজাগরণের সৃষ্টি হয় । অতএব এভাবে মুসলিম শাসন প্রবর্তনের ফলে ব্রাহ্মনদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর একচেটিয়া অধিকার খর্ব হয় ।

এই সুযোগে ব্রাহ্মন ভীতিমুক্ত হয়ে হাড়ি, ডোম, বাগদী, কৈবর্ত, প্রভৃতি অস্পৃশ্য বর্ণের লোকে অনেকে লেখা পড়া শিখতে থাকে ।[২] বাংলাদেশে হিন্দু শাসনের অবসানের দরুন সংস্কৃত শিক্ষা

---

১. ডঃ এম, শহিদুল্লাহ, 'দি ইনফ্লুয়েন্স অব উর্দু হিন্দী অন বেঙ্গলি-ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচার, জার্নাল অব দি এশিয়ান টিক সোসাইটি অব পাকিস্তান (জে, জ, এস, পি) ৭ম খন্ড, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

দুরাবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলিম শাসনের উদার শাসনতান্ত্রিক পরিবেশ ও মুসলিম শাসকদের গভীর আগ্রহের ফলে সংস্কৃতের চর্চা ও শিক্ষার গুরুত্ব পুনরুজ্জিবিত হয়। বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রবর্তিত উদার নীতি শিক্ষার প্রভাবের ফলে সংস্কৃত শিক্ষার নতুন অধ্যায় শুরু হয়। সংস্কৃত টোল, পাঠশালাগুলির উন্নতি হয় এবং সংস্কৃতি শিক্ষার বড় বড় কেন্দ্র স্থাপিত হয়।[১] নিম্নে হিন্দু সমাজের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

প্রাথমিক শিক্ষা ও পাঠ্য-সূচী :

প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে হিন্দুদের জন্য ছিল পাঠশালা, চৌপাড়ী, বা চৌবাড়ী, চতুষ্পাঠী। চতুষ্পাঠী শব্দের বিবর্তিত রূপ হল চৌপাঠী বা চৌবাড়ী। চতুষ্পাঠী শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল যেখানে 'চারিবেদ' পড়ানো হয়। পাঠশালা ছিল সর্বসাধারণের জন্য। সাধারণত প্রতি গ্রামেই পাঠশালা ছিল। কোন শিক্ষিত ব্যক্তি গুরু মশাই সেজে নিজের বাড়ীতে অথবা গ্রামের চন্ডী মন্ডপে পাঠশালা খুলতেন। অনেক সময় অবস্থাপন্ন পরিবারের সংগে যুক্ত পুরহিত পরিবারের শিশুদের পড়াবার সংগে সংগে গ্রামের অন্যান্য ছেলে মেয়েদেরও পড়াতেন।[২] তবে এরূপ বিদ্যালয়ে সাধারনঃ ব্রাহ্মনদের বর্ণ হিন্দু সন্তানরাই লেখাপড়া করত। এগুলি পন্ডিত বা উস্তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হত। তবে গ্রামের লোকেরাও সহযোগীতা করত।[৩] সাধারণ গ্রামবাসীর শিক্ষা লাভের জন্য পাঠশালা ছিল। পাঠশালা ও চতুষ্পাঠীর মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, চতুষ্পাঠীসমূহ ব্রাহ্মন পন্ডিতের পরিচালনা করতেন। পাঠশালাসমূহ সাধারণত প্রাথমিক লিখন, পড়ন, শুভংকরী, পত্র ও দলিলাদি লিখন প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হত। পাঠশালার শিক্ষককে গুরুমশাই বলা হত এবং তিনি শিক্ষা দানের জন্য খুব বদনামের সাথে বেতের ব্যবহার করতেন। পাঠশালার ছেলেমেয়ে উভয়েই পড়ত।[৪] অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলে সর্বস্তরে শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূর হলে শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মোচিত হয়। তাই বহু শিক্ষানুরাগী জমিদার অবস্থা সম্পন্ন ধনী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিজ গৃহে

---

১. বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩৭
১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭২।
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯-৯০।
৩. বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩৯।
৪. বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা গৃহসংলগ্ন কোন স্থানে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করতেন। শুধু তাই নয় পন্ডিত অথবা গুরুজনও নিজ গৃহ কোনে বা গাছ তলায় পাঠশালা স্থাপন করতেন। এভাবে সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বহু পাঠশালা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

হিন্দু ছেলে মেয়েদের পাঁচ বা সাত বছর বয়সে "হাতে খড়ি" নামের অনুষ্ঠান করে পাঠশালায় পাঠানো হত। ইহা মুসলমানদের বিসমিল্লাহ খানের মতই এক অনুষ্ঠান ছিল। অবস্থা সম্পন্ন পরিবারে ইহা উৎসব মুখর ও জাকজমকের সাথে করা হত। ভোজ, পায়েস, সিন্নি, গুড়, বাতাসা, মিষ্টি ও পান যোগে উপস্থিত লোকেরা আপ্যায়িত হত। অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল পুরোহিতকে রেশমী বস্ত্র প্রদান করা ও দেবী সুরস্বতীর পূজা করা। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ বাসা হতে আসন সাথে নিয়ে যেত ও গুরুমশায়ের ডান ও বামদিকে আসন গ্রহণ করত। সাধারণভাবে তাদের সংখ্যা বিশজনের মত হত। মাটিতে ধুলার উপর শক্ত খর বা কন্চী দিয়ে নিজের লেখার উপর গুরু শিশুদের লেখার অভ্যাস করাতেন। বর্ণ পরিচয়ের পর পরবর্তী পর্যায়ে অষ্ট ধাতু বা অষ্ট শব্দ অর্থাৎ আটটি প্রধান শব্দের নাম ও সর্বনাম ও ৮টি প্রধান ধাতুর রূপ মুখস্থ করানো হত। একে বলা হত অষ্টাশব্দী। এ ছাড়া পাঠশালায় গনিত ও পড়ানো হত। গণিত শিক্ষার মধ্যে ছিল নামতা, কড়াকিয়া, গন্ডাকিয়া, শতকিয়া ইত্যাদি। যোগ বিয়োগ, পুরণ, ভাগ, ইত্যাদি মুখে মুখে শিখানো হত। অংক শিখানোর পদ্ধতির নাম ছিল "স্যাখত"। পদ্য তথা ছড়ার মাধ্যমে অংক শিখানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। এর নাম ছিল আর্যা। গনিত সুত্রের ছড়ার আর্যা নাম এখনো প্রচলিত আছে। কিন্তু আর্যামূলত প্রাচীন প্রাকৃত কবিতার একটি ছন্দের নাম।[১] এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়াদি ও পাঠশালায় পড়ানো হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন-ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, জ্যোতির্বিদ্যা ও শাস্ত্র শিক্ষার সংগে রতি শাস্ত্রও কখনো কখনো শিক্ষা দেয়া হত। বাৎসায়নের কাম শাস্ত্র কিংবা 'নায়িকা লক্ষন' প্রভৃতি সে যুগে তেমন লজ্জাজনক বিদ্যা ছিল না। তাই কাব্যে, উপাখ্যানে রতি রমনের ও নারী রূপের বিস্তৃত

---

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০-১১। আহমদ শরীফ, মধ্য যুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, (ঢাকা, ১৯৭৭) ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা থাকত ।[১] প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে পাঠশালায় এই পাঠ্য সূচী ব্যাপক ছিল বলে মনে হয় এবং সকলের পক্ষে অধ্যয়ন করাও ইহা কঠিন ছিল । কিন্তু সময় ও পরিবেশের কারণে উহাই তখন হয়ত স্বাভাবিক ছিল ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ শুরুকারী ছাত্র ছাত্রীরা প্রথমে বালি ও ধূলার উপর লেখা অভ্যাস করত । এরপর তারা মেঝেতে খড়িমাটি নিয়ে লেখার চেষ্টা করত । পরবর্তী পর্যায়ে তারা কলাপাতা, তালপাতা ও ভোজ পাতায় লিখত । খড়ের বা নল খাগড়ার টুকরা, বাঁশের কঞ্চি ইত্যাদি দ্বারা তখনকার ছাত্রেরা লিখত । বড়রা হাঁসের পালক, পাখীর ও ময়ুরের পালক কলম হিসেবে ব্যবহার করত । শ্লেট, পেন্সিল ও ব্লাকবোর্ডের তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল ।[২]

টোল বা উচ্চ শিক্ষা ও পাঠ্য-সূচী ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর হিন্দু ছাত্রগণ যারা উচ্চ শিক্ষা লাভের ইচ্ছা পোষণ করত, তারা সাধারণত টোলে লেখা পড়া করত । এ সমস্ত টোলে সাধারণত সংস্কৃত শাস্ত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল । সাধারণত বর্ণ হিন্দু সন্তানেরা তথা ব্রাহ্মন সন্তানরা টোলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত । তবে অর্থ ও প্রতিপত্তির সাহায্যে কখনও ধনী, বণিকগণ টোলে তাদের সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারতেন । চৈতন্য দেবের প্রভাবে অবশ্য পরবর্তীকালে শূদ্রের ও বেদ পাঠের অধিকার প্রদান করা হয়েছিল ।[৩] টোল চতুষ্পাঠী ইত্যাদি স্থাপন করা সে সময়ে সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল । সাধারণত নিজের বাড়ীতেই টোল প্রতিষ্ঠিত হত । তবে অন্যের বাড়ীতে কেউ কেউ স্থাপন করত । পন্ডিতরা নিজের বাড়ীতে টোল খুলে শিক্ষাদানে ব্যাপৃত হতেন, ধনীরাও অনেক সময় নিজ বাড়ীতে টোল স্থাপন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন ।[৪] কোথাও কোথাও বিত্তশালী

---

১. মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সাংস্কৃতির রূপ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭ ।

২. ডি,এন,দাসগুপ্ত, বিক্রমপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৩৩০-৩৩ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ২৩৩ । বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১০৪১ ।

৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ২২৯ ।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৯২ ।

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৯৮, ৯২ ।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষানুরাগী লোকদের অর্থ সাহায্যে টোল স্থাপিত হত । চৈতন্য ভগবতে দেখতে পাওয়া যায় যে, নবদ্বীপের পন্ডিতরা নিজেদের ঘরে ঘরেই টোল খুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন ।[১] দূরের ছাত্ররা পন্ডিতের কাছে থেকে লেখা পড়া করত । নিকটবর্তী যে সমস্ত ছেলেরা পড়ার জন্য আসত তারা সন্ধ্যায় যার যার ঘরে ফিরে যেত । খাওয়া দাওয়া ও পূজার্চনার জন্য দুদফায় পাঁচ ছয় ঘন্টা বিরতি দিয়ে সকাল হতে গভীর রাত পর্যন্ত অধ্যয়ন চলত । বিষয় অনুসারে আট, দশ, কিংবা বার বছর অধ্যয়ন করতে হত । শিক্ষা শেষে ছাত্ররা গুরু দক্ষিণা দিত ।[২] এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা জোরালো ব্যবস্থা না থাকায় ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিজ নিজ বাড়ীতে কিংবা অন্য কোন স্থানে টোল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার সুব্যবস্থা করে দিতেন । এ ছাড়া পন্ডিতেরাও নিজ নিজ বাড়ীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন ।তাই সে সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থাও শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে নিয়ন্ত্রিত হত ।

উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রসমূহ :-
নবদ্বীপ ও অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্র :

হিন্দু শাসনামলে হিন্দুদের শাস্ত্র এবং বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল মিথিলা । কিন্তু বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর তা নষ্ট হয়ে যায় । এরপর নবদ্বীপ ব্রাহ্মন্য শাস্ত্র ও সংস্কৃতি চর্চার এবং জ্ঞান অর্জনের প্রধান কেন্দ্রে পরিনত হয় । নব্য ন্যায় স্মৃতির নতুন ভাষ্য ও গৌড়ীয় নব বৈষ্ণব মত এখানেই সৃষ্টি হয় । বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভগবতে নবদ্বীপের জ্ঞান চর্চা ও সংস্কৃত শিক্ষার উজ্জল কেন্দ্ররূপে পরিগনিত হয় এবং এখানে বিপুল সংখ্যক ছাত্রের অধ্যয়নের কথা জানা যায় ।[৩]

---

১. বাংগালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪০ ।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩ ।

৩. বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য , ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশে সংস্কৃতি শিক্ষার কেন্দ্রের মধ্যে নবদ্বীপের কেন্দ্রটিই ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ। ইহা হিন্দু আমলে ও বিরাট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। মুসলিম যুগে এই শিক্ষা কেন্দ্রটি দর্শনের একটি নতুন মতবাদের প্রধান কেন্দ্রে উন্নীত হয় এবং ভারত বর্ষের সকল অঞ্চল হতে ছাত্ররা এখানে জ্ঞান অর্জন করতে আসতে থাকে। কোন কোন পন্ডিত এ শিক্ষা কেন্দ্রকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে অভিহিত করেছেন। নবদ্বীপে বহু সংখ্যক টোল ছিল এবং সেখানে হাজার হাজার খ্যাতনামা ও বিখ্যাত পন্ডিত অধ্যাপক ও বিদ্বান ব্যক্তিদের বসবাস ছিল। তাঁরা তাদের জ্ঞানের দ্বারা এই শিক্ষা কেন্দ্রকে প্রভূত সমৃদ্ধশালী করে তুলে ছিল।[১] মধ্যযুগে নবদ্বীপের জ্ঞান চর্চার খ্যাতি ও সুনাম সমগ্র ভারত ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল।

নদীয়ার বাসুদেব সার্বভৌম পনর ষোল শতকের (১৪৩০-১৫৪০) বিখ্যাত অধ্যাপক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ষোল শতকের বাংলাদেশে তাঁর টোলের ছাত্ররা এক অবিস্মরণীয় কীর্তি ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। তন্মধ্যে তন্ত্র ধর্ম প্রচারে ও কালী মূর্তি পরিকল্পনায় কৃষ্ণানন্দ, আগম বাগীশ, নব্য ন্যায়ের নতুন ধারা প্রবর্তনের রঘুনাথ শিরমনি, স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় রঘুনন্দন ও পদার্থ তত্ত্ব বিশ্লেষনে কনাদ তর্ক বাগীশ প্রমুখ পন্ডিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ যোগ্য। এর পরেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন রামভদ্র সার্বভৌম, (১৫২৫-৭৫) তাঁর টোল ছিল নবদ্বীপে। তাঁর চারজন প্রধান ছাত্র ছিল যেমন-মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালংকার, গৌরিকান্ত সার্বভৌম, ও জগত গুরু জয়রাম প্রমুখ।[২] এ সকল কীর্তিমান পুরুষরা এই নবদ্বীপ শিক্ষা কেন্দ্র হতে শিক্ষা গ্রহণ করে এর মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুগুনে বৃদ্ধি করেছিলেন। অতএব এতে বুঝা যায় যে, তৎকালীন সময়ে নবদ্বীপ শিক্ষা কেন্দ্র ব্যাপক সমৃদ্ধ অর্জন করে এবং এর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সমগ্র ভারত বর্ষ হতে বহু সংখ্যক জ্ঞান তাপসী জ্ঞান চর্চার জন্য এখানে আসতে থাকেন।

নবদ্বীপের উত্থানের পূর্বে সম্ভবত উত্তর বঙ্গ তথা বরেন্দ্র অঞ্চলেও বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ ছিল। এই শহরে পনের ষোল মাইল নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রাম হতে শিক্ষা লাভের আশায় কৃত্তি বাসের

---

১. বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভগবত, পৃঃ ১২১। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৯-৩০।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর বঙ্গে আগমন তারই ইঙ্গিত বহন করে । পরে কোন কারণে এ এলাকার গৌরব ও সুখ্যাতি নষ্ট হয়ে যায় । কেবল নবদ্বীপই একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না । শাস্ত্র অধ্যয় ও অধ্যাপনার জন্য এ ছাড়া আরো কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, হুগলীর ত্রিবেনী, নদীয়ার শান্তিপুর, চব্বিশ পরগনার কুমার হট্ট, ভট্ট পল্লী (ভাট পাড়া) গোন্দোল পাড়া (চন্দন নগর) ভদ্রেশ্বর, জয়নগর, মজিলপুর, আন্দুল, বালীদ, বর্ধমান ; বরিশালের বাকলা, ঢাকার বিক্রমপুর, ও ফরিদপুরের কাটালি পাড়া, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছিল । ত্রিবেনীতে পন্ডিত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের টোল ছিল । তিনি প্রায় ১০ বছর অধ্যাপনা কাজে নিয়োজিত ছিলেন ।[১] দ্রাবিড়, উৎকল, মিথিলা ও বাড়ানসী থেকে দলে দলে ছাত্র বর্ধমানের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতে আসত । এ সকল চতুষ্পাঠীতে কেবল মাত্র স্মৃতি শাস্ত্রেরই অনুশীলন হত তা নয়, এ ছাড়া জ্যোতিষ শাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র, কোষ, নাটক, গণিত, ব্যাকরণ, ছন্দ, সূত্র, প্রভৃতি ভারবি, মাঘ, কালিদাস, প্রভৃতি কাব্যসমূহ এবং ভারত কামন্দকী, দীপিকা, হিতোপদেশ ইত্যাদি পড়ানো হত ।[২] বরিশাল জেলার (বর্তমান বিভাগ) বিজয় গুপ্তের বসত গ্রাম 'ফুল্লশ্রী' ষোড়শ শতকে হিন্দু শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল । বিজয়গুপ্ত তার পদ্মাপুরানে উল্লেখ করেন যে, ফুল্লশ্রীতে ব্রাহ্মনদের বসতি ছিল । তারা চার বেদ ও নানা বিষয়ে ও বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে তাদের বিশেষ দক্ষতা, নৈপুন্য ছিল ।[৩]

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য হতে জানা যায় যে, সাতগাঁও একটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল । বিপ্রদাসের মতে পঞ্চদশ শতকে সপ্তগ্রামে অনেক হিন্দুযোগী ও সন্যাসীর আশ্রম ছিল এবং বহু জ্ঞানী গুণী পন্ডিত ব্যক্তি সেখানে বসবাস করতেন । এ ছাড়া সিলেট, চট্টগ্রাম ও বিষ্ণুপুর (বাকুড়া জেলা) হিন্দু শিক্ষার কেন্দ্র ছিল ।[৪] অতএব সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে, সাধারণ হিন্দুরা যে শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত হয়েছিল, তা বাংলায় মুসলিম

---

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৬০ ।বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৬ ।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬ ।

৩. বিজয় গুপ্ত, পদ্ম পুরান, পৃঃ৪ ।উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৩ ।

৪. বিপ্রদাস, মনসামঙ্গল, (১৪৯৫) সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১১৩ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সে বাধা বিপত্তি প্রতি বন্ধকতা দূর হয়ে যায় এবং সকলের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে হিন্দু জমিদার, ধনী ও বিত্তশালী ও পন্ডিতেরা, শিক্ষার উন্নতির জন্য দ্রুত এগিয়ে আসেন। তাঁরা তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় পাঠশালা, টোল ও অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলেন। এভাবে মুসলিম শাসকদের সহযোগীতায় হিন্দু পন্ডিত ও অন্যান্যদে প্রচেষ্টায় সুলতানী শাসনামলে সংস্কৃত তথা হিন্দু ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

পাঠ্যসূচী :

টোলের পাঠ্য-সূচীতে বিভিন্ন ধরনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই একজন ছাত্রকে জ্ঞানের অনেক শাখায় বিচরণ করতে হত। কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, সাহিত্য তত্ত্ব, দর্শন, শব্দ শাস্ত্র, রাজনীতি, জোতিষ শাস্ত্র, নিরুক্ত (বৈদিক অভিধান বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ) ইত্যাদি টোলে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়া হত। কাব্য পাঠ করতে হত ভারবির, 'কিরাতার্জুনীয়' মেঘের শিশু পলবধ, কালী দাসের, মেঘ দূত, রঘু বংশের-কুমার সম্ভব, শ্রী হর্ষের -নৈষধচরিত, কবিরাজের-রাঘব পান্ডবী, সাত বাহনের -গাথা সপ্তসতী, ও সপ্তসতী নামক মার্কন্ডের পুরানের দেবী মাহাত্ম অংশ ইত্যাদি। নাটকের মধ্যে পাঠ্য ছিল বিশাখা দত্তের-মুদ্রারাক্ষস, মুরারি মিশ্রের-অনর্ঘ রাঘব, হর্ষচিত-রত্নাবলী, ভবভূতির মালতী মাধব ও বেরাবের-জয়দেব রচিত -প্রসন্ন রাঘব ; সুবন্ধচিত গদ্য আখ্যায়িকা, বাসবদত্তা ও তার পাঠ্য তালিকায় ছিল। সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক বই এর মধ্যে ছিল সম্মাটের কাব্য প্রকাশ, বিশ্বনাথ রচিত সাহিত্য দর্শন, ও পিঙ্গলের ছন্দ শাস্ত্র। এ ছাড়া আরো অন্যান্য পাঠ্য বিষয় ছিল যেমন-শতানন্দ বিরচিত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ, ভাস্বতী, কামন্দক-বিরচিত রাজনৈতিক রচনা নীতিসার, অন্নমভট্টের দর্শন গ্রন্থ দীপিকা। এতদ্ব্যতীত ব্যাকরণ, মৈত্রেয় রক্ষিতের-ধাতু প্রদীপ, ন্যায় দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থ, বিভিন্ন পঞ্জিকা ও টীকা-ভাষ্যতার পাঠ্য সূচীর অন্তর্গত ছিল।[১] টোলের পাঠ্য তালিকায় ধর্ম তত্ত্ব ও দর্শন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে পরিগনিত ছিল।[২] ইতিহাস ও

---

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৬, ৯৭।

২. দয়াময়, সারদা শশীল, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৮৫। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১] কালিদাসের গ্রন্থাবলী, বিজয় রক্ষিতের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের টীকা-মধু কোষ, অমর কোষ, (অমর সিংহের বিশ্বকোষ), পানিনির ব্যাকরণের টীকা এবং রামায়নও মহাভারত, সংস্কৃত বিদ্যালয় বা টোলের প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল।[২] অতএব এতে বুঝা যায় যে, এ সময় টোলের পাঠ্যসূচী অত্যন্ত ব্যাপক ও কঠিন ছিল। যা ছাত্রদের অধ্যায়ন করতে খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু ছাত্রদের অসীম ধৈর্য্য ও ত্যাগ স্বীকার করেই উচ্চতর শিক্ষার জন্য এ সব পাঠ্যক্রম অধ্যায়ন করতে হত। যেহেতু সে সময় শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রন না থাকায় ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রীত হত। সেহেতু পাঠ্য-সূচীর তালিকা প্রতিষ্ঠানের পন্ডিত কিংবা পৃষ্ঠ পোষকদের কর্তৃক অনুসৃত হত। তাই এর পাঠ্য সূচীর কলেবর হত ব্যাপক ও বিস্তৃত। তবে এ সব পাঠ্য-সূচীতে ধর্মীয় অনুভূতি ও নৈতিকতা প্রাধান্য দেয়া হত। তাই বলা যায় যে, তখনকার শিক্ষা ও শিক্ষাক্রম ছিল ধর্ম ভিত্তিক অবশ্য পার্থিব প্রয়োজনের তাগিদের এর সাথে অন্যান্য বিষয়ও সংযোজিত হত।

ধর্মীয় গুরুরা ধর্মীয় বিশ্বাস, বিধি বিধান, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মকে জানা ও বুঝার জন্য শিক্ষা দিতেন। তবে উচ্চ শ্রেণীতে অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করানো হত তাও কিন্তু ধর্মাশ্রিত ও ধর্ম কেন্দ্রিক ছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একান্ত ভাবে সীমা বদ্ধ ছিল সংস্কৃত ভাষার ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য সে শিক্ষার দ্বার বন্ধ ছিল। তবুও দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিত ছিল। সেটা অবশ্য সম্ভব হয়েছিল আনুষ্ঠানিক লোক শিক্ষার কারণে।

কেননা ঘরোয়া ও সামাজিক পরিবেশে শ্রুতি, স্মৃতির মাধ্যমে লোক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু সমাজের জন্য ছিল যেমন-কথ কথা, ব্রতিকথা, উপকথা, ইতিকথা, রূপ কথা, কিংবদন্তী, যাত্রা, কীর্তন, পাঁচালী, খনার বচন, আপ্ত বাক্য, চানক্য শ্লোক, সাদীর বয়েত, প্রবচন, প্রবাদ, গায়েনের আসর এবং পুরান, রামায়ন, মহাভারত, ভাগবত, মঙ্গল কাব্যপাঠ, ইত্যাদি এবং মুসলিম সমাজের জন্য ছিল ওয়াজ নছিহত, মাহফিল, পুঁথি পাঠ, মর্সিয়া গীতি প্রভৃতি। লোক শিক্ষ

---

১. বংশীদাস, মনসা মঙ্গল, টি,সি,দাস গুপ্ত (সম্পাদিত) পৃঃ১৭৪। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৯।

২. সারদা মঙ্গল, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ১৩৯২। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

বাহন ও মাধ্যম ছিল ।[১] ইত্যাদি এসব প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান ও চর্চা মাধ্যমে সমাজের নিরক্ষর লোকের পুঁথি গত বিদ্যা না থাকলেও ধর্মের মূল বাণী, প্রত্যয় ও শিক্ষাকে তারা আত্মস্থ করার সুযোগ পেত । তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেনি তারা এভাবে ধর্মীয় বিষয় জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে এবং অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও শিক্ষিত হয়েছে ।

অতএব উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সবশেষে বলতে পারি যে, সুলতানী শাসনামলে মুসলিম শাসকদের উদার নৈতিক শাসন ব্যবস্থার ফলে মুসলিম ও হিন্দু সমাজে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক জাগরনের সৃষ্টি হয় । মুসলিম শাসক আমীর ওমরাহ অভিজাত, ধনিক, বণিক শ্রেণীর এবং আলেম, সুফী দরবেশগণ যেমন-ধর্মীয় অনুসাসন ও নির্দেশে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মুসলিম সমাজকে শিক্ষিত করে তুলার মানসে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, খানকাহ, ইত্যাদি স্থাপন করেছেন । তেমনি হিন্দু সমাজেও হিন্দু জমিদার অভিজাত ধনীও পন্ডিতেরাও তাদের সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে পাঠশালা ,টোল ও উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেন । এভাবে দেশের আনাচে কানাচে, শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষিত হতে থাকে । উভয় সমাজের শিক্ষাসূচী ধর্মাশ্রিত পাঠ্য সূচীকেই প্রাধান্য দেয়া হত । তবে অন্যান্য বিষয়ও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকত । সুতরাং এভাবে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই প্রচেষ্টায় সুলতানী আমলে বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে ছিল ।

তাই এন,এন,ল উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানদের ভারত আগমন কেবলমাত্র সামাজিক এবংরাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান চর্চা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল । এ উপমহাদেশে মুসলিমানগণই প্রথম সার্বজনীনতা ও উদারতা পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনও আদর্শের প্রবর্তন করে তারা সকলের নিকট এমন কি ব্রাম্মনদের দ্বারা উপেক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের নিকটও শিক্ষার দ্বার. উন্মোচন করে দেয় । এ ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা ও শিক্ষা বিস্তারকে একটি পবিত্র কাজ ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসার নিদর্শন বলে মনে করত । সুতরাং মুসলমান শাসনকর্তা,রাজ কর্মচারী ও অবস্থা পন্ন ব্যক্তিরা নিজেরা বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং এ প্রেক্ষিতে মাদ্রাসা মক্তব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন ।আলেম সম্প্রদায়ও বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি ও শিক্ষাদানে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দেন এবং নিজেদের মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠানাদি নিজ দায়িত্বেই রক্ষনাবেক্ষন করেন ।[২]

---

১. পূর্বোক্ত,পৃঃ১০৫ ।বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য,২য় খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ ১০৩৬ ।
২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,২য় খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ ৩১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) মুগল শাসনামলে (১৫৭৬-১৭৫৭) বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ঃ-

সুলতানী শাসনামলে উদার নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুসলিম ও হিন্দু সমাজে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক জাগরণের সৃষ্টি করে। মুসলমান শিক্ষানুরাগী শাসক, আমীর ওমরাহ অভিজাত ও আলেম, সূফী দরবেশগণ মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, খানকাহ, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা বিস্তারে যেমন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তেমনি হিন্দু জমিদার, ধনী, অভিজাত ও পন্ডিতরা পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী ইত্যাদি স্থাপন করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন। তাই সুলতানী শাসনামলে শিক্ষা বাংলাদেশে নব চেতনার সূচনা করে। মুগল শাসনামল ছিল সেই সূচনাকৃত শুভ অধ্যায়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরব উজ্জ্বল যুগ। মুগল সম্রাট, সুবাদার, রাজকর্মচারী প্রায় সবাই শিক্ষানুরাগী ও সংস্কৃতবান ছিলেন তাদের পৃষ্ঠ পোষকতায় ও সহযোগীতায় এই শিক্ষা মুগল শাসনামলে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। নিম্নে এ সময়ের মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা ঃ

বাংলাদেশে মুগল বিজয়ের পূর্বে সুলতানী শাসন আমলে শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে এক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ভিত্তিতে মুগল শাসন যুগে এ দেশের শিক্ষা, সাংস্কৃতিও সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়ে একটি নতুন স্রোতধারা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে ভিন্নতর ও নতুনতর উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সুলতানী শাসনামলে অনেক মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। মুগল আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া শিক্ষানুরাগীদের সহযোগীতায় আরো অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষার নতুন নতুন কেন্দ্রের উদ্ভব হয়। প্রাক মুগল যুগে লক্ষনাবতী (গৌড়) পান্ডুয়া, মাহিসন্তোষ, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, নাগর, মান্দারান, বাঘা, রংপুর চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান ছিল উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি। তবে এ সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্রের অনেকগুলি কেন্দ্র মুগল শাসনকাল পর্যন্ত শিক্ষা দান ও বিস্তারের কাজ অব্যাহত ছিল।[১] তাছাড়া মুগল যুগেও শাসকদের এবং আলেম, সূফী দরবেশদের অব্যাহত প্রচেষ্টাও উদ্যোগে আরো নতুন

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৫।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন মসজিদ মাদ্রাসা মক্তব, খানকাহ এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে । এ সময় শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায় । এভাবে মুগল যুগে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক গৌরব উজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করে ।

প্রাথমিক শিক্ষা ও পাঠ্য-সূচী ঃ

মুগল শাসনামলে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল । এ সময় প্রাইমারী শিক্ষা অবৈতনিক ছিল । শিক্ষার এই অবৈতনিক হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ হল মুসলমানরা তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া ধর্মীয় কর্তব্য এবং শিক্ষাকে তারা সামাজিক মর্যাদা হিসাবে মনে করত । তাই অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিরা ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদা ও পুণ্য লাভের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করত । এভাবে বাংলাদেশে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অন্তত একটি মক্তব,মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন একটি মক্তব দেখা যেত । মসজিদ ব্যতীত প্রত্যেক ইমাম বাড়ার সংগে ও একটি করে মক্তব ছিল । অবস্থা সম্পন্ন মুসলমানদের বাড়ীতে ও মক্তব ছিল । শুধু তাই নয় আলেম, সুফী দরবেশদের খানকাহ কিংবা নিজ বাড়ীতেও মক্তব, মাদ্রাসা ছিল । শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে মক্তবের এই ঐতিহ্য এ দেশে মুসলিম শাসনের অবসানের পরও থাকে ।[১] ষোড়শ শতকের মুসলিম কবি বাহরামের বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, মুসলিম বালক বালিকারা উভয়ে একই মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা গ্রহণ করত । কবি উল্লেখ করেছেন যে , অনেক বালক বালিকা মক্তবে বিদ্যা শিক্ষা করে, সেখানে লায়লী মজনু অধ্যয়ন করত ।[২] এতে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা করা মুসলিম ধর্মীয় বিধান হিসেবে মুগল শাসক, অভিজাত, ধনী শ্রেণী এবং আলেম, সুফী দরবেশগণ শিক্ষা বিস্তারে অনুপ্রাণিত হন । তাই আল্লাহর সন্তুষ্টিও পূণ্যের আশায় তাঁরা বাংলাদেশে সর্বত্র শহর বন্দর গ্রামে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে মসজিদ মাদ্রাসা, মক্তব, স্থাপন করে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ।

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৩৪৩ ।

২. পূর্বোক্ত,পৃঃ ৩৪৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

চার বছর চার মাস ও চারদিন বয়স হলে মুসলিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষা জীবন শুরু করা মুসলিম সমাজের এক রীতিতে পরিণত হয়েছিল । এ বয়সে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া শুরু করা একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হত । এ অনুষ্ঠানটি বিসমিল্লাহ খানি নামে পরিচিত ছিল । জ্যোতিষের সংগে পরামর্শ করে একটি শুভ দিন স্থির করা হত এবং শুভ দিনে ছাত্রকে রঙিন কাপড় পরিধান করিয়ে শিক্ষকের সামনে উপস্থিত করা হত । শিক্ষক কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করতেন এবং শিশু ছাত্র তা পুনরাবৃত্তি করত । এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুর শিক্ষা শুরু হত । অথবা শিক্ষার্থীর হাতে রৌপ্য নির্মিত একটি ফলক দেয়া হত । এর উপর লেখা থাকত কুরআনের একটি আয়াত । শিক্ষক বার বার এই আয়াত উচ্চারণ করতেন এবং ছাত্র তা মুখস্থ করতেন । এরপর হত কালাম পাঠ ।[১] অর্থাৎ খুব কম বয়সেই একজন মুসলিম ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষা জীবন শুরু হত । এ শিক্ষা ছিল কুরআন পাঠ ও ইসলামের মূল বিষয় কালেমা পাঠ শিক্ষার মাধ্যমে । ছাত্র ছাত্রীর এ শিক্ষা জীবন অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও উৎসব মুখর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হত । কেননা সে সময় বিদ্যা শিক্ষা করা সমাজে অত্যন্ত সম্মানের ও মর্যাদাকর ছিল এবং অভিভাবকগণও সমাজে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা পেত । হয়ত এ কারণেই সবাইকে অবহিত করার জন্য অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের শিক্ষা জীবন ঘটা করে শুরু করত ।

পাঠ্য-সূচী ঃ

মক্তবে শিক্ষা ছিল মুসলিম শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তর । দিনে কয়েকবার (পাঁচ) নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানদের ন্যূনতম অবশ্য কর্তব্য । নামাজের জন্য কুরআনের নির্দিষ্ট সূরা আয়াত, পাঠ করা ছিল নিয়ম, তাই এই কুরআন পাঠ শিক্ষা মক্তবেই দেয়া হত ।[২] ধর্মীয় শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম ও প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল । প্রত্যেক মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের কুরআন ও ধর্মের মূল নীতিগুলি শিক্ষা দেয়া হত । কবি বিপ্রদাস উল্লেখ করেন যে, মুসলমান ছাত্র ছাত্রীদেরকে মক্তবে নামাজ আদায় করা ও কিভাবে অজু করতে হয় তা শিখানো হত ।[৩] মক্তবী শিক্ষা পদ্ধতিতে মুখস্থ

---

১. অধ্যাপক, গৌরদাস হালদার, "ভারতের শিক্ষা সমস্যা, (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) "(কলিকাতা ১৯৭১) ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৭০ । শ্রী গৌর দাস হালদার এবং শ্রী ঋতেন্দু কুমার রায়, "শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস"(কলিকাতা ১৯৭৩) ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৭৮ । বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৫ ।

২. ভারতের শিক্ষা সমস্যা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০ । শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮ ।

৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

করানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত । কিছু লিখতে পড়তে এবং হিসাব নিকাশ জানাও প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত ছিল । নামাজ আদায় ও ধর্মীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা ছিল মুসলমানদের ন্যূনতম শিক্ষা । এই ন্যূনতম শিক্ষার বিচারে বলা যায়, মক্তব ছিল সে যুগের মুসলিম জনগণের মধ্যে গণ শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যম ।[১] সাত বছর বয়সে শুরু হত মক্তবের প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষা চর্চা । কুরআন ও ধর্মের নির্দেশ মেনে চলায় ছিল মক্তবের প্রাথমিক পাঠ । এর সংগে শিখানো হত পড়া, লেখা ও সাধারণ হিসাব পদ্ধতি । মক্তবের উচ্চ সুরে পড়ানো হত পীর দরবেশ, পয়গম্বরদের আত্ম কাহিনী, জীবনী, ফার্সী কাব্য, গাথা প্রভৃতি । শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী ও ফার্সী ।[২] এইচ,জি, রাউলিনসন উল্লেখ করেন যে, মক্তবে শিশু কালেমা বা ধর্মমত ও কুরআন থেকে কিছু আয়াত মুখস্থ করত এবং এসব মুখস্থ আয়াত তার প্রত্যাহিক নামাজের জন্য প্রয়োজন হত । কুরআন শরীফ মুখস্থ করা একটি সাধারণ রীতি ছিল । শুধু তাই নয় এর সংগে হাদীস, লিখন, পঠন ও অংকন এবং ফার্সী ভাষা শিক্ষা করাও সংযুক্ত ছিল । এলফিনস্টোন উল্লেখ করেন যে, উচ্চ মর্যাদা ও অভিজাত সম্পন্ন পরিবারের সন্তানেরা সাধারণত পাঁচ অথবা ছয় বছর বয়সে তাদের শিক্ষা জীবন শুরু করত । আরবী ফার্সী ও অন্যান্য বিষয় ব্যতীত ও তাদেরকে নামাজ শিক্ষা দেয়া হত । শিক্ষার এই ধারা ১৩ অথবা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকত ।[৩] অতএব এ থেকে বুঝা যায় যে, মক্তব তথা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মুসলমানগণ ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করত । অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান যথা নামাজ, রোজা, অজু, গোসলও আনুসাংগিক মাসআলা এবং কুরআন পাঠ ও মুখস্থ করা ইত্যাদি বিষয় বেশী গুরুত্ব দেয়া হত । তবে ধর্মীয় বিষয়াদি ছাড়াও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও চর্চা ও শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হত ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদেরকে তিনটি ভাষা শিখতে হত । আরবী, ফার্সী এবং বাংলা । কুরআন, ও হাদীস শিক্ষার জন্য আরবী ভাষা জ্ঞান ও শিক্ষা অপরিহার্য ছিল । সমগ্র মুসলিম শাসন ব্যাপী রাজ দরবারের এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা ছিল ফার্সী । ফলে সরকারের

---

১. শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১ ।
২. শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১ । ভারতের শিক্ষা সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭৩ ।
৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৫-৪৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

অধীনে কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী লাভের জন্য ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করা অপরিহার্য ছিল ।[১] আরবী ফার্সী ও বাংলায় প্রাথমিক জ্ঞান এবং ধর্মীয় নীতিমালা গদ্য ও পদ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক পাঠ্য-সূচী গঠিত ছিল । প্রাথমিক শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ ছিল অংক শাস্ত্র । অংক শাস্ত্রের উপাদানগুলো যেমন যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ এবং জমির মাপের সংগে সম্পর্কযুক্ত কাঠাকিয়া, গন্ডাকিয়া ও বিঘা কিয়া, প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষা দেয়া হত । অংক শাস্ত্রের পাঠ্য তালিকাভুক্ত একটি প্রধান অংশ ছিল শুভংকরী নামে অভিহিত শুভংকর পদ্ধতি ।[২] উল্লেখিত বিষয়গুলি ছাড়াও সে যুগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পদার্থ বিদ্যা এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ ও অধ্যয়ন ও শিক্ষাদান করা হত বলে প্রমাণ পাওয়া যায় ।[৩] এ থেকে বুঝা যায় যে, মুগল শাসনামলে বাংলাদেশে মক্তব ও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক বিষয়ে ও শিক্ষা অতিশয় গুরুত্ব দেয়া হত । অবশ্য মুগল সম্রাট আকবর এই প্রাথমিক শিক্ষা-সূচীর কিছুটা পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করে আরো গতিশীল ও বাস্তব ভিত্তিক করার চেষ্টা করেন ।

ঐতিহাসিক আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন যে, আকবর এক সরকারী আদেশ নামা দ্বারা শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করেন । উক্ত আদেশ নামায় উল্লেখ করা হয় যে, ইতিপূর্বে শিশুকে অক্ষর জ্ঞান লাভের জন্যই কয়েক বছর কাটাতে হত এবং এর মধ্যে অনেক বই পুস্তক তাকে মুখস্থ করতে হত । আকবর নির্দেশ দেন যে, শিশু দিগকে প্রথমেই অক্ষর লিখতে ও শিখতে হবে এবং অক্ষর জ্ঞান লাভ করতে হবে । কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উহা শিশুর পক্ষে আয়ত্বাধীন আসলে তাকে কিছু কবিতাও গদ্য মুখস্থ করতে দিতে হবে । তাকে নির্ধারিত কয়েকটি নীতিমূলক ও আল্লাহর গুণ সম্পন্ন কয়েকটি

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৬ ।

২. শুভংকর নামের বিখ্যাত হিন্দু অংক শাস্ত্রবিদ সপ্তদশ শতকের শেষে অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রথমে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে হয় । তিনি অংক শাস্ত্রের অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন । তার নতুন উদ্ভাবিত অংকের পদ্ধতির নাম হল শুভংকর ।

৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা অর্থসহ শিখতে হবে । দৈনিক লেখার অভ্যাস করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে । তেমনি অক্ষর জ্ঞান, শব্দার্থ ও কবিতা পাঠে শিশুকে সহযোগীতা প্রদান করতে হবে । স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে নীতি বোধক পুস্তক, গণিত, কৃষিবিদ্যা, জ্যোর্তিবিদ্যা, জ্যামিতি, পরিমিতি, গার্হস্থ বিজ্ঞান, ধর্ম বিজ্ঞান ব্যবহার বিধি, চিকিৎসা শাস্ত্র, তর্ক শাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় । আকবরের এই পাঠ্য-সূচীর বিষয়গুলি যাতে সঠিকভাবে পঠিত হয় সে দিকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরও প্রতি সর্বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় ।[১]

আবুল ফজলের উল্লেখিত বিবরণী হতে মুগল শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পাঠ্য-সূচীর পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় বিচার বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, মুগলযুগে শিক্ষাক্রম অত্যন্ত উন্নত ছিল । এ সময় শিক্ষা ও ধর্ম একই সংগে থাকায় মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল । মসজিদ এর ইমাম দিগকেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে কাজ করতে হত ।[২] প্রকৃতপক্ষে আকবরের সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মের চেয়ে জাগতিক প্রভাব বেশী ছিল । আকবরের অনুসৃত শিক্ষা পদ্ধতির ফলে অনেক হিন্দু ছাত্র ফার্সী শিখতে আরম্ভ করে। মাদ্রাসা ও মক্তবে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে কোন রূপ সম্প্রদায়গত পার্থক্য ও বৈষম্য ছিল না ।[৩] আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুগল শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম বিশেষত কায়স্থ পরিবারের বালকগণ মৌলভীদের পরিচালনাধীন মক্তবগুলিতে শিক্ষা লাভ করত ।[৪] সুতরাং মুগল সম্রাট আকবর শিক্ষাকে সুলতানী শাসনামলের চেয়ে গতিশিল করার জন্য এবং একটা নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আনয়নের জন্য শিক্ষা সংস্কার করেন । এ শিক্ষা সংস্কারে তিনি পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় বিষয়াবলীর চেয়ে জাগতিক বিষয়াবলীর উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন । পাঠ্য-সূচী তিনি এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যে, হিন্দু মুসলিম উভয়ই যাতে শিক্ষা লাভ করতে পারে ।

---

১. ডঃ আঃফঃমঃআব্দুল বারী, "আমাদের শিক্ষার ইতিহাস" (ময়মনসিংহ ১৯৭২) ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৫ ।

২. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬ । শিক্ষাক্রম-তান্ত্রিক ও ব্যবহারিক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১০ ।

৩. মধ্যযুগের পাক ভারতীয় সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৪ ।

৪. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৪৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব মুগল যুগে মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে এমনভাবে পাঠ্য-সূচী প্রণয়ন করা হয়েছিল যে, একদিকে যেমন একজন ছাত্র ধর্মীয় বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করতে পারত তেমনি জাগতিক বিষয়েও জ্ঞান লাভ করতে পারত এবং সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনা বিকাশেরও সুযোগ ছিল। উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা বুঝতে পারি যে, মুগল শাসনামলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গতিশীল পাঠ্যক্রম ছিল এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল এবং সুলতানী শাসনামলের শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্য-সূচী হতে অনেক আধুনিক ও গতিশীল ছিল। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, মুগল শাসনামলে শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় উন্নতি লাভ করলেও জন শিক্ষার কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না এবং জন শিক্ষা ব্যাপক ভিত্তিক করার জন্য বা বিভিন্ন স্কুলও মাদ্রাসায় একই নিয়ম ও একই বিষয়াদি শিক্ষা দেয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিংবা শিক্ষার মান উন্নত রাখার বা করার উদ্দেশ্যে সরকার পরিচালিত কোন শিক্ষা বিভাগও দপ্তর ছিল না।[১]

উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষা কেন্দ্র, পাঠ্য-সূচী :

এ যুগে উচ্চ জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ও জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে বহু পন্ডিত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের অসাধারণ জ্ঞান ও বুৎপত্তি ছিল। মুসলমানেরা ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়ে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত। উন্নততর শিক্ষা ও জ্ঞানান্বেষনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ ও তাদের ছিল। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণ হতে জানা যায় যে, শাসকবর্গ, অভিজাত আমীর ওমরাহ, অবস্থাপন্ন ধনী ব্যক্তি, আলেম, শেখ, সুফী, দরবেশদের সহযোগীতায় বহু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ গুলি সুরক্ষা ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য লাখেরাজ ভূমির ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে বাংলাদেশে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বেশীর ভাগ শহর ও গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান এলাকাসমূহে মুসলিম অধিবাসীদের শিক্ষার চাহিদা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল।[২] বৃটিশ শাসনামলে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলিম শাসক ও অবস্থাসম্পন্ন ধনী

---

১. ডঃ আব্দুল করিম, "পাক ভারতের মুসলিম শাসন", (ঢাকা ১৯৬৯) ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৪৮৮।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৩। ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিরা ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অসংখ্য নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন ।[১] শেখ, আলেম, সুফী দরবেশগণ তাদের প্রতিষ্ঠিত খানকাহ, মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি নিজ দায়িত্বে রক্ষনাবেক্ষন করতেন ।[২] এ ছাড়া অনেক সময় এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারী সহায়তাও পাওয়া যেত । বহু মসজিদ ও ইমামবাড়াগুলিতে মাদ্রাসা অবস্থিত ছিল । উক্ত মাদ্রাসা সমূহে উচ্চ শিক্ষাদান করা হত । এ সময়ের উপমহাদেশের শিক্ষার অবস্থা উল্লেখ করে ১৮৮২ সালের এক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সমস্ত মসজিদ ইমামবাড়া গুলির কিছু কিছু মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে এমন কি ঊনিশ শতক পর্যন্তও চালু ছিল । রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে, এ রকম একটি মাদ্রাসা কিংবা ইমামবাড়া ছিল না যেখানে আরবী ও ফার্সী অধ্যাপকদের রক্ষনাবেক্ষন করা হত না ।[৩] রাজকোষ হতে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবস্থা করা হত এবং শিক্ষকদের বেতন দেয়া হত । মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিও দেয়া হত । সম্রাট নিজে এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা শিক্ষার কাজ দেখাশুনা করতেন এবং এ বিষয়ে আইন কানুন প্রয়োগ করতেন ।[৪] অতএব এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুগল শাসনামলে বাংলাদেশে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী, অভিজাত, ধনী ও বণিক শ্রেণী এবং শেখ, আলেম, সুফী, দরবেশদের শিক্ষার প্রতি ও শিক্ষা বিস্তারের প্রতি অদম্য স্পৃহা ও অনুরাগের কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল ।

শিক্ষার উন্নতির জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘোষণা দেন যে, কোন আমীর মৃত্যু বরণ করলে তার সম্পত্তি যদি শাহী সরকারের আওতায় আসে, তবে সে সম্পত্তির আয় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষনাবেক্ষনের কাজে ব্যবহৃত হবে । আওরঙ্গজেব দেশের সর্বত্র অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাতে অধ্যাপনা ও অধ্যয়নরত শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য বৃত্তি ও ভাতা মঞ্জুর করেন ।[৫] শায়েস্তা খান দু দফা

----

১. ডব্লিউ, হান্টার, ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃঃ১৭৭ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৩ ।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৫, ১৪৮ ।

৩. এ, আর, মল্লিক, বৃটিশ পলিসি এন্ড দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল' ১৭৫৭-১৮৫৬'(ঢাকা ১৯৭৭), পৃঃ ১৪৯ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃঃ ২২০ । ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৩৩ ।

৪. এম, এ, কাদের, শিক্ষাক্রম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, ১ম সংস্করণ, (ঢাকা-১৯৮৮), পৃঃ ১৯০ ।

৫. মধ্যযুগের পাক ভারতীয় সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৫, ৯৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার সুবাদার ছিলেন । প্রথম দফা ১৬৬৩ সাল হতে ১৬৭৮ সাল পর্যন্ত, দ্বিতীয় বার ১৬৭৯ সাল হতে ১৬৮৮ সাল পর্যন্ত । বলা হয় তিনি এ সময় কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন ।[১] তার সম্পর্কে 'আছরারুল উমারা' এর লেখক বর্ণনা করেন যে, শায়েস্তা খান ১৬৬৪ সাল হতে ১৬৮০ সাল পর্যন্ত ঢাকার সুবাদার ছিলেন । এ সময় তিনি 'পাথর তলীতে' নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে (বুড়িগঙ্গা) একটি মাদ্রাসা ও মসজিদের গোড়া পত্তন করেন । এই মাদ্রাসা বিগত শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চালু ছিল । এরপর কিছু কাল অব্যবহৃত থাকার পর মাদ্রাসা ভবনে হাসপাতাল চালু করা হয় । অর্থাৎ ইহা বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালে অন্তর্ভুক্ত হয় । ঢাকার অধিবাসী জনৈক হাকিম হাবিবুর রহমান তার এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ঢাকার উপকন্ঠের বিশিষ্ট ব্যক্তি শাহনুরী তার 'কিবরিয়াতে আহমর' গ্রন্থে লিখেছেন যে, তিনি প্রতিদিন চার মাইল পথ অতিক্রম করে মগ বাজার হতে শায়েস্তা খানের এই মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করতে যেতেন । এই অধ্যয়ন কাল সম্ভবত ১৭০৮ সাল ছিল । এ ছাড়া হাকিম সাহেব আরো উল্লেখ করেন যে, তার কাছে 'ফতোয়ায় খানীয়া' নামক একটি হাতে লিখা পান্ডুলিপি আছে । ১৭৩৩ সালে জনৈক ছাত্র এই মাদ্রাসাতে বসে এই পান্ডুলিপিটি তৈরী করেন ।[২] এ ছাড়া পাথর তলী মাদ্রাসায় তিনি হাসান সাগানী লাহোরী রচিত 'মাশারিকুল আনওয়ার' (হাদীস গ্রন্থ) ও 'শরহে মতালি' (যুক্তি বিদ্যা) ও অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন বলে কিবরিয়াতে আহমর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ।[৩] আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শায়েস্তা খানের ঢাকার লাল বাগের কেল্লার অনতি দূরে প্রায় দুই ফার্লং পশ্চিমে একখানা জমকালো মসজিদ রয়েছে এই মসজিদকে প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ বলা হয় । এই ভবনটি দ্বিতল বিশিষ্ট । মসজিদের শিলা লিপি হতে বুঝা যায় যে, এটি ১৭০৪ সালে নির্মিত হয় । এর নীচ তলায় বেশ কয়েকটি সুপ্রসস্ত ঘর রয়েছে । খুব সম্ভব এই ঘরগুলি ছাত্রদের আবাস স্থল রূপে ব্যবহৃত হত । মসজিদের চারিদিকে যে সব প্রসস্ত প্রকোষ্ট আছে তা এখনো মাদ্রাসা নামে পরিচিত ।

---

১. মুহম্মদ যুবায়ের, "ইসলামী কুতুবখানা", কলিকাতা, পৃঃ ২৮৯ । উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩ ।

২. আঃ সাত্তার, 'আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস', (ঢাকা ১৯৮০) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, পৃঃ ২৪, ৩০,। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩ ।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

ড: টেলর তার 'টপোগ্রাফী অব ঢাকা', গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, মৌলভী আসাদুল্লাহ এই মসজিদের আরবী ফার্সী মাধ্যমে ছাত্রদের যুক্তি বিদ্যা, দর্শন ও ফিকাহ, ইত্যাদি পড়াতেন এবং স্থানীয় নওয়াবদের নিকট হতে মাসিক ৬০ টাকা করে বৃত্তি পেতেন।[১] এ ধরনের আর একটি মসজিদ ঢাকার আজিমপুরে রয়েছে। এ মসজিদটি দ্বিতল বিশিষ্ট। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র মোহাম্মদ আজম বা আজিমুশশানের নামানুসারে ইহা পরিচিত। এ মসজিদের দোতালায় উত্তরাংশে কয়েকটি প্রসস্ত প্রকোষ্ঠ আছে এগুলি আজ পর্যন্ত মাদ্রাসা রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ দেওয়ালে মুদ্রিত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, এই মাদ্রাসামূলত আত্মশুদ্ধি এবং এলমে বাতেন শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে ইহা আধ্যাত্ম শিক্ষার পাশাপাশি এলমে জাহের বা সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার ও প্রচলন হয়। খান মুহাম্মদ কর্তৃক শিলা লিপি হতে জানা যায় যে, এ ছাড়া ঢাকাতে এ ধরনের আরো মসজিদ আছে[২] যা মাদ্রাসা হিসেব ব্যবহৃত হয় এবং উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্ররূপেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ থেকে বুঝা যায় যে, এ রূপ উচ্চতর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কারণে মুগল শাসনামলে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি সাধন করে।

সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ 'সুবহ-ই-সাদিক' হতে জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকা) বুদ্ধি বৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহু প্রসিদ্ধ বিদ্বান কবি, জ্ঞানী, গুণী পন্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সপ্তদশ শতকে জাহাঙ্গীর নগরে বসবাস করত।[৩] এতে দেখা যায় যে, জাহাঙ্গীর নগর মুগল আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক গৌরব উজ্জ্বল শিক্ষা কেন্দ্রে উন্নীত হয়। সমসাময়িক লেখকদের লিখনী হতে মুগল শাসনের শুরু হতে জাহাঙ্গীর নগরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণিত হয়। ঢাকার বড় কাটারা এবং ছোট কাটারা নামে

---

১. সগীর হাসান আল মাসুমী, 'বেঙ্গলস কন্ট্রিবিউশন টু ইসলামিক স্টাডিজ', জার্নাল অব দি ইসলামিক রিসার্চ ইনসটিটিউট অব পাকিস্তান, ৪ম খন্ড, নং ২, জুন ১৯৬৭, উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, উনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩ ।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১ । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, উনবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪ ।

৩. বৃটিশ পলিসি এন্ড দি মুসলিমস ইন বেঙ্গাল (১৭৫৭, ১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত ভবনগুলি বিরাট মাদ্রাসা এলাকা ও শিক্ষা কেন্দ্র ছিল বলে অনুমান করা হয়। লালবাগের শাহী মসজিদেও একটি মাদ্রাসা ছিল বলে জানা যায়। এই মাদ্রাসার শেষ উস্তাদ মৌলভী আসাদ উল্লাহ ছিলেন বলে জানা যায়।[১] এভাবে শুধু ঢাকাতেই নয় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল।

মসজিদ কেন্দ্রিক এইসব মাদ্রাসা শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার দরুন এই দেশের মুসলিম অধ্যুষিত প্রধান প্রধান শহর বন্দরে ও জনপদে বৃহদাকারের মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এ সব বৃহদাকার মসজিদের নির্মাণ এবং অবস্থান প্রত্যক্ষ করলে সহজেই এ কথা বুঝা যায় যে, এসব মসজিদ কেবলমাত্র নামাজ বন্দেগীর জন্যই নির্মাণ করা হয়নি। এতে নিয়ম তান্ত্রিকভাবে উচ্চতর বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চাও রীতিমত হত।[১] এভাবে দেখা যায় যে, এদেশে মসজিদ কেন্দ্রিক বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলি উচ্চতর বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে ১৮৮২ সালে শিক্ষা কমিশনের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পর অন্যান্য মুসলিম দেশ সমূহের মত এখানকার মসজিদগুলিও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।। যেহেতু হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের শিক্ষার ভিত্তি মূল হল তাদের ধর্ম। একজন্য এ ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র সরকারের তেমন বায়ভার বহন করতে হয়নি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মাদ্রাসা ওয়াকফ সম্পত্তি ও উইলের টাকায় পরিচালিত হত। ধর্ম পরায়ন লোকেরা পরকালীন পূণ্য অর্জনের জন্য এসব শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য সম্পত্তি প্রদানের অসিয়ত করে যেতেন। পাক ভারতীয় মসজিদ কেন্দ্রিক মাদ্রাসার এ অবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[২] সুতরাং মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা ছিল উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মক্তবের ন্যায় অধিকাংশ মাদ্রাসা মসজিদের পাশাপাশিই গড়ে উঠতো। তবে মসজিদ ছাড়াও অন্যান্য স্থানেও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সিলেট শহরের মুফতী পরিবারের মওলানা জিয়া উদ্দিন একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসার জন্য মুগল সম্রাটগণ লাখেরাজ ভূমি দান করে ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এই মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করত। ফসটার্স মেমোয়ার্স গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে যে, এই মাদ্রাসা ১৮২৭ সালে পর্যন্ত চালু ছিল। ১৮৩৬ সালে ফার্সী আদালতের ভাষা হিসেবে বাতিল হওয়ার পর ১৮৩৭ সালে এই মাদ্রাসা উঠে যায়।[১] মুগল যুগে সিলেট শহরে ফুলবাড়ী ও তরফে কয়েকটি মাদ্রাসা ছিল। ফুলবাড়ীর হাজরা বংশীয় গণ ফুলবাড়ীতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে ইহা আজিজিরিয়া আলিয়া মাদ্রাসা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তখনকার সময়ের মৌলনা আজীর উদ্দীনের নামে এর নামকরণ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মজুমদার পরিবারের সৈয়দ বখত মজুমদার, সৈয়দিয়া মাদ্রাসা নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে সিলেটে বহু স্থানে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে কোম্পানী সরকারের সাথে মাদ্রাসাকে ভিত্তি করে এখানকার আলেমদের ও প্রতিষ্ঠাতাদের বিরোধ বাধে। অবশেষে এ সব মুসলিম শিক্ষার কেন্দ্র মাদ্রাসাসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়।[২] বর্ধমান জেলার মঙ্গল কোটে সপ্তদশ শতক থেকে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিগণিত হয়। এই গ্রামের অধিবাসী মওলানা হামিদ দানিশমন্দ কর্তৃক মঙ্গল কোর্টে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তিনি জনসাধারণকে শিক্ষাদান ও তাদের সামাজিক জীবনের সংস্কার সাধন করার উদ্দেশ্যেই মঙ্গল কোটে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি বাংলায় 'মুজাদ্দাদিয়া সিলসিলাহ' এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষাদান ও ধর্ম প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেন।[৩]

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম প্রভাব প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগেই উক্ত উচ্চ শ্রেণীর মাদ্রাসা যথেষ্ট সংখ্যায় স্থাপতি হয়েছিল বলে বুঝা যায়। মুগল শাসন আমলে এ মাদ্রাসার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুগল শাসনের পতনের কালে লখনৌর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা নিজামুদ্দীনের চেষ্টায় এ উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে মাদ্রাসার সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়।[৪]

----

১. সৈয়দ মূর্তজা আলী, 'হযরত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস', (ঢাকা ১৯৮৮) ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৬০-১৬১। সিলেট কথা, সম্পাদনা, কৃষ্ণ কুমার পাল চৌধুরী, (সিলেট ১৯৮৬) ১ম সংস্করণ, রাজা গিরিশ চন্দ্র হাই স্কুল এর শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ ১৭০, ১৭৩।

২. সিলেট কথা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭।

৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৭-২৮।

৪. সন্ধান, কেন্দ্রিয় ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র, ১ম বর্ষ, জুন-জুলাই, সংখ্যা ২-৩, (ঢাকা ১৯৬৪), পৃঃ ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব মুগল শাসনামলে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে উচ্চতর শিক্ষার আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন-রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, ইত্যাদি অঞ্চলে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য বহু মাদ্রাসা গড়ে উঠে। মুগল রাজা, বাদশাহ, সুবাদার, আমীর ওমরাহের পৃষ্ঠপোষকতা, অভিজাত ও ধনী অবস্থাপন্ন শ্রেণী লোকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং শেখ আলেম, সুফী দরবেশদের ত্যাগও শিক্ষা বিস্তারের কঠোর সাধনা বলে এসব মাদ্রাসা গড়ে উঠে। এসব মাদ্রাসা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত ও অন্যান্য বিষয়ের উচ্চতর শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র পরিণত হয়। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নত ও উচ্চাঙ্গের ধর্মীয় পুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা হত। নিম্নে এসব মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাদ্রাসার পাঠ্য-সূচী সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পাঠ্য-সূচী ঃ

উল্লেখিত মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্য-সূচী পূর্বের ধারায় চলে এসেছে। অর্থাৎ এদের মূল উৎস ছিল বাগদাদের দরসে নেজামিয়া মাদ্রাসা। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের সলজুক বাদশাহ মালিক শাহের খ্যাতনামা মন্ত্রী নেজামুল মুলক কর্তৃক বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত নেজামিয়া মাদ্রাসাই এর মূল আদর্শ।[১] উক্ত মাদ্রাসায় যে পাঠ্য-সূচী অনুসৃত হত সে অনুযায়ী এদেশের মাদ্রাসাগুলিতেও সে পাঠ্য-সূচী প্রবর্তন করা হয়। এ ব্যাপারে আলেম, সুফী দরবেশ এবং শাসকগণ সক্রিয়ভাবে উক্ত পাঠ্য-সূচী প্রবর্তনে সহায়তা করেন। কেননা তারা সাধারণত উক্ত আদর্শে ও পাঠ্য-সূচী অনুযায়ীই শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। তাই বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসায় প্রবর্তিত পাঠ্য-সূচীর প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে তারা উহা বাংলাদেশের মাদ্রাসার পাঠ্য-সূচীতেও অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর হতে বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সময় মাদ্রাসাসমূহে যে পাঠ্য-সূচী প্রবর্তিত ছিল, তা আবুল হাসান নদবী যুগের ক্রমানুসারে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছিলেন এবং প্রত্যেক যুগের পাঠ্য গ্রন্থের নাম ও উল্লেখ করেছিলেন। এ পর্যায়ে মুগল শাসন যুগ হল তাঁর দ্বিতীয় যুগ। অর্থাৎ এ যুগ ষোড়শ শতাব্দী হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত

---

১. সন্ধান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল । এ যুগের পাঠ্য-সূচী অনেকটা প্রথম যুগের তথা সুলতানী শাসনামলেরই অনুরূপ ছিল । যেমন ছরফ, বালাগাত, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, মানতিক, কালাম, তাসাউফ, হাদীস, তাফসীর, ইত্যাদি । তবে মুগল যুগে পান্ডিত্য লাভের মাপ কাঠিকে আরো উন্নত করা হয়েছিল । এ যুগে পূর্ববর্তী যুগের পাঠ্য-সূচীর সংগে কাজী আযুদ রচিত মাতালী, মাওয়াকিফ, এবং সাক্কাকী রচিত মিফতাহুল উলুম ও এর পাঠ্যভুক্ত করা হয় । এ ছাড়া এসমান্বয়ে শরহে ই মাতালী, শরহেই মাওয়াকিফ মুত উয়াল, মুখতাসারুল মআনী, তালবীহ, শরহে আকয়েদ ই নাসাফী, শরহে ই বিকায়াহ ও শরহে ই জামী পাঠ্য-সূচীতে সংযোজন করা হয় । অর্থাৎ মুগল উপমহাদেশে হাদীস ও আরবী সাহিত্য শিক্ষা তেমন প্রসার লাভ করেনি কিন্তু এ সময় সাক্কাকী রচিত মিফতাহুল উলুম এবং আযুদ রচিত মাতালি ও মাওয়াকিফ ইত্যাদি জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হত ।[১]

তবে মুগল শাসনামলে উচ্চ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মীয় জ্ঞান ও লোক বিজ্ঞান উভয় বিষয়েরই পর্যালোচনা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল । ধর্মীয় বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি পদার্থ বিদ্যা এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানে ও পারদর্শি ছিল । শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ধর্মীয় ও লোক বিজ্ঞানে খ্যাতনামা বিদ্বান ও পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন । ছাত্ররা সোনার গায়ে অবস্থিত তাঁর শিক্ষা কেন্দ্র উভয় বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত ।[২] কুরআন, হাদীস আইন শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস এবং অন্যান্য ইসলামী বিষয়গুলি উচ্চ ও মাধ্যমিক পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল । লৌকিক বিজ্ঞান সমূহ যেমন-তর্ক শাস্ত্র, জ্যামিতি, অংক, বীজ গনিত, জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, ও অন্যান্য বিষয়েও মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষা দেয়া হত বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । সম্রাট আকবরের সময়ের শিক্ষা সংক্রান্ত রেগুলেশনের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবুল ফজল তাঁর সময়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য বিষয়সমূহের উল্লেখ করেছেন । তিনি লিখেছেন যে, প্রত্যেকটি বালকের পক্ষে নীতি শাস্ত্র, অংক শাস্ত্র, অংক শাস্ত্রের জন্য নতুন পদ্ধতি বা চিহ্ন, কৃষি বিদ্যা, জ্যামিতি, ক্ষেত্র বিদ্যা, শরীর বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন , পদার্থ বিজ্ঞান,

---

১. হিন্দুস্তান কি কাদীম দরস গাহে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪ । উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা এক বিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭, ২৮ ।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৪৯ । ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৩-৩৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, প্রশাসন বিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, কারিগরী বিদ্যা, সঙ্গীত, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভাষা, নীতি শাস্ত্র, ইত্যাদি লেখা পড়া শেখা অত্যাবশ্যক ছিল । এসবগুলি বিষয়ই পর্যায়ক্রমে আয়ত্ত করা যেত । সংস্কৃত শিখতে গিয়ে ছাত্রদের ব্যাকরণ, ন্যায় শাস্ত্র, বেদান্ত, পতঞ্জলি, ইত্যাদি অধ্যয়ন করা আবশ্যক ছিল । এ সমস্ত বিষয় বিদ্যালয় সমূহে নতুন আলোর সঞ্চার করে এবং মাদ্রাসাগুলিতে দীপ্তি বৃদ্ধি করে ।[১]

আবুল ফজলের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রকার কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ের উপর অধ্যয়নের জন্য যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ছিল এবং মাদ্রাসায় এ ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্র বেশ ব্যাপকতর ছিল । মাধ্যমিক শ্রেণীর একজন ছাত্রকে উপরে উল্লেখিত সব বিষয়ই পাঠ করতে হত না । তবে শুরুতে তাকে এ সব বিষয় হতে কয়েকটি বিষয় নির্বাচন করে অধ্যয়ন করতে হত এবং শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে অগ্রসর হয়ে এ সব বিষয়গুলি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত । তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ছিল । তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চপাঠ্য বিষয়কে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করতে মনস্থ করে ছিলেন । যাতে প্রত্যেকটি শিক্ষিত যুবক ব্যবহারিক ও মৌখিক উভয় ক্ষেত্রেই সকল বিষয়ে বিপুল জ্ঞানের অধিকারি হতে সমর্থ হয় । এমনকি সম্রাট আওরঙ্গজেবের মত একজন খাঁটি মুসলমান শাসক এর পক্ষেও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি লৌকিক বিষয়ের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন ।[২] মাদ্রাসাগুলিতে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার একটা অঙ্গ ছিল । ইহা অংক শাস্ত্র, কারিগরি শিক্ষা ও সঙ্গীত বিদ্যার সংগে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই বিষয়গুলি একত্রে 'রিয়াজী' বা বিজ্ঞান রূপে পরিচিত ছিল । মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে এই উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশে জ্যোতিশাস্ত্র খুব একটা বেশী অধ্যয়ন হত না । তবে আকবরের শাসনামলে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়নও

---

১. আইন-ই-আকবরী, ১ম খন্ড, (অনু-ব্লক ম্যান) পৃঃ ২৮৮ । উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৪ । ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২১ । শিক্ষাক্রম-তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯০ । মধ্যযুগের পাক ভারতীয় সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮ ।

২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

অনুশীলন মুসলমানদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।[১] তাই মুগল শাসন যুগে মাদ্রাসা পাঠ্য তালিকা অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই যুগেই বাংলাদেশে শুভংকরীর প্রবর্তন নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং বাদশাহ শাহজাহান সে যুগে চিত্র, ভাস্কর্য ও সঙ্গীত শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্য প্রসারের সাথে ইতিহাস, ও ছিল এ যুগের অন্যতম আকর্ষণীয় পাঠ্য বিষয়। বস্তুত ভারতে মুগল শাসন যুগে আধুনিক ধারায় ইতিহাস লেখা সুত্রপাত হয় এবং এ যুগে লিখিত ইতিহাস হিন্দুযুগে লিখিত ইতিহাস ধরনের পুস্তক অপেক্ষা উন্নত ও সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল।[২] মুগল আমলে বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহের উচ্চ শিক্ষার পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, এ উপমহাদেশে অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহ রসায়ন, চিকিৎসা শাস্ত্র ও লোকায়ত বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়াদি শিক্ষা ও অধ্যয়ন করা হত। বাংলাদেশে গ্রীক ও ইরানী চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যায়ন করা হত এবং এ শাস্ত্রমতে চিকিৎসা কার্য ও চালানো হত। এমন কি এ্যাডাম উনিশ শতকের প্রথম দিকেও বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলিতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামী বিষয়াদি ছাড়াও প্রকৃতি বিষয়ক দর্শন ও সাধারণ দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থাদির সংগে অনূদিত ইউক্লিডের ক্ষেত্র বিদ্যা এবং টলেমীর জ্যোতিষ শাস্ত্র কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা হত।[৩]

অতএব উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, মুগল শাসনামলে বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মুগল শাসক, সুবাদার, আমীর ওমরাহ এবং অভিজাত ধনী ও আলেম, সুফী দরবেশদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এই উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব মাদ্রাসাগুলির শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারী অনুদান তথা লাখেরাজ সম্পত্তি বরাদ্দ করা হত। এ ছাড়া ধর্মপ্রাণ ধনী ব্যক্তিরা পুণ্যের

----

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪১।

২. শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯।

৩. বৃটিশ পলিসি এন্ড দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, পৃঃ ১৫২। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২২, ২২৪।

Dhaka University Institutional Repository

আশায় মাদ্রাসার অনুকূলে সম্পত্তি ওয়াকফ করে দিতেন এবং আলেম সুফী, দরবেশগণ তাঁদের আর্থিক, শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা করে শিক্ষার কেন্দ্রগুলি উজ্জীবিত করে তুলতেন । তাই সকলের প্রচেষ্টা ও সহযোগীতায়, মুগল শাসনামলে বাংলাদেশে উচ্চতর ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় । এসব মাদ্রাসাগুলিতে ধর্মের বিভিন্ন শাখায় বিষয়ের উপর জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা দেওয়া হত । ধর্মীয় বিদ্যার পাশাপাশি লোক বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, অংক শাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি আরো বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গুরুত্ব অধ্যয়ন ও জ্ঞান চর্চা করা হত । সুতরাং এভাবে মুগল শাসনামলে বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে ।

হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ঃ

মুগল শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপক উন্নতি ও সম্প্রসারণের ফলে হিন্দু সমাজের শিক্ষা ক্ষেত্রে দৃষ্টি ভঙ্গির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় । কেননা মুসলিম পূর্ব যুগে বাংলাদেশের শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মনদের মধ্যে সীমা বদ্ধ ছিল এবং অন্যান নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদেররকে যে কোন প্রকার শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা হতে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল । এভাবে মুগল যুগে হিন্দু সমাজে পূর্বের তুলনায় অবাধ জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার পথ সুপ্রসস্থ হলে শিক্ষাও জ্ঞান চর্চা সম্প্রসারিত হয় । নিম্নে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় শিক্ষার সম্পর্কে আলোচনা করা হল ।

প্রাথমিক শিক্ষা ও পাঠ্যসূচী ঃ

হিন্দু বালক বালিকাদেরকে সাধারণত পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হত । এ সকল প্রাথমিক পাঠশালা বা বিদ্যালয়ে সাধারণত শিক্ষানুরাগী ধনী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বাড়ীর আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত হত কিংবা গুরু মশায়ের বাড়ীতে অথবা গাছের তলায় পাঠশালা বসত । এছাড়া রাজা, জমিদারগণ অনুরূপভাবে ব্যক্তি গত দানের সাহায্যে পাঠশালা বা টোল প্রতিষ্ঠা করে দিতেন অনেকে আবার বৃত্তি হিসেবে ছাত্রদের নগদ টাকা প্রদান করতেন । পাঠশালায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে গুরু একটি টুলের উপর আসন গ্রহণ করতেন : এবং ছাত্র ছাত্রীরা তাদের নিজস্ব মাদুরে বসত । কখনো বা মাদ্রাসা ও পাঠশালা একই ঘরে বা ছাদের নীচে বসত । মুন্সী জোরে এবং গুরুমশায়

Dhaka University Institutional Repository

অপরাহ্নে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করতেন।[১] এসব প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণভাবে ব্যক্তির উদ্যোগে বা উৎসাহেই প্রতিষ্ঠিত হত। এদের রক্ষনাবেক্ষন ও সুরক্ষার জন্য এবং গুরু মশাই, ছাত্রদের বেতন ও বৃত্তির জন্য প্রতিষ্ঠাতারা অর্থ সাহায্য প্রদান করত কিংবা লাখেরাজ ভূমির ব্যবস্থা করে দিত। এ ভাবে হিন্দু প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণভাবে দেশের সকল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় গড়ে উঠেছিল।

মুগল শাসনামলে হিন্দু প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি ও ধরণ মোটামুটিভাবে সুলতানী শাসন যুগের অনুরুপই ছিল। খুব একটা পরিবর্তন দেখা যোয় না। সুলতানী শাসন যুগে যেমন একজন হিন্দু ছাত্রকে পাঠশালায় প্রবেশের জন্য হাতে খড়ি অনুষ্ঠান পালন করা হত। মুগল যুগেও তেমনি একই ভাবে উক্ত অনুষ্ঠান জাক জমকের সাথে পালন করা হত। পাঠশালায় সাধারণত ধর্মীয় বিষয়ের উপর শিক্ষা দানই প্রাধান্য দেয়া হত। ধর্মীয় বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান দান করা হত। ধর্ম গ্রন্থ হতে বিভিন্ন মন্ত্র বা শ্লোক মুখস্থ করানো হত। গুরু মশাই প্রথমে শ্লোক বলে যেতেন ছাত্ররা তার সাথে সথে উচ্চারণ করে যেত। ধর্ম গ্রন্থের বিভিন্ন গল্প কাহিনী ও অধ্যয়ন করা হত শুধু তাই নয় সে সময় এর সাথে পার্থিব প্রয়োজনের জন্য হিসাব রক্ষার জন্য অংক শাস্ত্র, জ্যামিতি শতকিয়া, কড়াকিয়া, গন্ডাকিয়া, তা ছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, দর্শন, কৃষি বিজ্ঞান, ইত্যাদিও পড়ানো হত। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সুলতানী শাসন যুগে হিন্দু সমাজের প্রাথমিক শিক্ষা যেভাবে যে বিষয়ে দেয়া হত মুগল যুগেও প্রায় অনুরুপই দেয়া হত, খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। অতএব এভাবেই মুগল শাসন যুগে হিন্দু প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালু ছিল

উচ্চ শিক্ষা ও শিক্ষা কেন্দ্র এবং পাঠ্য-সূচী :

মুগল শাসনামলে হিন্দু সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার সময়সীমা পরিধি ছয় বছরেরও অধিককাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরপর টোল, বা চতুষ্পাঠীতে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হত। এ সব টোল ও চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে কয়েকটি সংস্কৃত তথা উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তন্মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। হিন্দু

---

১. জে,এন,দাস গুপ্ত, বিক্রমপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৩৩০-৩৩। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৬। মুসলিম শাসনে ভারত ও বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমল হতে ইহা একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেই পরিচিতি ছিল। মুগল আমলে নবদ্বীপ দর্শন চর্চার নব্য কেন্দ্ররূপে উন্নীত হয়। কেউ কেউ ইহাকে সে যুগের অক্সফোর্ডের সাথে তুলনা করতে এ'টি করেন নি। এর খ্যাতি ও সুনামের কথা উল্লেখ করে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভগবত' উল্লেখ হয়েছে যে, নবদ্বীপে বহু টোল বিদ্যমান ছিল এবং হাজার হাজার খ্যাতিমান জ্ঞানী পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ ও সেখানে ছিলেন। এ সমস্ত বিদ্বান ও অধ্যাপকবৃন্দ, সেকালের সংস্কৃত জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করে তুলে ছিলেন।[১] নোয়াখালীর যুগদিয়া সে সময়ের হিন্দু শিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। শমসের গাজীর পুঁথি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি তাঁর 'তুলবাই খানার (টুলবাইখানা) অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা দেয়ার জন্য যুগদিয়া হতে একজন পন্ডিত এনেছিলেন।[২] এ থেকে বুঝা যায় যে, নোয়াখালির যোগদীয়া তৎকালীন সময়ে শিক্ষা দীক্ষায়ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি সাধন করেছিল এবং বাঙলাদেশের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তাই জ্ঞান চর্চা ও বিদ্যা শিক্ষার সুনাম ও সুখ্যাতি বাংলাদেশের অন্যত্র ও ছড়িয়ে পড়েছিল। শমসের গাজী এখানকার পন্ডিতদের পান্ডিত্যের কথা শ্রবন করে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য একজন সংস্কৃত পন্ডিত নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় এ ছাড়া ঢাকা, বিক্রমপুর, সাভার, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, বরিশাল, সাতগাঁও ইত্যাদি অঞ্চলেও হিন্দুদের উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, তৎকালীন সময়ে হিন্দু উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র বিশেষ অবদান রেখেছিল বলে মনে হয়।

পাঠ্য-সূচী ঃ

উচ্চ শিক্ষার জন্য এ সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে বা টোলে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান চর্চা ও অধ্যয়ন হত। রামপ্রসাদ, বর্ধমানে অবস্থিত একটি টোল বা চতুষ্পাঠীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, সেখানে দাক্ষিণাত্য, উৎকল (উড়িষ্যা) হতে ফার্সী কবি এবং ত্রিহুত হতে পন্ডিতগণ এখানে সমবেত হতেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, একজন সংস্কৃত পন্ডিতকে তার শিক্ষা জীবনে বিভিন্ন স্তরের মধ্য

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৮।

২. ডি,সি,সেন, টিপিক্যাল, সিলেকশন অব দি বেঙ্গলি লিটারেচার, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ১৮৫৪। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে অতিবাহিত করতে হত। তার শিক্ষা সাধারণত পাঁচ বছর বয়সে বিশেষ শুভ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হত। তাকে প্রথমে পত্র লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হত। অতপর তাকে ব্যাকরণ, এবং ভট্টিকাব্যম, রঘুবংশম, ও কুমার সম্ভব গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে দেয়া হত। অতপর তাকে

সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যসমূহ ও তর্ক শাস্ত্র পাঠ করা হত। এরপরে জ্যোতিষ বিজ্ঞান, বেদান্ত ও বৈদিক ছন্দসহ দর্শনের মত আরো কঠিন ও শক্ত বিষয়সমূহ পাঠ করতে দেয়া হত।[১] সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন-ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কাব্য, ছন্দ ইত্যাদি বিষয় পাঠ করা হত। জ্যোতিষ শাস্ত্র, দর্শন যুক্তি বিদ্যা, চিকিৎসা, ধর্মতত্ত্ব, বেদান্ত, ছন্দ, ইত্যাদি টোলের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা টোলে ইতিহাস চর্চারও ব্যবস্থা ছিল।[২] কালী দাসের গ্রন্থাবলী বিজয় রক্ষিতের (মধুকোষ) চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির উপর টিকা, অমর কোষ (অমর সিংহের বিশ্বকোষ) এবং পানিনির ব্যাকরণের উপর টীকা ভাষ্য ও রামায়ন, মহাভারত ইত্যাদি টোল গুলিতে পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩]

চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ও জ্যোতির্বিদ্যা, ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষ পাঠ্যক্রম চালু ছিল। বৈদ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মন, চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের বেশী মনোযোগী হত। ষোড়শ শতকের কবি হরিরাম উল্লেখ করেন যে, তাদের কেউ কেউ চিকিৎসা দর্পন (রোগ নিরাময়) কেউ কেউ নাদান (রোগ নিরুপন বিদ্যা) অধ্যয়ন করত। আবার অনেকে রক্ষিত ও চক্রপাদত্তের চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও অধ্যয়ন করত। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা আবার ব্যবহারিক রসায়ন চর্চা করত। জ্যোতিষ শাস্ত্র ও জ্যোতিষ বিদ্যার অধ্যয়ন দৈবজ্ঞ শ্রেণীর ব্রাহ্মনদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।[৪] এ থেকে বুঝা যায় যে, মুগল শাসনামলে হিন্দু সমাজের শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়াবলী যেমন-গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করা হত এবং একজন ছাত্র ধর্মীয় বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করতে পারত।

---

১. কে,কে দত্ত, আলীবর্দী এন্ড হিজ টাইমস, পৃঃ২৩৬। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৭।
২. বংশীদাস মনসা মঙ্গল, টি,সি,দাস গুপ্ত, পৃঃ১৭৪। উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৭।
৩. সারদা মঙ্গল, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় পত্রিকা, ২য় খন্ড, পৃঃ১৩৯২। উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৭।
৪. দ্বিজ হরিরাম চন্ডী কাব্য, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় পত্রিকা, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ৩১৭-৩২৬। উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক ও পার্থিব বিষয়াবলী ও সমান গুরুত্বসহকারে শিক্ষা দেয়া হত। তবে এদের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্র, যুক্তি বিদ্যা, দর্শন এবং চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদির উপর অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়া হত। তাই এ সমস্ত বিষয়ের উপর মুঘল শাসন যুগে বাংলাদেশ বহু উন্নতি সাধন করে এবং দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর একটা বৈশিষ্ট্যতা অর্জন করে। এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান চর্চা ও সাধনার সুখ্যাতি সমগ্র উপমহাদেশেই ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে মুগল শাসনামলে হিন্দু সমাজ উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, সুলতানী শাসনামলে হিন্দু সমাজে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পাঠ্য সূচী ও পাঠ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, মুগল আমলেও অনুরূপ পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত ছিল। এতে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। তাই বলা যায় যে, পূর্বের মত মুগল শাসন যুগে হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় এই ধরনের ছিল।

অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুগল শাসনামল ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক গৌরব উজ্জ্বল যুগ। মুগল সম্রাট, সুবাদার, অভিজাত শ্রেণী, সকলেই শিক্ষিত ও সংস্কৃত বান ছিল এবং তাদের দরবার জ্ঞানী গুণী ও পন্ডিতদের দ্বারা সর্বদা অলংকৃত হত। রাজ দরবারে এই জ্ঞানের আলো মুগল সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া মুসলিম ও হিন্দু জমিদার, অভিজাত শ্রেণী, ধনী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং আলেম, সুফী দরবেশ, গুরু পন্ডিত প্রমুখের স্বীয় প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। উভয় সম্প্রদায়ই স্বীয় জাতির জন্য শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, খানকাহ, পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, টোল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। এসব শিক্ষা কেন্দ্রে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি উভয় সম্প্রদায় জাগতিক ও পার্থিব বিষয়েও গুরুত্বসহকারে বিদ্যা শিক্ষা দিত। কেননা এ সময়কার মানুষের চিন্তা চেতনার বিকাশের সাথে সাথে পার্থিব বিষয়ের ও চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এভাবে মুগল শাসন যুগে বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু সমাজে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে ও এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে। আমরা বলতে পারি যে, সরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোগে ও উৎসাহে যেভাবেই হোক পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, টোল, মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজেই প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা সমগ্র বাংলাদেশে চালু ছিল। হিন্দু মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি অসীম আগ্রহ শিক্ষা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং উভয় সমাজেই শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) নবাবী শাসনামলে (১৭১৭-১৭৬৫) বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা :-

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুগল শাসন যুগে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ও পাঠ্য সূচীতে একটা সুশৃংখলতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আনার চেষ্টা করা হয়। নবাবী শাসন যুগে উক্ত শিক্ষা, শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্য সূচীকেই অনুসরন করা হয় তবে এ সময় কিছুটা পরিবর্তন ও নতুনত্ব আনয়নের চেষ্টা করা হয় এবং ইহা যুগের দাবী ও চাহিদা অনুসারেই করা হয়। তাই সুলতানী ও মুগল শাসনযুগের তুলনায় নবাবী শাসনামলে হিন্দু ও মুসলিম উভয় শিক্ষাক্ষেত্রেই পূর্বের তুলনায় কিছুটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তবে এ সময়েও বাংলাদেশে সরকারের অধীনে কোন সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগ, নবাব, জমিদার, অভিজাত, আলেম, সুফী দরবেশ ও পন্ডিতদের প্রচেষ্টা, সহযোগীতা ও পৃষ্ঠ পোষকতায় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। নিম্নে এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা হল।

মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা :-

বাংলার নবাবরা বিদ্বান ও সংস্কৃতবান ছিলেন। তাঁরা পন্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সাহচার্য ভাল বাসতেন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মুর্শিদকুলী খান বিদ্বান ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের জন্য বৃত্তি বৃদ্ধি করে দেন। কথিত আছে যে, তিনি দুই হাজার পাঁচ শত কারী (কুরআন পাঠকারী) ও আল্লাহর নাম জপকারীদের রক্ষনাবেক্ষন ও পৃষ্ঠ পোষকতা করতেন।[১] এভাবে নবাবগণ বিদ্বান শিক্ষার্থীও ধর্মপ্রান ব্যক্তিদের রক্ষনাবেক্ষন ও পৃষ্ঠ পোষকতা করে শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেন। শুধু তাই নয় মুসলিম জমিদার অভিজাত ও অবস্থাপন্ন ধনী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারের মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া আলেম, সুফী, দরবেশগণ এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কিংবা নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা মক্তবে শিক্ষা প্রদান করে শিক্ষাকে আরো উদার ও জনপ্রিয় করে তুলেন। তাই নবাবী আমলে মুসলিম সমাজে প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

---

১. আব্দুল করিম, মুর্শিদকুলী খান এন্ড হিজ টাইমস্, পৃঃ ২৩৮। উদ্ধৃত, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

নবাবী শাসনামলে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। দেশের আনাচে কানাচে যেখানেই অল্প বিস্তর মুসলমানদের বসবাস ছিল, সেখানেই ইবাদত বন্দেগীর জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হত। এই মসজিদ শুধু মাত্র ইবাদত বন্দেগীর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ মসজিদকে মক্তব হিসেবেও ব্যবহার করা হত। অভিভাবকগণ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এ সমস্ত মক্তবে তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠাতেন। কেননা মুসলিম সমাজে শিক্ষা গ্রহণ করাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। তাই শিক্ষা মুসলিম সমাজে অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মক্তবগুলি এ কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

মুসলিম শাসনের পরবর্তী কালে ম্যাক্সমুলার এবং উইলিয়াম এ্যাডামের বাংলাদেশে পরিচালিত জরীপ হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রাক বৃটিশ যুগে তথা নবাবী শাসনামল বাংলাদেশে এক ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। ম্যাক্সমুলার দাবী করেন যে, ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশে ৮০ হাজার মক্তব বা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।[১] ম্যাক্সমুলারের জরীপ রিপোর্ট হতে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশে নবাবী শাসনামল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে এত ব্যাপক অগ্রগতির কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষানুরাগী মুসলিম শাসক সুবাদার, নবাব ও রাজ কর্মচারীদের আন্তরিক পৃষ্ঠ পোষকতাও সহযোগীতা। তা ছাড়া প্রত্যেক মসজিদ, ইমামবারা, খানকাহ, ইত্যাদিতে শিক্ষার জন্য মক্তব ছিল এবং জমিদার, অভিজাত, অবস্থাপন্ন ধনীক শ্রেণী কিংবা আলেম, সুফী, দরবেশদের বাড়ীতেও শিক্ষালয় ছিল। এ কারণে শিক্ষা দেশের আনাচে কানাচে পৌঁছে যায়। তাই সকলের সহযোগীতা, কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ইত্যাদি বিরাট অবদানের ফলে নবাবী শাসনামলে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং শিক্ষিতের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নাই।

---

১. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮। শিক্ষাঃ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাডামের বিবরণী হতে জানা যায় যে, ঐ সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধানত দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায় , যা প্রাথমিক বা মক্তব এবং উচ্চতর মাদ্রাসা নামে অভিহিত হত । এ ছাড়া বাংলাদেশের মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি কুরআন স্কুল বিদ্যমান ছিল । এ্যাডাম আবার প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মক্তবগুলিকে দুভাগে ভাগ করেছেন । যেমন-'দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ' এবং 'অন্যান্য সব প্রাথমিক বিদ্যালয়' । দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যাল য়গুলিই কালের বিবর্তনে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় রূপে পরিণতি লাভ করেছে বলে মনে হয় । এসব বিদ্যালয় বেশীরভাগ ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল। তাই এসব স্কুলে হিন্দুরাও লেখা পড়া করত । এ্যাডামের মতে স্কুলে যাওয়ার বয়স অর্থাৎ পাঁচ হতে চৌদ্দ বছর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অনুন্নত জেলাগুলিতে শতকরা ২.৫ ভাগ, উন্নত জেলা সমূহে শতকরা ১৬ ভাগ এবং সমগ্র বাংলাদেশে গড়ে শতকরা ৭ ভাগ উপস্থিত থাকত ।'অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়' বলতে মক্তব, পার্শীয়ান স্কুল, ও কুরআন স্কুলগুলিকে বুঝাত । কুরআন স্কুল সাধারণত মসজিদে বসত। এখানে শুধু কুরআন পাঠ শিক্ষা দেয়া হত । মক্তব ও কুরআন স্কুলের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য ছিল না । এগুলিতে সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষাই দেয়া হত ।[১] এভাবে বাংলার নবাব, অভিজাত, আমির, ধনী, আলেম, সূফী দরবেশদের পৃষ্ঠ পোষকতায়ও অর্থানুকুল্যে মক্তব,মাদ্রাসা ঘিরে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল । অতএব এ্যাডামের উপরোক্ত বিবরণী হতে বুঝা যায় যে, তৎকালীন সময়ে এই মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল । যেমন-দেশীয় স্কুল, পার্সীয়ান স্কুল এবং কুরআনীক স্কুল ইত্যাদি । এ সকল শিক্ষা কেন্দ্র সাধারণত ধর্মীয় বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হত ।

পাঠ্য-সূচী :

বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রচুর সংখ্যক মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করত । এরা সাধারণত ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করত । ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ের উপরও কিছু প্রাথমিক জ্ঞান দেয়া হত । তবে আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি যে, সুলতানী শাসনামল হতে নবাবী শাসনামল পর্যন্ত মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রায় একই

---

১. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮ । শিক্ষাক্রম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯১ ।

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী চালু ছিল । অর্থাৎ বরাবরই ধর্মীয় শিক্ষাকেই প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেয়া হত । ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ধর্মের বিভিন্ন শাখা ও বিষয়ের উপর প্রাথমিক জ্ঞান দান করা হত, তৎপর অন্যান্য কিছু বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হত । বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর হতে প্রায় একই ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা চলে এসেছে । তবে মুগল শাসন যুগে এর কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে . এবং নবাবী শাসনামলে এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকে ।

এ সব মক্তবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সাধারনত আরবী, ফার্সী, উর্দু বর্ণমালা লিখতে ও পড়তে শিখানো হত । মুখে মুখে আরবী, ফার্সী সাহিত্য থেকে পড়ানো হত ও মুখস্থ করানো হত । প্রাথমিকভাবে অংক শাস্ত্রের উপর ও কিছু জ্ঞান দেয়া হত । তা ছাড়া ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুস্তকের সংগে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেয়া হত ।[১] কুরআন মুখস্থ করা এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত । কুরআন পাঠ ও ইসলাম ধর্মীয় পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত লেখা পড়া এবং প্রাথমিক গণিতের বিষয় বস্তু শিক্ষা দেয়া হত । অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর ও গুরুত্ব দেয়া হত । সে জন্য ছাত্রদের উচ্চারণ ও প্রকাশ ভঙ্গির উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হত । পাঠ্য বিষয়ের পুনরালোচনা এবং শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত প্রশ্নসমূহের উত্তর আদায় করা এ সময়কার মক্তব ও কুরআন স্কুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল । এ ছাড়া মনিটর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার কাজ পরিচালনা এই প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল । এ সকল শিক্ষায়তনে ধর্মীয় বিষয়ের উপর শিক্ষার গুরুত্ব ও মনোযোগ বেশী থাকত বলে ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও আচার ব্যবহার ও সৌজন্যের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখা হত । যেহেতু মুসলিম সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ধর্ম ভিত্তিক সে জন্য মক্তব ও কুরআন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী উভয়েই শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ ছিল ।[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ যুগে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা ঃ সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯ ।

২. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২ ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বরূপ সম্পর্কে স্ক্রাফ্টনের গ্রন্থে আভাস পাওয়া যায় যে, এদের শিক্ষার তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল (ক) আরবী ফার্সী লিখতে ও পড়তে শিক্ষা, (খ) গাম্ভীর্য ও বিচক্ষনতা অর্জন করা সেই সংগে আবেগ ও অধৈর্যভাব দমন করা, (গ) অশ্বারোহন ও অস্ত্র চালনা শিক্ষা করা।[১] অতএব অতীতের ন্যায় নবাবী শাসন যুগেও বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বের অনুরূপ পাঠ্যক্রমও অনুসরণ করা হলেও কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

নবাবী শাসনামলে মক্তবে শিক্ষার্থীরা সাধারণত তাল পাতা ও কলা পাতায় লিখত। তবে লেখার জন্য এ সময় দেশী কাগজও ব্যবহার হত। নল খাগড়া, খড়ি ও কঞ্চির কলম দিয়ে লিখত এবং লেখার জন্য দেশী কালী ব্যবহার করা হত। অধিকাংশ শিক্ষার্থী পাঠশালা ও মক্তবে শিক্ষা শেষ করে চাষাবাদও পারিবারিক কাজ কর্মে নিয়োজিত হত। কিন্তু এদের মধ্যে যারা মেধাবী ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য উচ্চাশাপুষন করত তারা উচ্চতর শিক্ষার জন্য মাদ্রাসাসমূহে ভর্তি হত।[২] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নবাবী শাসনামলেও পূর্বের মত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও এ ভাবেই শেষ হত আরবী, ফার্সী, বর্ণমালা, লেখা, পড়া, আরবী, ফার্সী কবিতা পাঠ ও মুখস্থ করা, কুরআন পাঠ ও মুখস্থ করা, ধর্মের বিভিন্ন শাখার প্রাথমিক জ্ঞান, হিসাব নিকাশের জন্য গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান ইত্যাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা মক্তবে দেয়া হত। এ সময় শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার যেমন-বিস্তৃতি লাভ করে তেমনি শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও বিস্তৃতি ঘটে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষা বিস্তারে নবাবী আমল প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল।

উচ্চ শিক্ষা ও শিক্ষা কেন্দ্র এবং পাঠ্য-সূচী :

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য অন্যত্র গমন করতে হত। কেননা মক্তবের মত উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র বা মাদ্রাসা তখন ও বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে স্থাপিত হয়নি। কেবল মাত্র বড় বড় শহর, জেলা শহর বা নাম করা স্থানে এসব উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোথাও দূরে গিয়ে জ্ঞান চর্চা করা ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২।

২. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত না। তবে এদের মধ্যে যাদের জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল তারা অবশ্য উচ্চতর শিক্ষার জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হত।

এ যুগে মাদ্রাসা সাধারণত মসজিদ ও ইমাম বাড়ার সংগে যুক্ত থাকত। রাজধানী শহরে, বড় বড় শহরে, জেলা শহরে, কিংবা কোন নামকরা স্থানে মাদ্রাসা স্থাপিত হত। শাসকগণ এসব মাদ্রাসার অধ্যয়ন ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনেক নিষ্কর জমি দান করতেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে মাসিক বা বাৎসরিক অর্থ প্রদান করা হত।[১] তাছাড়া অভিজাত, অবস্থাপন্ন ধনীরাও মাদ্রাসা স্থাপন করে দিতেন এবং এগুলির ব্যয় নির্বাহের জন্য লাখেরাজ ভূমি দান করতেন। শুধু তাই নয়, আলেম সূফী, দরবেশগণ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাদ্রাসা স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারেও মুখ্য ভূমিকা রাখতেন। তাই নবাবী শাসনামলে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল। এ সম্পর্কে ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, সে সময়ের উচ্চ শিক্ষার চাবিকাঠি ছিল আলেমদের হাতে। তারা ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ও যত্নবান ছিলেন। প্রত্যেক মসজিদ ও খানকাতে মাদ্রাসার প্রচলন ছিল। এসব শিক্ষা কেন্দ্রে এককালীন সরকারী সাহায্য অথবা জায়গীর বা ওয়াকফ সম্পত্তি প্রদান করা হত। এছাড়া সাধারণ ও এসব প্রতিষ্ঠানে দান করত।[২]

নবাবী শাসনামলে বাংলাদেশে উচ্চতর শিক্ষার জন্য মসজিদ কেন্দ্রিক বহু মাদ্রাসা বা উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। মুগল শাসন যুগে সুবাদার শায়েস্তা খাঁর সময় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বহু মসজিদ উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র বা মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- পাথর তলী বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত মাদ্রাসা বিগত শতক পর্যন্ত তথা নবাবী শাসন যুগেও পুরো উদ্যমে চালু ছিল। লালবাগ কেল্লার অদূরে মুহাম্মদ মৃধার মসজিদ, ঢাকার আজিমপুর এলাকায় মুহম্মদ আযমের মসজিদ ইত্যাদি মাদ্রাসা হিসেবে উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্র ছিল যা আমরা

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই আলোচনা করেছি । এগুলি মুগল যুগের শেষ মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হলেও নবাবী শাসনামল পর্যন্ত পুরো উদ্যমে চালু ছিল । ঢাকা শহরে মাদ্রাসা সংযুক্ত এমন অনেক মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায় -যা মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হত । তাই নবাবী শাসনামলে ঢাকা উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রভূত উন্নতি সাধন করে । এসব মসজিদ কেন্দ্রিক মাদ্রাসা শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এ দেশের মুসলিম অধ্যুষিত বড় বড় শহর বন্দরে বড় আকারে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ।যেমন-চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ইত্যাদি অঞ্চলে বৃহদাকার মসজিদ নির্মান এবং অবস্থান লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায় যে, এসব মসজিদ -শুধুমাত্র এবাদত বন্দেগীর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না বরং এতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান চর্চ রীতিমতভাবে হত ।

নবাবী শাসন যুগে সিলেট ও উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সিলেটের মুফতী পরিবারের মাওলানা জিয়া উদ্দীন একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন । হিন্দু মুসলিম উভয় শ্রেণীর লোক এ মাদ্রাসায় আরবী ফার্সী চর্চা করত । ফস্টার্স মেমোয়ার্স গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই মাদ্রাসা ১৮২৭ সাল পর্যন্ত চালু ছিল । ১৮৩৬ সালে ফার্সী আদালতের ভাষা হিসেবে বাতিল হওয়ার পর ১৮৩৭ সালে এই মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায় ।[১] এতে বুঝা যায় যে, উক্ত মাদ্রাসা নবাবী শাসনামলে পূর্ণ মাত্রায় চালু ছিল । এ ছাড়া সিলেটে ফুলবাড়ী ও তরফেও মাদ্রাসা ছিল যা নবাবী শাসন পর্যন্ত চালু ছিল ।

মুর্শিদাবাদ এলাকায়ও সেখানকার শাসক ও নবাবদের পৃষ্ঠ পোষকতায় অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এসব মাদ্রাসায় ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান তথা আরবী ফার্সীর অনুশীলন ও জ্ঞান চর্চা হত । মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭) মুর্শিদাবাদে কাটারা মাদ্রাসা নামে একটি বড় মাদ্রাসা এবং তৎসংলগ্ন একটি গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।[২] অষ্টাদশ শতকে মুগল শাসনের পতনের কালে এবং নবাবী শাসনামলে লখনৌর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা নিজাম উদ্দীনের চেষ্টায়

---

১. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০-১৬১ । সিলেট কথা-সম্পাদনা কৃষ্ণ কুমার পাল চৌধুরী, ১ম সংস্করণ,সিলেট-১৯৮৬, পৃঃ১৭০-৭৩ ।

২. মুহাম্মদ যুবাইর, ইসলামী কুতুবখানা, কলিকাতা, পৃঃ২৪৯ ।এন,এন,ল-প্রমোশন অব লার্নিং ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন,১৯১৬, পৃঃ ১১২ ।উদ্ধৃত,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,ঊনবিংশ সংখ্যা পূর্বোক্ত,পৃঃ ৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে মাদ্রাসার সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়।[১] অর্থাৎ নবাবী শাসনামলে বাংলাদেশে উচ্চতর শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা ক্রমাগত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কেননা এ সময় উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। এ সকল মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্ম সম্পর্কীয় বিভিন্ন ধরনের উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ, কুরআন, হাদীস, অধ্যয়ন করা হত। ধর্মীয় পুস্তক ছাড়াও পার্থিব বিষয়ের উপরও বিভিন্ন গ্রন্থের অধ্যয়ন ও জ্ঞান চর্চা হত। মোট কথা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আরবী ফার্সী তথা ইসলামী শিক্ষার যেসব কেন্দ্র গড়ে উঠে তা মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর হতে নবাবী শাসন পর্যন্ত দীর্ঘ শতাব্দী ব্যাপী ইসলামী শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত থাকে।

বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পন্ডিত ও কবিদের অবদানের জন্য নবাবী শাসনামল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এসব কবি ও পন্ডিতগণ আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যে এবং কুরআন হাদীস, সূফী তত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে তাদের পান্ডিত্যের ও জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন। তারা ইসলাম প্রচারের জন্য এবং কুরআন, ইসলামী জ্ঞান, আরবী ও ফার্সী ভাষাকে জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলার জন্য বাংলায় গ্রন্থাদি রচনা করেন। বিষয় বস্তু, নতুন শব্দ বিন্যাস ও আঙ্গিক সৌষ্ঠবের মাধ্যমে ইসলামী ঐতিহ্য প্রবর্তন করে তাদের রচিত গ্রন্থাবলী বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এইরূপ বিপুল সংখ্যক গ্রন্থাবলী প্রমাণ করে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে নবাবী শাসনামল ব্যাপক উন্নতি করেছিল। সুতরাং এসব পন্ডিত ও কবিদের রচনা ও গ্রন্থ হতে বুঝা যায় যে, নবাবী শাসনামলে উচ্চতর শিক্ষা জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

পাঠ্যসূচী :

মুগল শাসনামলে মাদ্রাসাসমূহে পাঠ্যসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে পঠিত বিষয়সমূহের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই ধারাবাহিকতায় নবাবী শাসনামলেও মাদ্রাসাসমূহে পাঠ্যসূচী প্রণয়নের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইতিপূর্বে মাদ্রাসাসমূহে বাগদাদের দরসে নিজামিয়া অনুসরণে অধ্যয়ন করা হত। কিন্তু নবাবী আমলে লখনৌর দরসে নিজামিয়া বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহে জনপ্রিয়তা লাভ

---

১. সন্ধান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

করলে বাগদাদের দরসে নিজামিয়া ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই স্বাভাবিকভাবে নবাবী শাসনামলে পূর্বের তুলনায় পাঠ্যসূচীতে কিছুটা নতুনত্ব আসে এবং পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

এ সময় আরবী মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্য তালিকায় পূর্ববর্তী মুগল শাসনের সময়ের পাঠ্য তালিকা হতে কিছুটা নতুন বিষয় সংযোজন করা হয় এবং ইসলামী শিক্ষার আরো উন্নতি বিধান করা হয় এ সময়ের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা মনীষী ছিলেন শাহ ওলী উল্লাহ দেহলবী (১৭০৩-৬২)। তিনি তার 'আলজুযউল লতীফ' নামক আত্ম জীবনী গ্রন্থে সে সময়ের প্রচলিত পাঠ্যসূচীর বর্ণনা দিয়েছেন। শাহ ওলী উল্লাহ স্বয়ং একটি পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু তা জনগণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়নি। কেননা সে সময় মুসলিম শাসন পতনের মুখমুখী ছিল বলে দিল্লীর শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষা ধারা দুর্বল হয়ে পড়ে, তাছাড়া লখনৌতে মোল্লা কুতুব উদ্দীন ও তার পুত্র মোল্লা নিযাম উদ্দীনের প্রচেষ্টায় অপর একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠে। এছাড়া যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের প্রতি সে যুগের মানুষের আকর্ষণ ও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাই তারা দিল্লীর মাদ্রাসা অনুসরণে হাদীস, তাফসীর শিক্ষার প্রতি ততটা অনুরাগী না হয়ে লখনৌ শিক্ষা কেন্দ্রের মানতিক, হিকমাত ভিত্তিক শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আরবী ফার্সী সাহিত্যের প্রতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোন আগ্রহ ছিলনা। পাঠ্য সূচীতেও এ সাহিত্যের কোন ব্যবস্থা ছিল না।[১] অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা চেতনারও পরিবর্তন হতে থাকে। এ কারণে তারা পূর্বের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী জ্ঞান চর্চা ও বিদ্যা শিক্ষা করতে অনুৎসাহী হয়ে পড়ে, এবং অনেকটা অনীহা প্রকাশ করে। তাই নিযাম উদ্দীন প্রণীত পাঠ্যসূচীতে কিছুটা নতুনত্ব থাকার কারণে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং ইহা অতি সত্বর জনপ্রিয়তা লাভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী শাসনামলে মোল্লা নিযাম উদ্দীন কর্তৃক অপেক্ষাকৃত আধুনিক পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তবে মূলত এযুগের শিক্ষা শুরু হয় মোল্লা কুতুব উদ্দীন প্রণীত শিক্ষা সূচীর রূপরেখার মধ্য দিয়ে। তিনি আরবী মাদ্রাসাসমূহের

---

১. হিন্দুস্তান কি কাদীম দরসগাহে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৬-৯৭। উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮, ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্য তালিকার জন্য যে কাঠামো দাঁড় করেছিলেন, তা পরিপূর্ণতা দিয়ে ছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র মোল্লা নিযাম উদ্দীন। তাই মোটামুটিভাবে তাঁকেই এ যুগের শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবাত্মক পরিবর্তনের যুগ স্রষ্টা বলে আখ্যায়িত করা যায়।[১] কেননা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা ভাবনা ও ধ্যান ধারনায় পরিবর্তন আসে। তাই পূর্বের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বাগদাদ কিংবা দিল্লীর অনুসরনে গতানুগতিক শিক্ষা গ্রহণে এ যুগের মানুষের আগ্রহ কমে যায়। মোল্লা নিযাম উদ্দীন তাই মানুষের মনের কথাও জ্ঞানের চাহিদা উপলব্ধি করে অত্যন্ত যুগউপযোগী বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং দর্শন ও যুক্তিভিত্তিক একটি সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এজন্য তা প্রণীত পাঠ্যসূচী শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সমাদৃত হয়েছিল এবং এ যুগে ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

তাই এ যুগে প্রণীত দরসে নিযামিয়া গোটা উপমহাদেশের আরবী শিক্ষার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। লখনৌর দরসে নিযামিয়ার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ায় উপমহাদেশে বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।[২] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় ১৭৮০ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এতে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত লখনৌর দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যসূচী প্রচলিত ছিল এর পরবর্তী সময় মাদ্রাসাই আলিয়ার পাঠ্য সূচীতে কিছুটা পরিবর্তন করা হলেও ১৮৯১ সাল পর্যন্ত লখনৌর দরসে নিযামিয়াই তাতে প্রচলিত ছিল। মাদ্রাসাই আলিয়া ব্যতীত খারেজী বা কওমী মাদ্রাসাসমূহে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত মোটামুটি লখনৌর দরসে নিযামিয়াই প্রচলিত ছিল।[৩] অদ্যাবধি এই উপমহাদেশে প্রাচীন মাদ্রাসাসমূহে দরসে নিযামিয়ার রীতিতেই পরিচালিত হচ্ছে। মোল্লা নিযাম উদ্দীন কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যসূচী বা সিলেবাসের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়- যেমন-(ক) প্রত্যেক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত দুই একখানা পুস্তক।(খ) প্রত্যেক বিষয়ের অত্যন্ত সুলিখিত এবং অনবদ্য একখানা পুস্তক।(গ) তর্কশাস্ত্র (মানতেক) এবং দর্শন শাস্ত্রের প্রাধান্য সর্বাধিক (ঘ) হাদীস হতে শুধুমাত্র মেশকাত শরীফ (ঙ) সাহিত্য পুস্তকের পরিমান অত্যন্ত সীমিত, ইত্যাদি।[৪]

----

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, এক বিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।
২. শিবলী নুমানী, মাকালাত-ই-শিবলী, (আযমগড়, ১৯২২) পৃঃ ৪৩। উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০।
৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০।
৪. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

মোল্লা নিযাম উদ্দীন দরসে নিযামিয়ার জন্য যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেছিলেন এবং যে সব পুস্তক ও গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের জন্য অনুমোদন করেছিলেন বিষয় ভিত্তিক তার কিছু তালিকা ও নাম নিম্নে তুলে ধরা হল। যেমন-ছরফ ঃমিজানমুনশাব, ছরফেমীর, পাঞ্জে গাঞ্জ, জুবদা, ফসুলে আকবরী ও শাফিয়া। নহুঃ নহুমীর, শরহেমিয়াতে আমেল, হেদায়াতুন নহু, কাফিয়া ও শরহে জামি। মানতেকঃ-ছোগরা, কোবরা, ইছাগুজি, তাহজিব, শরহে তাহজিব, কিবতী মামীর ও ছুল্লমুল উলুম। হেকমতঃ- (বিজ্ঞান) মাযুবজী, ছদরা, শামসেবাজেগা।
রিয়াজী ঃ- (অংক) খোলাসাতুল হেসাব, তাহরিরে আকলিদাস (মাকালায়ে উলা), তাশরিহুল আফলাক, রেছালায়ে কুশজিয়া, শরহেচগমুনী।
বালাগাতঃ- (ভাষাতত্ত্ব) মুখতাসারুল মাআনী, মোতাওয়াল।
ফেকাহ ঃ- শরহে বেকায়া, হেদায়া (আওয়ালাইন ও আখেরাইন)।
উসূলে ফিকাহঃ- নুরুল আনওয়ার, তাওজিহ, তালবিহ, মুসল্লামুসসুবুত।
কালাম ঃ- শরহে আকায়েদ ই নাসাফী, শরহে আকায়েদ-ইজালালী, মীরজাহেদ ও শরহে মওয়াকেফ তাফসীর ঃ- তাফসীরে জালালাইন ও তাফসীরে বায়জবী। হাদীস ঃ- মেশকাত শরীফ, ইত্যাদি।[১]
এভাবে মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষার্থীদের ইসলামী ধর্মশাস্ত্র কুরআন, হাদীস, আইন, আরবী, ফার্সী, সাহিত্য আরব দেশের বিজ্ঞান অংক, ও চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি শিখানো হত।[২] এ ছাড়া মাদ্রাসায় উচ্চ স্তরে ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্ম তত্ত্ব, ইতিহাস, বীজগণিত, গণিত, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র, শাসন বিধি, দর্শন ও পদার্থ বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হত।[৩] উপরোক্ত পাঠ্যসূচী হতে বুঝা যায় যে, মোল্লা নিযাম উদ্দীন অত্যন্ত যুগ উপযোগী ও স্বার্থক পাঠ্যসূচী রচনা করেছিলেন। তিনি ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়েরই খুব সুন্দরভাবে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। এ কারণে ইহা শিক্ষিত, সুধী মহলে ও সাধারণ সমাজেও সমাদৃত হয়েছিল।

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫।
২. প্রাক পলাশীর বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯।
৩. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব আমরা বলতে পারি যে, নবাবী শাসন পূর্বে যে সব মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল, এমন কি যে সব মসজিদ, খানকাহ ও ইমাম বাড়ায় মাদ্রাসা ছিল, সে সব মাদ্রাসায় মোটামুটি বাগদাদের দরসে নিযামিয়া বা দিল্লীর মাদ্রাসা অনুসরণে ও অনুকরণে পাঠ্যসূচী প্রণীত হত । এবং এভাবেই দীর্ঘকাল যাবত বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা হয়ে আসছিল । কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মন মস্তিষ্ক ও চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে ও পরিবর্তন আসতে থাকে । তাই নবাবী শাসন যুগে গতানুগতিক পূর্বের সেই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী জ্ঞান চর্চা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে ও ক্রমাগত এর প্রতি অনীহার সৃষ্টি হয় । অবশেষে মোল্লা নিযাম উদ্দীন লখনৌতে এক মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং তিনি যুগ উপযোগী ও মানুষের শিক্ষার চাহিদানুযায়ী অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত, দর্শন ও যুক্তি ভিত্তিক অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেন । এই পাঠ্যসূচী শিক্ষিত ও সুধী মহলে খুব আগ্রহের সাথে সমাদৃত হয় এবং অতি সত্ত্বর অত্যন্ত জন প্রিয়তা লাভ করে । তাঁর এই পাঠ্যসূচী যখন ব্যাপকভাবে প্রসার ও বিস্তার ঘটে, তখন বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার পাঠ্য সূচী বাংলাদেশে পাঠ ও অধ্যয়ন ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং অচিরেই লখনৌর দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যসূচী বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহে অধিভুক্ত হতে থাকে ।

সুতরাং এভাবেই দীর্ঘ দিনের মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচীর অবলুপ্তির পর নবাবী শাসনামলে মাদ্রাসাসমূহে পাঠ্যসূচী নতুন আঙ্গিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধাচে প্রণয়নের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে । এই পাঠ্যসূচীর কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে বৃটিশ শাসনযুগেও মাদ্রাসাসমূহে পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়েছিল । আজও অবধি বাংলাদেশের খারেজী মাদ্রাসা সমূহে দরসে নিযামিয়া অনুকরণে অধ্যয়ন প্রক্রিয়া চলছে । তাই নবাবী শাসনামলে শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় কিছুটা উন্নতি হয় এবং একটা নিয়মে ও সুষ্ঠু সুশৃংখল অবস্থায় আনার চেষ্টা করা হয় । তবে শিক্ষাকে একই সূত্রে এনে উন্নতমান নিয়ন্ত্রিত করার কোন নির্দিষ্ট দপ্তর বা বিভাগ ছিল না । তাই সম্পূর্ণ বেসরকারী ভিত্তিতে ও উদ্যোগে এবং নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতিতে শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্য-সূচী প্রচলিত ছিল । তবে নবাবী শাসনের অবসানের পর বৃটিশ শাসনামলে এসব কিছুর পরিবর্তন হয় এবং সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাক্রম সাজানো হয় । এ সময় শিক্ষা সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসে এবং সুষ্ঠু ও সুশৃংখল শিক্ষার জন্য সরকারী নীতিমালা ও আইন কানুন প্রণীত হয় । তাছাড়া এ সময় শ্রেণী বিন্যাস ও পাঠ্যসূচীর নতুন সংযোজন হতে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা :

নবাবী শাসনামলে হিন্দু শিক্ষাক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু ও সুশৃংখল নিয়ম পদ্ধতি ও ব্যবস্থা ছিল না। সামাজিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে হিন্দু জমিদার অবস্থাপন্ন ও অভিজাত, ধনী ব্যক্তিদের সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাক্রম চালু ছিল। তাই প্রত্যেক পাঠশালা বা টোলের নিজস্ব নিয়ম নীতি ও নিজস্ব পাঠ্য তালিকা অনুসারে পাঠ দান করা হত। তবে নবাবী শাসনামলে পূর্বের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক উন্নতি লাভ করেছিল নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

প্রাথমিক শিক্ষা ও পাঠ্যসূচী :

নবাবী শাসনামলে হিন্দু ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গ্রামে পাঠশালা ছিল। এ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ছাত্র ছাত্রীরা লেখা পড়া করত। শতকরা আশি ভাগ বা আরো বেশী শিক্ষার্থীর শিক্ষা এখানে সমাপ্তি হত। সাধারণত গ্রাম্য পাঠশালাতে পাঁচ বছর বয়সের একজন বাঙালী হিন্দু শিক্ষার্থীর শিক্ষা গুরু মহাশয়ের অধীনে শুরু হত এবং দশ হতে এগার বছর বয়সের মধ্যে এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি হত। হিন্দু মেয়েরা এ সমস্ত পাঠশালা এক বা দু বছর বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করত। ৮ বছর বয়স হলে অভিভাবকগণ তাদেরকে আর পাঠশালায় পাঠাত না। তিন চারটি গ্রামের সমন্বয়ে অর্থাৎ গ্রামের ছাত্রদের নিয়ে এ সময় এক একটি গ্রামীন পাঠশালা স্থাপিত হত। সাধারণত ব্রাহ্মন কায়স্থ বর্ণের কোন ব্যক্তি গ্রামের পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের দায়িত্ব পালন করত।[১] এ সব পাঠশালা সাধারণত শিক্ষানুরাগী হিন্দু আমীর ওমরাহ, জমিদার, অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ সমস্ত পাঠশালা নিজেদের বাড়ীতে কিংবা বাড়ী সংলগ্ন স্থানে অথবা কোন চন্ডি মন্ডপে বা নাট মন্দিরে স্থাপন করত। তা ছাড়া পন্ডিত ও গুরু মহাশয়েরা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে স্বীয় বাড়ীতে পাঠশালা বসাত। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে গাছের তলায়ও অনেক সময় পাঠশালা বসত। অতএব এভাবে পাঠশালা মাধ্যমে হিন্দু শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত।

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা(সামাজিক ও আর্থিক জীবন)১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৭, মূল- দীনেশ চন্দ্র সেন, টিপিক্যাল সিলেকশনস ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলী লিটারেচার, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮৫৫

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্যসূচী ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে এসব পাঠশালায় হিন্দুদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হত। কেননা এ সময় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ধর্ম ভিত্তিক। তবে গুরু মহাশয় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছাত্রদের অংক শিক্ষা দিতেন। অংক না শিখলে কোন কাজ চলে না। চাষাবাদের হিসাব, ব্যবসা বাণিজ্য, জমি জমার আয় ব্যয় ও রাজস্বের হিসাব রাখতেই হত। তাই সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই অংক শিক্ষা দেয়া হত। বাংলাদেশে মুখে মুখে অংক শিক্ষার রীতি শুভংকরের পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল। শুভংকর তার অতি পরিচিত মানসংকের ছড়া গুলিতে এ রীতিতে আরো সুন্দরভাবে সুগঠিত রূপ দিয়ে ছিলেন। এই মানসংকের ছড়া ছাত্রদের মুখস্থ করতে হত। এ ছাড়া আরো দুটি জিনিস পাঠশালায় ছাত্রদের শিক্ষা দেয়া হত। অক্ষর পরিচিতি ও লেখা শিখানো।[১] শিক্ষার্থীরা ছয় সাত বছর পাঠশালায় থেকে বাংলা পড়তে ও লিখতে পারত এবং কিছু কিছু গণিত শিক্ষা গ্রহণ করত। কড়ি বা পাথরের নুড়ি ও ঝিনুক দিয়ে সংখ্যা গণনা, যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেয়া হত। হিসাব রাখা, চিঠি পত্র, দলিল ও দরখাস্ত লেখা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা এ সময় পাঠশালাতেই দেয়া হত।[২] পাঠশালাতে কোন প্রকার বই পড়ানো হত না। দু'চারটি ছড়া ও কবিতা মুখে মুখে শেখানো হত।[৩]

বলা বাহুল্য নবাবী শাসনামলে ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মুদ্রিত বই বা লেখার জন্য শ্লেট পেন্সিল ছিল না। শিশুরা প্রথমে বালির উপরে খড়ের টুকরা দিয়ে লিখত। তারপর খড়ি দিয়ে মাটির মেঝেতে লিখত, কিংবা মাটিতে বালি বিছিয়ে তার উপর আঙ্গুল দিয়ে লেখার অভ্যাস করত। ক্রমে ক্রমে ছাত্রীরা কলা পাতা, তাল পাতায় বাঁশের কঞ্চি বা নল খাগরার কঞ্চি দিয়ে লেখার অভ্যাস করত। হরিতকী ও বয়ড়ার রস প্রদীপের কালি ভূষায় মিশিয়ে কালী তৈরী হত। সেই কালি দিয়ে কঞ্চির কলমের সাহায্যে ছাত্ররা লিখত।[৪] পাঠশালা ব্যতীত কীর্তন, যাত্রা, কথ কথা

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৭।
২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৮।
৩. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮।
৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৮। প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করত । বাড়িতে বাংলা রামায়ন, মহাভারত ও ভগবত পুরানের বাংলা অনুবাদ পাঠ এবং কথকথা, পাঁচালী, পল্লীগাথা ও গীতি কাব্য এর মাধ্যমেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করত । একদল ভ্রাম্যমান শিক্ষক, ব্রাহ্মন ঠাকুর, প্রমুখ ব্যক্তিরা এ কাজে নিয়োজিত থাকত । এরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘুরে জনসাধারণকে ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে নানা প্রকার উপদেশ ও জ্ঞান দান করত । ধর্ম শাস্ত্রের তত্ত্ব ও অনুশাসন সহজভাবে ব্যাখ্যা করত ।[১] এগুলির মধ্য দিয়ে আক্ষরিক শিক্ষা লাভ না হলেও বাঙালীর মন মানসিকতা উন্নততর হত এবং শিক্ষিত মনের জন্ম নিত । অতএব নবাবী শাসনামলে এভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী প্রচলিত ছিল । কেননা সে সময় শিক্ষার জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি বা পাঠ্য সূচী ছিল না । বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব পদ্ধতি ও শিক্ষাসূচী অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া হত । কাজেই শিক্ষার জন্য মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে যেভাবে পেরেছে মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলার চেষ্টা করেছে । তবে নবাবী শাসনের অবসানের পর কোম্পানী শাসনামলে সরকারী নিয়ন্ত্রনে এ শিক্ষা ধারার পরিবর্তন সূচিত হয় এবং একটা নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আসে । পাঠশালাগুলিতে একটি সুষ্ঠু নিয়ম পদ্ধতি ও শ্রেণী বিন্যাসে সাজানো হয় এবং পূর্বের সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ্যসূচীতে আধুনিক যুগ অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয় ।

উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষা কেন্দ্র এবং পাঠ্যসূচী :

প্রাথমিক শিক্ষার মত উচ্চতর শিক্ষা ও বাংলাদেশে নবাবী শাসনামলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল । অর্থাৎ শিক্ষিত ও উচ্চতর শিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে জমিদার অভিজাত ধনী ব্যক্তিরা স্বীয় প্রচেষ্টায় চতুষ্পাঠী, টোল, ইত্যাদি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন । এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বীয় নিয়ম পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পরিচালিত হত । সরকার বা কোন বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল না । বর্তমানে যেমন-বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারের নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হয়, এমনটি তখন এবং তার পূর্বে ও কোন সময় ছিল না । তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লেখাপড়া করাত । শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন মুক্তভাবে গড়ে উঠেছিল ।

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে নদীয়া ছিল বাংলার হিন্দু শিক্ষা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত কেন্দ্র। অপর দুটি কেন্দ্র ছিল বর্ধমান ও ঢাকার রাজনগর। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র এ যুগে এমন একজন শিক্ষানুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যে, তার শিক্ষার প্রতি উৎসাহ ও বদান্যতা শুধু কেন্দ্রের পন্ডিতরাই অর্থ সাহায্য পেতনা। তিনি তাঁর নিজের জমিদারীর মধ্যে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও টোল প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র শিক্ষকদের জন্য তিনি নিস্কর জমি ও দান করেছিলেন।[১] তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া বা নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র সংস্কৃত পন্ডিতদের পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন এবং বহু সংস্কৃত পন্ডিত তাঁর রাজ সভা অলংকৃত করেছিলেন। তিনি নিজেও একজন পন্ডিত ছিলেন এবং রাজ সভার পন্ডিতদের সাথে ন্যায়, দর্শন ও ধর্ম শাস্ত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন।[২] অবশ্য ইংরেজ শাসনামলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নদীয়ার গৌরব হ্রাস পায়। তবে বহু বাধা বিপত্তির পর নদীয়া আজও প্রাচীন শিক্ষার ধারা বহন করে আসছে। নদীয়ায় টোল বা চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মন্য, শিক্ষা বর্তমানেও অক্ষুন্ন আছে। নদীয়ার শিক্ষা ধারা পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশে ও বহু স্থানে আজও পরিব্যাপ্ত। প্রসংগত উল্লেখ্য যেমন-ভাট পাড়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকার সারস্বত সমাজ, বরিশালের আশেতোষ চতুষ্পাঠী (খলিশাকোটা) কবিন্দ্র কলেজ, (গৈলা), ধর্মরক্ষিনী সভা (বরিশাল) ইত্যাদি চতুষ্পাঠীর নাম উল্লেখযোগ্য।[৩]

নদীয়া ব্যতীত আরো সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। বাঁশ বেড়িয়াতে অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল। এ প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণত ন্যায় শাস্ত্রের উপর জ্ঞান চর্চা হত। ত্রিবেনী, কুমারহাট, ভট্টপল্লী, গোন্দল পাড়া, ভদ্রেশ্বর, জয়নগর, মজিলপুর, আন্দুল ও বালিতে বহু সংখ্যক চতুষ্পাঠী ছিল। কাজেই দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য বহু চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বর্ধমানের এক চতুষ্পাঠীতে দ্রাবিড়, উৎকল, কাশী, মিথিলা প্রভৃতি স্থান হতে এসে প্রচুর শিক্ষার্থীরা বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা করত।[৪] বর্ধমানের রাজা

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬, ১১৩।
২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৭।
৩. শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬।
৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তি চাঁদ, তিলকচাঁদ, বীরভূমের আসাদুল্লাহ ও বদিউজ্জামান খানের পরিবার, নাটোরের রামাকান্ত ও তাঁর স্ত্রী রানী ভবানী, বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজা গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহ এবং ঢাকার রাজনগরের রাজা রাজ বল্লভসেন প্রমুখ জমিদাররা অতিশয় শিক্ষানুরাগী ছিলেন। এরা সকলেই তাদের জমিদারীর আয়ের একটা অংশ শিক্ষা বিস্তারের জন্য কিংবা বিদ্বান পন্ডিতদের জন্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য ব্যয় করতেন।[১] তাই পশ্চিম বাংলায় যেমন কৃষ্ণ চন্দ্র পূর্ব বাংলায় তেমনি রাজবল্লভ হিন্দুদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ঢাকার রাজনগরে বহু মক্তব, পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, টোল, ইত্যাদি স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। রাজনগরের ছাত্রদের তিনি আরো উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নদীয়া বা নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন এদের মধ্যে তিনজন উল্লেখযোগ্য যেমন নীলকন্ঠ, সার্বভৌম, কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীস এবং কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত কৃতিত্বের সাথে পাশ করে রাজ নগরে ফিরে এসে সেখানে সংস্কৃত শিক্ষার দানের জন্য টোল স্থাপন করেছিলেন।[২] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নবাবী আমলে বাংলাদেশের ধনী হিন্দু ও মুসলিম জমিদারগণ এ দেশের সংস্কৃত শিক্ষার ও জ্ঞান চর্চার ধারক ও বাহক ছিলেন। এঁরা সকলেই নিজেদের জমিদারীতে সংস্কৃত তথা উচ্চতর শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের জন্য বহু সংখ্যক চতুষ্পাঠী ও টোল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অতএব এভাবে নবাবী শাসনামলে বাংলাদেশে হিন্দু সংস্কৃত তথা উচ্চ শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

পাঠ্যসূচী ঃ

হিন্দু ছাত্ররা সাধারণত পাঁচ বছর বয়সে চতুষ্পাঠীতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা জীবন শুরু করত। প্রথমে ছাত্রকে বর্ণমালা শিক্ষা দেয়া হত। এরপর তাকে ক্রমাগতভাবে ব্যাকরণ, কাব্য অলংকার শাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র, স্মৃতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র, দর্শনের বিভিন্ন শাখা, বেদান্ত ও বৈদিক ছন্দ ইত্যাদি শিখানো হত।[৩] চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা শেষ করে মেধাবী ও উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী

----

১. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩।

৩. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্ররা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্রে বা প্রতিষ্ঠানে গমন করত । এ সময়ের উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্রের নাম বলা হত টোল । বাংলার অক্সফোর্ড নামে খ্যাত নবদ্বীপ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল যেমন-চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বর্ধমান, ত্রিবেণী, হাওড়ার বালী, ঢাকার রাজনগর ও বিক্রমপুর ইত্যাদি স্থানে । এসব কেন্দ্রে ছাত্রদের উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের প্রচুর সুযোগ ছিল । ছাত্ররা ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নদীয়ায় গমন করত । বাংলার টোলগুলিতে ন্যায় শাস্ত্র ছাড়াও ব্যাকরণ, স্মৃতি শাস্ত্র বা আইন, দর্শন, কাব্য, জ্যোতিষ শাস্ত্র, বেদ, পুরান, এবং অভিধান ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হত । সাধারণত শিক্ষার্থীরা যে কোন একটি বিষয়ের উপর ৮ হতে ১৬ বছর পর্যন্ত অধ্যয়ন ও জ্ঞান চর্চা করত । বাংলাদেশে পাঠ শেষ করে আবার অনেক ছাত্র দর্শন ও স্মৃতি শাস্ত্র উচ্চতর শিক্ষার জন্য মিথিলায় (দ্বারভাঙ্গা) গমন করত । তেমনিভাবে অলংকার, ব্যাকারণ এবং বেদের উপর উচ্চতর জ্ঞানের জন্য কাশীতে যেত । এসব ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করে নিজেদের গ্রামে বা শহরে এসে চতুষ্পাঠী ও টোল প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে এবং শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত হত ।[১]

রূপরাম চক্রবর্তীর আত্ম কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, তিনি বাল্যকালে রঘুরাম ভট্টাচার্যের টোলে অমর কোষ, সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণ, পিঙ্গলের ছন্দসূত্র, অথবা প্রাকৃত পিঙ্গল এবং শিশু পালবধ, রঘুবংশ, নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্য অধ্যয়ন করেছিলেন । কবি কংকন চন্ডিতে শ্রীমন্তের বিদ্যা শিক্ষা প্রসংগে দীর্ঘ পাঠ্য বিষয়ের তালিকা হতে তৎকালে এ বিষয়ের একটি ধারণা করা যায় যেমন-প্রথমেই আছে যে, রক্ষিত পনিজকা টীকা, ন্যায় কোষবাটিকা, গন বৃত্তি আর ব্যাকরণ । এরপর পিঙ্গলের ছন্দসূত্র, দন্ডী, ভারবি, মাঘ, জৈমিনি-মহাভারত, নৈষধ, মেঘদূত, কুমার সম্ভব, সপ্তশতী, রাঘব পান্ডবীয় , জয়দেব, বাসবদত্তা, কামন্দকী-দীপিকা, ভাস্বতী, বামন, হিতোপদেশ, বৈদ্য ও জ্যোতিষ শাস্ত্র, স্মৃতি, আগম পুরান প্রভৃতি অধ্যয়ন করা হত ।[২]

অতএব সব শেষে আমরা বলতে পারি যে, সুলতানী, মুগল ,নবাবী মুসলমানদের দীর্ঘ ৫৫০ বছরের শাসনামলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু ও সুশৃংখল সুনির্দিষ্ট একক নীতিমালা বা পরিকল্পনা

---

১. প্রাক পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন) ১৭০০-১৭৫৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১০ ।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৭-৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না। সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল এবং নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পরিচালিত হত। শাসক শ্রেণী আমীর, ওমরাহ, নবাব, সুবাদার, জমিদার, অভিজাত, আলেম, সুফী দরবেশ, হিন্দু পন্ডিত, গুরু, প্রভৃতি ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগও প্রচেষ্টায় ব্যক্তি ও সমাজ কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সাধারণত মাদ্রাসা, টোল মক্তব, পাঠশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কোন শিক্ষকের নিজ বাস গৃহ, কিংবা মসজিদ, মন্দির বা জমিদার আভিজাত ও বিত্তশালীদের বাড়ীতে বা বাড়ীর আঙ্গিনায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হত। শিক্ষার জন্য কোন আলাদা শিক্ষা দপ্তর বা নির্দিষ্ট কোন নিয়ম পদ্ধতি, সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী ছিল না। এ সময় শিক্ষাকালের কোন নির্দিষ্ট ও বাধা ধরা সময় ছিল না। তাই সে সময় সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা কোন সুষ্ঠু সুশৃংখল ও নিয়ম তান্ত্রিকতার মধ্যে গড়ে উঠেনি। শুধু মাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগেই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল

কিন্তু ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার ক্ষমতা দখলের পর শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী আয়ত্তাধীন ও নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আনয়ন করা হয়। সরাকারী উদ্যোগে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং শিক্ষার জন্য আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। তাই যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত হত বর্তমান কালের মত সে সব প্রতিষ্ঠানগুলিও সরকারী নীতিমালা, পাঠ্যসূচী ও আইন কানুন অনুযায়ী লেখা পড়া করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিম শাসনামলের শিক্ষার যে পদ্ধতি ও ব্যবস্থা ছিল, সে সব কিছুর পরিবর্তন সাধন করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। অবশ্য পূর্বের শিক্ষার সব কিছুই বাদ দিতে পারেনি। ধর্মীয় শিক্ষা হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজে তখনও প্রচলিত ছিল। তবে শিক্ষার নিয়ম কানুন ও পদ্ধতিগত দিক থেকে ব্যাপক রদবদল ও পরিবর্তন আনয়ন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় ঃ- বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন (১৮০০-১৯০০)

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব হতেই বাংলাদেশে অল্প বিস্তর মুসলমান ছিল। পরবর্তীতে বঙ্গ বিজয়ের পর আরব দেশীয় মুসলিম বণিক, আলেম, সুফী, দরবেশগণ এদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসে। এরা ইসলামের শ্বাশত বানী প্রচার করে। ফলে জাতি, গোত্র, বর্ণ ও কৌলিন্য প্রথায় আবদ্ধ বর্ণবাদী হিন্দুদের অত্যাচারে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধরা ইসলামের সাম্য, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও বর্ণভেদহীন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে ও মুসলমান হতে থাকে। অবশ্য ইসলাম গ্রহণ করলেই বা মুসলমান হলেই একজন সত্যানুসারী দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। তাকে লেখা পড়া শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করতে হয়। অন্যথায় সে আবার পথভ্রান্ত হতে পারে। তাই বখতিয়ার খিলজী বঙ্গ বিজয়ের পরেই এদেশে ইসলামকে স্থায়ী করণের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা, মক্তব মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীরাও তাঁর পদাংক অনুসরন করে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাই নয় জমিদার, অভিজাত, বিত্তশালী এবং আলেম, সুফী দরবেশগণ ও স্বীয় উদ্যোগে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা বিস্তারের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া প্রত্যেক মসজিদ, খানকা সংলগ্ন ও মাদ্রাসা, মক্তব ছিল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য বিত্তশালীরা অর্থ দান, কিংবা লাখেরাজ ভূমিদান করতেন

ডঃ আব্দুর রহিম উল্লেখ করেন যে, বাংলার মুসলমানরা প্রথম যুগের মুসলমানদের শিক্ষার আদর্শ অনুসরন করে। যদিও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য তাদের পূর্বসুরীদের মত তত টা উল্লেখযোগ্য ছিলনা, তবুও তারা যে তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ঐতিহ্যকে মূল্যবান মনে করত এবং তাদের জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসন কর্তাগণ আমীর, কর্মচারী ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ও পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন এবং সর্বত্র শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে আত্ম নিয়োগ করেছেন। আলেম সুফী, দরবেশগণও বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এরফলে শহরে ও প্রধান প্রধান স্থানসমূহে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা মক্তব, বিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠে।[১] ১৮৮২ সালে

---

১. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৬। উদ্ধৃত মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার অবস্থা বিশ্লেষন প্রসংগে শিক্ষা কমিশনের বেঙ্গল প্রাদেশিক কমিটি উল্লেখ করেছেন যে, একটি মসজিদ বা একটি ইমাম বাড়াও ছিলনা, যেখানে আরবী ও ফার্সীর অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলনা। প্রতিটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলেই পাঠশালার অনুকরণে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১] এভাবে শাসক, জমিদার, বিত্তশালী, আলেম, সুফী, দরবেশদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে মুসলিম শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এ সময়ের শিক্ষা মূলত ধর্ম কেন্দ্রিক ছিল অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষার উপর বেশী প্রাধান্য দেয়া হত। তবে পাশাপাশি পার্থিব অন্যান্য বিষয়েরও শিক্ষা দেয়া হত। এ সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন কেন্দ্রিয় সরকারের বা একক কোন নিয়ম নীতির উপর পরিচালিত হত না। কিংবা কোন সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ও পাঠ্যসূচী ছিল না বর্তমানের মত শ্রেণী বিন্যাস ও ছিল না। শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তি ও সমাজ কেন্দ্রিক। বিভিন্ন মাদ্রাসা বিভিন্ন রকমের নিজস্ব পাঠ্যসূচী ছিল। তবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাগদাদের দরসে নিজামিয়া মাদ্রাসা অনুসরনে এদেশের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষা দেয়া হত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হতে লখনৌর দরসে নিজামিয়া এর চেয়ে উন্নততর আধুনিক ও যুগ উপযোগী পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করলে, এর ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষিত সমাজে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এরফলে বাগদাদের দরসে নিজামিয়ার প্রভাব বাংলাদেশে হ্রাস পায় এবং লখনৌর দরসে নিজামিয়ার পাঠ্যসূচী এদেশের মাদ্রাসাসমূহে পঠন ও পাঠন বৃদ্ধি পায়। মানুষের এই জ্ঞানের ও জানার তৃষ্ণা মেটানোর জন্যই তাই যুগে যুগে শিক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা সূচীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে।

সুতরাং মধ্যযুগে সুলতানী শাসনামলে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, মুগল আমলে তার কিছুটা উন্নতি লাভ করে ও শিক্ষার বিকাশ ঘটে। তেমনি নবাবী আমলেও শিক্ষা আরো উন্নতি লাভ করে শিক্ষার ধারা ও পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন হয়। সর্বোপরি মধ্যযুগের দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা দীক্ষায় মুসলিম সমাজ প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা সূচী পরিবর্তনশীল। মুসলমানরা পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যা/শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা করলেও

---

১. রিপোর্ট অব বেঙ্গাল প্রোভিনসিয়াল কমিটি, এডুকেশন কমিশন, পার্ট-২, প্যারা ১৮৩ উদ্ধৃত, এ, আর মল্লিক, বৃটিশ পলিসি এনড দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল(১৭৫৭-১৮৫৬), লন্ডন, পৃঃ১৪৯। উদ্ধৃত - বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর ময়মনসিংহ, প্রধান সম্পাদক নূরুল ইসলাম খান, প্রকাশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সংস্থাপন মন্ত্রনালয়, (ঢাকা-১৯৮২), পৃঃ ৩৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম শিক্ষাকে ত্যাগ করতে পারিনি । তাই বৃটিশ শাসনামলেও এই ধর্মীয় ভাবধারাকে অক্ষুন্ন রেখেই শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করা হয় এবং আধুনিক ও যুগউপযোগী পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয় । এ সময় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ম শৃংখলা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্যে আনয়ন করা হয় এবং শ্রেণী বিন্যাস করে পাঠ্যসূচী সাজানো হয় । অর্থাৎ দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা যে ব্যক্তি ও সমাজের উপর নির্ভরশীল ছিল এ সময় তা পরিবর্তন হয়ে সরকারী নিয়ম নীতি ও শৃংখলার মধ্যে আসে তবে পাশাপাশি বেসরকারী ব্যবস্থাও চালু থাকে ।

অপরদিকে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে, মুসলিম পূর্বযুগে বাংলাদেশে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না । কিন্তু মুসলিম শাসনামলে যখন সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, গোত্র, বর্ণ ও শ্রেণী ভেদের অবসান হল এবং উদার নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হল, তখন সর্বস্তরের মানুষ শিক্ষার জন্য এগিয়ে আসল । হিন্দু জমিদার প্রভৃতি জাত বিত্তশালী এবং পন্ডিতেরা নিজগৃহে কিংবা গৃহ সংলগ্ন স্থানে, অথবা মন্দির, চন্ডী মন্ডপে পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, টোল প্রভৃতি স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন । এভাবে ক্রমাগত সমগ্র বাংলাদেশে শিক্ষার জোয়ার ছড়িয়ে পড়ে । এসব প্রতিষ্ঠানে মূলত সে সময় ধর্মীয় শিক্ষাকেই প্রাধান্য দেয়া হত । তবে অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হত । সমগ্র মুসলিম শাসনামলে হিন্দু সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী বেসরকারী সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক উন্নতি সাধন করে । এ সময় শিক্ষা মোটামুটি ব্যক্তি ও সমাজ কেন্দ্রিক ছিল । বৃটিশ শাসনামলে এই পুরানো পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার ও রদ-বদল করা হয় এবং আধুনিক ও যুগউপযোগী করা হয় । তবে পাশা পাশি বেসরকারী পদ্ধতিতে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থাও চালু থাকে ।

এডামের বিবরণী হতে জানা যায় যে প্রাক বৃটিশ শাসন যুগে বাংলাদেশে শিক্ষার দুটি স্তর ছিল, প্রাথমিক ও উচ্চতর । এডামের বিবরনীতে আরো প্রকাশ পায় যে, তৎকালীন বাংলাদেশে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা ও হিন্দুদের জন্য টোল নামে দুই ধরনের স্বতন্ত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল । মাদ্রাসা সমূহে আরবী ও ফার্সী এবং টোল সমূহে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত । টোলগুলিতে ব্রাহ্মনগণ শিক্ষাদান করতেন এবং সাধারণত ব্রাহ্মন ছাত্ররাই শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ পেত। সাধারনত দেখা যায় যে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষকদের স্বীয় বাসগৃহ বা গৃহ সংলগ্ন স্থানে এবং মসজিদ বা মন্দিরে বসত। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জমিদার, অভিজাত শ্রেণী, বিত্তশালী ও শাসকদের নিকট হতে সাহায্য লাভ করত।[১] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বৃটিশ পূর্ব সমগ্র মুসলিম শাসন যুগে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং উচ্চ শিক্ষাও ছিল তবে খুবই সীমিত। মাদ্রাসা টোল ইত্যাদিতে নিজস্ব পদ্ধতিতেই বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা হত। বৃটিশ শাসন যুগে শিক্ষা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি, আইন কানুন প্রণয়ন করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃংখলা ও অনিয়মতান্ত্রিকতা দূর করে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি প্রচলন করা হয় এবং প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে আধুনিক ও পার্থিব বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়। হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা সূচী রচনা করা হয়। অতএব আমরা নিম্নে মুসলিম ও হিন্দু সমাজের ধর্মীয় শিক্ষা বৃটিশ শাসন যুগে কি ধরনের ছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করব।

(ক) বাংলাদেশে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা (১৮০০-১৯০০) ও বৃটিশ সরকারের নীতিঃ-

মক্তব বা প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ও পাঠ্যসূচীঃ

মুসলিম সমাজে মক্তব ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা অতি পুরানো। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও মক্তব ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। যদিও তখন আলাদা কোন মক্তব ছিলনা; মসজিদগুলিতেই মক্তবের কাজ সুসম্পন্ন হত। আমাদের বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি, সরকারী ও বেসরকারী ভাবে অসংখ্য মসজিদ, মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এতে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেছে। মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস, কৃষ্টি সভ্যতা, সংস্কৃতি অনুযায়ীই মুসলিম ধর্ম শিক্ষা চলে এসেছে। সে সময় সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের প্রাধান্য থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। মুসলিম সন্তানেরা ধর্ম শিক্ষার জন্য মক্তব মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করত এবং মক্তবই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র। বৃটিশ শাসনামলেও মুসলমান সন্তানেরা ধর্ম

---

১. এ,কে,এম,মোজাম্মেল হক, 'সংক্ষিপ্ত শিক্ষার ইতিহাস', (ঢাকা ১৯৭৬) ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার জন্য এ মক্তব মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেছে । তাই মক্তব প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

কাজেই মুসলিম সমাজে মক্তবের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মক্তব হল মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও সাংস্কৃতির মূল ভিত্তি । কোন কোন স্থানে মক্তবের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের ব্যবস্থা থাকত, আবার অনেক সময় কোথাও মসজিদ সংলগ্ন কক্ষে কিংবা মসজিদকেই মক্তব হিসেবে ব্যবহার করা হত । এ সব মক্তবে ছেলে মেয়েদের যে শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই দেয়া হত তা নয় বরং ভবিষ্যৎ সুন্দর ও উত্তম জীবন ও নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রাথমিক শিক্ষাও দেয়া হত । মাতৃভাষা যেটাই হোক না কেন মক্তবে প্রবেশের পর সর্বপ্রথম শিশুদেরকে আরবী বর্ণমালা ও কুরআন তাজবীদের সাথে শিক্ষা দেয়া হত । পর্যায়ক্রমে ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলি যেমন ঈমান, নামাজ, রোজা হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রাথমিক জ্ঞান দেয়া হত । এভাবে মক্তবের সুন্দর পরিসরে শিশুদের জীবনে ইসলামী শিক্ষাও সংস্কৃতি এবং তাহজীব ও তামাদ্দুনের গোড়া পত্তন হত । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিম সমাজে মক্তবের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে জন্য বিত্তশালীরা লাখেরাজ ভূমি দান করত এবং নগদ অর্থ ও দিত । এভাবে সে সময় শিক্ষা মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল । বৃটিশদের বাংলার ক্ষমতা দখলের পর তাদের শাসন ও শোষনের ফলে মুসলমানদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে । ঐতিহাসিক মহা দুর্ভিক্ষ ("৭৬ এর মন্বন্তরে") অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা করুন হতে করুনতর হয় । ফলে মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম অবনতি দেখা দেয় এবং অর্থের অভাবে মক্তব মাদ্রাসা ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যেতে থাকে ।

বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকদের হাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব চলে গেলে মুসলমানদের দুরাবস্থা সকল দিক হতে দ্রুত গতিতে খারাপ হতে থাকে । ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদাররা আরও নিঃস্ব হয়ে পড়ে ।[১] ১৭৬৫ সালে দীওয়ানী বা রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যাওয়ার পর বাংলার মুসলমানদের

----

১. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়া, "পটুয়াখালী", সাধারণ সম্পাদক, মেজর জেনারেল (অবঃ) এম, এ, লতিফ, (ঢাকা, ১৯৮৬), পৃঃ ১৭১ ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ উপার্জনের পথ সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস ইত্যাদি স্থাপন বা পরিচালনার আর্থিক ক্ষমতা মুসলমানদের আর থাকল না।[১] তবুও ওয়াকফ, লাখেরাজ সম্পত্তির বদৌলতে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুকাল অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৮২৮ সালের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তি সত্ত্ব লোপ, ১৮৩৫ সনের শিক্ষা সংশোধন আইন, ১৮৩৭ সনের ফার্সী রাজ ভাষার পরিবর্তন আইন, ১৮৪৪ সনের নতুন চাকুরীতে নিয়োগ পদ্ধতির প্রবর্তন ইত্যাদির আঘাতে পূর্বের মুসলমান শাসক জাতী নিঃস্ব, নিরক্ষর, নির্জীব জাতীতে পরিনত হয় এবং মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যায়।[২] ইংরেজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির কারণেই এরূপ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার সুদূর প্রসারী বৃটিশদের পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয়। কেননা কোম্পানী ক্ষমতা গ্রহনের পর ক্রমশ তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ শুরু করে। প্রথমত তারা এদেশের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা গ্রহণ করে মুসলমানদের অত্যাচার করে রাজস্ব আদায় করতে থাকে ফলে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পরে। অপর দিকে সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমন ছিল ১৮২৮ সালের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন। এতে মক্তব মাদ্রাসার নামে সমস্ত নিষ্কর ভূমি সরকার অধি গ্রহণ করে। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্থিক মহাসংকটে এবং অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। এছাড়া ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মুসলমানদের জন্য বিরাট আঘাত ছিল। যাই হোক বিভিন্ন কারণেই মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে দুরাবস্থায় পতিত হয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ভেংগে যায়। তাই ইহা ছিল বৃটিশদের সুদূর প্রসারী চক্রান্ত। কেননা মুসলমানরা যাতে শিক্ষা দীক্ষায়, অর্থে, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে তার জন্য মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংশ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

পলাশীর পর রাজ্য হারিয়ে বাংলাদেশের মুসলমানদিগকে চাকুরী, জমিদারী ইত্যাদি সব কিছু হারাতে হয়। এতে যেমন তাদের আর্থিক ঐশ্বর্য নষ্ট হয় তেমনি আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কেননা মক্তব, মাদ্রাসা, খানকাহ ও অন্যান্য

---

১. মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২।

২. ডাব্লু এ্যাডাম, থার্ড রিপোর্ট অন দি স্টেট অব এডুকেশন ইন বেঙ্গল ১৮৩৮। জেনারেল রিপোর্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ইন বেঙ্গল, ১৮৭২-৭৩, পৃঃ ৪১১। উদ্ধৃত, উনিশ শতকে বাংগালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করেই পরিচালিত হত। তাই যখন নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করার আইন করা হয়, তখন বিত্তহীন, নিঃস্ব মুসলমানদের পক্ষে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও দুরাবস্থা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাদের শিক্ষার ঐতিহ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে। তারা প্রাথমিক শিক্ষা কিছুটা হলেও বজায় রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় নির্বাহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার জন্য দেশের আনাচে কানাচে যে বহু সংখ্যক মক্তব, মাদ্রাসা চালু ছিল ইহা এ্যাডামের উক্তি হতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানই তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেই মনে করত। তাই এই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল।[১] তাছাড়া প্রত্যেক বিত্তশালীই তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য স্বীয় বাড়ীতে মক্তব প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন এবং অভাব গ্রস্থ, দারিদ্র প্রতিবেশী সন্তানদের এখানে শিক্ষা দিতেন।[২] তাই এ্যাডাম বৃটিশ কোম্পানির শাসনামলে প্রত্যেক মসজিদ ও ইমামবাড়ায় আরবী ও ফার্সী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা দেখতে পেয়েছিলেন। এ্যাডাম উল্লেখ করেছেন যে, তখন বাংলা ও বিহারের ৪ কোটি অধিবাসীর জন্য একলক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এই পরিসংখ্যান হতে বুঝা যায় যে, প্রতি গ্রামে অন্তত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঁচ হতে বার বছর বয়স্ক প্রায় তিনশত শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করত। এ্যাডাম আরো উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন আরও ব্যাপক ছিল।[৩] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এদেশে মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যাপক প্রতিষ্ঠান ছিল কিন্তু কোম্পানী শাসন গ্রহণের পর মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত করুন ও শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ও মাদ্রাসার ব্যয় বহন

----

১. সিলেকশন ফ্রম দি রেকর্ডস অব দি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, নং সি,সি,ডি, ২৪১,বেঙ্গল এডুকেশনাল ইনকোয়েরমেনটস কমিটি রিপোর্ট, কলিকাতা ১৮৮৮। উদ্ধৃত, মোহাম্মদ মোহর আলী, 'হিস্ট্রি অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল,' ১ বি খন্ড, ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সাঈদ, ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি, (রিয়াদ, ১৯৮৫) ১ম সংস্করন, পৃঃ ৮৪১।

২. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪১।

৩. ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (১৭৫৭-১৯৪৭) (ঢাকা ১৯৭৬) ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

করার ক্ষমতা তাদের ছিলনা, কিন্তু তথাপি এতদৈন্যতার পরও . নিজ নিজ উদ্যোগে মসজিদ, ইমামবাড়া, খানকায় এবং অনেকে নিজ বাড়ীতে অত্যন্ত দুরাবস্থায়ও প্রাথমিক শিক্ষা চালু রেখেছিল ।

মিশনারী ম্যাকসমুলারের ১৮৫৭ সালের জড়িপ থেকে তৎকালীন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি আভাস পাওয়া যায় । তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে তখন যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় বিদ্যালয় ছিল । তিনি আরো উল্লেখ করেন যে ১৮৫৭ সালে বাংলাদেশে ৮০ হাজার স্থানীয় বিদ্যালয় চালু ছিল ।[১] মুখ্যত মুসলমানদের জন্য ছিল এসব স্কুল মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তব ও মাদ্রাসা এবং হিন্দুদের জন্য ছিল মন্দির কেন্দ্রিক টোল ও পাঠশালা । এ ছাড়া আরো পারিবারিক বিদ্যালয়ও ছিল । মক্তবের উস্তাদ ও টোলের গুরু মহাশয়েরা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক ভাষা, অংক, ব্যাকরণ, দলিলপত্র লিখন সংক্রান্ত হস্তলিখিত নিজস্ব বইপত্র থেকে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিতেন । শিক্ষকগণ নিজেরাই পাঠ্য পুস্তক তৈরী করতেন এবং তাঁরাই ছাত্রদের শিক্ষা ও উপাধি দিতেন । লেখা পড়া শিখানোর বিনিময়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের কাছ হতে গুরু দক্ষিনা পেতেন । এছাড়া সরকার এবং বিত্তশালীরা এসব প্রতিষ্ঠানে লাখেরাজ জমি ও অর্থ দান করতেন ।[২] উইলিয়াম হান্টার (১৮৭১) পারিবারিক স্কুল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, পারিবারিক স্কুলে উচ্চ শ্রেণীর খানদানী মুসলমানগণ তাদের নিজেদের এবং প্রতিবেশী দরিদ্র ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দিতেন । এ সব বিদ্যালয়ে শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই দেয়া হত না, কোন কোন বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষাও দেয়া হত । সে সময় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপক ও সার্বজনীন ছিল ।[৩]

বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে মক্তবই সুপরিচিত ছিল । সমগ্র বাংলাদেশেই এই মক্তব সাধারণত মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল । মসজিদের ইমাম ফজরের নামাজ শেষে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তিনি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিতেন

---

১. শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬ ।

২. মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, 'কুমিল্লা জেলার ইতিহাস', পৃঃ ৪০৪ । উদ্ধৃত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সংস্থাপন মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত, বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, 'বৃহত্তর রাজশাহী' প্রধান সম্পাদক নরুল ইসলাম খান, (ঢাকা ১৯৯১) পৃঃ ২৮৬ । বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার পটুয়াখালী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭১ ।

৩. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, পটুয়াখালী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭১ ।শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

এসব মক্তব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চলত এবং এগুলি সাধারনত স্থানীয় জনসাধারনের সহযোগীতায় পরিচালিত হত । বৃটিশ সরকার ১৮৮২ সাল পর্যন্ত এসব মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে কোন মনোযোগ দেয়নি ।[১] ম্যাক্স্ মুলারের রিপোর্ট হতে বুঝা যায় যে,মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল । বাংলার শাসন ক্ষমতা বৃটিশদের হাতে চলে যাওয়ার পর মুসলমানেরা অর্থনৈতিকভাবে দুরাবস্থায় পতিত হলেও তারা প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষাকে টিকিয়ে রেখেছিল ।

উইলিয়াম এডামের শিক্ষা রিপোর্ট ঃ

উইলিয়াম এডাম তৎকালীন ভারতীয় বড় লাট, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংয়ের অনুমতি নয়ে ১৮৩৫ হতে ১৮৩৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান পূর্বক তিনি তিনটি শিক্ষা বিবরণ সরকারের নিকট উপস্থাপন করেন । তার প্রথম রিপোর্টটি ছিল ১লা জুলাই ১৮৩৫ সালে, দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২রা ডিসেম্বর ১৮৩৫ সালে এবং তৃতীয় রিপোর্ট ছিল ২৮শে এপ্রিল ১৮৩৮ সালে ।[২] এতে সে সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায় । তার প্রথম বিবরণীটি ছিল সংক্ষিপ্ত আকারের । এতে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলা ও বিহারে একলক্ষ স্কুল রয়েছে । এই দুই প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল তখন চার কোটির মত । সুতরাং এ হিসেবে প্রতি চারশত লোকের জন্য বাংলা ও বিহারে একটি করে বিদ্যালয় ছিল । এই দুই প্রদেশে তখন প্রায় দেড় লক্ষ গ্রাম ছিল । এই বিবরণী হতে অনুমিত হয় যে প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে একটি করে স্কুল ছিল এবং স্কুলের সংখ্যা কোনক্রমেই এক লক্ষের কম হবেনা ।[৩] কেউ কেউ এডামের এ অভিমতকে অতিরিক্ত বলে মনে করেন । কিন্তু ইহা অস্বীকার করার উপায় নেই । কেননা এডাম সে যুগে গ্রামাঞ্চলে অনেক পারিবারিক স্কুল দেখতে পান । সে সব স্কুলে কোন নির্দিষ্ট পরিবার বা একাধিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখা পড়া করত । অবশ্য স্কুল বলতে তখন এসব পারিবারিক

---

১. ডঃএ,কে,এম,আয়ুব আলী,'হিষ্ট্রি অব ট্র্যাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ (ডাউন টু ১৯৮০)"ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ (ঢাকা ১৯৮৩) পৃঃ৬৩, মূল, রিপোর্ট অব দি এডুকেশন কমিশন ১৮৮২ ৪র্থ চ্যাপ্টার ।

২. নলিনী ভূষন দাস গুপ্ত, 'ভারতের শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা",(কলিকাতা ১৯৮৬) ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১৯ ।

৩. ভারতের শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা, পূর্বোক্ত,পৃঃ১৯ ।ভারতের শিক্ষা সংস্থা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলগুলিকেই বুঝানো হত । সুতরাং বাংলা ও বিহারে এডাম যে এক লক্ষ স্কুলের কথা উল্লেখ করেছেন তা হয়ত এসব কিছু মিলিয়েই উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয় । বস্তুত সে সময়ে প্রত্যেক গ্রামেই স্কুল ছিল এবং বড় বড় গ্রামের একাধিক স্কুল ছিল বলেও উল্লেখ পাওয়া যায় ।[১]

কিন্তু এ সময় এত বিদ্যালয় ছিল না বলে ফিলিপ হার্টটগ নামে একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এ্যাডামের রিপোর্টের সত্যতা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন । কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা বিদদের মধ্যে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ আর, ভি, পারুলেকর, হার্টগের মন্তব্যের উত্তরে উল্লেখ করেন যে, এডাম দেশীয় বিদ্যালয় সম্পর্কে যে সংখ্যা লিপিবদ্ধ করেছেন হার্টগ তার মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি । কেননা সে সময়ে গৃহ বিদ্যালয় সমূহে সাধারণ শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা ছিল এডাম তার সবগুলিকেই দেশীয় বিদ্যালয় নামে অভিহিত করেছেন ।[২] এ সম্পর্কে আরো উল্লেখ করা হয় যে, সে দিনের দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বর্তমানের মত সুনির্দিষ্ট একটি সামাজিক সংগঠন ছিলনা । আজকের বিদ্যালয়ের স্থায়ী সামাজিক কাঠামো দিয়ে বিচার করলে সে দিন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ লক্ষ না হওয়ায় স্বাভাবিক । কিন্তু দেশীয় বিদ্যালয় বলতে সেদিন বোঝাত, যে স্থানে শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং এ অর্থে পারিবারিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেও বিদ্যালয় বলা হত ।[৩] কাজেই যারা ১ লক্ষ বিদ্যালয়ের কথা অবাস্তব বলে মনে করেছেন এরপর তাদের দাবী আর টিকতে পারে না ।

এডাম তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্টটি রাজশাহী বিভাগের নাটোরে (বর্তমান জেলা) দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এক জরীপ চালান । তাঁর এই জরীপকৃত বিবরণী হতে জানা যায় যে, নাটোরে অনেকগুলি পারিবারিক বা গার্হস্থ্য বিদ্যালয়, মক্তব, কুরআন স্কুল, ডজন খানিক পাঠশালা, টোল ছিল, যাতে ছাত্ররা অধ্যয়ন করত । এই অঞ্চলের জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি স্বচ্ছল শ্রেণীর ছেলে মেয়েরা নিজ গৃহে বা উক্ত বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা গ্রহণ করত, অধিকন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর অস্বচ্ছল ব্যক্তিগনের সন্তানেরাও উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করত । পারিবারিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা

---

১. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০-১১ । শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪১ । শিক্ষা প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৭-৫৮ ।
২. ভারতের শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯ ।
৩. ভারতের শিক্ষা সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারন স্কুলের প্রায় নয় গুন বেশী ছিল বলে এডাম উল্লেখ করেছেন । তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে ছাত্র ছাত্রীদের কোন বয়স নির্দিষ্ট ছিল না । তেমনি বিদ্যালয় ত্যাগেরও কোন নির্দিষ্ট বয়স সীমা নির্ধারিত ছিল না । সাধারনত ৮ হতে ১৪ বছর বয়সের ছেলে মেয়েরা স্কুলে পড়ত বলে এডাম উল্লেখ করেছেন ।[১]

এ্যাডামের রিপোর্ট হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নাটোরে তখন ৪৮৫টি গ্রাম ছিল, এ্যাডাম সে সময় সেখানে ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সন্ধান পান । এর ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৬২ জন । এর মধ্যে ১০টি ছিল বাংলা বিদ্যালয়, ছাত্র ছিল ১৬৭ জন । ৪টি ছিল ফার্সী বিদ্যালয় ছাত্র সংখ্যা ২৩ জন, ১১টি ছিল আরবী বিদ্যালয়, ছাত্র ছিল ৪২ জন । ২টি বাংলা ও ফার্সী বিদ্যালয় ছাত্র ছিল ৩০ জন । এছাড়া ২৩৮টি গ্রামের মধ্যে ১৫৪৪টি পরিবার ছিল । এসব পরিবার নিজেরা ২৩৪২ জন ছাত্রকে শিক্ষা দিত । অর্থাৎ সাধারণ বিদ্যালয়ের প্রায় নয় গুন বেশী ছিল পারিবারিক শিক্ষা ব্যবস্থা । সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় ছিল ৮ বছর এবং বিদ্যালয় ত্যাগের বয়স ছিল ১৪ বছর ।[২]

এডামের রিপোর্ট হতে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, তৎকালীন বাংলাদেশের লোকেরা শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত উৎসাহী ও আগ্রহী ছিল । বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানীয় লোকদের প্রচেষ্টা ও আর্থিক সাহায্য ও দানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হত । কেননা কুরআন হাদীসের নির্দেশাবলী সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ প্রদান করত । ধনী ব্যক্তিদের সন্তানেরা গৃহ শিক্ষকের নিকট ও পড়াশুনা করত । গরীব ছাত্রদের শিক্ষা লাভে কোন প্রকার ভাতা লাগতো না । পানদুয়া নামক এক উন্নত গ্রামে মুসলমান ভূস্বামীরা নিজের ব্যয়ে গৃহ শিক্ষক রেখে প্রতিবেশী গরীব ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করত । শিক্ষকগণ শিক্ষা দান করা তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করত । সে জন্য শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রে বিনা বেতনেই ছাত্রদের শিক্ষা দিত । তাছাড়া শিক্ষকদের বেতন ও ছিল অত্যন্ত নগন্য এবং ছাত্র শিক্ষক মিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলত[৩] । নাটোরের

---

১. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১-১২ । শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৪২
২. ভারতের শিক্ষা সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫ ।
৩. উইলিয়াম এডাম, ১ম রিপোর্ট, পৃঃ৫৫, ২৪ । উদ্ধৃত, ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক, 'বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান '(১৭৫৭-১৮৫৬) অনু, দেলওয়ার হোসেন, ১ম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা ১৯৮২) পৃঃ১৬৯ । শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪২ ।

Dhaka University Institutional Repository

ধরাইল নামক স্থানের বিদ্যালয় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে এ্যাডাম লিখেছেন যে, ঐ স্কুলটি চারটি পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । তাদের একজন তার বহির্বাড়ী উক্ত স্কুলের জন্য দান করেন । প্রতিষ্ঠাতাগণ তাদের ৫টি সন্তানকে ঐ স্কুলে পড়তে দিয়ে শিক্ষককে এক টাকা বার আনা হিসেবে মাসিক পারিশ্রমিক দিত ।[১]

এ্যাডাম উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধান দুটি স্তর ছিল । প্রাথমিক স্তর ও উচ্চতর স্তর । স্তর দুটি যথাক্রমে মক্তব ও মাদ্রাসা নামে পরিচিত ছিল । এছাড়া মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক কুরআন শিক্ষা স্কুল ও বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল । প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বিষয় ধর্মীয় শিক্ষা, পঠন , লিখন ও গনিত মূলত প্রধান ছিল । মাদ্রাসায় মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা চালু ছিল । উভয় স্তরে ধর্ম তত্ত্ব, ইতিহাস, গনিত, অর্থনীতি, নীতি শাস্ত্র, শাসন বিধি, দর্শন, বীজ গনিত, ন্যায়শাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হত । এ্যাডাম আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে দুভাগে ভাগ করেছেন । যেমন দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অন্য সব প্রাথমিক বিদ্যালয় ।[২] দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিই জন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল । এসব বিদ্যালয়ে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর জন্য অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা, সংখ্যা পরিচিতি, প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হত । গ্রামের সাধারণ জমিদার, ব্যবসায়ী এবং অবস্থাপন্ন কৃষকদের চাহিদাকে কেন্দ্র করেই এসব বিদ্যালয় গড়ে উঠত । ইতিহাসে প্রমান পাওয়া যায় যে, এসব প্রাথমিক বিদ্যালয় কালক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপ ধারণ করে ।[৩]

অন্যসব প্রাথমিক বিদ্যালয় বলতে মক্তব, কুরআন স্কুল ও পার্শিয়ান স্কুল গুলিকেই বুঝানো হত । কুরআন স্কুল সাধারনত মসজিদ কেন্দ্রিক ছিল । মক্তব ও কুরআন স্কুলের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না । এগুলি সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষাই দেয়া হত । কুরআন অধ্যয়ন এবং ইসলাম ধর্মীয় পাঠ্য বস্তু ব্যতীত লেখা, পড়া ও প্রাথমিক গনিতের বিষয় বস্তু শিক্ষা দেয়া হত ।অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখস্থ পঠনের উপর জোর দেয়া হত । এসব মক্তব ও কুরআন স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষার উপর বেশী

---

১. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১২ ।
২. শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৬ ।
৩. ভারতের শিক্ষা সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বারোপ করা হত বলে ছাত্রদের, আচার ব্যবহার ও সৌজন্যমূলক আচরনের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখা হত ।[১] সাধারনত শিশুরা মক্তবে তাদের ৪/৫ বছর বয়স হতে শিক্ষা জীবন শুরু করত এবং ৫ হতে ৬ বছর কাল যাবত অধ্যয়ন স্থায়ী হত । তারা সেখানে বিভিন্ন বিষয়েই শিক্ষা গ্রহণ করত । পবিত্র কুরআন পাঠ শিক্ষা ছাড়াও ইসলামের মৌলিক কতিপয় বিষয় যেমন নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা গ্রহণ করত । আরবী, ফার্সী ভাষা, ব্যাকরন, অংক, ইতিহাস, ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা লাভ করত ।[২] এবং সে সব বিদ্যালয়েও মক্তবে অধিকাংশ মুসলমানদের ফার্সী ভাষা চর্চা প্রিয় বিষয় ছিল । যেসব মক্তবে অধিকাংশ ফার্সী ভাষায় লিখিত পুস্তকাবলী শিক্ষা দেয়া হত, সাধারনত সেই সব বিদ্যালয় বা মক্তব গুলি পার্সিয়ান স্কুল নামে অভিহিত হত । এসব স্কুলে হিন্দু মুসলিম সকলেই লেখা পড়ার সুযোগ পেত । পার্শিয়ান স্কুলের শিক্ষকগণ পাঠশালার শিক্ষকদের চেয়ে অধিকতর শিক্ষাপ্রাপ্ত ও জ্ঞানী ছিলেন । এ সমস্ত স্কুলে হাতে লিখিত পুথি পুস্তকের ব্যাপক ব্যবহার ছিল । শ্রেণী ব্যবস্থার কোন নির্ধারিত নীতিমালা ছিল না ।[৩]

তবে আরবী ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল । কিন্তু ফার্সীর তুলনায় অনেক কম । ব্যাকরণ, সাহিত্য, আদর্শ নীতি, আইন কানুন, ইত্যাদি এবস শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল ।[৪] পর্যায়ক্রমে পাঠ্য পুস্তকগুলির শিক্ষা দান ও চলত । পারস্য কবি শেখ সাদীর লিখিত পান্দেনামা, গুলিস্তান ও বুস্তান, পাঠের পর অপরাপর কয়েকজন গ্রন্থকারের রচিত পুথি পুস্তক ও শিক্ষা দেয়া হত । তন্মধ্যে ইউসুফ জুলেখা, লাইলী মজনু ও সিকান্দার নামা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া পত্র লিখন, গনিত, প্রবন্ধ রচনা, ইত্যাদি ঐ সমস্ত স্কুলের অন্যতম পাঠ্য বিষয় ছিল ।[৫] মাঝে মাঝে অলংকার শাস্ত্র, ধর্ম দর্শন, কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি পার্শিয়ান স্কুলের উচ্চতর শিক্ষার জন্য অন্তর্ভুক্ত ছিল ।আরবী স্কুলের পাঠ্য সূচী আরো ব্যাপক ছিল । যুক্তি বিদ্যা, আইন বিদ্যা, ব্যাকরণের অনেক তত্ত্ব,অলংকার

---

১. শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭ ।
২. হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল ১ বি খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪১ ।
৩. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২ ।
৪. এডামস রিপোর্ট নং ১, পৃঃ ২০ , উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান(১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭০ ।
৫. আমাদের শিক্ষার ইতি হাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১২ ।

Dhaka University Institutional Repository

শাস্ত্রের নানা দিক, ইসলামের মূল নীতি, সব কিছুই পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল । ইউক্লিডের জ্যামিতি, টলেমির জ্যোতির বিদ্যা, প্রাকৃতিক দর্শন, আধ্যাত্মবাদ ইত্যাদি অনেক বিষয় পার্শিয়ান স্কুলে পড়ানো হত । এডাম তাই উল্লেখ করেছেন যে, ইহা বলা নিশ্চয়ই ভুল হবে না যে, ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা প্রাক ছাপাখানা যুগের ইউরোপীয় জাতীর সঙ্গে তুলনা করা যায় ।[১] কিন্তু এডাম যে সমস্ত আরবী স্কুলের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলির মাত্র অল্প কয়েকটি আরবীতে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করত । মক্তব বা প্রাথমিক আরবী বিদ্যালয় অর্ধ শিক্ষিত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে খারাপ হয়ে যেত । অর্থ না বুঝে কুরআন পাঠের ব্যবস্থাই ছিল তাদের সমস্ত শিক্ষা পদ্ধতি ।[২]

এ্যাডাম তার দ্বিতীয় রিপোর্টে গৃহ বিদ্যালয় এবং সাধারন দেশীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি লক্ষ্য করেছিলেন তাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় প্রত্যেকটি স্তরই যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করেছিল । তখনকার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পাক ভারতের অপরাপর অঞ্চলের মতই বাংলাদেশ মুসলিম সন্তানদের বয়স যখন ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন হত তখন খুব আড়ম্বর পূর্ণ ভাবে 'বিসমিল্লাহ খানি' অনুষ্ঠান পালন করা হত । এই অনুষ্ঠানে শিশুকে ভাল করে সুসজ্জিত করে মজলিসে নির্ধারিত স্থানে বসানো হত . এবং কুরআন শরীফের দু'একটি আয়াত এবং বিসমিল্লাহ পড়ানো হত । অবশেষে অনুষ্ঠানের প্রধান পরিচালক ও গ্রামের বিখ্যাত ধার্মিক ব্যক্তি কর্তৃক দোয়া দরুদ পাঠের পর আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হত । অনুষ্ঠান শেষে শিশুটিকে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অর্পন করা হত ।[৩]

প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম পর্যায় শুরু হত মাটির উপরে অক্ষর লেখার অভ্যাস করার মধ্য দিয়া । দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হত অক্ষরগুলির আকার সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা সৃষ্টি করা নিয়ে । এ সময়ে বাংলাদেশে তাল পাতায় এবং বিহারে কাঠের উপর অক্ষর লেখা শিখানো হত । তৃতীয় পর্যায় শুরু হত পড়া এবং লেখা শিক্ষা এক সংগে আয়ত্ব করার মাধ্যমে । কলিকাতা স্কুল বুক

---

১. এডাম এর তৃতীয় রিপোর্ট, পৃঃ ৮০, উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭০ ।

২. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭০ ।

৩. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩ । আর, নাথন, 'রিপোর্ট অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' (১৮৯৭-৯৮, ১৯০১-০২) কোয়ার্টারলি রিভিউ, ১ম খন্ড (কলিকাতা ১৯০৪) পৃঃ ৪১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত কিছু পাঠ্য পুস্তক এ সময় পড়ানো হত । সাথে সাথে চলত গনিত ও নামতা শিক্ষা । কাঠাকিয়া এবং সের, ছটাক প্রভৃতি ওজন করার পদ্ধতি শিখানো হত । অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যেক স্তরই মোটামুটি উন্নত ছিল বলে এ্যাডাম মত প্রকাশ করেছেন ।[১] এ ছাড়া বাড়ীর কর্তাও দেখা যায় শিক্ষার দায়িত্ব পালন করত । তারা তাদের সন্তানদের লেখা, পড়ার পদ্ধতি এবং অংক ও হিসাব নিকাশ শিক্ষা দিয়ে থাকত ।[২] মূলত দেশীয় শিক্ষার ব্যবস্থা বাঙালীদের চাহিদা সম্মত সহজ সরল এবং তখনকার সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল । জনসাধারন নিজ নিজ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে স্বীয় প্রচেষ্টায় উন্নতি বিধানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে ।

অতএব এ্যাডামের রিপোর্ট হতে বুঝা যায় যে, মুসলিম শাসনামলের শেষ পর্যন্ত কিংবা পলাশীর পর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরেও মুসলমানরা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল এবং বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা দেশের আনাচে কানাচে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল । কিন্তু বৃটিশদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অবহেলা, উদাসীনতা এবং মুসলমানদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা ইত্যাদি কারণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর করুন দুর্যোগ নেমে আসে । নিঃস্বার্থভাবে যারা শিক্ষা দিত এবং যারা শিখত, উনিশ শতকের প্রথম দিক হতে তাদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে । কারণ তখন মুসলিম সমাজ বিভিন্ন সমস্যায় নিমজ্জিত ছিল । বিশেষ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা তখন তাদের মাঝে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল । তাই বিভিন্ন কারণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং এরফলে মুসলিম সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মক ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । এ্যাডাম তাই উল্লেখ করেছেন যে, এই শ্রেণী (মুসলিম) দিন দিন ধ্বংশ হয়ে গেছে এবং সে ধরনের স্কুল ও এখন আর নেই ।[৩] অথচ দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এ দেশীয় জনগণের উন্নতি বিধানের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা ছিল বলে এ্যাডাম তার বিবরণীতে যে মত প্রকাশ

----

১. ভারতের শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১ ।
২. দি ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া, দি ইন্ডিয়ান এ্যাম্পায়ার ৪র্থ খন্ড (এ্যাডমিনেস্টেটিভ) নতুন দিল্লী, ভারত, পৃঃ ৪০৮ ।
৩. এ্যাডাম এর ১ম রিপোর্ট, পৃঃ ৫৫, উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১ ।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন তা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের কাছে নিশ্চয়ই স্বীকার্য ।[১] কাজেই এ্যাডাম মুসলিম শাসনামলের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে উন্নতি লক্ষ্য করেছিলেন, কোম্পানী আমলে এ উন্নতি লক্ষ্য করেন নি, বরং শিক্ষা ব্যবস্থায় অবনতি শুরু হয় । তাই এ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে অব্যবস্থা ও মারাত্মক অবনতি লক্ষ্য করেন তিনি তাঁর রিপোর্টে সুবিস্তার উল্লেখ করেন ।

এ্যাডাম উল্লেখ করেছেন যে, হুগলী জেলার পান্ডুয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম ছিল । এখানকার মুসলিম ভূস্বামীগণ দরিদ্র প্রতিবেশী সন্তানদের লেখা পড়ার জন্য শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা করত এবং সেখানে এমন কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ পরিবার ছিলনা যার বাড়ীতে শিক্ষক রাখা হত না । পান্ডুয়ার তিনটি মাদ্রাসা মুসলমান শাসনামল হতে নিস্কর জমির উপর নির্ভর করে টিকেছিল । কোম্পানীর শাসনামলে এদের অস্তিত্ব কোন রকমে বজায় ছিল । হুগলী জেলায় আরবী, ফার্সীর আরো কয়েকটি বিদ্যালয় ছিল । এদের একটির জন্য মহসিন ফান্ডের দানের ব্যবস্থা ছিল । সীতাপুরে একটি মাদ্রাসা ছিল এর জন্য ১৭৭২ সালে গভর্নর কার্টিয়ার সাড়ে পাঁচ টাকা দান করেন ।[২]

বর্ধমান জেলার বোহার ও চাঁদরিয়া মাদ্রাসাগুলির জন্য নিস্কর জমির ব্যবস্থা ছিল । এ্যাডামের সময় এই জেলায় ৯৩টি ফার্সী ও ৮টি আরবী বিদ্যালয় ছিল । অনেক শিক্ষকের নিস্কর জমি ছিল এবং ছাত্রদেরকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেয়া হত । বীরভূম জেলায় ৭১টি ফার্সী ও ২টি আরবী বিদ্যালয় ছিল । অনেক শিক্ষকের নিস্কর জমি ছিল । মেদিনিপুরে একটি মাদ্রাসা ও ৪৮টি ফার্সী বিদ্যালয় ছিল । মুর্শিদাবাদে একটি মাদ্রাসা এবং ১৭টি ফার্সী ও ২টি আরবী বিদ্যালয় ছিল।[৩] এ্যাডাম তার রিপোর্টে চট্টগ্রামের একটি মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করেন । এই মাদ্রাসার জন্য নিস্কর জমির ব্যবস্থা ছিল । কিন্তু নিস্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনের পর, আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন এই

----

১. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪ ।

২. জে,লং, এডামস রিপোর্ট ,পৃঃ৪০, ৪২, উদ্ধৃত, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬ ।

৩. জে,লং, এডামস থার্ড রিপোর্ট, পৃঃ২৮৯, ২০০, ৩৫, ১৫৩, ১৯৯ । উদ্ধৃত, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,(১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ১১৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা ভীষনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সিলেটের শাহজালালের দরগার সহিত সংশ্লিষ্ট একটি মাদ্রাসা ছিল এবং এরজন্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল।[১] এডামের রিপোর্ট পড়ে বুঝা যায় যে, পলাশীর পরবর্তী ১৮০০ সাল পর্যন্ত মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষা প্রভুত উন্নতি সাধন করেছিল এবং দেশের সর্বত্র অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু বৃটিশদের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন প্রণয়নের ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে পতিত হয়। ফলে মক্তব মাদ্রাসা ও আরবী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থা একদম ভেঙে পড়ে এবং চরম অব্যবস্থা দেখা দেয় ও আস্তে আস্তে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করে এডাম লিখেছেন যে, এই আরবী বিদ্যালয়গুলি এমন হীন ও জীর্ণ দশায় পৌঁছেছে যে, এর রক্ষার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।[২] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশ মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ ছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসনের শুরু হতেই তথা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে হতেই মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি শুরু হয় এবং অনেক পিছনে পড়ে যায়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেই এর প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাবে। সুতরাং এ সম্পর্কে আমরা কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করব।

১৮০১ সালে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ২০টি সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল এবং মুসলমানদের মাত্র একটি আরবী ফার্সী বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল।[৩] বুকানন দিনাজপুর ও মালদহের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, মক্তবের সংখ্যা খুবই নগন্য ছিল। দিনাজপুরে ২২টি থানার মধ্যে ১৩টিতে ১১৯টি প্রাইমারী বাংলা স্কুল (তথা সংস্কৃত স্কুল) ৯টি পার্সীয়ান স্কুল ছিল। অথচ ৯টি মহকুমাতে কোন প্রাইমারী স্কুল (মক্তব) ছিল না।[৪] রংপুর যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী ছিল, বুকানন সে সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, এখানকার শিক্ষা ক্ষেত্রে দিনাজপুরের চেয়েও অবহেলিত ছিল। পাবলিক স্কুল বলে সেখানে কিছু ছিলনা এবং এ জেলাতে হয়ত একজন লোকও খুজে বের করা যাবে না যে,

---

১. জে,লং এডামস থার্ড রিপোর্ট, পৃঃ১১১-১১৬, ৪৮, ৭৩, ২১৫, ৩২৭। উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬।
২. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫২-৫৩, ১৬৪।
৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ১১৭।
৪. বুকানন, ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭১০, উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৬-১৮৫৭), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

কেরানী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।[১] তবে ডঃরহিম উল্লেখ করেছেন যে, ১৮২৩ সালে রংপুর জেলায় ২টি ফার্সী বিদ্যালয় ছিল। দিনাজপুর জেলায় মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোন ফার্সী বিদ্যালয় ছিল না। হিন্দুদের অনেকগুলি বিদ্যালয় ছিল।[২]

ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ব বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত জেলাসমূহে শিক্ষার মান খুবই হতাশা ব্যঞ্জক ছিল। সাধারন সংসদের জনসংযোগ বিভাগ ১৮২৩ সালে এক অনুসন্ধান জরীপে অবহিত হন যে, ত্রিপুরা জেলায় (বর্তমান কুমিল্লার অন্তর্গত) শিক্ষার জন্য কোন মুনজুরী ছিল না। স্কুলের জন্য সাধারন কোন তহবিলও ছিল ন। এডাম ১৮৩৫ সালে এ ব্যাপারে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। ১৮৯১ সালে এর বিবরণের অনুসারে ময়মনসিংহ জেলাতে ৫জন মুসলমানের স্থানে মাত্র ২জন হিন্দু ছিল। বুকানন প্রত্যক্ষ করেন যে, মুসলমানদের জন্য এখানে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। অথচ হিন্দুদের ৫০ হতে ৬০টি স্কুল ছিল। মুসলিম অধ্যুষিত ময়মনসিংহ জেলায় মুসলমানদের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না দেখে এডাম ১৮৩৫ সালে অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হয়েছিলেন।[৩] অথচ ময়মনসিংহ জেলার শিক্ষা প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে এফ,এ সাকসী উল্লেখ করেছেন যে, (এখানকার) অধিকাংশ মক্তব ও মাদ্রাসা গ্রামের বিত্তশালী, ধনী ও মাতাব্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম হতে আগত অর্ধ শিক্ষিত ওস্তাদগণ এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতেন। এসব শিক্ষক নির্দিষ্ট হারে কোন বেতন পেতেন না। সাধারনত নিয়োগকারীর বাড়ীতেই তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হত। মক্তবে প্রধানত কুরআন পাঠ শিক্ষা দেয়া হত। ধর্মীয় বিষয়ে উর্দু ও ফার্সীর সহজ পাঠের ও ব্যবস্থা ছিল।[৪] অর্থাৎ সাকসীর বিবরণ হতে বুঝা গেল যে, মুসলিম শাসনামলে ময়মনসিংহ জেলায় প্রচুর মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বৃটিশদের পক্ষপাত মূলক আচরণ এবং অর্থনৈতিক চরম সংকটের কারণে এসব মক্তব, মাদ্রাসা বিলুপ্ত হয়ে যায়। যারফলে এডাম ১৮৩৫ সালে ময়মনসিংহ জেলায় কোন মাদ্রাসা মক্তব না দেখে অবাক হয়ে ছিলেন। কিন্তু অবাক হলেও ইহাই ছিল তখন চরম সত্য ও বাস্তবতা।

---

১. এডামস ১ম রিপোর্ট, পৃঃ১০২। উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৭৬-৭৭।
২. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭।
৩. এডামস ১ম রিপোর্ট, পৃঃ৪৪, ৪৯, ৯০। উদ্ধৃত, বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৬-১৮৫৭), পূর্বোক্ত, পৃঃ১৭৮-৭৯।
৪. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৫৮

Dhaka University Institutional Repository

১৮০১ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, চট্টগ্রামে ২ জন হিন্দুর স্থানে ৩ জন মুসলমান বাস করত। এখানে অবশ্য ১৮২৭ সালে মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারী মন্জুরী প্রাপ্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এ্যাডাম মনে করেন যে, এখানে হয়ত আরো প্রতিষ্ঠান ছিল। এ্যাডাম ঢাকা সম্পর্কে সরকারের দলিল দাস্তাবেজ ও কাগজপত্র দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হন যে, এখানে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যতা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কোন স্কুলের নজীর নেই বা কোন ব্যবস্থা নেই।[১] জেমস টেলর উল্লেখ করেন যে, ১৮৩৮ সালে শহরে মুসলমানদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৯টির মত। এতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১১৫ জন। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, এগুলির সবই পারিবারিক বিদ্যালয়। কয়েকজন ধনী ব্যক্তি কর্তৃক শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা হত। পার্শ্ববর্তী ছেলে মেয়েদের বিনা মূল্যে শিক্ষা দেয়া হত। তবে হিন্দু ও মিশনারী বিদ্যালয় ছিল অনেক।[২] অর্থাৎ ঢাকা শহরে তখন মুসলমানদের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় ছিল না। শুধুমাত্র ব্যক্তি উদ্যোগে কয়েকটি পারিবারিক বিদ্যালয় ছিল। তাই এসব স্কুল বা পারিবারিক বিদ্যালয় সরকারী নথিভুক্ত হয়নি। এডাম তাই অবাক হয়েছিলেন মুসলমানদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় না দেখে। তবে আর্থিক অনটনে উক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যাও হ্রাস পায় ও ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাখরগঞ্জ জেলার মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থাও খুব একটা উৎসাহজনক ছিলনা। যদিও এখানে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল বেশী। ১৮২৩ সালে কালেক্টর জানিয়েছেন উক্ত জেলার শিক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারী কোন অনুদান মন্জুরী তহবিল ছিল না।[৩] হেমিলটন উল্লেখ করেন যে, তিনি ঢাকা, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা) নোয়াখালী, বাখেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ নদীয়া প্রভৃতি জেলায় উল্লেখযোগ্য আরবী, ফার্সী বিদ্যালয় দেখতে পাননি। তিনি ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় হিন্দুদের অনেকগুলি বিদ্যালয় দেখতে পান।[৪] অতএব উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হতে বুঝা গেল যে, মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশ মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল, কিন্তু বৃটিশদের নীতি, অবহেলা ও মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারনে শিক্ষার বিপর্যয় শুরু হয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ভেংগে পড়ে।

---

১. এডামস ১ম রিপোর্ট, পৃঃ৮৬, ৮৮, ৮২। উদ্ধৃত, বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান, (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৯।

২. জেমস টেলর, 'কোম্পানী আমলে ঢাকা', অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করন (ঢাকা ১৯৭৮), পৃঃ২১৪।

৩. এডামস ১ম রিপোর্ট পৃঃ৪৩-৪৪, উদ্ধৃত বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ১৭৯।

৪. জে, লং, এডামস রিপোর্ট, পৃঃ১১১, ১১৬, ৪৮, ৭৩, ২১৫, ৩২৭, উদ্ধৃত, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) পৃঃ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া আমরা এডামের নাটোরের উপর জরীপকৃত ২য় রিপোর্ট হতেও মুসলমানদের শিক্ষার অবনতি সম্পর্কে প্রমান পাই । এ রিপোর্টটি এখানকার মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট ও পরিষ্কার ধারনা দিয়েছে এবং এর চিত্র অত্যন্ত বেদনাদায়ক । নাটোরে তখন ৪৮৫টি গ্রাম ছিল । হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৬,৫৬,৫৫৪ জন এবং মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১২,৯৬,৪০১ জন । উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বেশী থাকা সত্ত্বেও আনুপাতিক হারে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল হিন্দুদের তুলনায় খুবই নগন্য । নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানে তা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে । যেমন স্বদেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় হিন্দুদের জন্য ছিল ১১টি এবং মুসলমানদের জন্য ১৬টি । স্বদেশীয় উচ্চ বিদ্যালয় ছিল হিন্দুদের জন্য ৩৮টি কিন্তু মুসলমানদের জন্য কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না । মাতা পিতা অথবা বন্ধু বান্ধবদের কাছ হতে গৃহ শিক্ষা হিন্দুদের জন্য ছিল ১২৭৭টি এবং মুসলমানদের জন্য ৩১১টি[১] । প্রথম পর্যায়ের স্কুলে (সর্বমোট ২৭টি) ২৬২ জন ছাত্রের মধ্যে ৭১ জন ছাত্র মুসলিম শিক্ষকদের অধীনে শিক্ষা গ্রহন করত । (এর মধ্যেও সন্দেহ ছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকের নিকট ফার্সী অধ্যয়ন করত ।) এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৯১ জন । দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা হল ৩৯৭ জন[২] । সেখানে একজন মুসলমান ছাত্রও ছিল না । কাজেই দেখা যাচ্ছে এই দুই শ্রেণীর স্কুলের মধ্যে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল মোট ৫৮৮ জন এবং মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা মাত্র ৭১ জন ।

এ্যাডামের টেবল (ছক) অনুযায়ী বলা যায় যে, প্রতিবারে শতকরা দেড়জন শিশুকে গৃহ শিক্ষা দেয়া হত, আর যারা স্কুলে যেত, তাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৯১৬ জন এবং

----

১. এডাম ২য় রিপোর্ট,সামারি অব টেবলস,একস্ট্রা টেবল-১,কলাম ৬,৭,৮ পৃঃ
উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ১৮৭। তবে সৈয়দ নরুল্লাহ তাঁর গ্রন্থে এ সমপর্কে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নাটোর থানায় তখন মোট জনসংখ্যা ছিল ১৯৫২৯৬ জন,তন্মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ১২৯৬৪০ জন এবং হিন্দুদের সংখ্যা ৬৫৬৫৬ জন । গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪৮৫টি । এডাম সেখানে মোট ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখতে পান যার ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৬২ জন । এর মধ্যে বাঙালী হিন্দু স্কুল ছিল ১০টি যার ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬৭ জন । ৪টি পার্শিয়ান স্কুল, যার ছাত্র সংখ্যা ২৩ জন, আরবী স্কুল ১১টি ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪২ জন এবং ২টি হিন্দু ও পার্শিয়ান স্কুল যার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩০ জন ।
সৈয়দ নরুল্লাহ এবং জে,পি,নায়েক,এ স্টুডেনটস হিস্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, ৫ম সংস্করণ বোম্বে,কলিকাতা,মাদ্রাজ লন্ডন, ১৯৬৪, পৃঃ ১৫ ।

২. এডাম ২য় রিপোর্টটেবল ,৩,কলাম ৪, পৃঃ ,উদ্ধৃত,বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ১৮০ । শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৫৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৬৭ জন । যে অঞ্চলে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের আনুপাতিক হিসাব ২:১ জন সেখানে গৃহ শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু শিশুর সঙ্গে মুসলিম শিশুর আনুপাতিক হিসাব হল ৪:১ জন এবং স্কুলের হিসাব হল ৮ জন হিন্দুর স্থানে মাত্র একজন মুসলমান ।[১] এডামের বিবরণী হতে বুঝা যায় যে, নাটোরে জনসংখ্যায় মুসলমান সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও সেখানে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তাদের শিক্ষার হার হিন্দুদের তুলনায় খুবই নগন্য ছিল । কিন্তু মুসলিম শাসনামলে এরূপ ছিল না । বৃটিশ শাসনামলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিতের হার কম হওয়ার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং আর্থিক অবস্থা অভাব অনটন ইত্যাদি । উপরোক্ত কারণে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকাতে পারেনি। এভাবে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম দুর্যোগ নেমে আসে । আর এ অবস্থা তখন সমগ্র বাংলাদেশে বিরাজমান ছিল । কাজেই সরকারী আর্থিক সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা ও দুর্যোগের ফলে বাংলাদেশে মুসলিম ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিতের হার আশংকাজনকভাবে কমে যায় । এ্যাডাম বাংলাদেশে মুসলমানদের শিক্ষার এরূপ করুন অবস্থা অবলোকন করে অনুধাবন করেন যে, মুসলমানদের উপর শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা ইংরেজীকে চাপিয়ে না দিয়ে আরবী, ফার্সী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া যায় তাহলে এর কিছুটা উন্নতি হতে পারে । কেননা মুসলমানরা ইংরেজীকে মনে প্রাণে তখনো গ্রহণ করতে পারেনি । তাই শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা মুসলমানদের জন্য ঠিক হবেনা । তিনি তাই পল্লী স্কুল সমূহের উন্নতির জন্য কিছু প্রস্তাব করেন ।

এ্যাডাম অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, বাংলা ও বিহারের মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষার পরিবর্তে একমাত্র ফার্সী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা যায় । কিন্তু ফার্সী ভাষার অবস্থা তখন দুদোলামান । কারণ ফার্সী বাঙালী মুসলমানদের মৌখিক ভাষা ছিল না । তিনি লক্ষ্য করেন যে, বাংলার পল্লীর মুসলিম জনসাধারনকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে এবং বিহারে হিন্দির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যায় । অবশ্য তিনি ইহাও লক্ষ্য করেন যে, এ ব্যবস্থায় উর্দু ভাষীদের অসুবিধা হবে । তাদের জন্য তিনি উর্দু ভাষায় স্বতন্ত্র পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । এ্যাডাম উল্লেখ করেন যে, মুসলিম স্কুলগুলি বিশেষ করে আরবী স্কুলের উন্নতির জন্য এ ব্যবস্থা বিশেষভাবে

---

১. এ্যাডাম ২য় রিপোর্ট পৃ:৩৩, ৩৬ । উদ্বৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃ:১৮০-৮১ ।

Dhaka University Institutional Repository

উপকারে আসবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, দেশের সুশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবহেলা করা চলবে না। ইউরোপীয় জ্ঞান মিশ্রিত আরবী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। ছাত্রদের জন্য সাধারণ পরীক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে, তাহলেই ইউরোপীয় আদর্শে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে।[১]

জনশিক্ষা বিভাগের সাধারণ সংসদ ১৮৩৮ সালে এ্যাডামের রিপোর্ট বিবেচনা করেন। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা করলেন না কমিটি। কিন্তু বাংলা এবং বিহারের শিক্ষার প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটানোর জন্য পুরানো প্রচলিত দেশীয় স্কুল গুলির সংস্কার সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সিদ্ধান্ত সরকার মঞ্জুরকৃত কমিটির নীতি বহির্ভূত। এ্যাডামের প্রস্তাবিত পল্লী স্কুলের উন্নতি বিধান করা কমিটির ক্ষমতার বাইরে বলে অভিহিত হয় এবং এতে যে ব্যয় হবে তাও কমিটি বহন করার অপারগতা প্রকাশ করে। কমিটির অভিমত হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা। তাতে তাদের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি হবে। ফলে গ্রামাঞ্চলের সাধারন মানুষ যারা সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ উপকার পেলনা, তারও উপকৃত হবে।[২]

১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ সরকারী শিক্ষা পরিচালনা সংস্থা কাউন্সিল অব এডুকেশনকে বাদ দিয়ে স্বয়ং সরকারের রেভিনিউ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী তিনি সমগ্র বাংলাদেশে ১০১টি মাতৃভাষা স্কুল (ভার্নাকুলার) প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। এসব বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে একই ছাঁচে, লিখন, পঠন, গনিত, ভূগোল এবং ভারতের ইতিহাস শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[৩] বোর্ড ১৮৪৭ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রথম রিপোর্ট প্রদান করেন। তাতে দেখা যায় ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, যশোর, পাটনা, ভাগলপুর এবং কটক প্রভৃতি অঞ্চল মিলে মাত্র ৩৪টি

---

১. এ্যাডাম, তৃতীয় রিপোর্ট পৃঃ২১৫-১৬। উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, (১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ৩২২-২৩।
২. ইন্ডিয়া পাবলিকেশনস, ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৩৮ নং ১৮, অনুচ্ছেদ-৯। উদ্ধৃত, বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৭।
৩. শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৫। আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়। এতে ছাত্র সংখ্যা ৯৯৯ জন ছিল। বোর্ডের দ্বিতীয় রিপোর্টে দেখা যায় যে, ৬৪টি স্কুল চলছে এবং তাতে গড়ে ছাত্র সংখ্যা ১৭৩০ জন। মাতৃভাষা স্কুলের কৃত কার্যকারীতার সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নৈরাশ্যজনক অভিমত প্রকাশ করেন। বোর্ডের ধারণা যে, যে অনুপাতে আশা করা হয়েছিল, ঠিক সে অনুপাতে সাফল্য হয়নি এবং সফলতার সে রকম ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। ১৮৪৭ সালের শেষের দিকে স্কুলের সর্বমোট সংখ্যা হল ৬২টি এবং তাতে গড়ে প্রতিদিনের উপস্থিতি ১৯৮৩ জন (কটকের ১০টি স্কুলের ২৮৩ জনসহ)। সুতরাং পরিকল্পনার সাফল্য খুব উৎসাহ ব্যাঞ্জক নয়। পরবর্তী রিপোর্টে আরো নিরুৎসাহজনক ছিল স্কুলের সংখ্যা ৫১তে নেমে যায়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট ও হতাশাজনক ছিল। এসব রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করে বোর্ড বর্ণনা করেন যে, এ সমস্ত স্কুলের ভাগ্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের সাফল্য আশা করা যায় না।[১]

১৮৪৯ সালের রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, বছরের শুরুতে ৫৮টি মাতৃভাষার স্কুলের মধ্যে ১৫টি বন্ধ করে দেয়া হয়। বাকী খোলা থাকে ৪৩টি। ১৮৫০ সালের রিপোর্টে দেখা গেল ৪৩টি স্কুলের মধ্যে ৭টি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ১৮৫১ সালের মে মাস পর্যন্ত স্কুলের সংখ্যা দাড়াল ৩৬টিতে। ১৮৫৪-৫৫ সালের রিপোর্ট এ দেখা গেল যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ যে সমস্ত মাতৃভাষা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেগুলি সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে।[২] কাজেই অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হল যে, এই মাতৃভাষা বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার দশ বছরের মধ্যেই কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে ২৬টি স্কুল ব্যতীত বাকী সব বিদ্যালয়গুলি স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।[৩] বাংলা ও বিহারে পল্লীর জনগনের শিক্ষাদানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

১৮৫৬-৫৭ সালের রিপোর্টে যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বাংলার সর্বমোট ৫৩১৩ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৬১২ জন হিন্দু এবং মাত্র ৬৮১ জন মুসলমান ও ২ জন খৃষ্টান।[৪] বাংলা ও বিহারে মুসলিম

---

১. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত পৃঃ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৮।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪০, ৩৪১।
৩. শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪০। আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৯।
৪. জি,আর,পি,আই তে উদ্ধৃত, ডি,পি,আই,এর চিঠি ১৮৫৬-৫৭, পৃঃ৩,৫। উদ্ধৃত, বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

দেশীয় স্কুলগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষা মাতৃভাষাতে হয়নি, বরং আরবী, ফার্সীর মাধ্যমে হয়েছে। চট্টগ্রামের কালেক্টর তার ১৮৪৫ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, জেলার ১৩৭২টি স্বদেশী স্কুলের ২৩৩৭৫ জন ছাত্রের মধ্যে অর্ধেকের বেশী ছিল মুসলমান ছাত্রদেরকে আরবী ও ফার্সী শিক্ষা দেয়া হত। কুরআন ও পাঠের অর্ন্তভুক্ত ছিল।[১] সুতরাং সরকারী মাতৃভাষা স্কুল কিংবা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বেসরকারী স্কুল মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য শিক্ষা দিতে পারেনি। এ কারণে উক্ত স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং এডামের রিপোর্টে একথাই পরিস্কার হয়ে ফুটে উঠেছে যে, এদেশীয় মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রায় ধ্বংশ হয়ে যায়। এ সময় বিত্তশালী মুসলমানদের সংখ্যা এত নগন্য এবং তাদের আর্থিক অবস্থা এত দুর্বল ছিল যে আর্থিক সাহায্য দিয়ে এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখার সামর্থ তাদের ছিলনা। অপরদিকে ১৮৫৪ সালে মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তবের সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দিলে মুসলমানদের শিক্ষার শেষ সুযোগটুকুও বিনষ্ট হয়ে যায়।[২] এমতাবস্থায় মুসলমানদের চরম দারিদ্র্যতা, রাজনৈতিক সংকট ইত্যাদি কারণে তাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাড়ায়। সরকারী অবহেলা, দুরভিসন্ধি এবং মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তবগুলি সরকারী আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার ফলে মুসলমানদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থা আরো অবনতি ঘটে। কিন্তু সাধারন মুসলমানরা তাদের যতটুকু সামর্থ ছিল ততটুকু দিয়েই ধর্মীয় শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখার আপ্রান চেষ্টা করেছে।

অতপর দীর্ঘ দিন পর ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৮৮৯ সালে মুসলিম শিক্ষার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকার দুজন সহকারী স্কুল ইনসপেক্টর নিয়োগ করেন। এদের দায়িত্ব ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকুলে মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করা এবং মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি তথা মুসলিম বিদ্যালয়ের স্বার্থ ও ছাত্রদের স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখা। তাছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত মাদ্রাসাগুলিতে অংক, ভূগোল, এবং দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এদের একটি

---

১. বেঙ্গল এডুকেশনস, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৭ নং ১৭। উদ্ধৃত, বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৩।

২. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার পটুয়াখালী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭২। মোহাম্মদ আব্দুল কদ্দুস, কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, পৃঃ ৪০৫। উদ্ধৃত, বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর রাজশাহী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

রিপোর্টের ফলে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যে সব মক্তব ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে ভূগোল অংক এবং দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবে তাদেরকে সরকারী অনুমোদন দিবেন। অল্পদিন পরেই প্রদেশের মক্তবগুলিকে বিশেষ অর্থ মন্জুরী প্রদান করা হয়।[১]

আলফ্রেড এ্যাকফ্ট ১৮৯১ সালের ২৫শে জুলাই ৯৮ নং এক সারকুলার প্রকাশ করেন যাতে তিনি স্বীকৃতি প্রাপ্ত মক্তব সম্পর্কে প্রস্তাব রাখেন যে, যে সমস্ত মক্তব ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে ধর্ম নিরপেক্ষ তথা অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি এবং দেশীয় শিক্ষা পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে, সে সমস্ত মক্তবে অনুদান ও বৃত্তি প্রদান করা হবে। তবে এ থেকে খাটি কুরআন স্কুলকে বাদ দেয়া হয়।[২] আলফ্রেড এ্যাক্রফ্ট মক্তবগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-(ক) প্রথম প্রকারের মক্তবের শিক্ষা হল, যেখানে কুরআন এর সংযোজন, ইসলামের আধ্যাত্ম ও ধর্মতত্ত্ব উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। (খ) দ্বিতীয় প্রকারের মক্তব যেখানে উর্দু অথবা ফার্সী অথবা উভয়ই ভাষায় শিক্ষা দেয়া হয়। কুরআন ও ধর্মতত্ত্বসহ অথবা উহা ব্যতীত এবং প্রাথমিক মানের বাংলা ও এ্যারিতমাটিক শিক্ষা দেয়া হয়। (গ) তৃতীয় প্রকারের মক্তব হল এখানে নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বিভাগীয় মানের এবং যেখানে দেশীয় ভাষা এবং উর্দু অথবা ফার্সী অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেয়া হয়।[৩] এ থেকে বুঝা যায় যে, মক্তবের শিক্ষার সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষার শর্ত জুড়ে দেয়ার পিছনে সরকারের এক বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে। কেননা শর্তারোপ করা হয় যে, যে মক্তব পাশ্চাত্য শিক্ষা দিবে কেবল সেই মক্তবেই সরকারী মন্জুরী প্রদান করা হবে। অন্যথায় সাহায্য দেয়া হবেনা। মক্তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটানো অর্থ মক্তবের খাটি ধর্মীয় শিক্ষার ঐতিহ্য ও বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করা এবং সরকারী সাহায্যের নামে মক্তবকে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণে এনে ধর্মীয় শিক্ষাকে উঠিয়ে দেয়া। এভাবে সরকার মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য মক্তব মাদ্রাসাতে সাহায্যের আশ্বাস দেন এবং মন্জুরীও প্রদান করেন।

---

১. বাংলাদেশ মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৬। মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ৫৩।

২. ডঃ এ,কে,এম,আইয়ুব আলী, "হিস্ট্রি অব ট্র্যাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ", (ডাউন টু ১৯৮০) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ঢাকা ১৯৮৩) ১ম প্রকাশ, পৃঃ৭৮। রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩।

৩. আর,পি,আই, ইন বেঙ্গল ১৮৯০-৯১, পৃঃ৯৩ উদ্ধৃত সুফিয়া আহমেদ, "মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল" (১৮৮৪-১৯১২) (ঢাকা ১৯৭৪) ১ম প্রকাশ পৃঃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু তাই নয় স্যার আলফ্রেড ক্রফট মক্তবের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক ও ইন্সপেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। প্রতি টি স্কুলে মুসলিম ছাত্রদের জন্য কয়েকটি অবৈতনিক আসনের ব্যবস্থা করা হয় এবং শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মুসলমান ছাত্রদের জন্য অনেকগুলি বৃত্তি প্রদানের ও ব্যবস্থা করা হয়। এই বৃত্তি মুহসিন ফান্ডে এবং সরকারী তহবিল হতে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মুহসিন ফান্ড হতে প্রদত্ত বৃত্তি যেমন আরবী বিভাগের জন্য ৪৪টি বৃত্তি, প্রতিটির পরিমান ৩ হতে ৭ টাকা। ইংরেজীর স্কুলের জন্য দুই বছর মেয়াদী ৩৪টি বৃত্তি। জুনিয়র বৃত্তি ৮টি তথা এন্ট্রান্স পাশ করার পর দুই বছর ব্যাপী। এফ,এ পাশ করার পর দুই বছর মেয়াদী সিনিয়র বৃত্তি ৫টি। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ২টি। সরকারী বৃত্তি হল যেমন ৭টাকা হিসাবে জুনিয়র বৃত্তি ২০টি, ১০ টাকা হিসেবে সিনিয়র বৃত্তি ১০টি। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি ৩টি ইত্যাদি।[১] উপরোক্ত ব্যবস্থাদি ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের পর ক্রমশ মুসলিম ছাত্ররা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এবং অসংখ্য ছাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। ক্রমানুয়ে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনেকেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং একে একটি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করে।[২] তবে সামগ্রিকভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের বিরূপ মনোভাব থেকেই যায়। তাই এত ষড়যন্ত্রেও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মক্তব মাদ্রাসা ধ্বংস হয়ে যায়নি। মুসলমানদের অসীম সাহস ধৈর্য্য ও প্রচেষ্টায় মক্তব মাদ্রাসা ও ধর্ম শিক্ষা টিকে যায় এবং আজও টিকে আছে।

তাই এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বৃটিশ সরকারের ধর্মীয় শিক্ষা অবলুপ্তির প্রচেষ্টার পরেও দেশে প্রচুর ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা কুরআন স্কুল ও ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। যেমন বিভিন্ন সনের এক হিসাব দেখা যায় যে, ১৮৯১-৯২ সালে দেশে কুরআন স্কুল ছিল ৭০,৩৬০টি, প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ২৩,৩৮০টি, সর্বমোট ৯৩,৬৪০টি। ১৮৯৬-৯৭ সালে কুরআন স্কুল ছিল ৫৯,৭৯০ টি, প্রাইভেট বিদ্যালয় ছিল ১৯.৬৭৫টি, সর্বমোট ৭৯,৪৬৫টি। ১৯০১-০২ সালে কুরআন স্কুল ছিল ৫৩,০৯৯টি, প্রাইভেট বিদ্যালয় ২১,৭৩৬টি

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ২০০। বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ২০০। রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭২-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

মোট ৭৪,৮৩৫টি ।[১] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শত চেষ্টা করেও মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষাকে তথা প্রাথমিক শিক্ষাকে ধ্বংশ করা যায়নি । নিম্নের একটি ছকের মাধ্যমে আমরা মুসলমানদের বাস্তব শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবো ।

সন	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র সংখ্যা	অন্যান্য ছাত্রদের সাথে মুসলিম ছাত্রদের শতকরা হার ।
১৮৮১-৮২	২,১৭,২১৬ জন	২৪.৬%
১৮৮৬-৮৭	৩,০৮,৫০০ "	২৮.৫ জন
১৮৯১-৯২	৩,২৪,১৭২ "	২৭.৬ "
১৮৯৬-৯৭	৩,৬২,৩২৮ "	২৭.৭ "
১৯০১-০২	৩,৪৬,৭৬৪ "	২৭.৪ "[২]

অপর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে স্বীকৃতি প্রাপ্ত মক্তবের সংখ্যা ১৯০৭-০৮ সালে ছিল ১৬৪৬টি, অস্বীকৃতি প্রাপ্ত মক্তব ছিল ৭৯৮ টি মোট মক্তবের সংখ্যা ছিল ২৪৪৪টি, এতে সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫০,৪০২ জন । ১৯১১-১২ সালে স্বীকৃতি প্রাপ্ত মক্তব ছিল ৩৬৯৫ টি, অস্বীকৃতি প্রাপ্ত ৮৫১টি, সর্বমোট ৪৫৩৬টি এবং এতে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১২৭৮৫ জন ।[৩] এ থেকে বুঝা যায় যে, বৃটিশ সরকারের মুসলমানদের ধর্ম শিক্ষা ধ্বংশের চক্রান্ত, অর্থনৈতিক অবস্থার চরম দুর্গতি ও বিপর্যয় এবং দারিদ্র্যতা ও অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা প্রচুর মক্তব ও কুরানিক স্কুলগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ও নতুন নতুন অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল । কোনভাবেই এদেশ হতে ধর্মীয় শিক্ষাকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে দেয়নি । কাজেই দেখা যাচ্ছে বৃটিশদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যজনিত কারন, মুসলিম বিদেষী মনোভাব, মুসলিম শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা, সর্বোপরি মুসলমানদের আর্থিক অসচ্ছলতা ও দৈনতা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যবাহী মক্তব, মাদ্রাসা, খানকা ও মসজিদ কেন্দ্রিক

---

১. রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল(১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড , পূর্বোক্ত, পৃ:৭৪ । হিস্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ পূর্বোক্ত, পৃ:৭৮ ।

২. রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল(১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৪ ।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পারিবারিক স্কুল ইত্যাদি বৃটিশদের কোপ দৃষ্টিতে পরে ধ্বংশ হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী তা সত্তেও মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা একেবারে বিলুপ্ত করতে পারেনি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও একেবারে বন্ধ হয় যায়নি। মুসলমানদের ধর্মের প্রতি একান্ত বিশ্বাস, শিক্ষার প্রতি অদম্য আগ্রহ শিক্ষা হতে বিমুখ করতে পারেনি। তাই তারা আর্থিক সংকট, দুঃখ দুর্দশা ও শত বাধা বিঘ্ন থাকা সত্তে ও ধর্মীয় শিক্ষাকে টিকিয়ে রেখেছে। এ অবস্থায় সারা দেশের মুসলমানদের মধ্যে আরবী শিক্ষার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। তাই দরিদ্র জনসাধারনের দানে, সাহায্য সহযোগীতায় গ্রামে গ্রামে মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তাছাড়া বড় বড় আলেম, পীর দরবেশগণ ও তাদের ব্যক্তি উদ্যোগে মক্তব প্রতিষ্ঠা করতে থাকে এবং পাশা পাশি মসজিদ ও খানকাতেও ধর্ম শিক্ষার চর্চা চালিয়ে যেতে থাকে।

এভাবে বৃটিশ শাসনামলে দঃখ দৈর্দশা বাধা বিঘ্নের মাঝেও শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে অতি উৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী মুসলমানেরা মুসলিম ধর্ম শিক্ষাকে মুসলিম শাসনামলের মত না হলেও ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছিল এবং বিশেষ করে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান অত্যন্ত ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের মাধ্যমে টিকিয়ে রেখেছিল। যদি সচেতন মুসলিম সমাজ ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে না আসত, শত প্রতি-কুলতার মাঝে ধর্মীয় শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা না করত তাহলে হয়ত বৃটিশদের চক্রান্তে বাংলাদেশ হতে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে যেত। তাই সাহসী, ত্যাগী ও পরিশ্রমী মুসলমানদের সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহনে, অশুভ শক্তির এহেন প্রচেষ্টা ও দূরভীসন্ধি নস্যাৎ হয়ে যায় এবং ধর্মীয় শিক্ষা শত প্রতিকুলতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েই টিকে যায়।

অপরদিকে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ ও বৃটিশদের চক্রান্তে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। কেননা অধিকাংশ উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ সরকারী, বেসরকারী নিস্কর ভূমির উপর নির্ভর করেই চলত। যখন বৃটিশ সরকার নিস্করভূমি বাজেয়াপ্ত আইন প্রনয়ন করে তখন এসব নিস্কর ভূমি সরকারী হাতে চলে যায়। এতেশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মারাত্মক আর্থিক সংকটে পতিত হয়। অন্য দিকে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তাই তারাও আর্থিকভাবে এসব পতিষ্ঠানের কোন সহযোগীতা করতে পারেনি। এভাবে বৃটিশ সরকার পরোক্ষভাবে মুসলমানদের উচ্চ ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ বন্ধ করে দেয়। এরফলে মুসলমানরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অপারগ হয়ে পড়ে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আশংকা জনকভাবে পিছিয়ে পড়ে। মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা যখন এমনি ধ্বংশের মুখোমুখী এবং এডামের রিপোর্টে যখন মুসলমানদের শিক্ষার এরূপ মারাত্মক অসহায় চিত্রফুটে উঠে, তখন বৃটিশ সরকার মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি ফেরান এবং কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) বাংলাদেশে মুসলিম উচ্চ শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষা ও বৃটিশ সরকারের নীতি

প্রত্যেক শিক্ষা ব্যবস্থা তার একটা নিজস্ব ঐতিহাসিক ধারায় যেমন অগ্রসর হয়, তেমনি আমাদের মাদ্রাসা তথা ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ও রয়েছে ক্রম বিকাশের এক সুদীর্ঘ ধারা ও ঐতিহ্য। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় মুসলিম শাসনামলের শিক্ষার বিবর্তনের একটা স্বাভাবিক উত্তরাধিকার।[১] মুসলিম শাসনামল হতেই বাংলাদেশের মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজকেন্দ্রিক ছিল। সমাজের বিত্তশালী, অভিজাত, ধনী, জমিদার ও নবাব, সুবাদারগণ মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে কিংবা নিজ নিজ বাড়ীতে বা বাড়ী সংলগ্ন স্থানে মাদ্রাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠা করতেন। এ ছাড়া প্রত্যেক মসজিদ, খানকা ও ইমামবাড়ায় মাদ্রাসা, মক্তব সংশ্লিষ্ট ছিল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম সন্তানদের বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য। আলেম, সুফী, দরবেশ, উস্তাদগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে শিক্ষাদানের মত এই মহান দায়িত্ব পালন করতেন। তাই সমগ্র মুসলিম শাসনামল মুসলিম শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের পর বৃটিশ কোম্পানীর নীতি ও অবহেলার কারনে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

কেননা ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাংলার দিউয়ানী বা রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা চলে যাবার পর বাংলার মুসলমানদের অর্থ উপার্জনের পথ সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ তা বন্ধ হয়ে যায়। এতে বিদ্যালয় কিংবা বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, ইত্যাদি স্থাপন এবং পরিচালনার আর্থিক ক্ষমতাও সহযোগীতা মুসলমানদের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।[২] এরফলে আর্থিক সংকটে পড়ে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রায় ধ্বংশ হয়ে যায়।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, তার শাসনামলের প্রথম দিক হতেই ভারতবাসীর তথা বাঙালীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কোন দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনুভব করেনি। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে

---

১. আত্তাওহীদ, ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক. অধ্যাপক মহাম্মদ রশীদ. ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (ঢাকা ১৯৭৮) পৃঃ ২১।

২. মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল অধিক মুনাফা । তাই তারা ভাবত মূর্খ দেশবাসীকে স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করাই হল লাভ জনক । প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়া মোটেই লাভজনক নয় ।[১] তাদের এ হীনমন্যতা, অবহেলা এবং শাসন ও শোষন নীতির কারনে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয় । তারা শুধু মুনাফার লোভে এদেশ বাসীকে শোষন করে সম্পদের পাহাড় গড়েছে । তাই অসহায়, নির্যাতিত মানুষের শিক্ষা দিবার বা শিক্ষা বিস্তারের দিকে তাদের দৃষ্টি দিবার সময় কোথায় ।

বৃটিশ কোম্পানীর এই উদাসীনতার পিছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ছিল বলে মনে হয় । এ ব্যাপারে ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষের মনোভাব প্রথম উপলব্ধি করা যায় ১৭৯০ সালে । এ সম্পর্কে একজন ডিরেক্টর উল্লেখ করেছিলেন যে, ইংল্যান্ড তাদের ভুলের জন্যই আমেরিকা হারিয়েছিল । তাদের ভুল ছিল, সেখানে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করা । ভারত প্রসংগেও যেন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে ।[২] অর্থাৎ তারা মনে করে যে, ভুল করে আমেরিকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে শিক্ষিত করার ফলে তাদের আমেরিকাকে হারাতে হয়েছে । তাই সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে জন্য বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারত বর্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সেই ভুল যেন না করা হয় এবং আমেরিকার মত এদেশকেও হারাতে না হয় । এ থেকে বুঝা যায় যে, বৃটিশরা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে এদেশের মানুষদের শিক্ষা হতে বঞ্চিত করেছে এবং পুরানো প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষার দ্বারকে রুদ্ধ করে দিয়েছে । শুধু তাই নয় এ দেশের মানুষের চিন্তা চেতনার ধারাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার জন্য মিশনারীদেরও ব্যবহার করা হয়েছে ।

১৭৬৫ সালে যদিও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের শাসন ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত খৃষ্টান ধর্মের প্রচারনা ও এ দেশে খৃষ্টানদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা মিশনারীদের সরাসরি সহায়তা ও সহযোগীতা করে আসছিল । কিন্তু শাসন ক্ষমতা লাভের পর হতে এ দেশে মিশনারীদের শিক্ষা

---

১. এস, মাহমুদ, হিস্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ২ । উদ্ধৃত, বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান, (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৬ ।

২. জন ক্লার্ক, মার্সম্যান ১১ই জুন, ১৮৫৩ উদ্ধৃত, এস, মাহমুদ, হিস্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ ২ উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারের প্রচেষ্টার প্রতি কোম্পানীর মনোভাব অনেকটা পরিবর্তন হয়। ফলে একদিক দিয়ে মিশনারীদের যেমন ধর্মীয় কার্যকলাপ ও প্রচারনা বাধা প্রাপ্ত হয়, অপরদিকে এদেশবাসীর প্রতি কোম্পানীর কিছুটা হলেও সহানুভূতি জাগরিত হয়। এমতাবস্থায় এদেশীয় মুসলিম ও হিন্দু আইন কানুন জ্ঞান দান সম্পর্কে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।[১] তাই কোম্পানীর ক্ষমতা গ্রহনের পর হতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমশ নতুন ভাবধারা অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে এবং এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন হতে থাকে। কেননা উপনিবেশ সরকারকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এ দেশের অধিবাসীদের জন্য এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রথমে তারা শহর এলাকায় ইংল্যান্ডের অনুকরনে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে।[২] তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা জনগনের মধ্যে প্রবেশ করাতে পাড়লে গোড়ামি অনেক দূর হয়ে যাবে, এবং খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবে ক্রমশ তাদের কুসংস্কার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[৩] কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলে বাংলার মুসলমানরা প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহন করতে অনীহা প্রকাশ করে। তারা তাদের সন্তানদেরকে আধুনিক সরকারী স্কুলে প্রেরণ না করে মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহনের জন্য পাঠাতে থাকে।[৪]

কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন :

এদিকে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বৃটিশ সরকার কলিকাতায় প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতার মুসলিম জনগনের অনুরোধে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫] বৃটিশ সরকারের অধীনে বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা বিবর্তনের সাথে গোটা মুসলিম বাংলার ধর্মীয় তথা আরবী শিক্ষার ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহার ইতিহাসও বড় বিচিত্র। কেননা বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত ও

---

১. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১-২২।
২. ডঃ শরিফা খাতুন, "তুলনামূলক শিক্ষা তত্ত্ব", ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, (ঢাকা-১৯৮৩) পৃঃ ২৭০।
৩. এইচ, সি, সিলেক্ট কমিশন, ১৮৩১, পৃঃ ৫৯,৬২। উদ্ধৃত, বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৭।
৪. তুলনামূলক শিক্ষা তত্ত্ব, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭০।
৫. এ, এফ, সালাউদ্দিন আহমেদ, "সোসিয়াল আইডিয়াস এন্ড সোস্যিয়াল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল" ১৮১৮-১৮৩৫, ২য় সংস্করণ (কলিকাতা ১৯৭৬) পৃঃ ৭৫০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও ইহা টিকে থাকে । তাই সে মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতির ইতিবৃত্ত এবং সে সময়ের ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে জানা আবশ্যক তাই এই মাদ্রাসার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা ব্যতীত এ বিষয়ে সব কিছু জানা ও ধারনা করা সম্ভব নয় । নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ।

ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে বাংগালী মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । তাই তারা দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহন করতে অনীহা প্রকাশ করে । তারা মনে করে যে, এ শিক্ষা গ্রহন করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে খৃষটান ধর্ম সমাজের মধ্যে চেপে বসবে, ধর্ম কর্ম, জীবন জীবিকা হতে অপসারিত হবে । অবশ্য এরূপ মনে করার পিছনে যুক্তিও ছিল । কেননা যেহেতু ইংরেজরা কৌশলে বিশ্বাস ঘাতকতা করে, ষড়যন্ত্র করে দীর্ঘ দিনের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে নিজেরা রাজনৈতিকভাবে এ দেশের ক্ষমতা দখল করেছে, অর্থনৈতিকভাবে পংগু করে দিয়েছে, সামাজিক শৃংখলাকে ভেঙ্গে দিয়েছে এবং আর্থিক সহযোগীতা না করে এ দেশের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংশ করে দিয়েছে । তাই মুসলমানরা ইংরেজদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি এবং ইংরেজীকেও সহজভাবে গ্রহন করতে পারেনি । কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে চলবেনা-বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করতে হবে, তাই নেতৃস্থানীয় মুসলিম নেতারা মুসলমানদের উচ্চ ধর্মীয় শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাতে থাকে ।

১৭৭৬ সালের দিকে দিল্লীর বিখ্যাত জ্ঞান তাপস শাহ ওলী উল্লাহ এবং দরসে নিজামিয়ার প্রবর্তক মুল্লা নিজামুদদীনের শিষ্য মুল্লা মাজদুদ্দীন (মজিদ উদ্দিন) নামক বিশিষট শিক্ষাবিদ কলিকাতায় আসেন । ক্রমে তার বুদ্ধিমত্তাও পান্ডিত্যের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে । কলিকাতার নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে অনেকে তার জ্ঞান ও গুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন । তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন যে, কিভাবে মুসলমানদের জন্য তাঁর মত একজন প্রথিতযশা জ্ঞানী শিক্ষাবিদকে কলিকাতায় রাখা যায় । কিন্তু তাঁর উপযুক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে রাখার মত সামর্থ তাদের ছিলনা । তাই তারা তৎকালীন বাংলার শাসনকর্তা লর্ড হেষ্টিংসের উদ্দেশ্যে এ মর্মে একটি আবেদন প্রস্তুত করেন যে, তিনি যেন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নির্দেশ দেন ,যেখানে মুসলিম সন্তানেরা শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং মুল্লা মাজুদুদ্দীনের মত একজন সুযোগ্য ও বিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাবিদকে কাজে লাগানো যেতে পারে । অতপর মুসলিম প্রতিনিধীবৃন্দ ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড হেষ্টিংসের সাথে দেখা করে তাদের আবেদন উপস্হাপন করেন ।[১]

এদিকে তখনও ফার্সী আদালতের ও সরকারী ভাষা ছিল এবং আরবী ও ফার্সী ভাষা ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা । তাছাড়া দেশ তখনও ইসলামী আইন কানুন ও শরাহ শরীয়ত অনুযায়ী শাসিত হত । কাজেই প্রশাসন ও বিচার কাজ পরিচালনার জন্য অর্থাৎ দারোগা, কাজী, মৌলবী, মুন্সী, উকিল ও আদালত সংশ্লিষট লোকের জন্য আরবী ফার্সী ও ইসলামী আইন কানুন জানা বহু সংখ্যক দক্ষ কর্মচারী ও কর্মকর্তার প্রয়োজন ছিল । কিন্তু দুঃখের বিষয় নিস্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হওয়ার কারনে মাদ্রাসার আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায় এবং মাদ্রাসাগুলি ও বন্ধ হয়ে যায় । ফলে সুশিক্ষিত লোকের অভাব দেখা দেয় । এতে লর্ড হেষ্টিংস কাজী, মুফতী, উকিল, দারোগা ইত্যাদি প্রশসনিক পদ সমূহে কর্মচারী সরবরাহের উদ্দেশ্যেকে সামনে ররেখেই মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দেন যে তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন ।[২] তাছাড়া কলিকাতার মুসলমান ছেলে মেয়েদের জন্য কল্যান মূলক কিছু করার কথাও লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস ভাবছিলেন এবং একটা সুযোগ ও খুজছিলেন । সে সুযোগ ও এসে গেল তখন কলিকাতার মুসলমানেরা তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপনের দাবী নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে । হেষ্টিংস তাদের এই আবেদন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে মেনে নেন ।[৩] তাই সুদক্ষ প্রশাসনিক অফিস আদালতে কর্মকর্তা, মুসলমানদের সন্তানদের লেখা পড়া ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই হেষ্টিংস কালক্ষেপন না করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন । তিনি মোল্লা মাজদুদ্দীনকে মাসিক তিনশত টাকা বেতন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মনোনীত করেন এবং ৪০ জন ছাত্রের মাসিক পাঁচ ও সাত টাকা হারে বৃত্তির ব্যবস্হা করেন । এভাবে প্রধান শিক্ষক মোল্লা মজিদুদ্দীনকে মাদ্রাসা স্হাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে হেষ্টিংস তাকে কাজে অগ্রসর হতে অনুমতি দেন । অতপর ১৭৮০ সালে অক্টোবর মাসে শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে বৈঠক খানার একটি ভাড়া বাড়ীতে প্রস্তাবিত মাদ্রাসার প্রথম উদ্বোধন করা

---

১. মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩ ।

২. মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৩৩-৩৪ । বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২২ । বৃটিশ নীত ও বাংলার মুসলমান(১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ১৮৮ । আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত,পৃঃ৪০ , ৪১ , ৪৩ ।

৩. শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত,পৃঃ২৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। দরসে নিয়ামিয়ার রীতি অনুযায়ী মাদ্রাসার শিক্ষা বিষয় প্রবর্তন করা হয়। কেননা মোল্লা নিজেই দরসে নিজামিয়ার ছাত্র ছিলেন । এবং পরিকল্পনামতে ৪০ জন ছাত্রের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং আরবী, ফার্সী জনাও মুসলিম আইন সম্পর্কে জানা বিশেষ করে

----

১. মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩,৩৪। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২২। বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৮। আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪০,৪১,৪৩। এখানে আলিয়া মাদ্রাসা ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে অন্যান্য গ্রন্থে অবশ্য ১৭৮১ সালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে "The first educational institution established by the Government was the Calcutta Madrasa. It was founded by warren Hastings in 1781 in response to the request of the Muslims of Calcutta" মিনিট বাই ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭ ইং এপ্রিল ১৭৮১ সিলেকশন ফর্ম এডুকেশনাল রেকর্ড পার্ট ১ পৃঃ ৭,৯ উদ্ধৃত সোসিয়াল আইডিয়া এনড সোসিয়াল চেন্জ ইন বেঙ্গাল, ১৮১৮-১৮৩৫, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ১৫০। আরোও বলা হেয়েছে যেমন "The Calcatta Madrash was founded in 1781 by warfen Hastings provided a bulding at his own expanse."

এইচ, শার্প, বুক অব এডুকেশন ইন্ডিয়া, সিলেকশনস ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস পার্ট ১, (১৭৮১-১৮৩৯) (কলিকাতা, ১৯২০), পৃঃ ১৮২। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, পৃঃ৮৭। আততাওহীদ, ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, পৃঃ ২৫। শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮। ভারতের শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১। ইত্যাদি।

এ ছাড়া ১৭৮০ সালে কথা অনেক পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৩৪। বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪। শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত,পৃঃ ২৪। ঊনিশ শতকের বাঙ্গালী চিন্তা চেতনার ধারা ১ম খনড, পূর্বোক্ত,পৃঃ৩৪। ইত্যাদি। ডঃ সেকান্দর আলী ইব্রাহীমী," "রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশনাল এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গাল"-(১৮৬১-১৯৭৭, ৩য় খনড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (ঢাকা ১৯৮৫) ১ম প্রকাশ পৃঃ ১৩৯ ৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

অফিস আদালতের জন্য সুদক্ষ বিচারক ও অফিসার তৈরী করার উদ্দেশ্য[১] এবং মুসলমানদের দাবীর প্রেক্ষিতে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতায় প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ।

পাক ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করে ব্যক্তিগত তহবিল হতে তিনি মাদ্রাসার যাবতীয় ব্যয় বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । কেননা তিনি অনুধাবন করেন যে, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর অনুমোদনের জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টরস এর আশায় বসে থাকলে দেরী হয়ে যাবে । অবশ্য এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পিছনে অনেক শিক্ষানুরাগী বিত্তশালী মুসলমানগণ ও প্রচুর অর্থ দান করেন । মোল্লা মজিদুদ্দিনের সুনামে এই মাদ্রাসা এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে সুদূর কাশ্মীর[২] গুজরাট, কর্নাটক ইত্যাদি অঞ্চল হতেও অনেক ছাত্র এসে ভর্তি হয়ে শিক্ষা অর্জন করতে থাকে । ১৭৮০ সালে ডিসেম্বর মাসে হেষ্টিংস স্বয়ং মাদ্রাসা পরিদর্শন করে অধ্যক্ষের জ্ঞান, গুন ও কর্ম দক্ষতার পরিচয় পান । তিনি বিশেষ করে আনন্দিত হন এইদেখে যে, মাদ্রাসায় সুদূর কাশ্মীর, গুজরাট ও কর্নাটক হতে ছাত্ররা ভর্তি হয়ে শিক্ষা লাভ করছে । তাছাড়া তিনি মাদ্রাসার আর্থিক সংকট দূর করার জন্য বৈঠক[৩] খানায় এক খন্ড জমি ক্রয় করে অচিরেই সেখানে মাদ্রাসা ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ইংরেজদের সহযোগীতায় এটাই ছিল প্রথম প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ।

----

১. এইচ, শার্প, "ব্যুরো অব এডুকেশন, ইন্ডিয়া সিলেকশন ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস", পার্ট-১ (১৭৮১-১৮৩৯) (কলিকাতা ১৯২০), পৃঃ ৩০ । রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল, ১৮৬১-১৯৭৭ ৩য় খন্ড , পূর্বোক্ত,পৃঃ৩২৫ । সুফিয়া আহমেদ, "মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল, ১৮৮৪-১৯১২", প্রথম প্রকাশ (ঢাকা ১৯৭৪) পৃঃ ৭

To promote the study of the Arabic and persian Language and of Muhammadans law, with a view more especially to the production of qualified offieers for the courts of justice.

২. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩ । শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত,পৃঃ ২৪ ।

৩. মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৮১ সালে বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মাদ্রাসা সম্পর্কে তাঁর উদ্যোগ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে কোম্পানীর ডিরেকটরদের অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আমি এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি যেখানে মুসলমান ছাত্রদের আইন শিক্ষা দেয়া হবে। শিক্ষা লাভ করে এরা সরকারের অধীন জজ এবং পরিসংখ্যান বিদদের পদ অলংকৃত করবে। এতদিন যাবত মাদ্রাসার যাবতীয় ব্যয় ভার আমার বিশেষ তহবিল হতে পূরন করা হয়েছে। কিন্তু এখন কোম্পানীকে এই প্রতিষ্ঠানের সকল দায় দায়িত্ব বহন করা উচিত। মাদ্রাসার জন্য ইতিপূর্বে যে জমি ক্রয় করা হয়েছে কোম্পানী সেখানে মাদ্রাসা ভবন নির্মানের ব্যবস্থা করবে।[১] তিনি উল্লেখ করেন যে, এই ভবন নির্মান করতে আনুমানিক ৫১ হাজার টাকা ব্যয় হবে। তবে তিনি মোট ৫৭,৭৪৫ টাকা ব্যয়ে মাদ্রাসার ভবন নির্মান করেন।[২] যদিও কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ মাদ্রাসা সম্পর্কে গর্ভনরের এই প্রস্তাব বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌এর কাছে পাঠান, কিন্তু ১৭৮২ সাল নাগাদ এ মাদ্রাসা সম্পর্কে কোন মন্জুরী পাওয়া যায়নি। এরপর গর্ভনর নিজেই এই মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ পত্রাদি নিজের তহবিল হতেই বহন করতে থাকেন। কোন মতেই মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যেতে দেয়নি।[৩] ১৭৮২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তিনি এভাবেই পরিচালনা করেন। অবশেষে ১৭৮২ সালে হেস্টিংসের অনুরোধে এবং বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর অনুমোদনক্রমে সরকার মাদ্রাসার পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন।[৪] তাছাড়া মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের সুপারিশক্রমে বাংলা সরকার মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য বার্ষিক ২৯ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি ব্যবস্থা করেছেন এবং হেস্টিংস তার স্বীয় পকেট হতে যে টাকা ব্যয় করেছিলেন তার সমুদয় তাকে ফেরত দেয়া হয়।[৫] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, হেস্টিংসের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগীতায় মুসলমানদের শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম কলিকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মুসলমানদের দুরাবস্থার কথা ভেবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অবনতি দেখে একটু

----

১. পাষ্ট এন্ড প্রেজেন্ট অব বেঙ্গল, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৯৯। উদ্ধৃত আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩-৪৪।

২. মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশপ্ত পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪।

৩. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪।

৪. মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪। বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

৫. সৈয়দ নরুল্লাহ এন্ড জে,সি,নায়েক "এ ষ্টুডেন্ট হিস্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া" ৫ম সংস্করন বোম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতা, লন্ডন, ১৯৬৪, পৃঃ ৩২। সাঈদ মাহমুদ এ হিস্ট্রি অব ইংলিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া (১৭৮১-১৮৯৩) প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫, পনমুদন, (দিল্লী ১৯৮১), পৃঃ ১৮। রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এনড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল ১৮৬১-১৯৭৭, ৩য় খন্ড, পর্বোও, পৃঃ ৩২৫। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২২। বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, পৃঃ ১৭১, ১৭০। আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পৃঃ ২৩। মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪। শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

সহানুভূতিশীল হয়ে, পশ্চাদপদ মুসলমানদের শিক্ষার আলো জাগাতে এই মহান কার্জটি করেছিলেন। এই মাদ্রাসাকে ঘিরে মুসলমানদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয় এবং ধর্মীয় শিক্ষা নতুন করে মূল্যায়ন হওয়ায় আনন্দিত হয়।

পাঠ্যসূচী প্রবর্তন : প্রাথমিক যুগের মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত কুরআন শিক্ষার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কুরআনকে বুঝতে হলে, হাদীস অধ্যয়ন ও অপরিহার্য। তাছাড়া তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়াদি যেমন আরবী ভাষা, ব্যাকরন, সাহিত্য, অলংকার শাস্ত্র, কাব্য ইত্যাদিও উপেক্ষা করা যায় না। তাই ভারতীয় উপমহাদেশের মাদ্রাসা সমূহের জন্য শিক্ষাবিদ মুল্লা নিজামুদ্দীন সিহালুভী (১৭৪৮) যে পাঠ্য সূচী প্রনয়ন করেছিলেন কলিকাতা মাদ্রাসায় ও তার শিষ্য মুল্লা মজিদ উদ্দিন সে পাঠ্যসূচীই প্রবর্তন করেন। দরসে নিজামীর পাঠ্যসূচী গ্রন্থ ভিত্তিক বিষয়ের শাখা উপ-শাখা বা প্রসংগ ভিত্তিক নয়। প্রত্যেক বিষয়ের সহজতম, গ্রন্থ থেকে শুরু করে ক্রমে কঠিনতর ও ব্যাপকতর গ্রন্থ তালিকা ভুক্ত করা হয়, যা পর পর অধ্যয়ন করলে সে বিষয়ে সহজে বুৎপত্তি অর্জন হয়। মেধাবী ছাত্র বিষয়টি দ্রুত আয়ত্ত করে সহপাঠীদের সাহায্য করতে পারে।[১] যা হোক কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর অধ্যক্ষ মোল্লা মজিদ উদ্দিন উক্ত দরসে নিজামিয়ার অনুসরনে পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করেন। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসার এই শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাসূচী অব্যাহতভাবে চলে আসছিল। এই পাঠ্যসূচীর বৈশিষ্ট হল যেমন (ক) প্রত্যেক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত দুই একটি পুস্তক। (খ) প্রত্যেক বিষয়ের অন্তত সুলিখিত এবং অনবদ্য একখানা পুস্তক (গ) তর্কশাস্ত্র(মানতেক) এবং দর্শন শাস্ত্রের প্রাধান্য সর্বাধিক। (ঘ) হাদীসের মধ্য হতে শুধুমাত্র মেশকাত শরীফ (।(ঙ) সাহিত্য পুস্তকের পরিমান অত্যন্ত সীমিত। এই পাঠ্যসূচী প্রনয়নে মোল্লা নিজামুদ্দিন সাহেবের একটি উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে কাজ করছিল যে, কঠোর পরিশ্রম করে এসব কিতাবাদি অধ্যয়ন ও অনুশীলনের পর ছাত্রদের এতখানি জ্ঞান ও ক্ষমতা লাভ হবে যে, যাতে সে যে কোন বিষয়ের যে কোন পুস্তক পড়ে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। দরসে নিজামিয়া এতখানি জনপ্রিয় হয়েছিল যে, বাংলাদেশ হতে সুদূর পেশোয়ার পর্যন্ত সকল ছোট বড় মাদ্রাসায় এই পাঠ্যসূচী অনুসরন করা হত।[২] সময়ের

---

১. মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬-৪৭।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিবর্তনে বর্তমান সময়ে দরসে নিজামিয়ার মৌলিকত্ব অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে এ দেশের মাদ্রাসা সমূহে যে দরসে নিজামিয়ার পাঠ্যসূচী প্রচলিত রয়েছে প্রকৃত দরসে নিজামিয়ার সাথে তার সাদৃশ্য খুবই সামান্য। দরসে নিজামিয়ার জন্য মোল্লা নিজামুদ্দিন যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেছিলেন, বিষয় ভেদে তা এখানে তুলে ধরা হল।

ছরফ :- মিজান মুনশাব, ছরফেমীর, পান্জেগাঞ্জ, জুবদা, ফুসুলে আকবরী ও শাফিয়া।

নুহু :- নুহুমীর, শরহে মিয়াতে আমেল, হেদায়াতুন নুহু, কাফিয়া ও শরহে জামি।

মানতেক :- ছোগরা, কোবরা, ইছাগুজি, তাহজিব, শরহে তাহজিব, কিবতীমা মীর ও ছুল্লুমুল উলুম।

হেকমত :- (বিজ্ঞান) মায়বুজী, ছদরা, শামছে বাজেগা।

অংক :- খোলাসাতুল হেসাব, তাহরিরে তাকলিদাস (মাকালায়ে উলা), তাশরিহুল আফলাক, রেছালায়ে কুশদিয়া, শরহে চগমুনী।

বালাগাত-(ভাষাশৈলী) :- মুখতাসারুল মাআনী, মোতওয়াল।

ফিকাহ :- শরহে বেকায়া, হেদায়া আখেরাইন ও আওয়ালাইন।

উসুলে ফিকাহ :- নুরুল আনওয়ার, তাহজিহ, তালবিহ, মুছল্লমুছ ছুবুত।

কালাম :- শরহে আকায়েদে নছফী, শরহে আকায়েদে জালালী, মীরজাহেদ ও শরহে মওয়াকেফ।

তাফসীর :- জালালাইন ও বায়জাবী শরীফ।

হাদীস :- মেশকাত শরীফ।[১] তবে নিজাম উদ্দিন কর্তৃক দরসে নিজামিয়ার এই পাঠ্যসূচী পরবর্তীতে অনেক পরিবর্তন হয়। যেমন-

ছরফ :- মিজান মুনশাব, পান্জেগাঞ্জ, দরফে মীর, জুবদা, ফুসুলে আকবরী, শাফিয়া, মোবতাদী ইলমুস সীগা।

নহু :- নহুমীর, মেয়াতে আমেল, শরহে মিয়াতে আমেল, হেদায়াতুন নহু, কাফিয়া ও শরহেজামী।

বালাগাত :- মোখতাছারুল মাআনী কামেল ও মোত্তোয়াল।

আদব (সাহিত্য) :- নাফহাতুল ইয়ামন, ছাবআ মোয়াল্লাকা, দিওয়ানে মোতানাব্বী, মাকামাতে হারিরি ও হামাসা।

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪-৫৫। মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭। হিষ্টি অব ট্র্যাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ফিকাহ ঃ- শরহে বেকায়া, আওয়ালাইন ও হেদায়া আখিরাইন ।

উসূলে ফিকাহ ঃ- নুরুল আনওয়ার, তাহুজিহ, তালবিহ, ও মুছল্লমুছ ছুবুত ।

মানতেক ঃ- (তর্ক শাস্ত্র বা যুক্তি বিদ্যা) ঃ- ছোগরা, কোবরা, ইছাগুজি, তাসে আকওয়াল, মিজান মানতেক, তাহজিব, শরহে তাহজিব, কুত্বী, মীরে কুত্বী, মোল্লা হাসান, হামদুল্লাহ, কাজী মোবারক, মীর জাহেদ রেছালা, হাশিয়া, গোলাম ইয়াহিয়া, মোল্লা জালাল, বাহরুল উলুম, শরহে মোছাল্লাম ইত্যাদি ।

হেকমত (বিজ্ঞান) ঃ- মাইবুজি, ছদরা, শামসে বাজেগা ।

কালাম ঃ- শরহে আকায়েদে নছফী, খায়ালী, মীর জাহেদ ও উমূরে আম্মা ।

রিয়াজী (অংক)ঃ- তাহরিরে আকলিদাস, মাকালায়ে উলা, খোলাসাতুল হিসাব, তাছবিহ, শরহে তাশরিহ, শরহে চগমুনী ।

ফারায়েজ ঃ- শরিফিয়া ও সেরাজী ।

মোনাজেরা ঃ- মোনাজেরায়ে রশিদিয়া ।

তাফসীর ঃ- তাফসীরে জালালাইন ও বায়জাবী শরীফ (সূরা বাকারা পর্যন্ত) ।

হাদীস ঃ- বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুয়াত্তা ইত্যাদি ।

আলীয়া মাদ্রাসাতেও এই পাঠ্যসূচী ও পাঠ্য পুস্তকাদি প্রচলিত ছিল । এ ছাড়া অন্যান্য নিয়ম কানুন ও বন্দোবস্ত ও দরসে নিজামিয়া অনুরূপ ছিল ।[১] দরসে নিজামিয়ার একটা ভাল দিক এই ছিল যে, এতে পাঠ্য পুস্তকের তুলনায় পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান ও বুৎপত্তি লাভের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হত । এ ব্যবস্থা শিক্ষনীয় বিষয়টি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য শিক্ষককেই সরবরাহ করতে হত । তাই ইহা পূর্বের পদ্ধতির চেয়ে অধিক উপকারী ও বাস্তবমূখী বলে মুসলমানদের স্বীকৃতি লাভ করে ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মাদ্রাসায় প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম শাস্ত্র ধর্ম তত্ত্ব,আইন শাস্ত্র, দর্শন,জ্যোতির্বিদ্যা, অংক, জ্যামিতি, তর্কশাস্ত্র বা যুক্তি বিদ্যা, অলংকার শাস্ত্র এবং ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষা সংস্কৃত বিষয়ক গ্রন্থ উহার পাঠ্য তালিকা ভূক্ত ছিল । এই

----

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত,পৃঃ৫৫-৫৬ । ডঃইউসুফ হোসেন,"মধ্যযুগের পাক ভারতীয় সংস্কৃতি", অনু, ফারুক মাহমুদ, বাংলা একাডেমী (ঢাকা ১৯৬৭) ১ম প্রকাশ, পৃঃ১০১ ।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্যক্রম ৭ বছরের ৭টি শ্রেনীতে শিক্ষা দেয়া হত ।[১] তবে এই ৭টি শ্রেণীর পাঠক্রমকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে । সিনিয়ার বিভাগ ও জুনিয়ার বিভাগ এবং এই বিভাগ অনুযায়ী পাঠক্রম সাজানো হয়েছে । যেমন সিনিয়ার বিভাগে চারটি ক্লাশ, এখানে আরবী, ফার্সী, সাহিত্য, অলংকার শাস্ত্র, মুসলিম আইন, যুক্তি বিদ্যা, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, জ্যামিতি, এ্যারিতম্যাটিকস্ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেয়া হত । জুনিয়ার বিভাগ ৪র্থ শ্রেনী হতে ৭ম ক্লাশ পর্যন্ত । এখানে সাধারনত, আরবী, ফার্সী, সাহিত্য, ব্যাকরন, প্রাথমিক যুক্তিবিদ্যা, মুসলিম আইন, এ্যারিতম্যাটিক্স ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত ।[২] এই সময় অর্থাৎ ১৭৮০ হতে ১৭৯০ সালের মধ্যে যুক্তিবিদ্যার প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়া হত । তাফসীর বিষয়ে মাত্র দুটি গ্রন্থ বায়জাবী ও জালালাইন শরীফ শিক্ষা দেয়া হত । বায়জাবী মাত্র আড়াইপাড়া পাঠ্যভূক্ত ছিল এবং জালালাইন সম্পূর্ণ কিতাব পড়ানো হত । কিন্তু জালালাইনের তাফসীর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারনে শিক্ষার্থীদের তাফসীরে তেমন জ্ঞান লাভ সম্ভব হত না । মানতেক বা যুক্তি বিদ্যার জন্য নির্ধারিত সবকয়টি গ্রন্থই সকল প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হত । অথচ হাদীস ও সাহিত্য বিষয়ের পাঠ্যভূক্ত গ্রন্থগুলি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়া হত না । এ সময়ের পাঠ্যসূচীতে ইতিহাস, ভূগোল ও কুরআনের মূলনীতি বিষয়ক কোন গ্রন্থের ব্যবস্থা ছিল না এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, শাহ ওলী উল্লাহ পূর্বযুগে আরবী মাদ্রাসাসমূহে ফিকাহও উসূলে ফিকাহ এর উপরই অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হত । তখন হাদীস, তাফসীর শিক্ষার প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তেমন কোন লক্ষ্য ছিল না । আবদুল হক মুহাদ্দিসই দেহলবী তিনিই প্রথম (১৫৮৭) হাদীসে শাস্ত্র প্রচলন করার চেষ্টা করেন । কিন্তু তা খুব একটা সাফল্য হয়নি । এরপর শাহ ওলী উল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২) এর উদ্যোগে দিল্লীতে যে শিক্ষা কেন্দ্র (রহীমিয়া মাদ্রাসার বর্ধিত রূপ) গড়ে উঠেছিল, তাতে সত্যিকার অর্থে হাদীস, তাফসীর শিক্ষার গোড়া পত্তন করা হয় । কিন্তু এরপর লখনৌতে দরসে নিজামিয়া প্রতিষ্ঠিত হলে হাদীস, তাফসীরের শিক্ষা অনেকাংশে ব্যাহত হয় । এ সময়ের অব্যবহতী পরে (অর্থাৎ ১৭৮০-৯০ সালের মধ্যে) আরবী সাহিত্য, হাদীস, তাফসীরের কয়েকটি গ্রন্থ পাঠ্যসূচী ভূক্ত করা হয় । কিন্তু তখনো আরবী সাহিত্য বা হাদীস শিক্ষা ততটা প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তার লাভ করেনি ।[৩]

---

১. ব্যুরো অব এডুকেশন, ইন্ডিস সিলেকশনস ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস পার্ট-১, (১৭৮১-১৮৩৯) (কলিকাতা ১৯২০) পৃঃ ৩০ । দি ইমপ্রেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া, দি ইন্ডিয়ান ইম্পায়ার ৪র্থ খনড, পৃঃ পৃঃ ৪০৮ । এ হিস্ট্রি অব ইংলিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, ১৭৮১-১৮৩৯) পৃঃ পৃঃ ১৯। আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পৃঃ পৃঃ ২৩ ।

২. বি, সি, এ্যালেন, "ইষ্টার্ন বেঙ্গাল ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার" ঢাকা", (ইলাহাবাদ ১৯১২) পৃঃ ১৬৬ ।

৩. আবুল হাসানাত নদবী, "হিনদুস্তান কী কাদীম দরস গাহে", (আজমগড়, ১৯৩৬), পৃঃ ১০০-১০১। উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১ ।

Dhaka University Institutional Repository

লখনৌতে দরসে নিজামিয়ার প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে এই ভারতীয় উপমহাদেশের আরবী প্রতিষ্ঠানসমূহে ৫ শত বছর ব্যাপী যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল, তার গতি প্রকৃতি ছিল ধর্মীয় অর্থাৎ ধর্ম শিক্ষা দানই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন যুক্তি বিদ্যা ও দর্শনের শিক্ষা ছিল খুবই নগন্য। আবদুল্লাহ মুলতী-ই-(মৃত ১৫১৬) সর্বপ্রথম যুক্তি বিদ্যা ও দর্শনের প্রবর্তন করেন। পরবর্তী সময় মোল্লা কুতুবুদ্দীন শহীদ এ দুটি বিষয়ের আরো উন্নতি সাধন করেন। এদিক থেকে এতটুকু লাভ হয় যে, ইতিপূর্বে ফিকাহ বীদদের মধ্যে যে কঠোরতা ছিল, তা অনেকটা হ্রাস পায়। কিন্তু অন্যদিকে এরফলে আরবী শিক্ষার ধর্মীয় উদ্দেশ্যতথা হাদীস, তাফসীরের শিক্ষা ব্যাহত হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী, ফার্সী সাহিত্য পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ছাত্রদের জন্য সাহিত্যিক জ্ঞান যোগ্যতা লাভের দ্বার অনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া নুহু, ছরফ অর্থাৎ ব্যাকরনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করায় ছাত্রদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং শিক্ষার অর্ন্তনিহিত বিষয়ের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত। এখানে লক্ষনীয় বিষয় এই যে, লখনৌর দরসে নিজামিয়ার যে সব গ্রন্থ পাঠ্যভুক্ত ছিল, সেগুলির অধিকাংশই ছিল আরবী ভাষায় লিখিত। এ শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারনত আরবী ভাষার মাধ্যমেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষা দেয়া হত। কিন্তু আরবী ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান লাভের প্রতি প্রাধান্য দেয়া হতনা বলে দরসে নিজামিয়ার পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে এ উপমহাদেশে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের কোন উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন হয়নি। আরবী গ্রন্থসমূহ ধর্মীয় দৃষ্টি কোন হতে পাঠ করা হত, কিন্তু সাহিত্যিক বা সাধারন জ্ঞানার্জনের দৃষ্টি হতে পাঠ করা হত না। যুক্তি বিদ্যা বা দর্শন যেটুকু পাঠ করা হত, তা ছিল সেকেলে বা গ্রীক তত্ত্বধর্মী, যা ছাত্রদেরকে প্রগতিশীল করাতো দূরের কথা, বরং তাদের মধ্য যুগের দিকে নিয়ে যেত। এ ছাড়া অংক ছিল খুবই কম। যাই হোক ওয়ারেন হেষ্টিংস উপস্থিত প্রশাসনিক পদে জন শক্তির প্রয়োজন মিটানোর জন্য ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় সর্বপ্রথম মুসলমানদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপন করে অন্যান্য ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত ..... মাদ্রাসায় ও উপরোক্ত দরসে নিজামিয়ার পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করেন এবং ১৭৯০ সাল পর্যন্ত দরসে নিজামিয়ার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষা দান অব্যাহত থাকে।

---

১. শিবলী নুমানী, "মাকালাত ই শিবলী,"(আজমগড়,১৯২২) পৃঃ১২৫, উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত,পৃঃ৩১-৩২।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৩২-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯১ সালে মিঃ জিপম্যান এর নেতৃত্বে গঠিত সংস্কার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। যেমন প্রাকৃতিক দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, আইন শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, জ্যামিতি যুক্তি বিদ্যা, অলংকার শাস্ত্র, ব্যাকরন এবং এ্যারিতম্যাটিক ইত্যাদি এবং ১৮৭২ সাল পর্যন্ত মোটামুটি সেই পাঠ্যসূচীই কলিকাতা মাদ্রাসা, হুগলী মাদ্রাসা, এবং কলিকাতা মাদ্রাসার অধীন অন্যান্য প্রাইভেট মাদ্রাসাসমূহে তা বহাল থাকে। মিঃ জিপম্যান কমিটি প্রনীত পাঠ্য তালিকার প্রতি লক্ষ্য করলে সহজে বুঝা যায় যে, ঐ পাঠ্য তালিকায় হাদীস ও সাহিত্যের কোন গ্রন্থ পাঠ্যভুক্ত ছিল না। ইতিহাস, ভূগোল, এমনকি মাতৃভাষা শিক্ষা দানের ও কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত দরসে নিজামিয়া অনুসারে এ প্রতিষ্ঠানে হাদীস বিষয়ে কেবল মিশকাত শরীফ এবং তাফসীর বিষয়ে কেবল জালালাইন ও বায়জাবীর আংশিক শিক্ষা দেয়া হত। অতপর এই পাঠ্যসূচী হতে হাদীস, তাফসীরকে বাদ দেয়া হয় এবং ১৭৯১ সাল হতে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩৭ বছর যাবত একই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। এ দীর্ঘ সময়ে কোন রদ বদল করা হয়নি। অবশেষে আর্ল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯০৯ সাল থেকে[২] এ প্রতিষ্ঠানে যথারীতি হাদীস তাফসীরের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশ তথা এই পাক ভারত উপমহাদেশে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ছিল সর্বপ্রথম সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের জন্য ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুসলিম শাসনামলে কোন সরকারী মাদ্রাসা ছিল না। তখন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারনত মসজিদ ও মক্তবকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। তাই আলিয়া মাদ্রাসা সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর শিক্ষা দানের সুনাম ও সুখ্যাতি খুব দ্রুত চতুর দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরফলে অধঃপতিত ও অবহেলিত মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়। আলিয়া মাদ্রাসায় দরসে নিজামিয়ার পাঠ্য-সূচীই অনুযায়ী শিক্ষা দীক্ষা শুরু হয় এবং ৭ বছর মেয়াদী পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়।

১৭৮০ সালে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে ১৭৯১ সাল পর্যন্ত মোটামুটিভাবে মাদ্রাসা নির্বিঘ্নে চলছিল। এ সময় তেমন কিছুই ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ১৭৯১ সালের দিকে মাদ্রাসায় কোন্দল,

---

১. এ স্টুডেন্ট হিস্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮। উদ্ধৃত, সি, লয়েড থুপ এডুকেশন এন্ড দি ডিভিলপমেন্ট অব মুসলিম ন্যাশনালিজম ইনপ্রিপারেশন ইনডিয়া, পাকিস্তান, হিস্ট্রিকাল সোসাইটি, (করাচি ১৯৬৫) পৃঃ ১০।

২. নূর মোহাম্মদ আজমী, "হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস," (ঢাকা ১৯৬৬) পৃঃ ৩৮১। উদ্ধৃত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিশৃংখলা ইত্যাদি অভিযোগ উত্থাপিত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার আভ্যন্তরীন অব্যবস্থা এবং বিশৃংখলা দূর করার জন্য সরকার সচেষ্ট হলে মুসলমানরা তাতে বাধা প্রদান করে এবং সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও সংশোধন করতে ও বাধা প্রাপ্ত হন। বাধ্য হয়ে সরকার মাদ্রাসার সমস্ত বিষয়াদি সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং তথ্য উদ্ধারের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি মাদ্রাসার সকল অনিয়ম ও অব্যবস্থা তদন্ত করে বোর্ডের নিকট তা উপস্থাপন করেন। ১৭৯১ সালের ১৮ই মার্চের রেকর্ড পত্র হতে জানা যায় যে, মিঃ জিপম্যান মাদ্রাসা তদন্ত করেন এবং মাদ্রাসার বিশেষ অবনতি ও অনিয়ম হয়েছে বলে রিপোর্ট দেন। অর্থাৎ তদন্তে অভিযোগ সত্য প্রমানিত হয়। রাজস্ব বোর্ড লক্ষ্য করে যে, মাদ্রাসার রেজিষ্টারে বৃত্তি ভোগী ছাত্রদের নাম ছিল, কিন্তু তারা মাদ্রাসায় কোন মতে হাজিরা দিত, নিয়মিত লেখাপড়া করতনা এবং নিয়মতান্ত্রিক উপস্থিতি সম্পর্কে তাদের উৎসাহ ছিলনা। ছাত্রদের নৈতিক এবং চারিত্রিক অধঃপতন ও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মিঃ জিম্যানের নেতৃত্বে এই রিপোর্ট বোর্ডের নিকট পেশ করলে মোল্লা মজিদ উদ্দিনকে পদচ্যুতি ও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য গর্ভনর জেনারেলের কাছে সুপারিশ করা হয়। গর্ভনর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস বোর্ডের সুপারিশক্রমে মোল্লা মজিদ উদ্দিনকে পদচ্যুত করেন এবং তার স্থলে মোহাম্মদ ইসরাইলকে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করেন এবং তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির হাতে মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব প্রদান করেন। সব কিছু পুর্নগঠিত করে মাদ্রাসা কমিটি অনুমোদন করা হয় ও কমিটির জন্য কিছু আইন প্রনয়ন করা হয়। পাঠ্যসূচীর ও কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়। যেমন প্রাকৃতিক দর্শন, পরমার্থ বিদ্যা, আইন বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, অংক শাস্ত্র, যুক্তি বিদ্যা, অলংকার শাস্ত্র এবং ব্যাকরন ইত্যাদি

----

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬-৫৭। মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫। বেঙ্গল পাষ্ট এন্ড প্রেজেন্ট ৩য় খন্ড জানুয়ারী জুন ১৯১৪। হিষ্ট্রি অব দি কলিকাতা মাদ্রাসা, পৃঃ৮৯। উদ্ধৃত লতিফা আখন্দ, "সোশিয়াল হিষ্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল" (১৮৫৪-১৮৮৪) ইসলামিক ফাউঃ বাংলাদেশ (ঢাকা ১৯৮৯), পৃঃ৬৩।

২. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৫। বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭। সোশিয়াল হিষ্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল (১৮৫৪-১৮৮৪) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯১ সালে সংস্কার চেষ্টার পর মাদ্রাসার আভ্যন্তরীন শৃংখলা এবং পড়াশুনার ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি হতে থাকে এবং এর ফলে, মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে । এরপর ১৮১১ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসার কাজ কর্ম নির্বিঘ্নে ও সুচ্ছন্দ গতিতে চলতে থাকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন অনিয়ম ও ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত দেখা যায়নি । তবে ১৮১১ সালের পর কমিটি মাদ্রাসার সার্বিক উন্নতি এবং এর কাজ কর্ম দেখাশুনা ও পর্যবেক্ষন করার জন্য[১] এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একজন ইংরেজ অফিসার নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । ১৮১২ সালে ডঃ লামসডেন প্রতিষ্ঠানের সাধারন কতকগুলি দোষ ত্রুটি বের করলেন । তাঁর প্রস্তাব মত প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন ইউরোপীয় তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তির কথা বলা হয় । এই তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব হবে, শিক্ষকগণ তাদের দায়িত্ব[২] সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা এবং ছাত্রদের উন্নতি কি পরিমান হল তায় দেখাশুন করা । এ প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি । কিন্তু ডঃ লামসডেন এবং লেপটেনেন্ট গ্যালওয়ে মাদ্রাসা কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন ।

১৮১৩ সালের শিক্ষানীতি ঃ- এ দিকে ১৮১৩ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বানিজ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, পুনরায় চুক্তির সময় বৃদ্ধির প্রশ্নে বৃটিশ পার্লামেন্টে তা উত্থাপন করা হয় এবং এই সাথে পার্লামেন্টে এ দেশের ব্যবস্থা প্রসংগে ও উত্থাপন করা হয় । পার্লামেন্টের কিছু সংখ্যক সদস্য এবং কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এ ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়কে সম্পূর্ণ অলাভজনক বলে মন্তব্য করেন । কিন্তু এরূপ বিরোধিতা সত্ত্বেও বৃটিশ পার্লামেন্ট এ দেশের শিক্ষার উন্নতির প্রসংগে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং এ ব্যাপারে একটি শিক্ষা এ্যাক্ট বা সনদ আইনের ব্যবস্থা করা হয় । অতপর ১৮১৩ এর ৫৩ ধারায় ভারতীয় সরকারের শিক্ষানীতি সর্বপ্রথম বিধান পরিষদের আইনের স্বীকৃতি লাভ করে । ১৮১৩ সালে সনদ আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় যে, কোম্পানীকে তার আয়ের উৎস হতে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বার্ষিক অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে । এরপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোম্পানীর

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯ ।

২. দি হিস্ট্রি অব দি ক্যালকাটা মাদ্রাসা, বেঙ্গল পার্ট এন্ড প্রেজেন্ট, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২২৫,২৩০ । উদ্ধৃত বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৯৬ । ব্যুরো অব এডুকেশন ইন্ডিয়া সিলেকশনস ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস, পার্ট -১, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২ ।

Dhaka University Institutional Repository

কোর্ট অব ডিরেক্টরগণ ১৮১৪ সালের ৩রা জুনের ডেসপ্যাচে গর্ভনর জেনারেলকে শিক্ষা খাতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দেন । কিন্তু এ নির্দেশের পাশাপাশি একথাও বলা হয় যে, সমপূর্ণ টাকা যেন হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় । অর্থাৎ এই অর্থের দ্বারা সংস্কৃত মাধ্যম প্রতিষ্ঠানে বেশী ব্যয় করা হয় । সংস্কৃত ভাষায় সে সব সাহিত্য বা গ্রন্থাবলী আছে তা যেন ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয় । এতে[১] মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ এবং আরবী ফার্সী ভাষায় তাদের জ্ঞানকে সমপূর্ণ উপেক্ষা করা হয় । এরফলে এক বিতর্কের সৃষ্টি হয় । এই বিতর্কের সমাধানের জন্য শিক্ষা সমিতি সরকারের দ্বারস্থ হন । এর উপর ভিত্তি করে মেকেল তাঁর মিনিট রচনা করেন । তিনি ১৮১৩ সালের সনদ আইন এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, এই সনদে সাহিত্য চা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের কথা উল্লেখ হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, কেবল মাত্র সংস্কৃত ও আরবী সাহিত্যেই সরকারী সাহায্য পাবে । তাঁর মতে পার্লামেন্টে সাহিত্য বলতে ইংরেজী সাহিত্যকে বুঝাতে চেয়েছেন । মেকেল উল্লেখ করেন যে, ইংরেজী ভাষা হচ্ছে শাসক শ্রেনীর ভাষা এবং কালক্রমে উহা ব্যবসা বানিজ্যের ভাষা হবে । সুতরাং দেশীয় লোকদের ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী করে তুলতে হবে । তিনি মন্তব্য করেন যে, সরকার যে শিক্ষা উপযুক্ত বলে মনে করবেন, সে শিক্ষায় অর্থ ব্যয় করার স্বাধীন ক্ষমতা[২] রাখেন । তাঁর মতে কতকগুলি পুরাতন ভাষা শিক্ষার জন্য অযথা অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নেই ।

অর্থাৎ মুসলমানদের আরবী, ফার্সী শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে কোন উল্লেখ করা হয়নি । অপরদিকে ইংরেজীর পরিবর্তে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষিত হিন্দুরাও প্রতিবাদ করে, তবে এ প্রতিবাদে কোন লাভ হয়নি । সংস্কৃতকেই ইংরেজরা প্রাধান্য দেয় । অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কোম্পানী এ দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য যে এক লক্ষ টাকা খরচ করার নির্দেশ দেন, তাতে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করার কোন নির্দেশ ছিলনা । মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির ব্যাপারে ইংরেজদের এরূপ বিমাতা সুলভ আচরন, সমপূর্ণভাবে ইচ্ছাকৃত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত । মুসলমানরা শিক্ষিত হয়ে যাতে সমাজের নেতৃত্ব দিতে না পারে, সরকারী

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ৬৫ । মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২২ । বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০ ।

২. কুমার রায়, ভারতের শিক্ষা সমস্যা, ৪র্থ সংস্করন, (কলিকাতা,১৯৭৭) পৃঃ১৩১ ।

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরী না পায় এবং ব্যবসা বানিজ্যে উন্নতি করতে না পারে । ইত্যাদি সর্বদিকে মুসলমানদের ধ্বংশ করাই ছিল একান্ত ইচ্ছা । কাজেই মুসলমানরা যাতে মাথাচারা দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়া কোম্পানী সুদুর প্রসারী নীল নকসা আঁকে এবং হিন্দুদের শিক্ষিত করে তোলে চাকুরী জীবি এক শ্রেনী মুসাহেবী তৈরী করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করাই কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল ।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষের শিক্ষা সম্পর্কীয় চিঠি পত্রাদি হতে বুঝা যায় যে, ভারতীয়দের শিক্ষাদানের ব্যাপারে তারা মুসলমানদের উপর মোটেই সুবিচার করেনি । তাদের সনদ আইনে আরবী ফার্সী শিক্ষার কোন উল্লেখ নেই । অথচ এ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল বলে এ সত্য কথাটি লর্ড মিন্টু প্রকাশ করেছেন । মুসলিম শিক্ষার প্রতি ইংরেজদের অবহেলার প্রধান কারন হল তারা মুসলমানদেরকে ভারতে খাটি বাসিন্দা বলে স্বীকার করতে পারেনি, তারা মনে করেছে মুসলমানরা এদেশে বিদেশী । কিন্তু ১৮৭১-৭২ সালের দিকে মেজর ইভেন্সবেল এই দৃষ্টি ভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করেছেন ।[১] শিক্ষাখাতে সনদ আইনে যে পরিমান অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল । তার বেশী কিছু করা প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতার বাইরে ছিল । তাই এ নীতি সব সময় মুসলমানদের বিপক্ষে যেত । ১৮১৫ সালের ২রা অক্টোবরে "ময়রার" স্থানীয় মানুষের বুদ্ধিগত ও নৈতিক অবনতি দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং জনশিক্ষা দপ্তরে কতিপয় নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন । তিনি আশা করেন যে, সরকার এ বিষয়ে যেন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন । তিনি প্রতি জেলাতে আলাদা আলাদা হিন্দু মুসলমানদের জন্য দুটি জেলা স্কুল স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করেন । এ প্রস্তাব মুসলমানদের জন্য ভাল হত কিন্তু বাংলা ও বিহারের গ্রামীন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করায় আর্থিক অভাবের কারণে সে সব ধ্বংস হয়ে যায় । অনুরূপ ভাবে মাদ্রাসা কমিটিতে ইউরোপীয় সেক্রেটারী নিয়োগ করার ফলে সরকার তার চাহিদা[২] মত টাকা দিতে অসমর্থ ছিল । এতে তার সাংগঠনিক তৎপরতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় ।

----

১. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২ ।

২. ৬ষ্ঠ রিপোর্ট সিলেক্ট কমিটি (এ্যাইচ,সি) ১৮৫২-৫৩ পৃঃ ২৪, ২৯ । ময়রার মিনিটের জন্য শার্প দ্রঃ উদ্ধৃত বৃটিশ নীত ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ১১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮১৮ সালে কমিটি ইউরোপীয় সেক্রেটারী নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের নিকট পুনরায় প্রস্তাব পাঠালেন। উত্তরে কমিটিকে জানানো হয় যে, তারা এমন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন যাতে কোম্পানীর উপর আর্থিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত কোন চাপ না পড়ে। অপাত্রে অর্থ নষ্ট না করার ক্ষেত্রে সরকার কলিকাতা মাদ্রাসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।[১] ১৮১৯ সালে চতুর্থ ইনফেন্ট্রির প্রাক্তন ক্যাপ্টেন এরভিনকে আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম সেক্রেটারী পদে মাসিক তিনশত টাকা বেতনে নিয়োগ করা হয়।[২]

মাদ্রাসা সংস্কার ও পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন :- এর পরের বছর অর্থাৎ ১৮২০ সালে কমিটি মাদ্রাসার আরো কিছু সংস্কারের প্রার্থনা করে একটি খসড়া প্রস্তাব গভর্নর জেনারেলের নিকট উপস্থাপন করে এবং গভর্নর জেনারেল তা মঞ্জুর করে যথাশীঘ্র কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এর উল্লেখযোগ্য কিছু প্রস্তাব এখানে তুলে ধরা হল যেমন (ক) শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহে প্রতিদিন ক্লাস করবে এবং মাদ্রাসার কার্যকাল সকাল ৮টা হতে ২টা পর্যন্ত চলবে। (খ) বিভিন্ন ক্লাসের দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষকের উপর থাকবে। (গ) লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট সেক্রেটারীর মাধ্যমে গভর্নর জেনারেলের নিকট পেশ করা হবে। (ঘ) ভর্তির পূর্বে ছাত্রদের উপযুক্ততা প্রমান করার জন্য একটি পরীক্ষা গ্রহন করতে হবে এবং ভর্তির পর ষান্মাসিক পরীক্ষাও দিতে হবে। (ঙ) বার্ষিক পরীক্ষা প্রতি বছরের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে ১২ টাকা হতে ১০০ টাকা পর্যন্ত নগদ পুরস্কার দিতে হবে। (চ) যে সকল ছাত্র সম্মানের সাথে পরীক্ষায় পাশ করবে, যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করতে হবে। (ছ) ভর্তির জন্য ছাত্রদেরকে লিখিতভাবে দরখাস্ত করতে হবে। (জ) কোন ছাত্রই দু মাসের বেশী মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। (ঝ) কোন ছাত্রই ২৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর মাদ্রাসায় ছাত্র হিসেবে থাকতে পারবেনা। (ঞ) সচ্চরিত্র ও মিতাচারের জন্য ছাত্রদের পুরস্কার বা খেলাত দিতে হবে ইত্যাদি।[৩]

---

১. ফিশার্স মেময়ার্স পৃঃ ৩১৮। উদ্ধৃত বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬।
২. ব্যুরো অব এডুকেশন ইন্ডিয়া, সিলেকসনস ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস, পার্ট-১ পৃঃ ১৮২। সোসিয়াল আইডিয়া এন্ড সোসিয়াল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল ১৮১৮-১৮৩৫, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৭ সোসিয়াল হিষ্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল (১৮৫৪-১৮৮৪) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩।
৩. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১। মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৮২০ সালের সংস্কার অনুযায়ী মাদ্রাসায় নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষা প্রবর্তনের প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু ছাত্র শিক্ষকগণ এ ধরনের পরীক্ষার ঘোর বিরোধীতা করে। বেঙ্গাল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট গ্রন্থে এই বিরোধিতার কারন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেহেতু ইতিপূর্বে মাদ্রাসার পরীক্ষা ঘরোয়াভাবে আদায় করা হত, ছাত্রদের কৃতকার্য হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণ হেড মৌলভীর উপর নির্ভর করত। এ জন্য মাদ্রাসার শিক্ষকগন সর্বদা হেড মৌলবীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য চেষ্টা করত। কেননা ছাত্ররা ফেল করলে তাদের সারা বছরের অধ্যাপনা বিফলে যাবে। কোন শিক্ষকের প্রতি যদি হেড মৌলবী অপ্রসন্ন ও অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে তার ক্লাসের ছাত্ররা অবধারিত ফেল করত। কাজেই এ ধরনের সাধারন পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে ছাত্ররা পরীক্ষার খাতায় যা লিখবে তা যাচাই এবং নম্বর প্রদান করার জন্য অন্যলোক নিয়োজিত হবেন। ফলে ছাত্র শিক্ষক উভয়ের প্রকৃত পরিশ্রম সুচারুরূপে মূল্যায়ন হবে এবং তাদের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে হেড মৌলবীর আর বাড়তি কোন ক্ষমতা ও দাপট থাকবেনা। সুতরাং উপরোক্ত কারনে হেড মৌলবীর নেতৃত্বে সকল শিক্ষক এবং ছাত্ররা এই ধরনের পরীক্ষা প্রবর্তনের তীব্র বিরোধীতা করে।[১] উল্লেখিত গ্রন্থে উপরোক্ত কারন উদ্দেশ্যমূলকভাবে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার বিরোধীতার কারন ছিল অন্য রকম।

কেননা কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী দরসে নিজামিয়ার পদ্ধতি অনুসারে তৈ ও পরিচালিত হত। এই পদ্ধতিতে একজন শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ থাকত। তাই সে সময়ের পরীক্ষা গ্রহনের নিয়ম পদ্ধতি ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। সে সময় পরীক্ষা পাশের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা ছিলনা এবং ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও প্রশ্ন পত্রের কোন ঝুট ঝামেলাও ছিল না। সে সময় শেষ বারের মত একটি পরীক্ষা গ্রহন করা হত। কেননা অধ্যয়নের ব্যাপার ছাত্রের অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষকই ভাল অবহিত থাকেন। তাই নির্দিষ্ট কেতাবাদি পড়া সম্পন্ন হলে শিক্ষক নিজেই ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহন করতেন। শিক্ষক যদি মনে করেন, লেখাপড়া ও জ্ঞান অর্জনে ছাত্রটির মধ্যে কোন দৈন্যতা ও এবটি নেই এবং এতটা দক্ষতা অর্জন করেছে যে, এখন স্বাধীন ভাবে অধ্যাপনা করতে তথা অপরকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার মত যোগ্যতা অর্জন করেছে, তখনই তাকে লিখিত "ইজাযা" বা পরীক্ষা পাশের সনদ প্রদান করেন। পক্ষান্তরে যে ছাত্রকে পাশের অযোগ্য ও অনুপোযুক্ত বলে বিবেচনা করতেন তখন কোনমতেই তাকে সনদ প্রদান করতেন না। সে সময়ের সনদ প্রদানের

---

১. বেঙ্গাল পাস্ট এন্ড প্রেজেনট, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৯৯ উদ্ধৃত, আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ম ছিল যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উচ্চতর অধীত পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় বা মার্জিনে শিক্ষক স্বহস্তে ইজাযা লিখে দিতেন। বড় বড় শিক্ষা কেন্দ্রে পরে সমাবর্তনের মত "দিস্তারবন্দী" অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। তা সত্ত্বেও ছাত্ররা ওস্তাদের স্বহস্তে লিখিত "ইজাযা" কে অধিকতর মূল্যবান মনে করত। সে সময় যোগ্যতা অর্জন ব্যতীত কোন ছাত্রকে অহেতুক পাশ করানো হত না এবং যত দিন না শিক্ষক তার জ্ঞানার্জন সম্পর্কে সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হতেন, ততদিন তাকে অবিরাম পরিশ্রম ও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হত।[১] মাদ্রাসার এই শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা রীতি, পদ্ধতি, বাংলাদেশে শতাব্দীকাল হতে চলে এসেছে। এখন এসব কিছু পরিত্যাগ করে, নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলে শত শত বছরের আরবী শিক্ষার মূল রীতি-নীতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। তাই সরকার যখন প্রাচীন নিয়ম পদ্ধতির উপর কলিকাতা মাদ্রাসায় আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন ও পরীক্ষা গ্রহনের নিয়ম চাপিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে তখন ছাত্র শিক্ষক উভয় এর মধ্যে সন্দেহ ও শংকার উদ্রেক হয় এবং এ কারনে এই নতুন ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতির তীব্র বিরোধীতা করে।

কিন্তু কমিটি পরীক্ষার আধুনীকি করনের প্রচেষ্টা ত্যাগ করলেন না। সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকার কমিটির প্রস্তাবিত আধুনিক পরীক্ষা নীতি ও পদ্ধতি অনুমোদন করলেন এবং কলিকাতার টাউন হলে মাদ্রাার প্রথম পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়। এভাবে ১৮২১ সালের ১৫ই আগষ্ট মাদ্রাসার প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৮২২ সালের ৬ই জুন দ্বিতীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।[২] এই পরীক্ষার সময় বহু গন্য মান্য ব্যক্তি নাগরিক এবং পদস্থ সরকারী অফিসারও কর্মকর্তা পরীক্ষা দেখতে এসেছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ টমাসন, শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারী ডঃ এইচ,এইচ,উইলসন এবং এইচ,ভি প্রিনসেফ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা সময়ে পরীক্ষার ফল গর্ভনরের কাছে পেশ করা হলে তিনি তা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভাল ছাত্ররা পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে পুরস্কার লাভ করে, এতে শিক্ষকগন ও অত্যন্ত গৌরববোধ করেন। ফলে পরীক্ষা পদ্ধতির প্রতি যে বিরোধ মনোভাব ছিল সে বিরোধিতার অবসান ঘটে।[৩] এভাবে ১৮২১ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে আলিয়া মাদ্রাসা এই আধুনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়।

---

১. ডঃ জিয়া উদ্দিন, নেজামে ইমতেহান, মুসলিম ইউনিভার্সিটি জার্নাল ১ম খন্ড, পৃঃ ৩০৪। উদ্বৃত আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পৃঃ৬৪। মাদ্রাসা শিক্ষাঃবাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮।

২. ব্যুরো অব এডুকেশন ইন্ডিয়া সিলেকশন ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস পার্ট-১ পূর্বোক্ত, পৃ ৩১,১৮২।

৩. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৬৪। মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৮২৩ সালে জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারীতে আবার সাং-বাৎসরিক পরীক্ষা শুরু হয়। কমিটি সুনদরভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই পরীক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট গর্ভনর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এই রিপোর্ট দেখে গভর্নর জেনারেল সন্তুষ্ট হন।[১] মাদ্রাসার এই উন্নতির জন্য সেক্রেটারী ডঃ ল্যামসডেন মাদ্রাসা কমিটির কাছে আরো কিছু পুর্নগঠনের প্রস্তাব দিলেন, যাতে ছাত্র এবং রাষ্ট্র উভয়ের উপকার হয়। মাদ্রাসা কমিটি সরকারের নিকট পুনর্গঠনের প্রস্তাব পাঠালেন যে, তখন যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হত, তা পরিবর্তন করে উন্নত মানের পাঠ্যসূচীর মধ্যে বিজ্ঞানকে প্রবেশ করাতে হবে। ছাত্রদের অধ্যয়নে এমন ভাবে নিয়োজিত রাখতে হবে যে, যাতে ছাত্র এবং সরকার উভয়েরই মঙ্গল হয়।[২] কিন্তু ল্যামসডেন অনুধাবন করেন যে, প্রাচ্যের অবাস্তব শিক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্ররা বিপথগামী হচ্ছে। তিনি তাই পুনরায় সরকারকে পাঠ্যসূচীর ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। পাঠ্য পুস্তকের যে অংশ প্রয়োজনীয় সেটকু থাকবে, বাকী অতিরিক্ত অংশ পরিত্যাজ্য হবে। তিনি আরো মন্তব্য করেন যে, ইংরেজী সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্তন হলে এদেশবাসীর চোখ খুলে যাবে। তিনি বিজ্ঞানমূলক ইংরেজী গ্রন্থের আরবী ও ফার্সী ভাষায় ভাষান্তরের কথা বলেন। অনুবাদ কাজের জন্য জনৈক আব্দুর রহিমকে নিয়োগ করা হয়। ল্যামসডেন ১৮২৩ সালের ৩০শে মে, অনুশীলনী পাঠশালা স্থাপনের প্রস্তাব দেন। এতে তিনি মনে করেন যে, মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি হবে।[৩] মাদ্রাসা কমিটি ল্যামসডেনের সাথে একমত হতে পারেননি তাই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং প্রত্যেক জেলাতে প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

১৮২৩ সালে সরকার জনগনের শিক্ষার প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলা প্রেসিডেন্সির অর্ন্তভুক্ত সকল অঞ্চলের জন্য জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন্ সংক্ষেপে জনশিক্ষা পর্ষদ গঠন করেন। জনশিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব হল উক্ত অঞ্চলের শিক্ষার অবস্থা কি এবং বিভিন্ন সরকার প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কি তা নিরুপন করা। তাছাড়া জন সাধারনের জন্য যাতে উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় এবং যাতে সকলের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন সাধন করা যায় জনশিক্ষা পর্ষদ সে সম্পর্কে

----

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৬৪। মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৮

২. বোর্ডস ক্যালেকশন, ৯০৮, পৃঃ২০৩, ২০৭। ল্যামসডেন টু মাদ্রাসা কমিটি ৬ই জুন ১৮২২। মাদ্রাসা কমিটি টু গর্ভনমেন্ট ২২শে জুলাই ১৮২২ উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯৬-৯৭।

৩. বোর্ডস কালেশন ৯০৮, পৃঃ৩৬৫, ৩৭১। ল্যামসডেন টু মাদ্রাসা কমিটি, ৩০শে মে ১৮২৩। উদ্ধৃত বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯৭। ডি, পি, সিনহা, দি এডুকেশনাল পলেসি অব ইষ্ট ইনডিয়া কোম্পানী ইন বেঙ্গাল টু ১৮৫৪ ১ম প্রকাশ, কলিকাতা১৯৬৪, পৃঃ ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনা করবে ।[১] ১৮২৩ সালে গঠিত প্রথম জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন কমিটি অভিমত প্রকাশ করেন যে, এ দেশবাসীকে এদেশেরই বিদ্যা শিক্ষা দেয়া উচিত । শিক্ষার বিষয় হবে প্রাচ্য বিদ্যা, সংস্কৃতি, আরবী, ফার্সী, সাহিত্য, ব্যাকরন এবং সেই সাথে প্রাচ্য দর্শন ।[২] কমিটির রিপোর্টে মোল্লা পুরহিত ইত্যাদি রক্ষনশীল শ্রেনী খুশী হলেন । কিন্তু রাম মোহন রায় প্রমুখ উচচ শিক্ষিত হিন্দু এর প্রতিবাদ করেন । তবে ইনস্ট্রাকশন কমিটির বিরোধিতার কারনে রাম মোহনের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায় ।

১৮২৫ সালে মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত পরীক্ষা পরবর্তী পথের দ্বার খুলে দেয় । এই পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন মিঃ মিল এবং মিঃ থমসন্ । পরীক্ষার ফল দেখে তারা হতাশ হন এবং মাদ্রাসাতে আরো সহজতর পাশচাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার উপদেশ দেন । থমসন্ আরো প্রস্তাব করেন যে, ইংরেজী গ্রন্থ প্রাচ্য ভাষায় পরিশ্রম করে অনুবাদ না করে বরং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত । ডঃ ল্যামসডেন মাদ্রাসাতে পাশচাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দানের পক্ষে জোর অভিমত প্রকাশ করেন । কিন্তু সরকারের পক্ষ হতে এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী না থাকায় তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে দ্বিধা গ্রস্থ ছিলেন । কিনতু পরীক্ষকদের ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুপ্রেরণা পেয়ে জেনারেল কমিটিকে এ বিষয়ে যথারীতি ব্যবস্হা গ্রহন করতে সুপারিশ করেন এবং তিনি কমিটিকে অনুরোধ করেন যে, মাদ্রাসাতে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হোক ।[৩]

১৮২৬ সালে লর্ড উইলিয়াম বেনটিং এর নির্দেশক্রমে মুসলমানদেরকে প্রাচ্য শিক্ষার সাথে প্রাশ্চাত্য শিক্ষা তথা ইংরেজী শিক্ষা দানের নিমিত্ত আলিয়া মাদ্রাসাতে একটি ইংরেজী ক্লাশ খোলা হয় । এর উদ্দেশ্য ছিল, ক্রমান্বয়ে ইংরেজীকে মাদ্রাসার শিক্ষা বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া ।[৪]

----

১. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১ ।
২. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ২৫, ২৬, ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা ও পরিকলপনা সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ সংকলন" শিক্ষা ও পরিকলপনা" প্রকাশ কুমিল্লা, ১৯৮১, পৃঃ ৮৭ ।
৩. বোর্ড কালেকশন, ৯০৮ পৃঃ৭৯,৮৩ । থমসন টু ল্যামসডেন, জানুয়ারী ১৮২৫ সাল । উদবৃত বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পৃঃ পৃঃ ২০০, ২০১ ।
৪. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পৃঃ পৃঃ ৭২ রিপোর্ট অন ইসলামিক এডুকেশন এনড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল ৩য় খন্ড, (১৮৬১-১৯৭৭) পৃঃ পৃঃ ভূমিকা পৃঃ XLIV , (৩২৮)।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে গর্ভনর জেনারেলের নির্দেশক্রমে তাই ১৮২৬ সালে মাদ্রাসা কমিটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্হা করেন । ১৮৫১ সাল পর্যন্ত এ ব্যবস্হাটি চালু ছিল । এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র দুজন ছাত্র ইংরেজী শিখেছিল । এতে মোট খরচ হয়েছিল ১,০৩,৭১৪ টাকা ।[১] কিন্তু এই খাতে বিশেষ অর্থ ব্যয়ও অনেক প্রচেষ্টার পর তেমন সন্তোষজনক ফল লাভ করা যায়নি।কেননা ইংরেজীর প্রতি মুসলমানদের তখন তেমন আগ্রহ ছিল না বরং ঘৃনাবোধই ছিল তীব্র ।তাই আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজী ক্লাসের ব্যর্থতার কারন হিসেবে বলা যায় যে, ইংরেজীর প্রতি মুসলমানদের ঘৃনা সন্দেহ এবং সর্বোপরি অবিশ্বাস । তারা সব সময় সন্দেহ পোষন করত যে, ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়েনা আবার মুসলমানদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস, কৃষ্টি, কালচার ধ্বংশ হয়ে যায় । তাই ইংরেজী শিক্ষার জন্য সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মুসলামানদের মধ্যে ইংরেজীর প্রতি তেমন আগ্রহ ও আসক্তি ছিলনা । উপরন্তু কিছু সংখ্যক নেতৃস্হানীয় ব্যক্তিত্ব ইংরেজীর প্রতি অনীহা ও বিরোধিতা করায় সাধারন মানুষ আরো এর থেকে দূরে সরে যায় । তাছাড়া মুসলমানরা সর্বদাই ইংরেজদের প্রতি মনে মনে ভীতশ্রদ্ধ ছিল । কেননা তারা ছলে বলে কৌশলে মুসলমানদের ক্ষমতা ও রাজত্ব কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে । এমতাবস্হায় ইংরেজী শিখলে তাদের কাছে মাথানত করা হবে বলে তাদের ধারনা ছিল । কিন্তু এই নীতি ও গোড়ামীর ফলে মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে পড়ে । পক্ষান্তরে হিন্দুরা এই সুযোগে ইংরেজী শিখে বড় বড় সরকারী চাকুরী গ্রহন করে এবং ইংরেজদের নিকট তারা অত্যন্ত আস্হাভাজন ও নির্ভরযোগ্য হয়ে পড়ে ।

কিন্তু এর জন্য কম বেশী সরকার ও দায়ী ছিল । কেননা সরকার প্রথমত মুসলমানদেরকে খুব একটা গুরুত্ব দিত না বরং অবহেলা করত । এমন কি শত্রু বলেই মনে করত । অপরদিকে হিনদুদের প্রতি তাদের অনুরাগ বেশী ছিল । এর প্রমান পাওয়া যায় যখন জেনারেল কমিটি দ্বারা সরাকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজ উন্নতি লাভ করতে লাগল, তখন কলিকাতা মাদ্রাসা প্রাচ্যের শিক্ষা ব্যবস্হা দ্বারা বিনষ্ট হতে চললো । ১৮২৮ সালের ১১ই অক্টোবর সরকারের এই অবহেলার কথা স্পষ্ট হয়ে যায় । কারন মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে ইংরেজী ভাষার কোন স্হান ছিলনা ।

----

১. মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

আগের মঞ্জুরী থাকা সত্ত্বেও প্রস্তুতি ক্লাস খুলা হল না । ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মুসলমান যুবকরা সে সুযোগ পেলনা ।[১]

তাই ১৮২৯ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিখানোর একটা পদক্ষেপ নেয়া হয় ।[২] এ কারনে কমিটি ১৮২৯ সালের ৩রা মার্চ একটি প্রস্তাব পাশ করেন । এতে অবিলম্বে মাদ্রাসায় ইংরেজী বিভাগ প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হয় । এভাবে মাদ্রাসাতে ইংরেজী বিভাগ ও ক্লাশ চালু করা হয় এবং ১৮২৯ সালের আগস্ট মাসের দিকে ছাত্র সংখ্যা ৪২ জনে এসে দাঁড়ায় ।[৩] ইংরেজীর প্রতি গুরুত্বারোপ করে ১৮২৯ সালে এক সরকারী আদেশে ইংরেজীকে পর্যায়ক্রমে প্রশাসনিক ও বানিজ্যিক কাজ কর্ম পরিচালনার ভাষা করা হবে বলে ঘোষনা করা হয় ।[৪] ইতিমধ্যে ১৮৩০ সালে বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ আর একটি ডেসপ্যাচ প্রেরণ করেন এবং এতে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি নিশ্চিত অগ্রাধিকার প্রদান করেন । ইংরেজীকে ক্রমশ সরকারী অফিস আদালতে সমস্ত কাজ কর্মের ভাষারূপে ব্যবহারের নির্দেশ দেন । এই ডেসপ্যাচ এদেশে আরবী, ফার্সীর আধিপত্যের অবসানের সূচনা করে এবং এরফলে মুসলিম ঐতিহ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।[৫]

সরকারী আইন এবং চাপ প্রয়োগের কারনে মাদ্রাসায় আরবী, ফার্সী শিক্ষার বাধ্যবাধকতা অনেকাংশে হ্রাস পায় এবং সে ক্ষেত্রে ইংরেজীকে গুরুত্ব দেয়া হয় । তাই ১৮২৯ সালে মাদ্রাসায় ইংরেজী প্রবর্তনের ফলে ইংরেজী ক্লাসে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা রাতারাতি বেড়ে যায় । ১৮৩০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ইংরেজী পড়ুয়া ৯৯ জন ছাত্রের প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । কলিকাতার লর্ড-বিশপ হল্ট ম্যাকেনজী এবং বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ রেভ ডঃ মিলের উপস্থিতিতে রেভ,টি, প্রক্টর পরীক্ষা

---

১. বোর্ডস কালেকশন, ৯৯৭০ এনোয়াল রিপোর্ট ১৮২৬-১৮২৭ । উদ্ধৃত বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৬ ।
২. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯ ।
৩. মাদ্রাসা রেজুলিউশন,৩রা মার্চ ১৮২৯ ।উদ্ধৃত,বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান(১৭৫৭-১৮৫৬) পৃঃপৃঃ২০৬ ।দিলীপ কুমার চট্টপাধ্যায়, ডায়নামিকস্ অব সোসাল ক্লজ ইন বেঙ্গল(১৮১৭-১৮৫১)১ম প্রকাশ (কলিকাতা ১৯৯০)পৃঃ২৪৫ ।
৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,একবিংশ সংখ্যা, পৃঃপৃঃ ৩৫ ।
৫. মাদ্রাসা শিক্ষা ঃবাংলাদেশ পূর্বোক্ত,পৃঃ ৩৯ ।বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা পৃঃপৃঃ১১ ।রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল(১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ভূমিকা,XLIV

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা করেন । পরীক্ষকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে উল্লেখ করেন যে, ছাত্ররা অতি প্রসংশামূলক পরীক্ষা দিয়েছে । এদের মধ্যে অনেকে এমন পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে যে, যে কোন ইংরেজ শিশু এত শীঘ্র এই সময়ের মধ্যে এতদূর অগ্রসর হতে পারতো না ।[১]

১৮৩১ সালের ৩০শে জানুয়ারীতে দ্বিতীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । এ পরীক্ষার ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক হয় । এ সময়কার পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল, ইংরেজী ভাষার উপক্রমনিকা, অংক, ভূগোল ইতিহাস এবং প্রাকৃতিক দর্শনের প্রাথমিক শিক্ষা ।[২] জেনারেল কমিটির এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, একমাত্র মাদ্রাসাই হল উপযুক্ত স্থান যেখানে পাশ্চাত্য সাহিত্য, শিল্পজ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে মুসলিম সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্মিলিত হতে পারে ।[৩] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সরকার ইতিপূর্বে মুসলমান ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন নি, বরং অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন । কেননা ১৮৩০-৩১ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা ও সন্তোষজনক ফল প্রকাশের মধ্য দিয়ে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের ইংরেজীর প্রতি আগ্রহ ছিল । কিন্তু ইংরেজদের বিমাতাসুলভ আচরনও গুরুত্ব না দেয়ার ফলে মুসলমানরা ইংরেজীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেনি । তাছাড়া মুসলমানরা তাদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস ও করতে পারেননি । তাই মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অমনোযোগীতা, এর পিছনে ইংরেজদের অবহেলা ও রাজনৈতিক অসত উদ্দেশ্যই বেশী কাজ করেছে বলে মনে হয় ।

এভাবে ১৮২৯ সালে যখন কলিকাতা মাদ্রাসায় আরবী, ফার্সী শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হয় তখন মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে এর প্রতিআগ্রহ দেখা যায় । প্রতি বছর ইংরেজী ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । কিন্তু মাদ্রাসায় যোগ্য ইংরেজী শিক্ষকের অভাব ছিল । এর ফলে ইংরেজীর মান খুবই প্রাথমিক স্তরের হয় । ১৮৫০-৫১ সালের এক তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, কলিকাতা মাদ্রাসার ১০ জন ইংরেজীর ছাত্রের জন্য মাত্র একজন ইংরেজী শিক্ষক ছিল । "উইড্রো" উল্লেখ করেছেন যে, মাদ্রাসায় ইংরেজী ব্যবস্থায় এরূটি থাকা সত্ত্বেও ছাত্ররা যেটুকু উন্নতি

---

১. এস,আর,বি,জি,১৪শ খন্ড,প্রেসিডেন্সী কলেজের কাগজপত্র সম্পর্কে,পৃঃ১ ।উদ্ধৃত,বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান ,পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৭ ।
২. রিপোর্ট,জিসি,পি,আই ১৮৩১, পৃঃ ৪ ।উদ্ধৃত , পূঃপৃঃ২০৭ ।
৩. বেঙ্গল পাবলিকেশন্স ১৪ই আগষ্ট,১৮৩১, নং ৩৭ বার্ষিক রিপোর্ট ১৮৩০ ।উদ্ধৃত পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৭-৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

করেছে তা তাদের আগ্রহ ও অধ্যবসায় এবং শিক্ষকদের ধৈর্য ও পরিশ্রমের কারনেই সম্ভব হয়েছে।[১] কিন্তু এর পরেও মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়নি । সরকারী জেলা স্কুলগুলিতে আরবী ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলনা । শিক্ষা পরিষদ উপলব্ধি করেন যে, ইংরেজীর সাথে আরবী,ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে তা মুসলমানদের নিকট গ্রহনযোগ্য হবে । কিন্তু এ বিষয়ে বহুদিন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি ।[২]

১৮৩৩ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার সেক্রেটারী মাদ্রাসার কারিকুলাম বর্ণনা করেন । এতে অধ্যয়ন সময়কাল ৭ বছরের নির্ধারন করা হয় । এই অধ্যয়নকাল সমাপ্ত করে একজন কৃতকার্য ছাত্র সনদ প্রাপ্ত হত । শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী শিক্ষাক্রম এভাবে সাজানো হয়েছিল যেমন ১ম বর্ষ:- আইন শাস্ত্র এবং সাধারন সাহিত্য, এর সাথে ব্যাকরন ও সংযোজিত ছিল ।২য় বর্ষ:- আইন শাস্ত্র এবং এ্যারিতমেটিক অথবা এ্যালজাবরা । ৩য় বর্ষ:- আইন এবং জ্যামিতি । ৪র্থ বর্ষ :- আইন শাস্ত্র এবং শিক্ষার্থীদের সুযোগ (অপশন) থাকবে যে, তারা যুক্তি বিদ্যা, অলংকার শাস্ত্র, ম্যাটা ফিজিক্স, প্রাকৃতিক দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্র, অথবা ধর্ম তত্ত্ব ইত্যাদি যে কোন বিষয় ।৫ম বর্ষ:- আইন ও এর সাথে সরকারী রেজিলিউশন সংযুক্ত এবং বিদেশী বিষয়ের যে কোন বিষয় যা ছাত্ররা নির্বাচন করবে । ৬ষ্ঠ এবং ৭ম বর্ষ:- ৫ম বর্ষের শিক্ষাক্রমের অনুরূপ । মাদ্রাসা কমিটি ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার জন্য চেষটা করেছেন এবং ছাত্র বৃত্তি মাসিক ২ হতে ৫ টাকায় উন্নতি ও পর্যাপ্ত কারার ও চেষটা করেন ।[৩]

১৮৩৩ সালে আবার মাদ্রাসায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । এই পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক ছিল । কিন্তু মাদ্রাসা কমিটি এসময় ইংরেজী শিক্ষাকে জটিল করে তুলে । কেননা কমিটি প্রস্তাব করে যে, ইংরেজী এবং আরবী এক সংগে না পড়লে কোন ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান করা হবে না ।[৪]

---

১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৮-২৯ ।
২. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃ:১২৯
৩. কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট ১৯১৭-১৯, ২য় খন্ড,পার্ট১,(কলিকাতা১৯১৯) পৃ:১১০ রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭)৩য় খন্ড,পৃ:পৃ: ৩৩০ । মাদ্রাসা এডুকেশন কমিটি ১৯৩৮,পৃ:৯ উদ্বৃত,হিষ্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ (ডাউ টু ১৯৮০)পূর্বোক্ত,পৃ:৩৮,৩৯ ।
৪. মাদ্রাসা রিজুলিউশন,এপ্রিল ২৬,১৮৩৪,দু:বোর্ডস কালেকশন,৭৭৬৩৩,পৃ:৮০ ।উদবৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬),পূর্বোক্ত,পৃ: ২০৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

এই ভুল পদক্ষেপের কারনে মাদ্রাসায় ছাত্রদের মারাত্মক পরিনতি ডেকে আনে । এতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আরবী বিভাগের বয়স্ক ছাত্ররা ইংরেজী ক্লাসে ভর্তি হওয়া শুরু করে । কিন্তু তাদের বয়স বেশী হওয়ার কারনে ইংরেজী শিক্ষায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয় । এতে কমিটি তাদের ভুল বুঝতে পারে । তাই ১৮৩৫ সাল থেকে আরবী ছাত্রদেরকে ইংরেজী অধ্যয়ন করতে কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা হল না । ফলে ইংরেজী বিভাগে ছাত্র সংখ্যা আবার ৩০ জন হতে ১৩৬ জনে দাড়ায় ।[১] এবং মুসলিম ছাত্ররা ইংরেজী শিক্ষার জন্য অসম্ভব আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে । ১৮৩৭ সালে এ সংখ্যা ১৫৫তে গিয়ে দাড়ায় । তার মধ্যে ২০ জন আরবী বিভাগের ছাত্র ছিল, যারা স্বেচ্ছায় ইংরেজী পাঠ করত ।[২] মাদ্রাসাতে ইংরেজী ভাষায় বর্ণ পরিচয় পড়ানো হত, অংক ভূগোল, ইতিহাস ও প্রাকৃতিক দর্শনের প্রাথমিক পর্যায় পাঠ্য ছিল ।[৩]

অতএব এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের মধ্যে যারা শিক্ষা গ্রহন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তারা ইংরেজী তথা পাশ্চত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে কট্টর মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েনি, কিন্তু এ শিক্ষা গ্রহন করার ক্ষেত্রে তাদের কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল । যে পদ্ধতি এবং যে পাঠ্যসূচীতে তাদের শিক্ষাদান শুরু হয়েছিল তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান কলিকাতা মাদ্রাসা যার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা মোটেও সন্তোষজনক ছিলনা । কাজেই বিভিন্ন কারনেই মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে এবং এতে তারা দারুনভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় ।

প্রাচ্য বনাম ইংরেজী শিক্ষা বিতর্ক :-

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ইংরেজী ভাষা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করে ইংরেজরা তাদের আধিপত্যকে আরো সুদৃঢ় করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠে । সরকার ইংরেজীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকে অধিকতর গুরাত্মারোপ করে । কিন্তু শিক্ষা পদ্ধতি বিশেষ করে শিক্ষার মাধ্যম কি হবে সে বিষয়ে জনশিক্ষা সমিতির কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিলনা । তাই এ সময় শিক্ষার মাধ্যম কি হবে সে সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং তুমুল তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয় ।

---

১. রিপোর্ট জি,সি,পি,আই,১৮৩৫, পৃ:২৭-২৮, উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৯ ।
২. রিপোর্ট জি,সি,পি,আই, ১৮৩৭, পৃ:১৭ উদ্ধৃত পূর্বোক্ত, পৃ:২০৪ ।
৩. রিপোর্ট জি,সি,পি,আই,১৮৩১, পৃ: ৪, উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

একদল মত প্রকাশ করে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম শুধু ইংরেজী ভাষাই থাকবে এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হবে। অপর দল এমতের বিরোধিতা করে মত প্রকাশ করেন যে, এ দেশীয় লোকদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করলে তারা তা সম্যক ভাবে উপলব্ধি ও আয়ত্ব করতে পারবে। উভয় দলই নিজেদের মতামতের স্বপক্ষে নানা যুক্তি প্রমান উপস্থাপন করে। এ সময় বোর্ড অব ডাইরেকটরস্ এর পক্ষ হতে গর্ভনর জেনারেলের নিকট ১৮৩০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর একটি পত্র প্রেরিত হয়। এতে বলা হয় যে, ইংরেজী শিক্ষার প্রসারই বৃটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য। তবে এ ব্যাপারে যেন তাড়াহুড়া করা না হয়। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ও সচেষ্ট থাকতে হবে, যাতে আগামীতে যখন অফিস আদালতে ফার্সীর বদলে ইংরেজী চালু করা হবে, তখন ইংরেজী শিক্ষিত লোকের কোন অভাব যেন না হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যেতে পারে। এই নির্দেশের ফলশ্রুতিতে ইংরেজী গ্রন্থাবলী উর্দু, বাংলা এবং ফার্সীতে অনুবাদ হতে থাকে। কিন্তু যারা স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহন সহ্য করলনা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রশ্নে ইংরেজী বাস্তবায়নকে একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করল, তাদের উদ্দেশ্য সফল হল না। তাছাড়া শিক্ষা কাউন্সিলে উভয় দলের লোক সংখ্যাও ছিল প্রায় সমান সমান। এজন্য উভয়ের তর্ক বিতর্ক প্রায় অমিমাংসিতই রয়ে যায়।[১]

এদিকে লর্ড মেকলে (ম্যাকালে) ১৮৩৪ সালে ভারতে সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে আগমন করলে বড় লাট তাকে শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি পদেও নিযুক্ত করেন। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে উভয় দলের যুক্তি ও প্রমানাদি শিক্ষা কাউন্সিলে উপস্থিত করলে কাউন্সিল উহার রায় প্রদানের জন্য সর্বময় ক্ষমতা লর্ড মেকলের উপর ন্যাস্ত করেন।[২] অপরদিকে গর্ভনর জেনারেল লর্ড বেন্টিং শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহন করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী জনশিক্ষা সাধারন পরিষদের ডিরেক্টর লর্ড মেকলে ভারতের শিক্ষা সংক্রান্ত মন্তব্য পত্র প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে শিক্ষা সাধারন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে উভয় দলের মধ্যে

----

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮-৮৯।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

বিতর্ক হয় । উভয় পক্ষের যুক্তি ও ভোট সমান সমান ছিল । এমতাবস্থায় মেকলে ছিলেন ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী, তাই তিনি সেই দিকেই ভোট দিলেন ।[১] কেননা তিনি এ দেশীয় প্রচলিত ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে, সেগুলি (ভাষা) অত্যন্ত নিম্নমানের ও নিম্ন স্তরের জ্ঞান বিস্তারের বাহন হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য । এমতাবস্থায় ইংরেজ সরকার যদিও ধর্ম মতের ব্যাপারে উদারতা দেখাবার পক্ষপাতি, তবুও এরপর সুশিক্ষার জন্য সংস্কৃত ও আরবীর স্থলে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন করাই কর্তব্য । তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থ যা ছাপা হয় তা মোটেই বিক্রয় হয় না । পক্ষান্তরে ইংরেজী গ্রন্থ সমূহের প্রচুর চাহিদা রয়েছে । এ দেশীয় আইন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য সংস্কৃত ও আরবী সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা চালু রাখার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন যে, সংস্কৃত ও আরবী ভাষা হতে আইনগুলি ইংরেজী অনুবাদ করে নিলে ঐ উদ্দেশ্য সহজেই হাসিল হবে ।[২] যাই হোক অবশেষে লর্ড মেকলের ১৮৩৫ সালের মিনিট প্রশ্নটির মীমাংশা করে দেয় । লর্ড মেকলের উদ্যোগে ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা এবং ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষার বাহন হবে ইংরেজী । অর্থাৎ এখন হতে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানই হল সরকারী নীতি । তিনি আরো ঘোষনা করেন যে, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বাহন হবে ইংরেজী সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সরকারী আর্থিক সাহায্য দেয়া হবে ।[৩]

এভাবে ১৮৩৫ সালে মেকলের সুপারিশকৃত নতুন শিক্ষা নীতি প্রাচ্যপন্থী ও প্রতীচ্য পন্থীদের মতবিরোধের অবসান ঘটে । মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে । মেকলে শুধু প্রাচ্য বিদ্যাকেই (আরবী) অস্বীকার করলেন না ; মাতৃভাষার দাবীকেও অস্বীকার করলেন । ইংরেজী, শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শেনীর সুবিধা হল । কিন্তু উচ্চ বংশীয় মুসলমানরা এই পরিবর্তনের জন্য পূর্ব হতে প্রস্তুত

----

১. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, "উনিশ শতকে বাংলার মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা", ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী (ঢাকা ১৯৮৩) ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১০৫ ।

২. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২ ।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, এক বিংশ সংখ্যা, পৃঃপৃঃ ৩৫ । উনিশ শতকে বাংগালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা ২য় খনড, পৃঃপৃঃ ১০৫ । মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮) পৃঃপৃঃ ৩২ । মাদ্রাসা শিক্ষাঃবাংলাদেশ পৃঃপৃঃ ৩৯ । আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস পৃঃপৃঃ ১১-১২ । বাংলার মুসলমানেদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) পৃঃপৃঃ ১২৫ । ভারতের শিক্ষা সমস্যা পৃঃপৃঃ ১৩৯-৪

Dhaka University Institutional Repository

না থাকায় দারুনভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় এবং আরবী মাদ্রাসাসমূহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।[১] এভাবে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষা বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্কের পর অবশেষে ইংরেজীকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ঘোষনা করা হয় এবং সকল অর্থ ইংরেজী শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়িত হবে বলে নির্দেশ জারী করা হয়। ইংরেজীকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার জন্য ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকেই রাজ ভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে মুসলমানদের উপর্যপুরি প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার ১৮৩৭ সালে শিক্ষানীতি সমপর্কিত ২৯ নং ধারা শীর্ষক একটি আইন পাশ করেন। এই আইন অনুযায়ী দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালত হতে চিরতরে ফার্সী ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয় এবং স্থানীয় ভাষাকে ফার্সীর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ফার্সীর পরিবর্তে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার সমপর্কেও তুমুল প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়। পূর্ব বাংলা হতেও ফার্সীকে অফিস আদালত হতে বাদ না দেয়ার জন্য বহু প্রতিবাদ লিপি সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা হতে ৪৮১টি দস্তখত সম্বলিত একখানি আবেদন পত্র পাঠান হয়। দস্তখতকারীদের মধ্যে ১৯৯ জন হিন্দু ও ছিল।[২] ১৮৩৭ সালের এক সরকারী নির্দেশ বলে অফিস আদালতে ফার্সীর ব্যবহার রহিত করে সে স্থলে আঞ্চলিক ভাষা (বাংলা) বা ইংরেজী ভাষা প্রয়োগের অনুমতি প্রদান করা হয়। সেই দিন হতেই ৬শত বছরের বেশী দিন ধরে প্রচলিত ফার্সী ভাষা বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঙ্গন হতে বিদায় গ্রহন করে এবং প্রশাসনিক কাজ কর্ম বাংলা ও ইংরেজীতে চলতে থাকে।[৩]

হিন্দু মুসলিম উভয় সম্মিলিত ভাবে ইংরেজ সরকারের এহেন আদেশ তথা ফার্সীকে অফিস আদালত হতে বাদ দেয়ার জন্য তীব্র প্রতিবাদ করে। কেননা হঠাৎ করে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করায় এর জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই দীর্ঘ ৬ শত বছরের ঐতিহ্যবাহী ফার্সী শিক্ষা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে হতাশা ও সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীর প্রবর্তন, ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে বিরাট চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র বলে মনে করে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। ইতিপূর্বে ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ বেন্টিং যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন তখন কলিকাতার ৮ হাজার মুসলমান ছাত্র সেই

---

১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯।
২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪-১৫।
৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, এক বিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং ৮ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদ লিপি দিয়েছিল। কারন তাদের মতে ঐ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা।[১]

এরপর শিক্ষা বিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট সকল অর্থ যখন সরকার কেবল ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিল এবং গরীব ছাত্রদের বৃত্তি ও ভাতা দেয়ার নিয়ম রহিত করে কেবল মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করল। তখন মুসলমানগণ হতভম্ব হয়ে গেলে। অবশ্য ১৮৩৫ সালের নির্দেশ নামায় বৃত্তি প্রথার ক্রম অপসারনের প্রস্তাব ছিল। এ নির্দেশে মাদ্রাসার গরীব ছাত্রদের উপর প্রচন্ড আঘাত আসে। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও আলেম সম্প্রদায়েসহ ৮ হাজার[২] ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পত্র সরকারের নিকট প্রেরণ করে। এ ধরনের সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। এতে বলা হয় যে, হিন্দু ও মুসলমানদের শাস্ত্র আলোচনার পথ বন্ধ করে সরকার যেভাবে শুধু ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইছেন, এর ফলে জনসাধারনের মনে এমন সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয় যে, সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা। অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার জন্য সমুদয় অর্থ বরাদ্দ করার অর্থ এ দেশের লোকদেরকে খৃষ্টান করার অশুভ পায়তারা এবং সর্বস্তরে ইংরেজী চালু করার অর্থ মূলত খৃষ্টান ধর্মেরই ব্যাপক প্রচার মাত্র।[৩] দরখাস্তকারীরা আরো প্রতিবাদ করে যে, বাংলাদেশের প্রায় মুসলিম পরিবারই অত্যন্ত দরিদ্র। কিন্তু যে কয়জনের কিছুটা ধন সম্পদ আছে, তারা আবার শিক্ষার প্রতি উদাসীন। মাত্র চার হতে পাঁচ জন সম্পদশালী পরিবারের ছাত্র ব্যতীত মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্রই কলিকাতার বাইরে থেকে লেখা পড়া করতে আসে। তাদের একান্ত আকংখা সরকারী সাহায্য পাবে। যাদের শিক্ষা গ্রহনের তীব্র ইচ্ছা আছে, কিন্তু তারা অত্যন্ত দরিদ্র। সুতরাং সরকারকে বৃত্তি প্রথা পুনরায় চালু করার জন্য জোর আবেদন করা হচ্ছে।[৪] এদিকে অকল্যান্ড মাদ্রাসার জন্য বৃত্তি মঞ্জুর করার সুপারিশ করেন। তিনি হব হাউসের কাছে লিখেন যে, আমরা ভীষন উদার, অরিয়েন্টাল গ্রন্থের ছাপা কাজে আর বাধানেই। কিছু বৃত্তি দিয়ে মাদ্রাসার মুসলমানদেরকে যদি হাতে রাখা যায়

---

১. এন,কে,সিনহা,হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল(১৭৫৭-১৯০৫) পৃঃ৪৬০। উদ্ধৃত,বংগদেশে ইংরেজী শিক্ষা বাংগালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭১। বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা,পৃঃ পৃঃ ১৩। ভারতের শিক্ষা সমস্যা, পৃঃ পৃঃ ১৪০।

২. বৃটিশ নীতি ও' বাংলার মুসলমান গ্রন্থে ২৩১ পৃষ্টায় ১৮ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্তের কথা বলা হয়েছে এবং আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস গ্রন্থে ৮শত এর কথা বলা হয়েছে পৃঃপৃঃ৯২।

৩. মুসলিম মানষ ও বাংলা সাহিত্য(১৭৫৭-১৯১৮) পৃঃপৃঃ৪০। আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস,পৃঃপৃঃ৯২।

৪. ইন্ডিয়া পাবলিকেশন ২৯শে আগষ্ট১৮৩৬। উদ্ধৃত বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান পৃঃপৃঃ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

তবে খারাপ কি ? কিন্তু সম্পূর্ণভাবে যদি এই প্রথার পরিবর্তন বা বিলুপ্ত করা হয় তবে উত্তপ্ত অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং ভারতের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে ।[১]

১৮৩৯ সালের ২৪শে নভেম্বর লর্ড অকল্যান্ড শিক্ষা সম্পর্কিত একটি নতুন অর্ডিন্যান্স বা ফরমান জারী করে এ দেশের মৌলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন । অধ্যাপকদের পদচ্যুতিরোধ, ছাত্রদের বৃত্তি বন্ধ এবং অধ্যাপকদের ছাটায়ের পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না বলে, লর্ড অকল্যান্ডের এই সিদ্ধান্ত বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ ১৮৪১ সালের জানুয়ারীতে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন । এতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশীয় কলেজ ও প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পূর্বে যে নিয়মে ও ধারায় ব্যয় বরাদ্দ হত, উহা যথারীতি ও যথা নিয়মে বলবৎ থাকবে ।[২] আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষিতদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু লর্ড অকল্যান্ডের ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিতে আলিয়া মাদ্রাসা কোন মতে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পায় । আলিয়া মাদ্রাসার নামে যে অর্থ বরাদ্দ ছিল ও ছাত্রদের যে বৃত্তি ছিল সে সম্পর্কেও কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হল না, সেগুলির আর্থিক সাহায্য পূর্ববৎ অক্ষুন্ন থাকে । অকল্যান্ড কর্তৃক উক্ত সুযোগ সুবিধা বলবৎ হলেও পূর্বোক্ত বৃটিশ নীতির কারনে স্বভাবতই আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের মন ইংরেজী শিক্ষা হতে উঠে গেল এবং অবশেষে মাদ্রাসায় ইংরেজী ক্লাশ বন্ধ করে দেয়া হল ।[৩] এদিকে ১৮৪২ সালে এক রিপোর্টে মাদ্রাসার আইন শৃংখলা অসন্তোষজনক পর্যায় পৌঁছে এবং অবনতি লক্ষ্য করা যায় । মাদ্রাসায় যে ইংরেজী ক্লাশ চালু করা হয়েছিল আরবী বিভাগের ছাত্রদের কর্তৃক সাড়া না পাওয়া যাওয়ায় তা অবহেলিত থেকে যায় এবং স্বাভাবিক ভাবেই উহা বন্ধ হয়ে যায় ।[৪] কিন্তু মাদ্রাসাতে ইংরেজী ক্লাশ বন্ধ হয়ে গেলেও অন্যত্র ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়নি । এতে মাদ্রাসার ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহন না করায় কার্যত নিজেরাই ভীষনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । কেননা ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ফলে সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে ইংরেজী অজানা মাদ্রাসার ছাত্রদের চাহিদা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে । তাছাড়া ১৮৪৪ সালে এই মর্মে এক সরকারী সার্কুলার দেয়া হয় যে, চাকুরী ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষিতদের প্রাধান্য দেয়া হবে । কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পর মাদ্রাসা শিক্ষার প্রশাসনিক প্রয়োজন বলতে গেলে ঐ সার্কুলারের সাথেই শেষ হয়ে যায় । মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা ক্রমাগত কর্মচ্যুত ও মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে ।[৫]

---

১. এডিশনাল মেসেস ৩৬৪৭৩, অকল্যান্ড টু অহব হাউস, ৯ই এপ্রিল ১৮৩৭, উদ্ধৃত বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩২ ।
২. এডুকেশনাল প্রোসিডিংস এপ্রিল ১৮৬১ । উদ্ধৃত আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পৃঃ পৃঃ ১৮ ।
৩. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পৃঃ পৃঃ ১৮ ।
৪. কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট ১৯১৭-১৯ । ২য় খন্ড, পার্ট-১, কলিকাতা ১৯১৯, পৃঃ ১১
৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, এক বিংশ সংখ্যা, পৃঃ পৃঃ ৩৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

যেভাবেই বিচার বিশ্লেষন করা হোক না কেন, সরকারের এসব প্রচেষ্টায় অধিকতর লাভবান হয়েছে শহরের লোক এবং বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষানুরাগীরা। মুসলমানদের মধ্যে তখনও ইংরেজী শিক্ষার তেমন প্রচলন হয়নি। কেবল কলিকাতা মাদ্রাসায় প্রাথমিক মানের ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হত। এতে মাদ্রাসার ছাত্ররা কলেজের উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগীতায় যোগ্যতা প্রমান করতে পারত না। উনিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশকের দিকে মুসলমানরা এসব কারনেই আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়ে।[১] এর একটি পরিসংখ্যানে আমরা আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারব। ১৮৪১ সালে বাংলাদেশের স্কুল, কলেজে মোট ৪০৩৪ জন ছাত্র ছিল, এদের মধ্যে ৩১৮৮ জন হিন্দু ও ৭৫১ জন মুসলমান ছিল। তবে মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশই কলিকাতা মাদ্রাসা ও হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। এসময় পূর্ব বাংলায় কোন কলেজ ছিলনা। ১৮৪৬ সালে মোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪৫৩৭ জন। এদের মধ্যে ৩৮৪৬ জন হিন্দু ছাত্র এবং মাত্র ৬০৬ জন ছিল মুসলমান ছাত্র। আবার মুসলমান ছাত্রদের ২২৪ জন ছিল কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্র এবং ২২২ জন ছিল হুগলী মাদ্রাসার। এই বছর ঢাকা কলেজে ও স্কুলে ২৬৩ জন হিন্দু ও ১৮ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। ১৮৫০-৫১ সালে মোট ৪৬৭৪ জন ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে ৩৮১৪ জন হিন্দু ও মাত্র ৭১৬ জন মুসলমান ছিল। মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে আবার ৪৩৩ জন কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্র ও ১৪৫ জন হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। হুগলী কলেজে ৩৮১ জন হিন্দু ছাত্র এবং মাত্র ৬ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। ঢাকা কলেজ ও স্কুলের মোট ৩৮৩ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ২১ জন মুসলমান ছাত্র ছিল।[২]

১৮৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল সমগ্র উপমহাদেশের শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টে এক রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। এতে দেখা যায় যে, সকল শ্রেনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৭,৩৬০ জন। তারমধ্যে ১৩ ৬১১ জন হিন্দু এবং মাত্র ১,৬৩৬ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। বাংলা, বিহার ও আসামে মোট ৭০৩৬ জন ছাত্র ছিল। এদের মধ্যে মাত্র ৯০৭ জন মুসলমান এবং ৪১৮৬ জন বর্ন হিন্দু ছিল। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ১৫২ জন এবং হুগলী মাদ্রাসায় ২৮০ জন উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকা কলেজে

---

১. উনিশ শতকে বাংগালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬।
২. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩১-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৩০১ জন হিন্দু ও মাত্র ২৪ জন মুসলমান, কুমিল্লা স্কুলে ১১৯ জন হিন্দু, ১৮জন মুসলমান। চট্টগ্রামে ৭২ জন হিন্দু ১৪ জন মুসলমান, সিলেটে ৪৫ জন হিন্দু মাত্র তিন জন মুসলমান, যশোহরে ৯৬ জন হিন্দু মাত্র ৩ জন মুসলমান ইত্যাদি।[১] অতএব উক্ত পরিসংখ্যান হতে মুসলমানদের শিক্ষিতের হার ও শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম অবক্ষয় ও অবনতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হিন্দু ছাত্ররা শিক্ষিত হয়ে সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য অধিকাংশ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। অপরদিকে মুসলমানদের সচেতনতার অভাব, সরকারী প্রচেষ্টার অভাব ও অবহেলা, মুসলমানদের ইচ্ছাকৃত আত্মাভিমান, কিংবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারনে, বৃটিশ প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি। যার ফলে তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে চরমভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনীহা উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেও মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান ছাত্রদের শুধু মাত্র প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষিত না করে বরং পাশাপাশি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত করার মানসে মাদ্রাসায় ইংরেজী বিভাগ চালু করা হয়েছিল। কিন্তু এতে তেমন সফলতা আসেনি। বিভিন্ন কারনেই তা ব্যাহত হয়। ১৮৪৭ সালেও দেখা যায় মাদ্রাসার আরবী বিভাগের ছাত্রদের জন্য ইংরেজী বিভাগ খোলা হয়েছিল, তারা খুব কম সংখ্যকই ইংরেজী পড়তে আসে। তাদের বদলে যারা পড়তে আসত তাদের নাম দেয়া হয় "এ্যাংলো এ্যারাবিক" বা আধা আরবীয়।[২] তাই আরবী বিভাগের ছাত্রদের উপকারার্থে ১৮৪৯ সালে মাদ্রাসায় এ্যাংলো এ্যারাবিক ক্লাস চালু করা হয়। কিন্তু এতে ছাত্রদের আশানুরূপ সাড়া ও সহযোগীতা না পাওয়ায় তা সফলতা লাভ করতে পারেনি। অবশেষে এ্যাংলো এ্যারাবিক বিভাগ বন্ধ করে দেয়া হয়। তবে ঐ ব্যর্থতার কারন হিসেবে বলা যায় যে, ইংরেজী শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্বাচন করায় ছাত্ররা ইংরেজীর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেনি। এইঅসফলতার দরুন তাই ১৮৫৩ সালে হাই ইংলিশ স্কুল,

---

১. মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৪-৫।

২. জি,আর,পি,আই, ১৮৪৭-৪৮, পৃঃ ৫০। আবদুল লতিফ, মোহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল, ট্রানজেকশনস অব বেঙ্গল সোসাল সাইন্স এসোসিয়েশন, ১৮৬৮, পৃঃ ৫৩, উদ্ধৃত বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬২। বঙ্গ দেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ নামে কলিকাতা মাদ্রাসায় আলাদা এক বিভাগ খোলা হয় । এতে কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয় ।[১] তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজী ও এ্যাংলো এ্যারাবিক বিভাগে উপযুক্ত ও দক্ষ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ না করে ইংরেজী বিভাগের উন্নতির জন্য কোন কিছু করা হয়নি । এ্যাংলো এ্যারাবিক বিভাগেও যে শিক্ষা দেয়া হত, সেটাও ছিল বিভ্রান্তিকর এবং অসম্পূর্ণ, কেবল মুখস্থ বিদ্যার উপরই চর্চা হত । ইংরেজী বিভাগ তেমনিভাবে তার এুটিপূর্ণ শিক্ষানীতি নিয়েই চলতে লাগলো এবং এ্যাংলো এ্যারাবিক বিভাগ ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে অবহেলিত হতে লাগল । ১৮৫০-৫১ সালের এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, ৯০ জন ছাত্রের জন্য মাত্র একজন শিক্ষক ছিলেন । তাঁকে বর্নমালা শিক্ষা দান হতে শুরু করে গোল্ড স্মিথ, ওয়াটস্ ,ইউক্লিড প্রভৃতি বিষয়েও পড়াতে হত ।[২] এভাবে মাদ্রাসার ইংরেজী ,এ্যাংলো এ্যারাবিক ও বাংলা বিভাগের এুটি বিচ্যুতি এমন ভাবে প্রকাশ পেল যে, কাউন্সিলের দৃষ্টি এড়াতে পারল না । বেথুন তাঁর এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অবনতির মুল কারন হল সেক্রেটারীর সাথে কাউন্সিলের সদভাব ও সহযোগীতার অভাব, তারা কে কি উদ্দেশ্যে শিক্ষার সংস্কার সাধন করতে চান তা বোঝা যায় না ।[৩]

সুতরাং ১৮১৩ সাল হতে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে কোম্পানী বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে । তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে মত বিরোধ থাকায় উপমহাদেশে শিক্ষার উন্নতি ব্যহত হয় । তবে ১৮১৩ সালে বৃটিশ সনদ আইনের সুপারিশ অনুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সঠিকভাবে নির্ধারন, বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা, শিক্ষার উপযুক্ত পদ্ধতি প্রনয়ন ও শিক্ষাদানের মাধ্যম সম্পর্কে বিস্তারিত চিন্তা ও গবেষনা করে সঠিক সংস্কার ও পরিবর্তন আনয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয় । কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্নয় করতে গিয়েই নানা মত বিরোধের সৃষ্টি হয় ।[৪] অপরদিকে ১৮২৬ সাল হতে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য

---

১. রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ভুমিকা ,৩৩ ।

২. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৪ ।

৩. বেঙ্গল, ইডেন পাবলিকেশন্স, ১ই জানুয়ারী ১৮৫০-নং-১৫ মিনিট বাই বেথুন ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৪৯ । উদ্বৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৬৫) পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৪

৪. শিক্ষাক্রম : তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ সরকার বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেন । ১৮২৬ সালে মাদ্রাসায় ইংরেজী ক্লাশ চালু, ১৮২৯ সালে ইংরেজী বিভাগ এবং ১৮৪৯ সালে এ্যাংলো এ্যারাবিক বিভাগ চালু করা হয় । কিন্তু ইংরেজী শাসনের প্রতি মুসলমানদের বিরূপ মনোভাব থাকায় সে প্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্য মন্ডিত হয়নি । তবে নবাব আবদুল লতিফ ও অন্যান্য মুসলিম নেতাদের উদ্যোগে ১৮৫৩ সালে যে ইঙ্গ ফরাসী বিভাগ খোলা হয়, তা অবশ্য মুটামুটি সাফল্য অর্জিত হয় ।[১] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই সুদীর্ঘ সময়ে নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে তেমন কোন গুনগত পরিবর্তন করা যায়নি এবং ইংরেজী শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানকে মুসলমানদের নিকট তেমনভাবে জনপ্রিয় করে তুলাও সম্ভব হয়নি । মুসলমানদের ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব, অবিশ্বাস এবং ইংরেজী শিক্ষার ফলে ধর্মহীনতার ভয় ইত্যাদি হয়তো ইংরেজী শিক্ষা হতে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল । তাছাড়া সরকারের রাজনৈতিক কূট কৌশল ও মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব মুসলমানদের আস্থা অর্জনে সন্দিহান করে তুলেছিল । যেভাবেই হোক ১৮৫০ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি হয়নি, বরং ধর্মীয় শিক্ষার উপর নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হয়েছে ।

মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ নিয়োগ ও শিক্ষা সংস্কার :- ওয়ারেন হেষ্টিংস এর শাসনামল পর্যন্ত শিক্ষানীতির কোন উন্নতি হয়নি এবং ভাল লেখাপড়াও হয়নি । ১৮৪২ সালে মাদ্রাসা কমিটি ভেঙ্গে দেবার পর হতে কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষা ও শৃংখলার মান ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে । এই অবস্থা প্রতিকারের জন্য ১৮৫০ সালে শিক্ষা কাউন্সিল অন্যান্য কলেজগুলির মত আলিয়া মাদ্রাসাতেও একজন ইংরেজ প্রিন্সিপাল নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করে । কাউন্সিলের এই প্রস্তাব সরকার গ্রহন করে প্রাচ্য ভাষা ও শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ ডঃ স্প্রীঙ্গারকে আলিয়া মাদ্রসার প্রথম প্রিন্সিপাল নিয়োগ করেন[২] ডঃ স্প্রীঙ্গার ১৮৫০ সালের নভেম্বর মাসে অধ্যক্ষ হিসেবে কাজে যোগদান করেন ।[৩]

---

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭ ।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯ । মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪ । বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪-১৫ ।

৩. কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট ১৯১৭-১৯ । ২য় খন্ড, পার্ট-১ (কলিকাতা ১৯১৯), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১১ । রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৮ । বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭০ ।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ স্প্রীঙ্গার অধ্যক্ষের পদ গ্রহনের পর ১৮৫০ সালেই মাদ্রাসার কতকগুলি আভ্যন্তরীন ব্যাপারে পরিবর্তন ও সংস্কারের চেষ্টা করেন। নিজের ইচ্ছানুযায়ী তিনি এই সংস্কারের একটি স্কীম ও তৈরী করেন এবং সবার্গ্রে মাদ্রাসার শিক্ষা বিষয়ের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বিক্ষুব্দ্ধ ছাত্রদের দ্বারা অপমানিত ও হন। শিক্ষা কাউন্সিল মাদ্রাসার এই আন্দোলন ও গোলযোগের কারন অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।[১] এই কমিটি জে,ই,ডি,বেথুন, সভাপতি শিক্ষা কাউন্সিল, মিঃ এফ,জে,হালিডে বাংলার প্রথম লেঃ গর্ভনর, মিঃ সিসিল বেডেন বাংলার লেঃগর্ভনর এবং ডঃ জে,ফোসেথ প্রমুখ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয়। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হতে জানা যায়, ছাত্ররা সংস্কার স্কীমের বিরুদ্ধে যে, আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহন করে তার কারনগুলি ছিল, যেমন মায়বুজী গ্রন্থকে শিক্ষা বহির্ভূত করার প্রয়াস, পুরাতন হেকমতকে বিষয় বহির্ভূত করে নতুন হেকমতের পবর্তন, আরবীর বদলে উর্দু ভাষায় হেকমত (বিজ্ঞান) শিক্ষার প্রবর্তন এবং আধুনিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য জনৈক এ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে (মিঃলওয়ার) নিয়োগ করার প্রস্তাব ইত্যাদি।[২] এ সময় আলিয়া মাদ্রাসায় ২টি বিভাগ ছিল। একটি আরবী বিভাগ। যেখানে আরবী বর্ণমালা হতে শুরু করে সকল উচ্চ আরবী বিষয়ের শিক্ষাদান করা হত। মাদ্রাসার গোড়াপত্তন হতেই এই বিভাগ চালু ছিল। অপরটি হল ইংরেজী বিভাগ। ১৮২৯ সালে এই বিভাগের যাত্রা শুরু। ইংরেজী বিভাগকে মুলত ইংরেজী শিক্ষার প্রাইমারী পর্যায় বলা যেতে পারে। এই বিভাগে ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাও পড়ানো হতো। ঐচ্ছিকভাবে ইংরেজীর সাথে বাংলা পড়তে হত ১৮৪৯ সালে মাদ্রাসায় একটি এ্যাংলো এ্যারাবিক ক্লাশের পত্তন হয়। এই ক্লাসের মাসিক ব্যয় ছিল মোট ১০০/- টাকা কিন্তু এরপরও মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষার উন্নতির কোন লক্ষন দেখা যায়নি।[৩]

কিছু সংখ্যক লোকের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি টান থাকা সত্ত্বেও আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষার তেমন উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। এর কারন হল, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের আন্তরিক টান যেমন ছিলনা, তেমনি এই বিভাগের ব্যবস্থাপনা ছিল অপ্রতুল ও নিম্নমানের।

----

১. রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৮।
২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০০।
৩. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস পূর্বোক্ত, পৃঃ১০১-১০২। সোসিয়াল হিস্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল (১৮৫৪-১৮৮৪) পূর্বোক্ত, পৃঃ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, যেসব মুসলমান বিশেষভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তারা নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে সেন্টপল স্কুল ও প্যারেন্টাল একাডেমীতে ভর্তি করে দিত। এজন্য কমিটি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আলিয়া মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের মান এবং ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করলেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। তখন ছাত্ররা সেন্টপল বা প্যারেন্টাল একাডেমীর পরিবর্তে মাদ্রাসাতেই ভর্তি হবে।[১]

অতপর তদন্ত কমিটির সুপারিশক্রমে শিক্ষা কাউন্সিল জুনিয়র স্কলারশীপ মান পর্যন্ত উভয় বিভাগের (এ্যাংলো অ্যারাবীক, ইংরেজী) বিলোপ সাধন করে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য ১৮৫১ সালে এ্যাংলো পার্শিয়ান নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়।[২] এই বিভাগে মুখ্যত ইংরেজীর সাথে ফার্সী অধ্যয়ন করা হবে। এ ছাড়াও এই বিভাগের ছাত্রদের জন্য বাংলা এবং উর্দু শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে। কেননা উর্দু এই উপমহাদেশের সাধারন ভাষা এবং বাংলা এই বাংলা প্রদেশের নিজস্ব ভাষা। মোট কথা এই বিভাগ হতে উত্তীর্ণ ছাত্ররা জুনিয়ার স্কলারশীপের মর্যাদা পাবে এবং যাকে সকুল অনার্স বলা যেতে পারে। এই কোর্সে ছাত্ররা ১০ হতে ১১ বছর বয়সে ভর্তি হবে এবং ৫ হতে ৬ বছরে এই কোর্স শেষ করবে। এই কোর্স শেষ হবার পর ছাত্ররা ইচ্ছা করলে ঐচ্ছিক ভাবে আরবী অথবা ইংরেজী নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহন করতে পারবে। যারা আরবী পড়তে ইচ্ছুক তারা আলিয়া মাদ্রাসাতেই পড়াশুনা করতে পারবে এবং যারা ইংরেজী বিষয়ে পড়তে ইচ্ছুক তারা মেট্রোপলিটান কলেজে শিক্ষা গ্রহন করতে পারবে।[৩]

<u>আরবী বিভাগের সংস্কার</u> :- এদিকে শিক্ষা কাউন্সিল আলিয়া মাদ্রাসার মৌলিক শিক্ষা ঠিক রেখে ছাত্রদেরকে অধিক হারে ইংরেজী শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করে, যাতে তারা অনায়াসে মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পার। তাই শিক্ষা কাউন্সিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০২।

২. মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৪। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১। রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩২৮।

৩. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১০৩। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস(১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ১২১। এস,আর,বি,জি,১৪শ প্রেসিডেন্সি কলেজ কাগজ পত্র সম্পর্কে, এ্যাপ খন্ড ২৬ খন্ড মিনিট বাই এইচ,এফ,জে,হ্যালিয়ে ১৬ই মার্চ ১৮৪২, পৃঃ১৩ উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

আলিয়া মাদ্রাসার আরবী শিক্ষার যুগউপযোগী সংস্কারের প্রস্তাব আনা হয় । কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাচীন পন্থী হেকমত বা বিজ্ঞান ও ফালসাফা বা দর্শন আরবী বা যে কোন ভাষাতেই হোক না কেন উহা চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয় । কেননা এতকাল পরও দুই হাজার বছরের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ বাঁচিয়ে রাখার কোনই যৌক্তিকতা নেই । তাই এই বিজ্ঞান ও দর্শনের পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে কিংবা পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করে শিক্ষা বিষয় হিসেবে তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । কাউন্সিলের রিপোর্টের শেষ পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, সরকার হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজ পত্তন করে হিন্দুদের প্রাচীন ধর্ম কথা ও রীতি নীতি পাঠ করার যে সুযোগ দিয়েছেন তেমনি আলিয়া মাদ্রাসা পত্তন করেও মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবী ও সাহিত্য শিক্ষার একটি সুব্যবস্থা করেছেন । কাউন্সিলের এই প্রস্তাবনার ভিত্তিতে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ও (বিলাতে অবস্থিত) অনুরূপ মন্তব্য করেন । এ্যাংলো পার্শিয়ান, ব্রাঞ্চ স্কুল ও মাদ্রাসার সংস্কার সম্পর্কিত কাউন্সিলের সমুদয় প্রস্তাব লর্ড ডাল হৌসী ১৮৫২ সালে অনুমোদন করেন এবং এরপর স্থায়ীভাবে এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগের পত্তন হয় । ১৮৫৪ সালে এই বিভাগের উদ্বোধন করা হয় । প্রস্তাবিত জুনিয়র স্কলার শিপের মান পর্যন্ত এই বিভাগ চালু করে কলঙ্গাতে একটি ব্রাঞ্চ স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করা হয় । কলঙ্গা শাখা স্কুলেও আলিয়া মাদ্রাসার অনুরূপ আরবী এবং এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ খোলা হয় ।[1]

ডঃ স্প্রীঙ্গার ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারীতে আরবী, ফার্সী শিক্ষা সম্পর্কে এক পরিকল্পনা রিপোর্ট পেশ করেন । তাঁর রিপোর্টের সারসংক্ষেপ এই যে, আরবী এবং ফার্সী ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য, ভাষা তাত্বিক কারনে ছাত্রদেরকে প্রথমে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে জ্ঞানদান করা এবং তারপরে তার আনুসঙ্গিক কঠিন তত্ত্ব আলোচনা করা । তিনি আরবী এবং ফার্সীকে শেখাতে চান, যে রকম ইউরোপে গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষাকে শেখানো হয় । যারা ইংরেজী ভাষা শিখছে একমাত্র তাদেরকেই ইংরেজী পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে । যারা উর্দু শিখছে তাদের জন্য নয় ।[2] শিক্ষা কাউন্সিল যখন এই পরিকল্পনা প্রচার করে ,তখন "বেডন" এবং

----

১. প্রবলেম অব মুসলিম এডুকেশন ইন বেঙ্গল,(আজিজুল হক)উদ্ধৃত ,আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পৃঃ পৃঃ১০৫-৭ ।

২. এম,আর,বি,জি,১৪শ খন্ড,প্রেসিডেন্সি কলেজের কাগজপত্র সম্পর্কে,এ্যাপ২-৩ পৃঃXVI,XXIII. (অর্থাৎ ১৬,২৩) উদ্ধৃত ,বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান(১৭৫৭-১৮৫৬)পৃঃ পৃঃ২৭০-৭১ ।

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ লিখে এর কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন । অর্থাৎ আরবী শিক্ষা কেবল সাহিত্য এবং আইন চর্চার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, ফার্সীকে মুসলমান ছেলে মেয়েদের প্রথম স্কুলে যাওয়ার অবলম্বন হিসেবে শিক্ষা দিতে হবে ।[১] ১৮৫৩ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ইংরেজী ভাষা ও উর্দুর মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা, কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করেন । কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের কারনে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন ।[২] এতসব প্রচেষ্টা সিদ্ধান্ত, সংস্কার ইত্যাদি তেমন কোন সফলতা আসেনি বরং সব কিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । কেননা তখন পর্যন্তও মুসলমানদের শিক্ষার পদ্ধতি, ধরন, মাধ্যম কি হবে সে বিষয়ে কোন সঠিক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি এবং এ বিষয়ে একমত হওয়াও সম্ভব হয়নি । এভাবে মুসলমানরা শিক্ষা ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় । এ সময় বিভিন্ন পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার করা হয়, কখনো ইংরেজী ,আরবী চালু করা হয়, কখনো এ্যাংলো এ্যারাবিক, আবার এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ খোলা হয় । কিন্তু এসব কিছুই দক্ষ ব্যবস্থাপনা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার অভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় ও ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যায় । তাই সিদ্ধান্তহীনতা ভুল সিদ্ধান্ত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন না করা এবং নীতি নির্ধারনের অপরিপক্কতার কারনে উদভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে মনে হয় ।

১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ : ১৮১৩ সাল হতে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত অনেক কমিটি, ও বিজ্ঞজনেরা এ দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষামূলক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছেন । কিন্তু কোন পরিকল্পনাই সঠিক সিদ্ধান্ত ও দূরদর্শিতার অভাবে বাস্তবরূপ লাভ করতে পারেনি । বরং বিভিন্ন মত বিরোধ ও বাক বিতন্ডার সৃষ্টি হয়েছে ।[৩] তাই এ দেশের শিক্ষার ইতিহাস ১৮১৩ সাল হতে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এই সময়কালকে বিষাদময় সময় বলা হয় । কারণ এই সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য কোন অবদানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না । শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম মত বিরোধ বিরাজমান থাকায় শিক্ষার উন্নতি ইতিহাসের পাতায় কোন স্থান পায়নি ।[৪]

---

১. এম ,আর ,বি ,জি ,পৃঃ পৃঃ XXVII, XXXII, (অর্থাৎ ২৭ ,৩২) মিনিট ,২৬শে এপ্রিল ১৮৫২ । উদ্ধৃত , পৃঃ পৃঃ ২৭১ ।

২. মঈন উদ্দিন আহমেদ, রিফ্লেকশনস অন দি বেঙ্গল রেনেসাস , পৃঃ৭৪ । উদ্ধৃত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১ ।

৩. শিক্ষার ইতিহাস , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৫ ।

৪. মোহাম্মদ আজহার আলী, "শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস," বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ (ঢাকা ১৯৮৬) পৃঃ ২৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

এতে ইংরেজ সরকার অনুধাবন করেন যে, এদেশবাসীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা তাদের পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব। কাজেই এ ব্যাপারে একটা পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য ইংল্যান্ডের নিম্ন আইন সভা ১৮৫৪ সালে উডস এর নেতৃত্বে একটি সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত করে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান কাজ চালায়। এই কমিটির উপর ভিত্তি করে উপমহাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ এডুকেশন ডিসপ্যাচ জারি করা হয়। ১৮৫৪ সালের এই ডিসপ্যাচে "উডস" এডুকেশন ডিসপ্যাচ" বলা হয়।[১]

এই এডুকেশন ডিসপ্যাচ ১৮৫৪ সালের ১০ই মার্চ তারিখে সরকারের নিকট এক রিপোর্ট পেশ করে যে, পরবর্তী বছর হতে মাদ্রাসার সংস্কার কাজ শুরু হবে এবং ১৮৫৪ সালের ১৫ই জুন থেকে কলিঙ্গা শাখা স্কুল খোলা হবে। সরকারের অনুমোদন নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের পাঠ্যসূচীর খসড়ার কাজও ঠিক হয়ে যায়।[২] ১৮৫৪ সালের জুলাই মাস হতে আলিয়া মাদ্রাসার সংস্কার কাজ শুরু হয়। এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে অনেক উপযুক্ত ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এই সংস্কার অনুযায়ী প্রতিটি পদক্ষেপ সর্তকতা ও অত্যন্ত যত্নের সাথে পালন করা হয়, যাতে সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ সন্তুষ্ট থাকে। তাদের ইচ্ছানুসারে নীচ বংশজাত, খৃষ্টান, হিন্দু কিংবা মুসলমানদের আর্থিক অসুচ্ছলতার কথা মনে রেখে এদের জন্য হিন্দু কলেজের হিসেবে এক চতুর্থাংশ বেতন এবং কলিঙ্গা শাখা স্কুলের জন্য অর্ধেক বেতন নির্ধারন করা হয়।[৩]

তাছাড়া ডিসপ্যাচ মনে করে যে, বিপুল সংখ্যক পুস্তকাবলী অনুবাদ করে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা অত্যন্ত দুরূহ ও সময়ের ব্যাপার। তাই ডিসপ্যাচ ইংরেজীকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করার জন্য সুপারিশ করে। কেননা স্থানীয় ভাষা অসম্পূর্ণ, সেহেতু ইংরেজীর সাথে স্থানীয় ভাষা পাশাপাশি চলতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। ডিরেক্টরগন উল্লেখ করেন যে, দেশীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষাকে চাপিয়ে দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং সুশিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করার জন্য একমাত্র ইংরেজী ভাষায়ই

১. শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৫।

২. এস,আর,বি,জি,১৪শ খন্ড, প্রেসিডেন্সি কলেজ সম্পর্কীয় কাগজপত্র, পৃঃ ৩১, ৬৮। মোয়াত টু বেডন, ১০ই মার্চ,১৮৫৪ পৃঃ ৬৪, ৭১। উদ্ধৃত, বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭৭-৭৮।

৩. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, (১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।[১] তাই ১৮৫৪ সালের কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এর ডিসপ্যাচ অনুযায়ী সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় যে, ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা সুদূর গ্রামাঞ্চলসহ দেশের সর্বত্র সম্প্রসারিত করা। এতে দেশীয় শিক্ষা বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকারের যে সামান্য অনুগ্রহ ছিল তা দূর হয়ে যায়।[২] এভাবে মাদ্রাসার সংস্কার সাধিন করে সম্ভ্রান্ত শ্রেনীর মুসলমানদের প্রয়োজন মিটানো হল। বাংলা, ইংরেজীর সাথে ফার্সী, উর্দু শিক্ষা মুসলমানদেরকে খুশি করল। কাউন্সিল মনে করল যে, সংস্কারের দরুন মুসলমানদের ইংরেজীর প্রতি একরোখা মনোভাব প্রকাশ পায়নি, এবং ফার্সীর প্রতি তাদের আগ্রহ ফুটে উঠেছে।

১৮৫৪ সালের ডিসপ্যাচের পর কলিকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফরাসী বিভাগের প্রবর্তনের ফলে মাদ্রাসার শিক্ষার অবস্থা কিছুটা পরিবর্তন ও উন্নতি হয়। এখানে মুসলিম ছাত্ররা স্বল্প বেতনে ইংরেজী পড়ার সুযোগ পায়। ফলে যেখানে ২৬ বছরে মাদ্রাসা থেকে মাত্র দুজন জুনিয়র স্কলারশীপ পরীক্ষা পাশ করে, সেখানে শুধু ১৮৫৬ সালে ৭ জন ছাত্র একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।[৩] এই কিছুটা উন্নতির কথা ১৮৫৫-৫৬ সালের শিক্ষা রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, মাদ্রাসার ছাত্ররা শৃংখলাবদ্ধ, ক্লাশে উপস্থিতি সন্তোষজনক, মনযোগী এবং শিক্ষা লাভে খুবই আগ্রহী ও কৌতুহলী ছিল। ১৮৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ১১১ জন দাড়ায় এবং পরবর্তী বছর তথা ১৮৫৭ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৮ জনে উন্নিত হয়। ১৮৫৬ -- ৫৭ সালে ১৫৮ জন ছাত্রের মধ্যে সকলেই ইংরেজী এবং ফার্সী লেখাপড়া করত, ৬৮ জন পড়ত উর্দু এবং ৯০ জন পড়ত বাংলা।[৪] কিন্তু মাদ্রাসার আরবী বিভাগের কোন উন্নতি হয়নি মাদ্রাসার নানা ওলট পালট, পরিবর্তন পরিবর্ধন ইত্যাদি কারনে ছাত্র সংখ্যা কমে যায় এবং তাদের ব্যর্থতা নেমে আসে।[৫]

----

১. শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৫-৬৬।
২. মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪।
৩. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০।
৪. জি,আর,পি,আই,এ্যাপ, এ, নং ১,১৮৫৫-৫৬, পৃঃ ১৮২, ১৮৬। উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৮-৭৯।
৫. জি ,আর,পি, আই, এ্যাপ, ডি, নং ১১, ১৮৫৫-৫৬, পৃঃ২ উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্রদেরকে পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহিত্য পড়াশুনা করতে বাধ্য না করে পুনরায় আইন শাস্ত্র ও সাহিত্যের মধ্য হতে যে কোন একটি বিষয় পছন্দ করার সুযোগ দেয়া হয়। ছাত্ররা সকলেই আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার অভিমত প্রকাশ করে। এতে ছাত্ররা আইন, সাহিত্য, যুক্তি বিদ্যা, অলংকার শাস্ত্র, জ্যামিতি ও এলজেবরা ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়নে জড়িয়ে পড়ে।[১] তাই ভারত সরকারের এই ডিসপ্যাচ এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে আছে। অবশ্য এখানে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়নি। জনশিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে হাইস্কুলে শিক্ষাদান এদের অন্যতম। এই ডিসপ্যাচের প্রস্তাব অনুসারে শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে মুষ্টিমেয় লোকের উচ্চশিক্ষার পথ কিছুটা প্রশস্ত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে দেশের অধিকাংশ জনসাধারনের শিক্ষার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি।[২] কাজেই ১৮৫৪ সালের ডিসপ্যাচ অনুযায়ী মাদ্রাসার সংস্কার এবং কলিঙ্গী শাখা স্কুল খোলা হলেও কলিকাতার মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহনের সত্যিকার পথ খুজে পায়নি। সমগ্র পরিকল্পনা কলিকাতাতে কার্যকরি করা হয়। বাংলা, বিহারে এর বিস্তারের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি, বরং এ এলাকার মুসলমানদের প্রয়োজনীয় তাকেই অস্বীকার করা হয়েছে।[৩] অতএব ১৮৫৪ সালের ভারত সরকারের ডিসপ্যাচ মুষ্টিমেয় লোকের শিক্ষাক্ষেত্রে উপকার হয় সত্য কিন্তু বাংলার সাধারন মানুষের ধর্মীয় শিক্ষার কোন উন্নতি হয়নি, বা কোন কাজে আসেনি। তাই মাদ্রাসার সংস্কার পুরোপুরি সাফল্য লাভ করেনি।

<u>মাদ্রাসা বিলোপের চক্রান্ত</u> :- ১৮৫৭ সালে বাংলাদেশে তথা ভারত বর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় এবং এই সিপাহী বিদ্রোহের কারনে মুসলিম জাতির প্রতি ইংরেজ সরকারের আচরন প্রতি হিংসায় রূপ নেয়ায় মুসলিম জনসাধারন ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষা থেকে আড়ো দূরে সরে যেতে থাকে এবং ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের অবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে তারা আরবী তথা ধর্মীয় শিক্ষাকে আরো দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে এবং বিভিন্ন স্থানে যেমন সাহারানপুর, দেওবন্দ, দিল্লী লখনৌ, রামপুর, প্রভৃতি স্থানে কাওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় শিক্ষাকে জোরদার ও সম্প্রদারনের ব্যবস্থা গ্রহন করে। এসব মাদ্রাসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় শিক্ষা, মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী সভ্যতাকে অক্ষুন্ন রাখা।[৪] বাংলাদেশেও এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

---

১. জি,আর,পি,আই,১৮৫৫-৫৬। উদ্বৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮০।
২. এস,এম,ছদরুদ্দীন, 'আমাদের শিক্ষা' ১ম প্রকাশ,(ঢাকা ১৩৫৭ বাংলা) পৃঃ ৩৮।
৩. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮১।
৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা এক বিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে ১৮৫৭ সালে মিঃ উইলিয়াম লিজ কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী বছরই অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে বাংলার লেঃগর্ভনর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে মাদ্রাসা শিক্ষার উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। এর অন্যতম কারন ছিল সিপাহী বিদ্রোহ। কেননা তিনি মনে করেন যে, এই বিপ্লবে মাদ্রাসার ছাত্ররাও অংশ গ্রহন করেছিল। মাদ্রাসার ছাত্ররা ধর্মযুদ্ধ, জিম্মি, দারুল হরব ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষা গ্রহন করে বিদেশী শাসকদের প্রতি বিষাদাগার ছড়াত ও উষ্কিয়ে দিত এবং জনসাধারনকে এ ব্যাপারে সচেতন করে বিদ্রোহী করে তুলত। ইত্যাদি অনুমান করে লেঃ গর্ভনর মাদ্রাসা শিক্ষার ঘোর বিরুধী ছিলেন।[১] তাই এই মর্মে সমগ্র মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ১৮৫৮ সালে লেঃগর্ভনর অত্যন্ত কড়া ভাষায় এক মিনিট রচনা করেন এবং ডিরেক্টরস্ অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতে বৃটিশ স্বার্থের জন্য আত্মঘাতী স্বরূপ। প্রকৃত পক্ষে মাদ্রাসা হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহীতার লালন ক্ষেত্র। লেঃগর্ভনর প্রস্তাব করেন যে, মাদ্রাসার বিলোপ সাধন করা হোক এবং এর পরিবর্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজে আরবীয় অধ্যাপক পদের প্রবর্তন করা হোক।[২] তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সরকারী খরচে ভবিষ্যতে মাদ্রাসা পরিচালিত হবে কিনা এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার সময় এসেছে। বর্তমান পরিবর্তনশীল সময়ে মাদ্রাসার প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়েও বিচার বিবেচনার সময় এসেছে। এ ব্যাপারে ডিরেক্টর স্বয়ং যেন চিন্তা ভাবনা করেন এবং মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মিঃ লিজের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। লেঃ গর্ভনরের নির্দেশক্রমে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মিঃ লিজ একটি রিপোর্ট পেশ করেন যা নিম্নে তুলে ধরা হল।

অধ্যক্ষ মিঃ লিজ উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের সাথে বৃটিশ সরকার দু'ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব নিয়মে ও স্বকীয়তা বজায় রেখে চলতে দিতে হবে এবং তাদেরকে দিন দিন অধপতন হতে রক্ষা করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে,

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮।

২. "বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা", পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮। মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪, কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন রিপোর্ট ১৯১৭-১৯, ২য় খন্ড পার্ট ১, কলিকাতা ১৯১৯ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩। রিপোর্ট অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০১, ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে আমি জানাতে চাই যে, বৃটিশ সরকার যখন এ দেশের ক্ষমতা গ্রহন করেন তখন মুসলমানরা একটি কারনে নিশ্চিত ছিল যে, তারা শুধু দেশের আভ্যন্তরীন শৃংখলা রক্ষার তদারক করবে। কিন্তু বৃটিশ সরকার যখন এদেশের সর্বময় ক্ষমতা অধিকার করে মুসলমানদের ক্ষমতা কেড়ে নেয় তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। সরকার ফৌজদারী আদালতগুলিতে মুসলমানদের পরিবর্তে ইংরেজ জজ নিয়োগ করে। এরপর সরকার সারাদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহন করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাকে এ দেশের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও মর্যাদা প্রদান করে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের সকল আশা আকাংখা মর্যাদা ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। কিন্তু এ সময় হিন্দুরা সব রকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু মুসলমানরা ক্ষোভ ও বিদ্বেষ প্রসূত ইংরেজী শিক্ষাকে বর্জন করে। যারফলে তারা সরকারী চাকুরীর সুযোগ হারায় এবং দিন দিন তাদের অধপতন হতে থাকে। এখন সরকার যদি তাদেরকে এরূপ সংকটময় অবস্থার মধ্যে ছেড়ে দেন, তাহলে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে এবং মুসলিম সম্ভ্রান্ত লোকেরা পেটের দায়ে অন্যের কাছে হাত পাতবে। এমতাবস্থায় সরকারের উচিত তাদের হারানো গৌরব পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, সমাজে তাদের বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন করা। আলিয়া মাদ্রাসার মত বিশাল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে কার্যকর করতে পারে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বর্তমানে মাদ্রাসার উদ্দেশ্য প্রতি পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। ১৮৫৪ সালে শিক্ষা কাউন্সিল মাদ্রাসায় যে সংস্কার কার্যকর করতে চেয়েছিল তা করা সম্ভব হয়নি। তার কারন মুসলমানরা এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু এর পরেও মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া কোন এসমেই ঠিক হবেনা। কেননা মুসলমানদের বিশ্বাস এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের মঙ্গলের জন্যই রয়েছে। তাছাড়া মাদ্রাসাকে বিশেষভাবে আরবী শিক্ষার জন্যই টিকিয়ে রাখতে হবে। তবে এর নাম পরিবর্তন করে আরবী কলেজ রাখতে হবে। এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ যেমন ছিল ঠিক তেমনই বহাল থাকবে।[১]

পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের ডিরেক্টর মিঃ ডব্লু গর্ডন, অধ্যক্ষ মিঃ লিজের রিপোর্টের সাথে একমত ছিলেন না। বরং মিঃ লিজের রিপোর্টের উত্তরে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে মন্তব্য করেন এবং তা লেঃ গর্ভনরের নিকট প্রেরণ করেন। লেঃগর্ভনর উক্ত নোট পেয়ে গর্ভনর জেনারেলকে লেখেন যে, অতি সত্ত্বর মাদ্রাসার আরবী বিভাগকে যেন বন্ধ করা হয়

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

এবং এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগকে যেন যথারীতি চালু রাখা হয়। তাছাড়া আরবী শিক্ষার জন্য এ্যারাবিক প্রফেসরশীপ অথবা উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয় অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজে উহার একটি বিভাগ খোলা হয়, আরবী শিক্ষার জন্য এতটুকু ব্যবস্থাই যথেষ্ট। গভর্নর জেনারেল লেঃগর্ভনর জেনারেলের সমুদয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং লেঃগর্ভনরকে এ ব্যাপারে হুশিয়ার করে দেয়ার জন্য এক নোট দেন। বাংলা সরকারের সেক্রেটারী মিঃ ডব্লু গ্রে ১৮৬০ সালের ২রা জুলাই এর ১২১৯ সং পত্রে এই মর্মে জন শিক্ষার ডিরেক্টরকে এক চিঠিতে ভারত সরকারের অভিমত নিম্নোক্ত রূপ বর্ণনা করেন।[১]

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, গর্ভনর জেনারেল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিষয়টি বিবেচনা করেছেন যে, কলিকাতা মাদ্রাসা বন্ধ করার জন্য লেঃ গর্ভনর যে সকল যুক্তির অবতারনা করেছেন তা সম্পূর্ণ শিক্ষা কল্যান বিরোধী এবং নীতির দিক হতে সেগুলি গ্রহনযোগ্য হতে পারেনা বলে তিনি মনে করেন। আলিয়া মাদ্রাসার গুরুত্ব সম্পর্কে লেঃগর্ভনর যে মূল্যায়ন ও মতামত ব্যক্ত করেছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তাই গর্ভনর জেনারেল সে বিষয়েও তার সাথে একমত হতে পারেননি। মাদ্রাসা সমগ্র বাংলাদেশের মুসলমান অধিবাসীদের অন্তরে দুষ্ট প্রভাব বিস্তার করছে ও ভ্রান্ত ধারনার বীজ বপন করছে, মাদ্রাসা ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক বিপদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, মাদ্রাসা প্রকৃত পক্ষে রাজদ্রোহিদের আশ্রয় ও লালন কেন্দ্র' ইত্যাদি গর্ভনর জেনারেল এ সকল উক্তির সাথে একমত নন এবং তিনি তা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন যে, বিদ্রোহের সময় উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষিত মুসলমানেরা শুধু সরকারের সহযোগীতাই করেনি তা নয় বরং মুসলমান সম্প্রদায়ের অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা তারাই সরকারের প্রতি অধিকতর আনুকূল্য ও আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছে।[২] অর্থাৎ এভাবে গর্ভনর জেনারেল লেঃ গর্ভনরের মাদ্রাসা বিলোপের প্রস্তাব বাতিল করে দেন।

অপরদিকে প্রিনসেপ এবং মেকলে ও মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গর্ভনর জেনারেল তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন এবং মাদ্রাসাকে বিলুপ্ত করা তিনি অযৌক্তিক বলে মনে করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মাদ্রাসাই হল বর্তমানে যোগাযোগের

----

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১১।

২. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস, এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র মাধ্যম যার মাধ্যমে বাংলার মুসলিম যুবকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও গভীর সম্পর্ক হতে পারে । ইহা নতুন কোন প্রতিষ্ঠান নয় যে, সরকার অর্থের অভাবে এটাকে বিলোপ করতে পারে । মাদ্রাসা একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠান যে উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য ইহা ভাল ভাবেই পালন করছে । তাছাড়া মাদ্রাসা বিলুপ্তির প্রস্তাব মুসলমানদের চিন্তা চেতনাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরো বিক্ষুব্ধ করে তুলবে । কাজেই মাদ্রাসা বিলুপ্তি ইহা সুবিচারের মানদন্ড নয় এবং সহনশীলতার বৈশিষ্ট্যও ইহা নয় ।[১] অতএব ইহা বন্ধ করা যাবে না ।

এদিকে মাদ্রাসা বিলুপ্তির কথা শুনে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । তারা মাদ্রাসা বিলোপের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ করে এক দরখাস্ত পেশ করে । দরখাস্তে তারা উল্লেখ করে যে, ছোট বড় সকলেই বিশ্বাস করে যে, মাদ্রাসা বিলোপের এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইসলাম ধর্মের রীতি নীতিকে ধ্বংশ করা এবং খৃষ্টান ধর্মকে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করা । দরখাস্তকারীরা সরকারেকে মুসলমান সমর্থকদের নাম ধাম তালিকাভুক্ত করতে আবেদন করেন । সরকার এরূপ দরখাস্ত পেয়ে অবাক ও বিস্মিত হলেন এবং গুজবে কোন প্রকার কর্ণপাত না করতে পরামর্শ দিলেন । সরকার দরখাস্তকারীদের আশ্বস্ত করেন যে কোন প্রতিষ্ঠান বিলোপ করা বা অপসারন করা সরকারের আদৌ কোন ইচ্ছা নেই এবং সরকার আরো আশ্বাস দেন যে, যে পর্যন্ত ছাত্রদের মধ্যে প্রাচ্য শিক্ষার প্রতি বিন্দু মাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা থাকবে ততদিন পর্যন্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তি ঘটানো হবেনা ।[২]

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, কিছু সংখ্যক বৃটিশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ষড়যন্ত্রে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার নামে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষাকে ধ্বংশ করার পায়তারা শুরু হয় । সে প্রেক্ষিতে তারা আলিয়া মাদ্রাসা বিলোপের জন্য গভর্নর জেনারেলের নিকট প্রস্তাব করে । এই প্রস্তাব তাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত মুসলিম বিদ্বেষমূলক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ছিল । কিন্তু তারা মাদ্রাসা তথা ধর্মীয় শিক্ষার বিলোপ চাইলেও গভর্নর জেনারেলের হস্তক্ষেপে তা বাস্তবায়িত হয়নি । কেননা গর্ভনর জেনারেল তাদের প্রস্তাবকে অত্যন্ত অযৌক্তিক আবেগপ্রসুত, বিদ্বেষমূলক ও বাস্তব সম্মত নয় বলে

---

১. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০-২১ ।

২. ইন্ডিয়া পাবলিকেসন্স ,১৩ই মার্চ ১৮৩৫ নং-১০ উদ্ধৃত বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৪-২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাতিল করেছেন । কেননা তিনি অনুধাবন করেন যে, মাদ্রাসার মাধ্যমেই মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং তাদের বিশ্বাস ও সহানুভূতি লাভ করা যায় । যদি ইহা বন্ধ করে দেয়া হয় তবে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হবে । তাহলে মুসলমানরা আর তাদেরকে বিশ্বাস করতে চাবে না । তাই মুসলমানদের আস্থা ভাজন হতে হলে ধর্মীয় শিক্ষার বিলোপ সাধন কোনভাবেই সম্ভব নয় । তাছাড়া যে শিক্ষা, বিশ্বাস ও চিন্তাচেতনা দ্বারা দীর্ঘ ৬ শত বছর ব্যাপী চলে এসেছে, তা হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হলে ধর্মীয় অনুভূতিতে ও বিশ্বাসে বিরাট আঘাত আসবে, যা মোটেই সমীচিন হবে না । অপরদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও গনঅভ্যুত্থানের ভয়ে তিনি সবদিক বিচার বিবেচনা করে মাদ্রাসা তথা ধর্মীয় শিক্ষা বিলোপ সাধনের প্রস্তাব অত্যন্ত অযৌক্তিক ,অবিবেচক, বাস্তবতা বিবর্জিত ও অজ্ঞতা প্রসূত বলে সমপূর্ণভাবে বাতিল করেছেন । অতএব এভাবে গর্ভনর জেনারেলের সরাসরি হস্তক্ষেপের কারনে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও একমাত্র সরকারী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা টিকে যায় ।

মিঃ লিজের দ্বিতীয় রিপোর্টঃ- ১৮৬০ সালে জন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরকে প্রদত্ত মাদ্রাসার সংস্কার সমপর্কিত মিঃ লিজের আরো একটি রিপোর্ট এর কথা জানা যায় । রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাদ্রাসায় এ্যাংলো পার্শীয়ান বিভাগ সন্তোষজনক ভাবে সাফল্য লাভ করছে । প্রতি বছর এই বিভাগ হতে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হচ্ছে । ১৮৫৮ সালের সংস্কারের পর আরবী বিভাগেরও অসামান্য উন্নতি লাভ হয়েছে । কাজেই আপাতত আর কোন সংস্কারের প্রয়োজন নেই । এ সময়ে নতুন করে সংস্কারের চেষ্টা করলে হয়ত ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিতে পারে অধ্যক্ষ মিঃ লিজ মাদ্রাসা সংক্রান্ত আরো একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন । এই রিপোর্টে তিনি মাদ্রাসার আভ্যন্তরীন অবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনক ও উৎসাহ ব্যাঞ্জক বলে মন্তব্য করেন এবং মাদ্রাসার মৌলিক আরবী বিভাগের পুনরায় কোন সংস্কার অথবা সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করেন । তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আলিয়া মাদ্রাসা উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । বাংলাদেশের সকল শিক্ষাবিদ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত । তাই এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির মৌলিকত্ব বিকৃত করা উচিত হবে না ।[১]

----

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত,পৃঃ১১২-১১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

ল্যামসডেন কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও শিক্ষা সংসদের পরিচালকদের উদ্দেশ্যে লেখা ১৮৬০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরে এক চিঠিতে আরবী শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, শুধুমাত্র আরবী ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করে কোন সম্মান জনক চাকরী পাওয়া যাবে না। তাই আরবী ক্লাসের সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ হবে আরবী ভাষায় শিক্ষিত মুসলিম বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি।[১] অর্থাৎ তিনি প্রকারান্তরে আরবী বিভাগ, আরবী শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষাকে তুলে দেয়ারই প্রস্তাব রাখেন। কেননা তার মতে এই শিক্ষা পার্থিব জীবনে কোন কাজে আসেনা। কিন্তু তার এ ধারনা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। তাই তার দাবীর অনুকুলে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। বরং আরবীর পাশাপাশি এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ বা অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন সমান তালে চলেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে অধ্যক্ষ মিঃ লিজ আরো একটি নতুন প্রস্তাব উপস্থাপন করেন যে, এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ হতে ছাত্ররা জুনিয়র স্কলারশীপে উত্তীর্ণ হলে তারা ঐচ্ছিকভাবে আরবী বিভাগে ভর্তি হতে পারবে। তবে শর্ত এই যে, তাদেরকে এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগের শেষ দুই বর্ষে আরবী ব্যাকরন ইলমেনহু, ও ছরফ অধ্যয়ন করতে হবে। জুনিয়র স্কলারশীপ পাওয়ার পর তারা আরবী বিভাগ বা উচ্চতর কলেজ যেখানেই ভর্তি হবে তাদের বৃত্তির কোন ব্যাঘাত হবে না। লেঃ গভর্নর অধ্যক্ষ সাহেবের এই প্রস্তাবটি মেনে নেন। কিন্তু শেষ দুই বর্ষে ইলমেনুহ ও ছরফ অধ্যয়নের প্রস্তাব বিবেচনায় রাখেন। কেননা এ বিভাগের ছাত্রদের ইংরেজীর সাথে ফার্সী পড়তে হয়। তাছাড়া আরবী ব্যাকরন নুহু ও ছরফ অধ্যয়ন করতে পেলে তাদের লেখা পড়ার চাপ বেড়ে যাবে। তাই আরবী বিভাগের শুরুতেই আরবী ব্যাকরন এর জন্য বাড়তি প্রাথমিক ক্লাসের পত্তন করা যেতে পারে। এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ সম্পর্কে মিঃ লিজ উল্লেখ করেন যে, এই বিভাগ হতে ছাত্ররা উত্তীর্ণ হয়ে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করে, এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, আমি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি তুলনামূলক আরবী তথা ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করেছি। কিন্তু তা সত্বেও এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগের ছাত্ররা আরবী বিভাগে ভর্তি হয়নি। তারা বরং এই বিভাগ হতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেলে ভর্তি হতে শুরু করে। কেননা মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত না থাকায় এর গুরুত্ব কম মনে হত। তাই মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করলে এই ছাত্ররা এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে অধ্যয়ন শেষ করে মাদ্রাসার আরবী বিভাগে ভর্তি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।[২]

---

১. সফি উদ্দিন জোয়ারদার, রিফ্লেকসনস অন দি বেঙ্গল রেনেসাস, পৃঃ ৪৩, উদ্বৃত, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯১।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আলিয়া মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব :- আলিয়া মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারনে শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব কম দেয়া হত এবং শিক্ষার মান ও অন্যান্য কলেজ হতে অনেক নিম্নমানের বলে মনে করা হত । শিক্ষার্থীরা তাই এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ হতে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য অন্যান্য কলেজে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করত । তাই মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ ও উচ্চমানের করার জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবী করে । ইহাও ছিল সম্পূর্ণ চক্রান্তমূলক । কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হলে তখন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কোন এখতিয়ার থাকবে না । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আইন কানুন এবং পাঠ্যসূচী মাদ্রাসাতে ও প্রনীত হবে । এভাবে মাদ্রাসা ক্রমশ তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে ,ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পাবে এবং পরিশেষে মাদ্রাসা সাধারন শিক্ষায় পরিনত হবে । কাজেই এভাবে সুদূর প্রসারী চক্রান্ত করে মাদ্রাসা তথা ধর্মীয় শিক্ষা বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু এ চক্রান্তও ব্যর্থ হয় ।

তবে মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার পিছনে অন্যতম প্রধান কারন ছিল সিপাহী বিপ্লব । কিছু সংখ্যক বৃটিশ প্রশাসকের ধারনা ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা তাদেরকে হীন এবং ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে গড়ে তোলে । এই সিপাহী বিপ্লবের পিছনে আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের চক্রান্ত রয়েছে । তাই আগামীতে যেন কোন ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহ দানা বেদে না উঠতে পারে সে জন্য মাদ্রাসাকে অতি সত্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করা উচিত । কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হলে মাদ্রাসা ক্রমশ সাধারন শিক্ষায় পরিনত হবে এবং এর অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যাবে । কিন্তু ভারত সরকারের অনমনীয়তা ও অসহযোগীতার কারনে ইহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । কিন্তু এরপরও অধ্যক্ষ মিঃ লিজ আরও একটি পরিকল্পনা পেশ করেন । মিঃ লিজ এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগকে আরো উন্নত করে আরবী বিভাগ হতে ফেকা, মানতিক ও ফালসাফা (দর্শন) বাতিল করার প্রস্তাব করেন । যার ফলে আরবী বিভাগ ক্রমশ এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে একত্রীভূত হয়ে যাবে এবং এভাবে মাদ্রাসা পাশ্চাত্য শিক্ষায় পরিনত হবে । লেঃ গর্ভনরের ইচ্ছা ছিল মাদ্রাসা সমূলে বিলুপ্ত করে দিবেন । কিন্তু ভারত সরকারের বিরোধীতার কারনে সে আশা পূরন হয়নি । তাছাড়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাদ্রাসা সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রদান করেন তা মাদ্রাসা রক্ষার অনুকূলেই কাজ করেছে।[১]

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

লেঃ গর্ভনর স্যার সিসিল বেডেন ও তাঁর সেক্রেটারী মিঃ গ্রে এরপর অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে, যেভাবেই হোক মাদ্রাসাকে বিলোপ করতেই হবে। প্রতি হিংসার বশবর্তী তিনি মাদ্রাসা বিলোপের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন যে, ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম ব্রেন্টিং উল্লেখ করেছেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষা সরকারের কোন উপকারে আসছে না, কাজেই মাদ্রাসার পিছনে অর্থ ব্যয় করা অনুচিত এবং অচিরেই মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া উচিত। এভাবে প্রাদেশিক সরকার ও মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের মাঝে মাদ্রাসা বিলোপের পক্ষে বিপক্ষে দীর্ঘ দিন বাদানুবাদ চলতে থাকে। এরপর প্রিন্সিপাল বাংলা সরকারকে জানিয়ে দেন যে, আমি যতদিন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত আছি, ততদিন পর্যন্ত মাদ্রাসা বন্ধ করতে দেয়া হবেনা। অতপর এভাবে মাদ্রাসা বিলোপের তর্ক বিতর্ক ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে এবং কেন্দ্রিয় সরকার অধ্যক্ষের সাথে একমত পোষন করে।[১]

যা হোক মাদ্রাসা বিলোপের দীর্ঘ দিনের তর্ক বিতর্কের অবসানের পর এর শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মনোনিবেশ করা হয়। কেননা এই অনাহূত পাল্টা পাল্টির কারনে মাদ্রাসা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়, যারফলে এর উদ্যমতা ও কমে যায়। তবে ভারত সরকার চেয়ে ছিলেন মাদ্রাসাকে ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যবহারিক ও যোগউপযোগী করা। ভারত সচিব স্যার চালর্স উড গর্ভনর জেনারেলের নিকট ১৮৬১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই মর্মে লিখিত ৭ নং পত্রে ভারত সরকারের অভিমতের সাথে ঐক্যমত পোষন করেন। মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে অতপর অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করে মাদ্রাসায় কতিপয় সংস্কার সাধনের জন্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।[২]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী মুসলমানদের অন্যতম নেতা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নবাব আব্দুল লতিফ খান। তিনি মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা দেখে মর্মাহত হন, তাই তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী হয়ে উঠেন। তিনি মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু মুসলমানদের জন্য আরবী ফার্সী শিক্ষা অপরিহার্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি তাই মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর করার জন্য

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫-১৬।

২. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

এবং মুসলিম সমাজে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ সালে মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন । এখানে আলোচনার ভাষা ছিল আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজী । এ কারনে বাংলা ভাষায় মুসলমানরা তেমন উৎসাহ পায়নি ।[১] তবুও ইহা বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের এক উৎসাহজনক প্রচেষ্টা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ।

১৮৬৬ সালে মুসলমানরা সরকারের নিকট এই মর্মে দাবী করে যে, এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগকে আরো সম্প্রসারিত করে কলেজে উন্নীত করা হোক । মুসলমানদের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার ১৮৬৭ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগকে ২য় শ্রেনীর কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করে ।[২] কিন্তু এ কলেজ শেষ পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি । কেননা প্রথম বছরে তথা ১৮৬৭-৬৮ শিক্ষা বর্ষে ইন্টার মিডিয়েট ক্লাসে ছাত্র ভর্তি হয় মাত্র ৬ জন, এর পরের বছর ভর্তি হয় মাত্র ৪ জন, এবং তারপরের বছর ভর্তি হয় মাত্র ৩ জন । কিন্তু এ তিনজন ছাত্রও শেষ পর্যন্ত বছর শেষ হওয়ার আগেই কলেজ পরিত্যাগ করে চলে যায় ।[৩] ফলে মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগের কলেজটি বন্ধ করে দিতে হয় এবং এর সাথে মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষা জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায় ।

বৃটিশ সরকার ১৮৬৭ সালের দিকে পুনরায় কলিকাতা মাদ্রাসা উঠিয়ে দিবার প্রস্তাব করে । এ সময় আব্দুল লতিফের প্রচেষ্টায় মাদ্রাসার অস্তিত্ব রক্ষা পায় ।[৪] তাই এ বছরগুলিতে মাদ্রাসা

---

১. সুখময় সেনগুপ্ত, "বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাংগালীর শিক্ষা চিন্তা" (১৮৩৫-১৯০৬) কলিকাতা ১৯৮৫), পৃঃ ১৭২ ।মূল কাজী আব্দুল ওদুদ, দি মুসলমানস অব বেঙ্গল স্টাডিজ ইন বেঙ্গল রেনেসা, এন,সি,আই,জাদবপুর, পৃঃ৪৭৪ ।মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ :সংস্কৃতির রূপান্তর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৫ ।উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭ ।

২. রিপোর্ট অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩১ । মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫ । আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭ । হিষ্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮ ।

৩. মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫ । বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১ । আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১১৭ ।হিষ্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮ ।

৪. আঃলতিফ,মাই হাম্বল ইফোর্টস টু প্রমোট এডুকেশন,পৃঃ১৪ ।উদ্ধৃত বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ মহলে পরস্পরবিরোধী দলাদলি বিদ্যমান ছিল । অধ্যক্ষ লীজ চেয়েছিলেন মাদ্রাসা চালু রাখা হোক, তবে তার কিছুটা সংস্কার দরকার । ভারত সরকার এবং ভারত সচিব তাঁকে সমর্থন করেন । জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর চেয়েছিলেন মাদ্রাসা উঠিয়ে দেয়া হোক, তাঁকে সমর্থন করেন বাংলা সরকার ।[১] এদিকে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মিঃ লিজ ১৮৬৮-৬৯ সালের দিকে কিছু দিনের জন্য বিলাতে গমন করেন । এ সময় কলিকাতার ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া (বর্তমান স্টেটসম্যান) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । এতে বলা হয় যে, মাদ্রাসার আভ্যন্তরীন অবস্থা ও পড়াশুনা সন্তোষজনক নয় । এজন্য অতি সত্বর সরকারের ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত , যাতে এ শিক্ষা মুসলমানদের জন্য উপকার আসতে পারে । এ সময় সরকার ও স্বয়ং মুসলমানদের শিক্ষা ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছিলেন । কেননা ওহাবী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে অনেক আলেম ও মাদ্রাসার শিক্ষক ইংরেজদের সন্দেহের কারন হয়ে উঠে এবং এই পুরানো রীতি পদ্ধতিতে শিক্ষা চালু থাকলে মুসলমানরা আবার হয়ত বিপ্লব ঘটাতে পারে বলে ইংরেজদের আশংকা ছিল ।[২] এভাবে বাংলা প্রেসিডেন্সির শিক্ষিত মুসলমানদের নিরবচ্ছিন্ন অসন্তোষ সম্পর্কে বাংলা সরকার বিভিন্ন সূত্র থেকে অবহিত হন । এরফলে মাদ্রাসার অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে লেঃগর্ভনর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন । কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার মিঃসি,এইচ,ক্যাম্পবেল প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ টি,সার্ট ক্লিফ এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর । তদন্ত কমিটি দীর্ঘ চার মাস যাবত পরিশ্রম করে বিস্তারিতভাবে তদন্ত করেন এবং ১৮৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি পূর্নাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করেন ।[৩]

<u>তদন্ত কমিটির রিপোর্ট</u> :- তদন্ত কমিটি সরকারের কাছে মাদ্রাসা সংক্রান্ত যে রিপোর্ট পেশ করে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা এখানে তুলে ধরা হল । কমিটি রিপোর্ট পেশ করে যে, একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্রাসার যে সুনাম সুখ্যাতি ছিল তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে ।

---

১. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০ ।
২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮ ।
৩. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা,পূর্বোক্ত, পৃঃ২০ ।উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা,১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৪৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসার এই অবনতির বিশেষ কতগুলি কারন হল (ক) আট বছরের কোর্সকে পাঁচ বছরে সীমিত করা, (খ) অসামানজস্যপূর্ণ পাঠ্য পুস্তক পাঠ্যসূচীর অনুর্ভুক্ত করা (গ) ছাত্রদের জন্য যে বৃত্তির টাকা ধার্য করা হয়েছিল তা খুবই সামান্য (ঘ) শিক্ষকদের দক্ষতা ও পান্ডিত্যের অভাব (ঙ) বিচার বিভাগ হতে মাদ্রাসার ছাত্রদের বঞ্চিত করার দরুন এই শিক্ষার প্রতি আকর্ষন হ্রাস (চ) উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অমনোযোগীতা ইত্যাদি । তবে বিচার বিভাগ ও অন্যান্য জীবিকার সুযোগ হতে বঞ্চিত হওয়ার পরও মুসলমানদের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অপরিসীম আগ্রহ ছিল । কেননা মাদ্রাসা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল ধর্মীয় শিক্ষা । কিন্তু ধর্মীয় চেতনার পাশাপাশি এই শিক্ষার দ্বারা অন্য কোন পার্থিব উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না । এ জন্য অনেক সচেতন মুসলমান তাদের সন্তানদেরকে মাদ্রাসার আরবী বিভাগের বদলে এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে ভর্তি করতে শুরু করে । সুতরাং এমতাবস্থায় হয় মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হোক, নতুবা কমিটি মাদ্রাসার জন্য যে আমুল সংস্কারের প্রস্তাব করেছে তা অতি সত্ত্বর কার্যকরী করা হোক ।[১]

মাদ্রাসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তদন্ত কমিটি যে রিপোর্ট প্রদান করে তাতে এ ব্যাপারে কিছু সুপারিশ মালাও উল্লেখ করা হয় । এখানে সুপারিশমালার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারা তুলে ধরা হল । (ক) প্রভাবশালী মুসলমানও ইংরেজদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্যবেক্ষক কমিটি নিয়োগ করা হবে । (খ) আরবী বিভাগকে কলেজে রুপান্তরিত করা হবে । তবে এই বিভাগে একমাত্র আরবীসহ এন্ট্রান্স পাশকারী ছাত্রদের প্রবেশধিকার থাকবে । (গ) শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অধীনে মাদ্রাসা পরিচালিত হবে । তবে পর্যবেক্ষন কমিটি মাদ্রাসার শুধু ভাল মন্দ তদারক করবে । (ঘ) অধ্যক্ষের পদ বিলোপ করে হেড মৌলভীর দ্বারা সে কাজ পুরন করতে হবে ।(ঙ) আরবী শিক্ষকেরা উভয় বিভাগেই সমানভাবে ক্লাশ নিবেন ।(চ) কলেজ চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে এবং মাদ্রাসার যে সব ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহী হবে তাদেরকে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হবে ইত্যাদি । উক্ত রিপোর্ট সমপর্কে লেঃ গর্ভনর মন্তব্য করেন যে, আমি রিপোর্ট এর পূর্বাপার পাঠ করেছি, এতে মাদ্রাসার দুরাবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে । মাদ্রাসার শিক্ষা বাস্তবিক পক্ষেই এস্মান্বয়ে নিম্নমানের দিকে যাচ্ছে । কাজেই অনতিবিলম্বে এই প্রতিষ্ঠানের সংশোধন অত্যাবশ্যক । কমিটি মাদ্রাসার সব দিকেই পর্যালোচনা করেছে । কিন্তু আরবী বিভাগ সমপর্কে তাদের ধারনা খুবই নীতি বাচক । এই রিপোর্ট

----

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

যিনিই পাঠ করবেন তিনিই মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার অবশ্যই দাবী করবেন । বর্তমানে যেসব পাঠ্য পুস্তক মাদ্রাসায় রয়েছে, তা যেমন যুগ উপযোগী নয়, তেমনি মাদ্রাসার শুভাকাংখীদেরও মনপুত নয় । শিক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, ছাত্র বৃত্তি, শিক্ষক ও কর্মচারীদের কার্যক্রম অর্থাৎ কোন ব্যবস্থাই সন্তোষজনক নয় ।[১] অতপর উক্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ হিসেবে বাংলা সরকার কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ বিলুপ্তির প্রস্তাব করেন এবং একটি কমিটি গঠন করে মাদ্রাসার পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের প্রস্তাব করেন । এই উদ্দেশ্যে মাননীয় বিচার পতি মিঃ নরম্যান (সভাপতি) মিঃ টি,সার্ট ক্লিফ, মিঃ এইচ, এল হারিসন, ক্যাপ্টেন এইচ, এস,জ্যারেট, প্রিন্স মোহাম্মদ রহিমুদ্দিন, কাজী আবদুল বারী, নবাব আবদুল লতীফ খান বাহাদুর, মুন্সী আমীর আলী, মৌলভী আব্বাস আলী খান, প্রমুখ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয় । কমিটি ১১টি বৈঠক অনুষ্ঠানের পর ১৮৭১ সালের ১৬ই জুন একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করেন ।[২]

<u>কমিটির সুপারিশ</u> :- মাদ্রাসার সংস্কার সম্পর্কিত যে সুপারিশ করা হয়েছে উক্ত কমিটি সে প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে এই রিপোর্ট তৈরী করে । নিম্নে তা উল্লেখ করা হল । আরবী বিভাগ সম্পর্কে যে সুপারিশ করা হয় তা হল (ক) মাদ্রাসার আরবী বিভাগের নাম আগামীতে এ্যাংলো এ্যারাবিক বিভাগ নামে অভিহিত করা হবে । (খ) ছাত্র ভর্তি প্রসংগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাদ্রাসার উভয় বিভাগে সকল সময় ছাত্র ভর্তি চলবে । আরবী বিভাগের ভর্তির পরীক্ষা গ্রহনের দায়িত্ব হেড মৌলভীর উপর এবং ইংরেজী বিভাগের দায়িত্ব হেড মাস্টারের উপর । আরবীর জামায়াতে হাপ্তম বা অষ্টম মান ক্লাসে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের আরবী হরফ ও নহুর প্রাথমিক জ্ঞানসহ সামান্য ফার্সী পড়ার দক্ষতা এবং ভালভাবে উর্দু জানা অত্যাবশ্যক । ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের কমিটির যে কোন সদস্যের দ্বারা চারিত্রিক সনদ পত্র গ্রহন করতে হবে ।(গ) মাদ্রাসার সময়কাল তথা দৈনিক অধ্যয়নকাল হবে সকাল ১০টা হতে ১টা পর্যন্ত এবং বিকেল দেড়টা হতে ৪টা পর্যন্ত । নিম্নমানের চারটি ক্লাসে দৈনিক তিন ঘন্টা আরবী, দুঘন্টা ইংরেজী এবং দেড় ঘন্টা ফার্সী, বাংলা ইত্যাদি অধ্যয়ন হবে । (ঘ) বিভিন্ন ক্লাসে ছাত্রদের বয়স সীমা নিম্নরূপ হবে । যেমন :-

হাপ্তম বা অষ্টম শ্রেণী ভর্তির বয়স ১৩ বছর   সর্বোচ্চ বয়স ১৫ বছর ।
হাপ্তম বা ৭ম শ্রেণী " ১৪ " সর্বোচ্চ বয়স ১৫ "

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৩, ১২৪ ।
২. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস,এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১ ।

Dhaka University Institutional Repository

শশম বা ৬ষ্ঠ শ্রেনী ভর্তির বয়স	১৫ বছর	সর্বোচ্চ বয়স	১৭ বছর ।	
পানজম বা ৫ম শ্রেনী "	১৫ "	"	১৮ "	
চাহারম বা ৪র্থ শ্রেনী "	১৫ "	"	১৯ "	
সুয়াম বা ৩য় শ্রেনী "	১৫ "	"	২০ "	
দুয়াম বা ২য় শ্রেনী "	১৫ "	"	২১ "	
উলা বা ১ম শ্রেনী "	১৫ "	"	২২ "ইত্যাদি	

(ঙ) পাঠ্য পুস্তক হবে জর্সে ছরফ, ফুসুলে আকবরী, জর্সে নহু, হেদায়াতুন নহু, কাফিয়া, শরহেজামি মিজান, মানেক, শরহে তাহজিব, কিবতী (হাশিয়া মীরসহ), ছল্লুমুল উলুম, বালাগাত, মোখতাছারুল মাআনী ইত্যাদি নিম্ন শ্রেনীতে আরবী ব্যাকরন শিক্ষা দেয়া হবে (চ) আইন শাস্ত্র যেমন শরহে বেকায়া, (তাহারত, সালাত, জাকাত, সাওম, হজ্জ, রোজা, নেকাহ, তালাক, ঈমান মরুদ, শারকা ও ওয়াকফ অধ্যায়) শিক্ষা দেয়া হবে । (ছ) সাহিত্য যেমন, ছাবআ মুআলাকা, মাকামাতে হারিরী, দিওয়ানে মুতানাব্বী তারিখুল খোলাফা, শেফা (কারী আয়াজ), শরিফা (কারায়েজ) এখলাকে মোহসেনী, জোলায়খা, সেকান্দারনামা, ও আবুল ফজল ইত্যাদি পড়ানো হবে । (জ) কমিটি শিয়া ছাত্রদের জন্য আলাদা কোন পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা করেন নি । কেননা এ্যাংলো এ্যারাবিক বিভাগে কোন শিয়া ছাত্র নেই । যদি কোন সময় এই বিভাগে শিয়া ছাত্র ভর্তি হয় তাহলে তাকে একজন শিয়া শিক্ষক দ্বারা নিম্নোক্ত পুস্তকাদি পড়ানো হবে, যেমন শরায়েউল ইসলাম এবং শরহে লাম্যা । (ঝ) প্রাথমিক চারটি ক্লাসে সপ্তাহে দুই ঘন্টা করে বাংলা পড়ানো হবে । উপরন্তু কমিটির ইহাও ইচ্ছা যে, ছাত্ররা বাংলা ও উর্দুতে এতখানি পারদর্শী হবে যে, অবলিলাক্রমে যেন তারা ইংরেজী অনুবাদ অথবা ইংরেজী হতে উক্ত দুই ভাষায় অনুবাদ করতে পারে ।[১] (ঞ) প্রাথমিক চারটি ক্লাসে বাংলা পাঠ্য পুস্তক নিম্নরূপ হবে যেমন প্রথম শ্রেনীতে, বর্ণ পরিচয় ১ম ও ২য় খনড, কথামালা, দ্বিতীয় শ্রেনীতে বোধদয় ও আখ্যান মন্জুরী ২য় খনড । তৃতীয় শ্রেনীতে, আখ্যান মন্জুরী ২য় খনড ও চারুপাঠ ১ম খনড এবং ব্যাকরন । চতুর্থ শ্রেনীতে সীতার বনবাস, চারুপাঠ ২য় খনড এবং ব্যাকরন ইত্যাদি । (ট) ছুটি প্রসংগে কমিটি সুপারিশ করে যে, ১৮৬৯ সালের প্রস্তাব অনুযায়ী মাদ্রাসার ছুটির তালিকা অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩০-৩১ ।

Dhaka University Institutional Repository

তবে কিছুটা রদ বদল হতে পারে। রবিবার দিন সম্পূর্ণভাবে মাদ্রাসা বন্ধ থাকবে। কিন্তু শুক্রবার সকাল ছয়টায় ক্লাশ শুরু হয়ে সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলবে। মহরম উপলক্ষে ১০দিন বন্ধ থাকবে। অন্যান্য সাধারনে ছুটির ক্ষেত্রে যদি মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পর্বাদির ব্যাঘাত ঘটে তবে মাদ্রাসার ছুটির তালিকা নিম্নরূপ হবে। যেমন রমজান ৩০ দিন, ঈদুল ফিতর ৩দিন, ঈদুল আযহা ৫দিন, মহরম ১০ দিন আখেরী চাহার শম্বা ১ দিন, ফাতেহা দোয়াজ দহম ১ দিন, শবে বরাত ২দিন, ক্রিসমাস ৭ দিন, নববর্ষ ১ দিন, গুড ফ্রাইডে ২দিন রানীর জন্মদিন ১ দিন, গ্রীষ্মের ছুটি ১৫ দিন ইত্যাদি (খ) পরীক্ষা গ্রহন হেড মৌলবী ও হেড মাষ্টারের নিয়ন্ত্রনাধীনে গঠিত দুটি কমিটির অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক শিক্ষক নিজ নিজ বিষয়ের দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটি জনশিক্ষার ডিরেক্টর অনুমোদন করবেন।(দ) ছাত্র বৃত্তি এক বছরের বেশী সময়ের জন্য দেয়া হবেনা। প্রতি ক্লাসে বৃত্তির পরিমান ও আসন এরূপ হবে, যেমন সপ্তম শ্রেনীতে বৃত্তির সংখ্যা ১টি, টাকার পরিমান ৪/- টাকা। ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে বৃত্তির সংখ্যা ৪টি এবং টাকার অংক ৪/ । ৫ম শ্রেনীতে বৃত্তি ৪টি, ৫/- টাকা। ৪র্থ শ্রেনীতে বৃত্তি ৫টি ৫/- টাকা। ৩য় শ্রেনীতে বৃত্তি ৬টি, ৬/- টাকা। ২য় শ্রেনীতে বৃত্তি ৬টি, ৮/-টাকা। প্রথম শ্রেনীতে ৬টি, ১০/- টাকা। প্রতি ক্লাসে পরীক্ষার পূর্ণমান থাকবে ৬০০ নম্বরের। যেমন আরবী ৩০০, ইংরেজী ২০০, অন্যান্য বিষয় ১০০ নম্বর। নিম্ন শ্রেনীর চারটি ক্লাসের বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর থাকবে আরবী ২০০, ইংরেজী, ২০০ এবং অন্যান্য ২০০ নম্বর।(ধ) আরবী বিভাগের ছাত্ররা উলা পাশ করার পর এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে দুই এক বছর অধ্যয়ন করার অনুমতি লাভ করবে।(ন) আগামীতে মাদ্রাসার কোন পদ খালি হলে কমিটির পরামর্শক্রমে তা পূরণ করতে হবে।[১] এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগের জন্য কমিটি সুপারিশ করেন যে, এই বিভাগের শিক্ষা দানের মান উন্নত করতে হবে এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে। আভিজাত্য নির্ণয়ক নিদর্শন পত্র দিতে হবে। এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগের ছাত্রদের জন্য আবাস স্থলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে ইত্যাদি।[২]

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৩২-৩৩। বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২।

২. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব মাদ্রাসা সংস্কারের প্রশ্নে ১৮৬৯ সালে কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছিল সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে পুনরায় মাদ্রাসা সংস্কারের জন্য এবং সার্বিক পথ নির্দেশনার জন্য এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর মাদ্রাসার আরবী এবং এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগের সকল দিক পর্যালোচনা করে মুসলমানদের শিক্ষার স্বার্থের অনুকূলে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী করে। এই রিপোর্টে শুধুমাত্র ইংরেজীকে প্রাধান্য না দিয়ে আরবী, ফার্সী শিক্ষাকেও প্রাধান্য দেয়া হয়। অপরদিকে উইলিয়াম হান্টার "আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস" নামক গ্রন্থটি রচনা করে এ মর্মে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, মুসলমানরা ইংরেজদের ধর্ম শিক্ষা বিবর্জিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা মেনে নিতে পারে না। কেননা এতে তারা ধর্ম হীনতার আশংকা করে। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী নয়, বরং তারা ধর্ম শিক্ষাকে বাদ দেয়ার কারনেই বিরোধীতা করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বিষয়সহ আরবী ফার্সী শিক্ষার প্রবর্তনই তারা কামনা করে। বৃটিশ সরকার হান্টারের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করেন এবং উহা সমর্থন করেন। অতপর মুসলমানদের আশা আকাংখা ও ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী, ফার্সী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়।[১] এ দিকে ১৮৭১ সালে নবাব আব্দুল লতিফ বড় লাট লর্ড মেয়োর এর সাথে সাক্ষাতের সুযোগে তিনি মুসলমানদের শোচনীয় দুরাবস্থা ও শিক্ষা ক্ষেত্র অনগ্রসরতা ও ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেন। এরফলে বড় লাট ঐ বছর মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে আরবী, ফার্সী পড়ার ব্যবস্থা গ্রহনের এবং বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দেয়ে এক প্রস্তাব গ্রহন করেন।[২] অতপর এভাবে উক্ত সংস্কার পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়।

<u>নতুন পাঠ্য-সূচী</u> :- ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসে উক্ত কমিটি মাদ্রাসার জন্য একটি নতুন পাঠ্য সূচীর সুপারিশ করে। সংস্কার পরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়ার পর মাদ্রাসার প্রত্যেক শ্রেনীতে নিম্নলিখিত পুস্তকাদি পাঠ্যসূচী হিসেবে অনুমোদন করা হয়। যেমন-প্রথম শ্রেনী বা উলা : <u>সুল্লুমুল উলুম সম্পূর্ণ, মুসল্লমুস</u> সবুত কামেল, শাফিয়া (কাজী আয়াজ) প্রথম অধ্যায়, হেদায়া (পাঁচটি অধ্যায়)

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০। মূল আব্দুস সাত্তার তারীখ-ই মাদ্রাসা আলিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১-৭২।

২. দি প্রসিডিংস অব দি গর্ভনমেন্ট অব ইন্ডিয়া ইন দি হোম ডিপার্টমেন্ট (এডুকেশন) নং-৩০০, সিমলা, ৭ই আগষ্ট, ১৮৭১, উদ্ধৃত, উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা ১ম খন্ড, পুবোক্ত, পৃঃ ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

মোকামাতে হারিরী (১ম ভাগ) ও মোতাওয়াল। দ্বিতীয় শ্রেণী বা দুয়াম :-মুতানাব্বি ১ম ভাগ, মোখতাসারুল মা'আনী, দ্বিতীয় অধ্যায়, তাওজিহ্ কামেল, মীর কুতবী, তারিখুল খোলাফা এবং হেদায়া চার অধ্যায়।

তৃতীয় শ্রেণী বা সুয়াম :- নুরুল আনোয়ার ২য় খন্ড, মোখতাসারুল মাআনী ১ম ভাগ, শরহে বেকায়া ৭ম অধ্যায়, কুতবী ২য় ভাগ, ছাব'আ মুআলাকা ও তারিখুল খোলাফা।

চতুর্থ শ্রেণী বা চাহারম:- সেরাজী কামেল, শরহে মোল্লাজামী ২য়খন্ড, নুরুল আনোয়ার ১ম ভাগ, আজকুল আজায়ের ১ম ভাগ, কিবতী ১ম ভাগ, ও শরহে বেকায়া ৫ম অধ্যায়।

পঞ্চম শ্রেণী বা পাঞ্জম-:- শরহে তাহজিব কামেল, শরহে মোয়াল্লা ১ম ভাগ এবং আনোয়ারে সোহায়লী দুই অধ্যায়।

ষষ্ঠ শ্রেণী বা শশম :- কাফিয়া সম্পূর্ণ, মিজান (মানতেক) সম্পূর্ণ, ফুসুলে আকবরী ২য় ভাগ, নাফহাতুল ইয়ামন শেষ খন্ড ১ম অধ্যায় ও আখলাকে মোহসেনী ১ম ২০ অধ্যায়।

সপ্তম শ্রেণী বা হাপ্তম :- হেদায়াতুন নহু, ফুসুলে আকবরী ১ম ভাগ, নাফহাতুল ইয়ামন ১ম ভাগ, শরহে মিয়াত, গুলিস্তান ৪ অধ্যায় ইত্যাদি।[১] ১৮৭১ সালে হুগলী মাদ্রাসা এবং কলিকাতা মাদ্রাসার আরবী বিভাগের জন্য সরকার দ্বারা গঠিত সংস্কার কমিটি কর্তৃক প্রনীত যে পাঠ্যসূচীর সুপারিশ করা হয় তাতে আরবী ব্যতীত ইংরেজী, উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে আরবী, ফার্সী ভাষা ও ইসলামী আইন শিক্ষার প্রতি এতে বিশেষ দৃষ্টি ও গুরুত্বারোপ করা হয়।[২] কিন্তু পাঠ্যসূচী হতে হাদীস তাফসীর এবং উসুল বাদ দিয়ে একটি আইন প্রধান পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত হয়। যারফলে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। এরপড়ে প্রতিবাদের মুখে বিষয়গুলি আবার পাঠ্যসূচীর অর্ন্তর্ভুক্ত করা

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৪২-৪৩। রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০২। হিস্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ পূর্বোক্ত, পৃঃ এ্যাপেন্ডেক্স এ পৃঃ ২০৭।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০। মূল তারীখ ই মাদ্রাসা আলিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

হয় । তাছাড়া এ সময় (১৮৭১) মাদ্রাসা শিক্ষাকাল জুনিয়র ও সিনিয়ার ৪ বছর করে ৮ বছর করা হয় । অর্থাৎ আরবী বিভাগকে ৮টি শ্রেনীতে ভাগ করা হয় । প্রথম ৪টি শ্রেনীকে হায়ার বা উচ্চ শ্রেনী বলা হত এবং পরবর্তী ৪টি শ্রেনীকে "লোয়ার" বা নিম্ন শ্রেনী বলা হত । প্রথম চারটি শ্রেনীতে আরবী ক্লাসের জন্য ৩ ঘন্টা সময় নির্ধারিত ছিল এবং ইংরেজী ক্লাসের জন্য ২ ঘনটা ৩০ মিনিট নির্দিষ্ট ছিল । পরবর্তী নিম্ন চার শ্রেনীতে ,আরবীর জন্য ২ ঘন্টা, ইংরেজীর জন্য ২ ঘন্টা এবং ফার্সী ও বাংলার জন্য ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট নির্ধারিত ছিল ।[১] ১৮৭৭ সালের পর হতে জুনিয়র বিভাগের শিক্ষাকাল ৪ বছর হতে ক্রমশ বাড়িয়ে ৭ বছর করা হয় এবং ১৯০৪ সালে সিনিয়র বিভাগ এর শিক্ষাকাল আরো এক বছর বাড়িয়ে ৫ বছর করা হয় ।[২] ১৮৭৭ সালে এই পাঠ্যসূচী কিছুটা পরিবর্তন করা হয় এবং ১৯০৯ সালে পশ্চিম বঙ্গে স্যার আর্কডেল আর্ল কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উভয় বঙ্গে তা কার্যকর ছিল ।[৩] এবং উক্ত পাঠ্যসূচী মুসলমানদের নিকট মুটামুটিভাবে সমাদৃত হয় ।

অতএব উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরোপ ও বিদ্বেষী মনোভাব ছিল না । বরং ধর্মীয় শিক্ষা বর্জিত ইংরেজী শিক্ষা ও শিক্ষানীতির উপর তারা বিক্ষুব্দ ছিল । কিন্তু বৃটিশ সরকার ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে সমপূর্ণ উদাসীন থেকে শুধু পাশচাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষটা করেছে, তাই মুসলমানরা এই ব্যবস্হাকে কখনো মেনে নিতে পারেনি । কেননা ধর্ম মুসলমানদের পারিবারিকও সামাজিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । যদি ধর্মকে না জানা যায়, না শিক্ষা যায়, তবে মুসলমানদের মুসলমানিত্ব থাকে না । কাজেই ধর্ম শিক্ষা অপরিহার্য । তাই বৃটিশ সরকার যখনই ধর্মীয় শিক্ষা বিলোপ সাধনের জন্য আপ্রান চেষ্টা করেছে কিংবা মাদ্রাসাকে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছে, তখনই মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরক্ত ও বিক্ষুব্দ হয়েছে । কেননা তারা মনে করত যে, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটবে ।

----

১. রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৩ ।

২. মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮ ।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সরকারের ঔদাসীন্যতা, অবহেলা, ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধাচারন, ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ না নেয়া এবং মুসলমানদের ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব ইত্যাদি কারনে এই দীর্ঘ শিক্ষা বিতর্কের দরুন মুসলমানরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।

বাংলা সরকারের নতুন শিক্ষা নীতিঃ- বাংলাদেশে ইতিমধ্যে কিছু রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় বাংলায় মুসলিম শিক্ষার প্রশ্নটি অবিলম্বে অধিক গুরুত্ব পায় । বিশেষ করে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য পশ্চাদবর্তিতা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে ক্রমশ একটি ভীতিপ্রদ অবস্থায় পরিনত হচ্ছিল । এরফলে লর্ড মেয়োর সরকারের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হয় এবং বাংলায় মুসলিম শিক্ষার সমস্যাটি পুনরায় গুরুত্ব লাভ করে । ১৮৭১ সালের ৭ই আগষ্ট ভারত সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে সর্ব ভারতীয় মুসলিম জনসাধারনের অবস্থা সম্পর্কে ৩০০ নং রেজিলিউশন প্রকাশ করেন । মুসলমানদের মত বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্প্রদায় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে থাকবে এ জন্য লর্ড মেয়োর উক্ত রেজিলিউশনে দুঃখ প্রকাশ করেন । তাই তিনি প্রাদেশিক সরকার সমূহের কাছে উক্ত রেজিলিশনটি প্রেরণ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে কিভাবে মুসলমানদের অধিকতর সুব্যবস্থা ও উন্নতি করা যায় সে সম্পর্কে অভিমত আহবান করেন ।[১] বৃটিশ ভারতের সকল প্রদেশ হতে রিপোর্ট পাওয়ার পর ১৮৭৩ সালের ১৩ই জানুয়ারী লর্ড নর্থবুকের সরকার একটি রেজিলিউশন প্রকাশ করেন । ভারতের প্রায় সর্বত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং কলেজগুলিতে মুসলমানদের লক্ষনীয় অনুপস্থিতি অথবা তাদের অনগ্রসরতার কথা এ রেজিলিশনে উল্লেখ করা হয় । সকল রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয় যে, আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরন করছি তাদ্বারা মুসলমানদেরকে আকৃষ্ট করা যায়নি । লক্ষ্য করা হয়েছে যে, মুসলমানরা সরকার অনুসৃত শিক্ষাদান পদ্ধতির যতটা বিরোধী, সরকারের স্থির করা পঠিতব্য বিষয়গুলির প্রতি ততটা বিমুখ নয় । বাংলাদেশ সম্পর্কে রেজিলিউশনে লেখা হয়েছে যে, বর্তমান উপাদানসমূহের সমৃদ্ধ এবং যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করে লেঃ গর্ভনর এখন বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার গৌরব পুনরুদ্ধার করতে ইচ্ছুক ।[২] ১৮৭১ সালে সাধারন বিদ্যালয়সমূহে মুসলমান ছাত্রদের আরবী ফার্সী শিক্ষার

---

১. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩ । হিষ্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৫ ।

২. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১-৩২ ।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য একটি বিশেষ ক্লাশ খোলার নির্দেশ প্রদান করা হয়। যে সকল স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র পাওয়া যাবে এবং যেখানে উচ্চতর শ্রেনীতে মুসলমান ছাত্ররা আরবী ফার্সীর সাথে নিয়মিত পাঠ্যসূচী গ্রহন করতে সম্মত হবে, সে সকল বিদ্যালয়ে উক্ত বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা করা হবে, এরফলে মুসলমান ছাত্রদের উভয় জাতীয় শিক্ষা অবশ্যই গ্রহন করতে হবে। কলিকাতা মাদ্রাসায় কলেজী শিক্ষাকে পুর্নগঠিত এবং পুনঃপ্রতিফলিত করা হবে। অধিকিন্তু ডিগ্রীর জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী, ফার্সীর পরীক্ষা গ্রহনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।[১]

রেজিলিউশনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, মুলিম শিক্ষার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আর্থিক ব্যবস্হার কথা চিন্তা করে বাংলা সরকার ১৮৭২ সালে সর্বপ্রথম উপলব্দি করেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের উৎসাহিত করার জন্য মুহসিন ফান্ডের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে মুহসিন অর্থ তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে।[২] ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে তাই বাংলা সরকার একটি নতুন শিক্ষা পরিকলপনা প্রস্তুত করেন। এই শিক্ষা পরিকলপনার অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ মুহসিন ফান্ড হতে করার প্রস্তাব রাখা হয়। এই পরিকলপনার উল্লেখযোগ্য দিক হল আগামীতে মুহসিন ফান্ডের অর্থ হতে হুগলী কলেজের ব্যয় নির্বাহ করা হবে না। যে অর্থ হুগলী কলেজ এবং আলিয়া মাদ্রাসার জন্য ব্যয় করা হত এই অর্থানুকুল্যে তিনটি বিশেষ ধরনের আরবী মাদ্রাসার গোড়া পত্তন করা হবে যেমন হুগলীতে একটি ছোট মাদ্রাসা, ঢাকা অথবা চট্টগ্রামে একটি মাঝারী ধরনের মাদ্রাসা এবং কলিকাতায় একটি বড় ধরনের মাদ্রাসা এছাড়া মুহসিন ফান্ডের যে টাকা ব্যয় করা হয়নি যা সরকারী তহবিলে জমা আছে, উক্ত অর্থ কলিকাতায় একটি ছাত্রাবাস এবং চট্টগ্রামের মাদ্রাসা ভবন ও ছাত্রাবাস নির্মান কাজে ব্যয় করা হবে।[৩]

এদিকে ১৮৭৩ সালে ছোট লাট লেঃ গভর্ণর জর্জ ক্যামপবেল মুহসিন ফান্ডের টাকা হুগলী কলেজে ব্যয় না করে তা বাংলাদেশের মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয়ের পরামর্শ দেন।[৪]

----

১. এ হিস্ট্রি অব ইংলিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া (১৭৮১-১৮৯৩) পুর্বোক্ত, পৃঃ ১৫১।
২. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পুর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।
৩. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পুর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১-৬২।
৪. বাংলাদেশ ও ইসলাম, পুর্বোক্ত, পৃঃ ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৩ সালের ২৯শে জুলাই বাংলাদেশ সরকার এক প্রস্তাব পাশ করে মুহসিন ফান্ডের টাকা শুধুমাত্র মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। এ সময় হুগলী কলেজ সরকারী কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মুহসিন ফান্ডের টাকা মুসলমানদের শিক্ষার কাজে ব্যয়িত হয়।[১] বড় লার্ট গর্ভনর জেনারেলের অনুমোদন ক্রমে মুহসিন ফান্ডের বার্ষিক ৫৫ হাজার টাকা ও কলিকাতা মাদ্রাসার ৩৮ হাজার টাকা যোগ করে উক্ত টাকা হুগলী ও কলিকাতা মাদ্রাসা পরিচালনার সুব্যবস্থা করা হয় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস স্থাপন এবং মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া সরকার ৯টি জেলা স্কুলে আরবী, ফার্সীর শিক্ষক নিয়োগেরও আদেশ দেন।[২]

উপরোক্ত রিপোর্ট যথা সময়ে গর্ভনর জেনারেল ইন কাউন্সিলের অনুকূলে পেশ করা হয়। তদানীন্তন গর্ভনর জেনারেল লর্ড নর্থ বুক্ক এই রিপোর্ট সমপর্কে মত ব্যক্ত করেন যে, রিপোর্টে সর্বত্রই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদেরকে আকর্ষন করতে পারেনি। রিপোর্টে একথাও অনুভূত হয় যে, সরকার দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সচেষ্ট মুসলমানরা সে ব্যাপারে তেমন বিরূপ মনোভাব পোষন করেনা। তবে বর্তমান শিক্ষার মাধ্যম ও পদ্ধতি সমপর্কে তাদের মত বিরোধ রয়েছে। অবশ্য এ মত বিরোধের পিছনে তাদের ধর্মীয় সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষনের কারন দায়ী। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দুর্বল পদ্ধতি তাদের এ অসহযোগীতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে। যেমন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে যে ভাষার প্রবর্তন করা হয়, তাতে মুসলমানদের সম্মতি ছিলনা। তিনি ভুল এুটি স্বীকার করে উল্লেখ করেন যে, এই এুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা এমন কোন জটিল বিষয় নয়, যার সমাধান করা যাবে না। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের লেঃ গর্ভনরের রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, তিনি স্থানীয় আনুকুল্যের মাধ্যমেই এই শিক্ষা সমপর্কিত বৈশাদৃশ্য দূর করতে চান। এ ব্যাপারে স্মরনযোগ্য ১৮৭১ সালে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, স্কুলগুলিতে আরবী ও ফার্সীর প্রবর্তন করতে হবে। প্রয়োজন

---

১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫০।

২. বাংলাদেশ ও ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮১। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫০। সোসিয়াল হিস্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল (১৮৫৪-১৮৮৪) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

বশত মুসলমানরা স্কুলে এই উভয় ধরনের শিক্ষা লাভ করতে পারবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষারও পুনর্বিন্যাস করতে হবে।[১]

মোট কথা বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার সংস্কার ও পুর্নগঠনের জন্য প্রাদেশিক সরকার ভারতীয় কেন্দ্রিয় সরকারকে লিখিত একপত্রে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করেন। পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ এ,সি,লায়ল (২৪৮ সংখ্যক পত্রে ১৩ই জুন ১৮৭৩, সিমলা) উক্ত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করেন এবং বিস্তারিত কার্যক্রমের দায়িত্ব বাংলা সরকারের হাতে অর্পন করেন।[২] বাংলার লেঃ গর্ভনর ক্যাম্পবেল মুসলিম শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষন করতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ব প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৭৪ সালে মুহসিন ফান্ডের অর্থানুকুল্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়।[৩] এসব মাদ্রাসার জন্য সুযোগ্য সুপারিনটেনডেন্ট ও শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এসব মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায় ইংরেজী ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কলিকাতা মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীই হুবহু প্রবর্তন করা হয়। এ তিনটি মাদ্রাসায় ইংরেজী ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়। তবে বিশেষ নির্দেশে বলা হয়েছিল যে, যেখানে ছাত্ররা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখাবে, সেখানে ইংরেজী শিখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ঢাকা মাদ্রাসায় উদ্বোধনের সময় হতেই ইংরেজী বিষয় প্রবর্তিত হয়। ফেকার অধ্যায় বিশেষ এবং নির্ভরযোগ্য অংশ পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা উদার প্রকৃতির শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে থাকে।[৪]

এ সব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রাচ্য সাহিত্য অধ্যয়নে উৎসাহ দান ছিল পরোক্ষ উদ্দেশ্য। এ প্রতিষ্ঠানগুলি মুহসিন ওয়াক্ফ ফান্ড হতে পরিচালিত হত। এছাড়া অন্যান্য ওয়াক্ফ সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত আরো চারটি মাদ্রাসা তালিকাভুক্ত ছিল। মুর্শিদাবাদের নওয়াবের মাদ্রাসা নামে পরিচিত

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২-৬৩।

২. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, এক বিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪০। উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ৬২।২য় খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃঃ১০৮। এ হিস্ট্রি অব ইংলিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া,১৭৮১-১৮৯৩, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১৬০।হিস্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৪০।

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৪০। আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত,পৃঃ১৬৫। মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

একটি মাদ্রাসার নাম ও তালিকাভুক্ত ছিল ।[১] এ সময় বাংলাদেশে কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী এই পাঁচটি সরকারী মাদ্রাসা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে চলতে থাকে । এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, এসব মাদ্রাসায় আরবী সাহিত্য প্রত্যেক শ্রেনীতেই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল । কিন্তু আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে যোগ্যতা ও পান্ডিত্য অর্জনের জন্য ছাত্রদের যে দক্ষতা ও আগ্রহ গড়ে তোলার দরকার ছিল এবং সেক্ষেত্রে যে শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল, সেদিকে তেমন কোন মনোযোগ দেয়া হয়নি । কেননা আরবী সাহিত্য পড়ানো হত তখন কেবল হাদীস ও তাফসীর শিক্ষার সহায়ক বিষয় হিসেবে ।[২]

এভাবে বাংলা সরকার মুলিম শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহন করে তন্মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে তিনটি মাদ্রাসা স্থাপন অন্যতম । এতৎসহ স্কুল এবং কলেজে মুসলমান ছাত্রদের জন্য ৪২টি বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয় । মুসলমান ছাত্ররা যাতে কম বেতনে ও কম খরচে লেখা পড়া করতে পারে সে জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজে মুহসিন ফান্ড হতে অর্থ বরাদ্দ করা হয় । এই তহবিলের টাকা হতেই কয়েকটি স্কুল কলেজের ফার্সী বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় । মুসলিম শিক্ষা স্বার্থ তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ইউরোপীয় পন্ডিতকে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয় । ১৮৭৩ সালের রেজিলিউশন অনুযায়ী মাদ্রাসা সমূহে নিম্ন বর্ণিত রূপে অর্থ বরাদ্দ করা হয় । যেমন কলিকাতা মাদ্রাসার জন্য ৩৫ হাজার টাকা, ঢাকা মাদ্রাসার জন্য ১০,০০০/- টাকা । তিনটি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস সংক্রান্ত ব্যয় ২১,০০০/- টাকা । ছাত্র বৃত্তি সহ অন্যান্য ব্যয় বাবত ১১,৮০০/- টাকা । নয়টি জেলা স্কুলে মুসলিম শিক্ষার জন্য ৭,২০০/- টাকা, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হুগলী কলেজ, ও ঢাকা কলেজ অথবা কলিজিয়েট স্কুলসমূহ কিংবা রাজশাহী ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুলে বা আইন ক্লাশে যে সকল মাদ্রাসার ছাত্র অধ্যয়ন করত তাদের জন্য বেতনের দুই তৃতীয়াংশ বাবদ ৮,০০০/- টাকা । অর্থাৎ সর্বমোট ৯৩,০০০/- টাকা বরাদ্দ করা হয় ।[৩]

----

১. মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬ ।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, এক বিংশ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১ ।

৩. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪-৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব এভাবে মুহসিন ফান্ডের অর্থানুকূল্যে বাংলাদেশে তিনটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে পশ্চাদপদ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির পরিকল্পনা করা হয়। কেননা সরকার দীর্ঘ একশতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পর কিছুটা অনুধাবন করতে পারে যে, মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার পিছনে তাদের (সরকারের) শিক্ষানীতি ও মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব অনেকটা দায়ী। কেননা সরকারের ভুলত্রুটি, সঠিক পদক্ষেপ গ্রহনে ব্যর্থতা, সর্বোপরি ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চাপিয়ে দেয়ার দূরভী সন্ধির কারনে, মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। সরকার আরো অনুধাবন করে যে, মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী নয় বরং ইংরেজী শিক্ষার নামে ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংশ করার চক্রান্তের বিরোধী। কাজেই বৃটিশ সরকার দীর্ঘ দিন পর এ ভুল বুঝতে পেরে শিক্ষা সংস্কারের এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহন করে এবং এ পরিকল্পনানুযায়ী মুসলমানদের ধর্ম, শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সাথে সংগতি রেখে শিক্ষা সম্প্রসারনের উদ্যোগ গ্রহন করে এবং মুহসিন ফান্ডের অর্থানুকূল্যে বাংলাদেশে ৩টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে কলিকাতা মাদ্রাসার অনুরূপ পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা হয়। এতে ইংরেজী বাংলা ছাড়াও আরবী, ফার্সীর উপর অধিক প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা সূচী প্রনয়ন করা হয়। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজেও আরবী ফার্সীর প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

১৮৭৩ সালের শিক্ষা পরিকল্পনার অল্প কয়েক বছর পর একটা প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, কলিকাতা এবং মফস্বল এলাকার উচ্চ মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমগ্র বাংলাদেশের মক্তবগুলিকে সংযোজিত করা হোক। সে চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি বরং বিপরীত আরেকটি পরিকল্পনার অনুকূলে তা পরিত্যাগ করা হয়। পরিকল্পনাটি এভাবে প্রকাশ করা হয় যে, মক্তবগুলিকে ক্রমশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদর্শে গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় যে সকল দেশীয় বিদ্যালয় স্বতন্ত্র অবস্থায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সেগুলির বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখেই সেখানে নতুন সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হয়। সংস্কারের কাজ হল সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে সনাতন পাঠ্যসূচীর মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করা, যাতে এদেশের সাধারন শিক্ষার সাথে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মুখোমুখি একটা সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। এর উপর ভিত্তি করে কয়েকশত মক্তবকে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্ররা সাধারন বেতন হারের যে এক তৃতীয়াংশ পরিশোধ করে অধ্যয়ন করতে পারত, ১৮৮০ সাল পর্যন্ত সরকারী, বেসরকারী নির্বিশেষে কলিকাতার সমস্ত কলেজেই তাদের জন্য সে সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ সকল ব্যবস্থা গ্রহনের ফলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১ সালের এক পরিসংখ্যান হতে হিন্দু ও অন্যান্য ছাত্রদের সাথে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যানুপাতে এরূপ বুঝা যায় যেমন স্কুলসমূহে হিন্দু ছাত্র সংখ্যা ১,৪৯,৭১৭ জন, মুসলমান ২৮,০৯৬ জন, অন্যান্য ছাত্র সংখ্যা ১৫,৪৮৯ জন। কলেজসমূহে, হিন্দু ছাত্র ১১৯৯ জন, মুসলিম ৫২ জন, অন্যান্য ৩৬ জন। সর্বমোট ১,৯৪,৫৮৯ জন, এর মধ্যে মুসলমান সর্বমোট ২৮,১৪৮ জন। এভাবে সে সময়ের বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা যখন সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩২.৩ জন, তখন স্কুল পর্যায়ে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা সমগ্র ছাত্র সংখ্যার শতকরা ১৪.৪ জন এবং কলেজ পর্যায়ে তাঁরা মাত্র শতকরা ৪ জন। এজন্য শিক্ষা পর্ষদের ডিরেক্টর ১৮৭১-৭২ সালের রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, এ অবস্থায় ইহাই প্রমান করে যে, মুসলমানদের শিক্ষার জন্য মনোযোগ দেয়া আবশ্যক।[১] ১৮৭৪ সালে সাধারন কলেজগুলিতে পাঠরত মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল শতকরা ৪ জন, স্বতন্ত্র কলেজসমূহে শতকরা সাড়ে পাঁচ জন, এবং সর্বসাধারনের জন্য উন্মুক্ত স্কুলে শতকরা ১৯-১/২ জনের কিছু বেশী। ১৮৮১-৮২ সালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল যেমন ইংরেজী কলেজে শতকরা ৩.৮ জন। প্রাচ্য কলেজে শতকরা ৯৯.৯০ জন। উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮.৭ জন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৩.২ জন। দেশীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৩.৭ জন এবং দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৪.৬ জন। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছিল, এতে সর্বমোট মুসলিম ছাত্র সংখ্যা দাড়ায় ২,৬১,১০৮ জন। এ রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, কলেজ পর্যায়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যানুপাত ১৮৭১ সাল অপেক্ষা অনেক হ্রাস পায়। পূর্বে অবশ্য তাদের সংখ্যাছিল ৪.০৪ জন। তবে সার্বিক ভাবে ১৮৮১-৮২ সালের দিকে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১ সালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৮,১৪৮ জন। ১৮৮২ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৬১১০৮ জন। অতএব ১৮৭১ সালের সংখ্যানুপাতিক হার হচ্ছে শতকরা ১৪.৪ জন এবং ১৮৮২ সালে শতকরা হার হল ২৩ জন।[২]

---

১. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫-৩৬।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন ঃ- মাদ্রাসার মাধ্যমে এবং মুসলিম বিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষার উন্নতির জন্য ১৮৭১ সালের দিকে একটি শিক্ষানীতি প্রনয়ন করা হয়েছিল । এতে স্থির করা হয়েছিল যে, দশ বছরের মধ্যে এই নীতি কার্যকর করা হবে । কিন্তু এ সত্ত্বেও মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি । এই পরিস্থিতি অবলোকন করে লেঃ গর্ভনর অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষন হতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, কয়েক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও হুগলী মাদ্রাসাসমূহ শিক্ষাগত কিংবা রাজনৈতিক কোন দিক থেকেই আর বেশী দিন চালু রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না ।[১] এদিকে সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮০ সালে মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা রচনা করেন । তিনি তাতে উল্লেখ করেন যে, মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না , সরকার এ বিষয়ে উদাসীন । মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা না করায় ভারতের অন্যান্য জাতীর সংগে তারা প্রতিযোগীতায় টিকতে পারে না । এদিকে মুহসিন ফান্ডের টাকায় হুগলী, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের মাদ্রাসায় যে ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে তার দ্বারা কোন উপকার হয় না । অতএব হুগলী মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হোক ও রাজশাহী, চট্টগ্রাম মাদ্রাসার ব্যয় সংকোচন করা হোক । এভাবে মুহসিন ফান্ডের যে ৯০ হাজার টাকা অতিরিক্ত হিসেবে বেঁচে যাবে তাঁর দ্বারা কলিকাতা মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে স্বতন্ত্রভাবে ডিগ্রী কলেজ খোলা হোক ।[২] কিন্তু তদানীন্তন গর্ভনর আমির হোসেনের এরূপ প্রস্তাব গ্রহন করেনি ।

এভাবে মুহসিন ফান্ডের অর্থে পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাব, অপরদিকে ১৮৭১ সালের শিক্ষা পরিকল্পনায় মুসলিম শিক্ষার উন্নতির যে আশা ব্যক্ত করা হয়েছিল, বাস্তবে তা অর্জিত না হওয়া ইত্যাদি কারনে মুসলমানদের শিক্ষার অনগ্রসরতার কারন অনুসন্ধানকল্পে ১৮৮২ সালে লর্ড রিপন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন । এই কমিশন ভারতের শিক্ষার অবস্থা বিশেষ করে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত করা হয় । প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর হান্টারকে এই কমিশনের সভাপতি নিয়োগ করা হয় । এজন্য একে হান্টার

১. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯-৪০ ।

২. মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর ,পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৬ । সোসিয়াল হিস্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল (১৮৫৪-১৮৮৪) , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন বলা হয় । এই কমিশন ব্যাপক ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের সাক্ষাৎকার ও পরামর্শ গ্রহন করে । কমিশন বাংলাদেশের শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য এ, ডব্লু, এগফ্রুট এর নেতৃত্বে অপর একটি কমিটি গঠন করে । এই কমিটি এ দেশের শিক্ষা প্রসংগে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলীর সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহন করেন ।[১] ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের সামনে সৈয়দ আমির আলী মন্তব্য করেন যে, মাধ্যমিক স্তর হতে উপরের দিকে সর্বস্তরে মাদ্রাসাগুলিতে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করা হোক । এ দেশের মানুষের ইংরেজী পরিত্যাগ করে শুধু প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা দেয়ার ফল খুবই খারাপ হবে ।[২] এ দিকে ১৮৭৮ সালে সৈয়দ আমির আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন" পরবর্তীতে যার নাম হয় "সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশন", হান্টার কমিশনের নিকট মুসলমানদের দাবী দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারক লিপি পেশ করেন । এই স্মারক লিপিতে সরকারকে হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদ্রাসা তুলে দিয়ে, ঐসব মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ বাঁচিয়ে কলিকাতায় কেবল মাত্র মুসলমানদের জন্য একটি ইংরেজী কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয় ।[৩]

এসোসিয়েশনের এ প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত দেবার জন্য সরকার আব্দুল লতিফ সাহেবকে অনুরোধ করেন । জনাব লতিফ সাহেব এ প্রস্তাবে বিরোধিতা করেন । তিনি মত প্রকাশ করেন যে, মাদ্রাসার বিলুপ্তি সাধন অবিবেচনা প্রসূত কাজ হবে । কেননা রাজনৈতিক দিক এবং মানস চর্চার দিক এ উভয় দিক থেকেই প্রাচ্য শিক্ষা অনুশীলনের ও অধ্যয়নের জন্য কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রাখার প্রয়োজন রয়েছে ।[৪] তিনি "পেপার অন দি প্রেজেন্ট কনডিশন অব ইন্ডিয়া মোহামেডান এন্ড দি বেষ্ট মেনস্ ফর ইটস্ ইমপ্রুভমেন্ট" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ সালে

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৭-৬৮ ।
২. বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭২ । মূল এ,কে,সিনহা, হিষ্টিু অব বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫) পৃঃ ৪৬২ ।
৩. বাংলাদেশ ও ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৮ । বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩ ।
৪. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের নিকট পেশ করেন । এই প্রবন্ধে লতিফ সাহেব মাদ্রাসা তুলে দেয়ার ঘোর বিরোধীতা করেন । তিনি উল্লেখ করেন যে, মুসলমানদের দৈনন্দিন ধর্মীয় কাজ কর্ম ও সামাজিক কর্তব্য পালনে শরাহ শরীঅতের শিক্ষা ও উপদেশ দেয়ার জন্য আরবী, ফার্সীতে অভিজ্ঞ কাজী ও মৌলবীর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ধর্মভীরু মুসলমানেরা মনে করেন যে, সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী ফার্সীর কোন স্থান না থাকায় ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানদের চরিত্র বিকৃত হয়ে যায় ।[১] এভাবে মত বিরোধের ফলে উনিশ শতকের শেষের দিকেও মাদ্রাসা শিক্ষা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায়ই রয়ে যায় । ১৮৮৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী লর্ড রিপন যখন কলিকাতা মাদ্রাসা পরিদর্শনে আসেন, তখন ঐ সময় লর্ড রিপনকে দেয়া এক স্মারক পত্রে আমীর আলীর নেতৃত্বে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রাখার পক্ষে জোর সুপারিশ করা হয় ।[২] তবে এখানে একটি কথা স্মরনযোগ্য যে, আব্দুল লতিফ সাহেব ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না । বরং তিনি ধর্মীয় শিক্ষা তথা আরবী, ফার্সীর প্রাধান্য দিয়ে ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছেন । কেননা মুসলমানদের দৈনন্দিন ধর্ম কর্ম পালন ও সামাজিক রীতি নীতির সাথে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এ কারনে তিনি আরবী, ফার্সী শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন । কিন্তু পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার কথাও বলেছেন । অপরদিকে সৈয়দ আমীর আলী আরবী, ফার্সী শিক্ষার পরিবর্তে কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষাকে তুলে দিয়ে শুধু ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার পক্ষপাতি ছিলেন । কেননা তার মতে আরবী, ফার্সী শিক্ষা হল পশ্চাৎমুখী শিক্ষা এর দ্বারা কোন উন্নতি করা যায় না । অতএব এখানেই আব্দুল লতিফের শিক্ষা ধারার সাথে সৈয়দ আমির আলীর শিক্ষা চিন্তাধারার পার্থক্য ।

---

১. আব্দুল লতিফ খান, এ শর্ট এ্যাকাউন্ট অব মাই হাম্বল ইফোর্টস টু প্রমোট এডুকেশন, স্পেশিয়ালী এ্যামংগ মোহামেডানস, (কলিকাতা ১৮৮৫) পৃঃ ৫২, ৫৪, ৫৬ । কাজী আবদুল মান্নান, "বাঙালী মুসলমানের শিক্ষান্দোলন ও বাংলা সাহিত্য", শীর্ষক প্রবন্ধ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা শ্রাবন, আশ্বিন, ১৩৬৮, পৃঃ ২৫, ২৬ । উদ্ধৃত বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩ ।

২. উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৭ । মুল রিপোর্ট অন দি ইন্ডিয়া এডুকেশন কমিশন, ১৮৮৩, পৃঃ ৩০৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলীর উপরোক্ত বিবৃতি অনুযায়ী সে সময়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিছুই গ্রহন করা হয়নি । মুসলমানদের শিক্ষা পুর্নগঠন বিষয়ক কমিশন মুসিলিম শিক্ষার অবস্থা সমপর্কে সামগ্রিকভাবে তদন্ত করেন এবং মুসলিম শিক্ষা শিরোনামে ১৭টি প্রস্তাব সম্বলিত একটি সুপারিশ পেশ করেন । নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হল । যেমন-(ক) মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার করার জন্য যে বিশেষ ব্যয় বরাদ্দ করা হবে উহা জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও প্রাদেশিক সরকারের বাজেট হতে ব্যয় করা হবে ।(খ) দেশের মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এমন উদারভাবে উৎসাহিত করা হবে যাতে অন্য ধর্মের পাঠ্য বিষয় তথা ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়সমূহ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । (গ) মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার একটি বিশেষ মান নির্ধারন করতে হবে । (ঘ) ভারতীয় ভাষাকে (উর্দু) সাধারনভাবে মুসলমানদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ স্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করতে হবে । তবে অঞ্চল বিশেষ মুসলমানরা যদি অন্য ভাষাকেও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে চায় তাও সে বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে । (ঙ) যে সব অঞ্চলে উর্দু ভাষা অফিস আদালতের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি সে সব এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে এই ভাষা চালু করতে হবে । বিশেষ করে সরকারের অধীনে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাতে অংক শিক্ষাও এই ভাষায় দিতে হবে । (চ) মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারী মিডল ও হাই স্কুলে উর্দু ও ফার্সী অধ্যয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। (ছ) ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানরা খুবই পশ্চাৎপদ ও উদাসীন । তাই এ ব্যাপারে অধিক হারে সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে ।(জ) জনশিক্ষা বিষয়ক বার্ষিক রিপোর্টের একটি স্বতন্ত্র অংশ মুসলিম শিক্ষা সমপর্কিত আলোচনার জন্য রক্ষিত রাখতে হবে ।(ঝ)শিক্ষিত মুসলমান এবং অন্য সমপ্রদায়ের মধ্যে সরকারী চাকরী ও অন্যান্য সুবিধাদি বিতরনের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হার রক্ষার দিকে প্রাদেশিক সরকার সমূহের দৃষ্টি আকর্ষন করতে হবে ইত্যাদি । কমিশনের উক্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর ভারত সরকার ১৮৮৪ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখের ৩০১/১০ নং রেজিলিউশনে মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের সাধারন নীতি প্রসংগে এতটুকু মন্তব্য করেন যে, গর্ভনর জেনারেল ইন কাউন্সিল মুসলমান সমপ্রদায়ের অনুন্নত অবস্থা ও শিক্ষার অনগ্রসরতার ব্যাপারে কতিপয় ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা প্রদানের জন্য আলাদাভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন । তাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই পশ্চাৎপদ, এজন্য বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে তাদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে ।[১]

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১১০-১২ ।বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০,৪২ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মাদ্রাসার সামগ্রিক চিত্র ঃ- সৈয়দ আমির আলী এবং নবাব আবদুল লতিফ খানের পূর্বোক্ত মতামতের উপর ভিত্তি করে বাংলা সরকার এ সমপর্কে চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন । মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আলিয়া মাদ্রাসায় যদি কলেজ করা হয়, তবে অল্প বেতনে ছাত্ররা সহজেই কলেজের শিক্ষা লাভ করতে পারবে । এই প্রস্তাব উত্থাপনের ফলশ্রুতিতে সরকার ১৮৮৪ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগকে উন্নত করে দ্বিতীয় গ্রেড কলেজে রূপান্তরিত করা হবে ।[১] এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৮৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় এফ,এ,পর্যায় পর্যন্ত কলেজ বিভাগ পুনরায় চালু করা হয় ।[২] কিন্তু বাস্তবে এই কলেজ প্রবর্তন করতে গিয়ে এমন কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয় যে, অবশেষে সরকারকে কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হয় । এরপর এই সমপর্কে নতুন ইশতেহার প্রকাশ করা হয় যে, আলিয়া মাদ্রাসাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করা হবে এবং আগামীতে মাদ্রাসাতে আর কখনো কলেজের মানের শিক্ষারপ্রবর্তন করা হবে না । তবে অবশ্য মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য এতটুকু সুবিধা দেয়া হবে যে, তারা মাদ্রাসার ছাত্র - হিসেবে পরিচিত হবে এবং মাদ্রাসায় তারা যে ধরনের নামে মাত্র বেতনে লেখাপড়া করতে পারত, প্রেসিডেন্সি কলেজেও তারা এতটুকু সুযোগ সুবিধা পাবে ।[৩] অতপর শিক্ষাদানের নিমিত্ত এ বিভাগকে ১৮৮৮ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের সাথে সংযোজিত করে দেয়া হয় এবং এ সময় হতে মাদ্রাসা কলেজের ছাত্ররা প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্লাশ করতে থাকে ।[৪] উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের পর এই নিয়ম মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য ১৯০৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । কিন্তু এ বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদালেয় কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসাকে কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অসম্মতি জানায় । কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মাদ্রাসা কলেজের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালেয়ের মানের সাথে সংগতি পূর্ণ নয় বলে মনে করে । এ কারনে ১৯০৯ সালে মাদ্রাসার কলেজ শাখা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় ।[৫]

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৪ ।
২. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫ ।
৩. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৫ ।
৪. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পৃঃ ৪৫ ।
৫. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে ১৮৭৪ সালে বাংলাদেশে যে তিনটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় তন্মধ্যে রাজশাহীর দরসে নিজামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা ও একটি। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা ক্রমশ প্রভাব বিস্তার লাভ করায় এবং সরকারী অফিস আদালতে চাকুরী লাভের আশায় অধিকাংশ মুসলিম ছাত্র স্থানীয় স্কুল কলেজে ইংরেজী মাধ্যমে পড়া লেখা শুরু করে। ফলে ক্রমশ মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকে। এ কারনে ১৮৮৩ সালে রাজশাহী মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়।[১] কিন্তু মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলে অবশেষে সরকার দ্বিতীয় বার রাজশাহী মাদ্রাসা চালু করতে বাধ্য হন। তবে এ সময় মাদ্রাসার মান হ্রাস করে জুনিয়র মাদ্রাসায় পরিনত করা হয় এবং এ মাদ্রাসায় রাজশাহী কলেজের একটি শাখাও প্রবর্তন করা হয়। মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা ও দেখাশুনার ভার রাজশাহী কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর অর্পন করা হয়। তবে মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয় ও সূচী কলিকাতা ও অন্যান্য মাদ্রাসার মতই ছিল।[২]

১৮৮৪-৮৫ সালে জনশিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট হতে বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহের নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন-(ক) কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ১৮৮৪ সালে ছিল ২৫৫ জন, ১৮৮৫ সালে ৩৩৬ জন, সরকারী সাহায্য ১৮৮৪ সালে ১১,৪৬৪ টাকা, ১৮৮৫ সালে ৯,২৬৪ টাকা, বেসরকারী সাহায্য ১,২৭৩ টাকা, মোট খরচ ১৮৮৪ সালে ১২,৭৩৭ টাকা। (খ) ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ১৮৮৫ সালে ছিল ২৩৮ জন এবং ১৮৮৪ সালে ৩৫০ জন, বেসরকারী সাহায্য ১৩,৪১০ টাকা, মোট খরচ ১৮৮৪ সালে ১৩,৪১০ টাকা, ১৮৮৫ সালে ১২,২৭৩ টাকা। (গ) চট্টগ্রাম মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ১৮৮৫ সালে ছিল ৩৪১ জন, ১৮৮৪ সালে ৪৯৭ জন, বেসরকারী সাহায্য ৮,৯৬৫ টাকা মোট খরচ ১৮৮৪ সালে ৮,৯৬৫ টাকা, ১৮৮৫ সালে ৯,১২১ টাকা। (ঘ) রাজশাহী মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ১৮৮৫ সালে ৫০ জন। বেসরকারী সাহায্য ৫৬১৬ টাকা, মোট খরচ ১৯৮৪ সালে ৫৬১৬ টাকা, ১৮৮৫ সালে ২৩৮৬ টাকা। (ঙ) হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ১৮৮৫ সালে ৩৩ জন, ১৮৮৪ সালে ৩৯ জন বেরসকারী সাহায্য ৫৬৩১ টাকা,

---

১. কাজী মোহম্মদ মিছের "রাজশাহীর ইতিহাস", (বগুড়া ১৯৬৫) ১ম খন্ড, ১ম মুদ্রন, পৃঃ১২২। সোসিয়াল হিষ্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল, ১৮৫৪-১৮৮৪, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯৬। রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৫ সালে ২৫১৯ টাকা । উপরোক্ত মাদ্রাসাগুলি সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল । এসব মাদ্রাসা ব্যতীত ও বাংলাদেশে আরো কয়েকটি মাদ্রাসা ছিল যেগুলিকে সরকার অনুমোদন করে কিছু অর্থ বরাদ্দ করেন । মাদ্রাসাগুলি হল জোড়াঘাট মাদ্রাসা হুগলী, মুহসিন ফান্ড হতে ৪০ টাকা পেত । কক্সবাজার মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম, সরকারী তহবিল হতে প্রতি মাসে ৪০ টাকা পেত । মীর এ হিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম মীর এহিয়া ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে সাহায্য পেত । এভাবে ১৮৮৫ সালে বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী মাদ্রাসা সব মিলিয়ে দশটিতে উন্নীত হয় । এই দশটি মাদ্রাসার মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩৮৬ জন । এরমধ্যে সরকারী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল ১০৫৭ জন এবং বেসরকারী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল ৩২৯ জন ।[১]

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, এ সময় মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ছাত্র সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়নি । কেননা অধিকাংশ মুসলমান গ্রামে বাস করত এবং তাদের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত করুন ছিল । কিন্তু সরকার গ্রামের মানুষের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেনি । তাই বিপুল অর্থ ব্যয় করে শহরে গিয়ে লেখা পড়া করার সঙ্গতি খুব কম সংখ্যক মুসলমানের ছিল । তাছাড়া উত্তর বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্য ছিল অধিক, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা মোটেই । অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল কলিকাতায় । কিন্তু সেখানে মুসলমানের সংখ্যা ছিল খুবই কম । তাই মফস্বল শহর বা গ্রাম হতে গিয়ে কলিকাতায় লেখা-পড়া করার অবস্থা অধিকাংশ মুসলমানের ছিল না । যারফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করতে পারেনি । এ কারনেই মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য ছিল । এভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ইত্যাদি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে একই অবস্থা বিরাজ করছিল । এ কারনেই ১৮৮৪ সালের শিক্ষা পরিদপ্তরের সাধারন রিপোর্টে লেঃ গর্ভনর রিভিস থমসন্ উল্লেখ করেছেন যে কোন সংস্কারের চেয়ে বরং মুসলমানদের আনুপাতিক দারিদ্রই তাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহনে বাধা দিচ্ছে । যে সব জেলায় মুসলমানরা সমাজের নিচু স্তরে বাস করে সেখানেই তাদের শিক্ষার হার কম এবং যেখানে তারা স্বচ্ছল সেখানেই তাদের শিক্ষার হার বেশী ।[২]

----

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৫-৯৭ । রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬১-১৯৭৭) ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৬ ।
২. বাংলাদেশ ও ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭২ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৮ সালের এক তথ্য বিবরণীতে প্রকাশ পায় যে, এ সময় কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১৭০ জন । এর মেধ্যে ২৫ জন ছাত্র ছিল কলেজ বিভাগে এবং ৩০০ জন ছিল কেলেসঁা শাখা স্কুলে । ঢাকা মাদ্রাসায় সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪২৪ জন, এর মধ্যে ২৩৮ জন ছিল আরবী বিভাগে এবং ১৮৬ জন ছিল ইংরেজী বিভাগে । চট্টগ্রাম মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪২১ জন । হুগলী মাদ্রাসায় ছিল ৬০ জন, সীতাপুর মাদ্রাসায় ৬০ জন, জোড়াঘাট মাদ্রাসায় ৫৫ জন এবং চট্টগ্রামের মীর এহিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার ছাত্র ছিল ১০৮ জন । এ সময় চট্টগ্রামের সরকারী মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলবী আবদুল ওয়াদুদ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন । অতি অলপদিনে এই মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা দাড়ায় ৩১৮ জন । মাদ্রাসাটির নাম রাখা হয় এ্যাংলো এ্যারাবিক মাদ্রাসা । তাছাড়া ১৮৮৮ সালে বিভিন্ন মাদ্রাসায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সর্বমোট ৭২ জন মাত্র পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে, এর মধ্যে ১ম বিভাগে ২৯ জন, ২য় বিভাগে ১৮ জন, ৩য় বিভাগে ১২, সর্বমোট ৬৯ জন পাশ করে । ঢাকা মাদ্রাসায় ৫৭ জন ছাত্র পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করে, এর মধ্যে ১ম বিভাগে ১০ জন, ২য় বিভাগে ১৮ জন , ৩য় বিভাগে ১২ জন, মোট ৩৮ জন পাশ করে । চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় ৫১ জন ছাত্র পরীক্ষা দেয় । এরমধ্যে ১১ জন ১ম বিভাগে, ৭ জন ২য় বিভাগে ,১২ জন তৃতীয় বিভাগে, মোট ৩১ জন ছাত্র পাশ করে । হুগলী মাদ্রাসায় মোট ১৯ জন পরীক্ষা দেয় । এরমধ্যে ৭ জন ১ম বিভাগে, ৩য় বিভাগে ৫ জন, মোট ১২ জন পাশ করে ।[১] উপরোক্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, পূর্বোবাংলার মাদ্রাসাসমূহে ছাত্র- সংখ্যা এবং পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা অন্যান্য মাদ্রাসার তুলনায় বেশী । কেননা এ সময় মুসলমানদের মধ্যে মনমানসিকতার পরিবর্তন হতে থাকে এবং ক্রমশ তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে । এরফলে মাদ্রাসার সংখ্যা কয়েকটি বৃদ্ধি পায় সাথে সাথে ছাত্র সংখ্যাও কিছুটা বৃদ্ধি পায় ।

১৮৯২ -৯৩ সালে এক তথ্য বিবরণী হতে প্রমান পাওয়া যায় যে, এ সময় ঢাকা মাদ্রাসার সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪১৬ জন । এরমেধ্য আরবী বিভাগে ২১৭ জন এবং এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে ছিল ১৯৯ জন । চট্টগ্রাম এলাকার লোকেরা একটি প্রস্তাব করেছিল যে, চট্গ্রাম মাদ্রাসার

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগকে ইংরেজী হাই স্কুলের সমমানে উন্নীত করা হোক । কিন্তু বৃটিশ সরকার এ প্রস্তাব স্বীকার করেন নি । রাজশাহী ও হুগলী মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের মান কলেজের সাথে সমপর্কিত ছিল । এ সময় চট্টগ্রামের মীর এহিয়া মাদ্রাসায় ১২২ জন ছাত্র লেখা পড়া করত । কক্স বাজারের মাদ্রাসায় আরবী, ফার্সী ব্যতীত ইংরেজী, বাংলা ও অধ্যয়ন করানো হত । পরবর্তীতে এই মাদ্রাসা ক্রমান্বয়ে মিডল স্কুলে পরিনত হয়েছিল । এছাড়া এ সময় আরো অনেক বেসরকারী মাদ্রাসা ছিল । যেমন-বর্ধমান বিভাগের মেদিনীপুর মাদ্রাসা, বোহার মাদ্রাসা, কুসুমগ্রাম ও সীতাপুর মাদ্রাসা । ঢাকা বিভাগে ছিল, ফরিদপুর এবং জামালপুর মাদ্রাসা । চট্টগ্রাম বিভাগে ছিল ইসলামিয়া মাদ্রাসা, সুলতানপুর ভিক্টোরিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম ও হোসামিয়া মাদ্রাসা ত্রিপুরা । পাটনা বিভাগে আহমদিয়া মাদ্রাসা, পাটনা ইসলামিয়া মাদ্রাসা, দানাপুর হানিফিয়া মাদ্রাসা ও আহমদিয়া মাদ্রাসা, আড়া । ভাগলপুর বিভাগে ভাগলপুর মাদ্রাসা ও ছোট নাগপুর ইত্যাদি মাদ্রাসা তখন চালু ছিল ।[১]

কিন্তু দীর্ঘ দেড় শতকের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার তেমন কোন উন্নতি হয়নি । কোম্পানী শাসনের শুরু হতে বিংশ শতাব্দীর দ্বারগোড়ার পর্যন্ত এসেও মুসলিম শিক্ষার ব্যাপারে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসা যায়নি কিংবা শিক্ষা জটিলতার কোন সমাধান করা সম্ভব হয়নি । সময় সময় শুধু বিভিন্ন কমিটি গঠন, রিপোর্ট পেশ, বাস্তবায়নের চেষ্টা এবং অবশেষে ব্যর্থতা এভাবেই চলে এসেছে । তবে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে । উপরোক্ত আলোচনা হতে মনে হয়েছে যে, বৃটিশদের ধর্মীয় শিক্ষা বিরোধী মনোভাব, অপরদিকে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মহীনতার চক্রান্ত, ইত্যাদি কারনে মুসলিম শিক্ষা সবদিক থেকেই পিছিয়ে পড়ে । সরকার মুসলমানদের সার্বিক শিক্ষা ব্যাপারে কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহনে তেমন মনোযোগ দেয়নি । শুধু কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসাকেই কেন্দ্র করে তাদের মনোযোগ ও চিন্তা আবর্তিত হয়েছে । ১৮৭৪ সালের দিকে যদিও তিনটি মাদ্রাসা খোলা হয় তাও আবার ছাত্র ভর্তি সমস্যায় রাজশাহী মাদ্রাসায় জুনিয়ার মাদ্রাসায় পরিনত হয় । তাই দেখা যায় যে, মুসলিম শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয় ভূমিকার অভাব, ঔদাসীনতা, এবং সর্বোপরি মুসলমানরা রাজনৈতিক স্বীকারে পরিনত হওয়ার কারনে এরূপ সমস্যার সৃষ্টি হয় । তাই মুসলিম শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করে এবং প্রকৃত সমস্যার

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৫-২০৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

মূল উৎসবের সন্ধান না করে, বার বার কমিশন গঠন ও রিপোর্ট প্রনয়ন করে এর পরিবর্তন পরিবর্ধন করে কোন লাভ হয়নি, শুধু সময় ক্ষেপন হয়েছে। প্রথম হতেই যদি সরকার সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতেন এবং মুসলমানদের প্রকৃত শিক্ষা সংস্কৃতিও ধর্মের সাথে সংগতিরেখে একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতেন, তাহলে এ সমস্যা এত জটিল রূপ ধারন করত না। কাজেই শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে বিংশ শতাব্দীর ১ম ও ২য় দশক পর্যন্ত ও বিতর্ক চলতে থাকে। এদিকে সরকারী পৃষ্ঠ পোষকতা না পেলেও মুসলমানরা তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শত অভাব বাধা বিপত্তির মাঝেও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষাকে টিকিয়ে রেখেছে। তাই গ্রাম গঞ্জে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মক্তব মাদ্রাসা ধর্মীয় শিক্ষাকে বাচিয়ে রাখার যে প্রয়াস চালিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

মাদ্রাসা সংস্কারের নতুন উদ্যোগ ঃ- যাই হোক ঘাত, প্রতিঘাত, ও শত প্রতিকূলতার মাঝে মুসলিম শিক্ষা টিকে থাকলেও শিক্ষা বিতর্কের অবসান কিন্তু তখনো হয়নি। সে কারনে আবার মাদ্রাসা সংস্কারের নতুন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। ১৯০১ সালে সার আলেক জান্ডার পেডলার মাদ্রাসা এবং মক্তব সংক্রান্ত বিষয়ে কতিপয় সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ক্রমশ তার জনপ্রিয়তা ও সুখ্যাতি হারাচ্ছিল। প্রশ্ন হল কি করে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি করা যায়, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত পাঠ্যসূচীর মতই মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা সরকারী চাকুরীর জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ লোক তৈরী করা যায়। এ জন্য যুগপৎ মুসলমানদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বিষয় সমূহকে ও মাদ্রাসার পাঠক্রমের প্রাধান্য দিতে হবে। নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সাথে জনশিক্ষা পর্ষদের ডিরেক্টরদের সাথে একটি আলোচনা বৈঠকে এ প্রশ্ন সম্পর্কিত বিষয়টি বিবেচনা করেন।[১]

এদিকে মিঃ ডেনিসন কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় মাদ্রাসার অভ্যন্তরীন ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন। এরমধ্যে ১৯০৩ সনে মুসলমানরা সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করে যার মূল কথা এরূপ যে, মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে এবং একটি বিশেষ মান অবধি শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা বিষয় সবার জন্য সমমানের করতে হবে। এই মান নির্ধারনের পর হতে শিক্ষার দুটি শাখা থাকবে। তন্মধ্যে

---

১. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

একটি ইংরেজী বিভাগ। এই বিভাগে ইংরেজী এবং প্রাচ্য বিষয়াদির শিক্ষা থাকবে। এই বিভাগের জন্য আলিয়া মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগকে কাজে লাগাতে হবে। দ্বিতীয় বিভাগ হল আরবী শিক্ষার জন্য। এই বিভাগে শুধু প্রাচ্য ভাষাদি বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষার প্রাধান্য থাকবে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনার পর এই প্রস্তাব গ্রহনযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেন। কেননা সরকার মনে করেন যে, ইংরেজী শিক্ষার জন্য যত বেশী সময় ব্যয় হবে ততই প্রাচ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়ের অভাব হবে। ফলে প্রাচ্য শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষা গ্রহনের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। যার দরুন ছাত্ররা ইংরেজী বা আরবী কোন বিষয়েই পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। এ প্রস্তাবের পরিবর্তে আর একটি প্রস্তাব করা হয় যে, আরবী বিভাগের যে সব ছাত্র ইংরেজী বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চায়, তাদেরকে আগে আরবী বিভাগের শিক্ষা শেষ করে যথা নিয়মে এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে ভর্তি হতে হবে। অপরদিকে এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগের ছাত্ররা যারা আরবী বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই এই বিভাগে পড়া শেষ করে যথা নিয়মে আরবী বিভাগে ভর্তি হতে হবে।[১]

কিন্তু এর অল্প কাল পর এ দেশের শিক্ষানুরাগী কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোক পুনরায় একটি প্রস্তাব করেন যে, মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার মানকে আরো এতটুকু উন্নত করতে হবে যে, এ সব মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর বাংলাদেশের ছাত্রদেরকে যেন অন্য কোথাও উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে না হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর অনেক ছাত্র হাদীস, তাফসীর বিষয়ে আরো জ্ঞান অর্জন ও অধ্যয়নের জন্য পাক ভারতের অন্যান্য আরবী শিক্ষা কেন্দ্রে গমন করত। তাই ছাত্ররা যাতে অন্যত্র গমন না করে সে জন্য আরবী বিভাগের শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, আগামীতে মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্রদেরকে বিশেষ সনদ বা ডিগ্রী দিতে হবে। এই প্রস্তাবটি খুবই যুক্তিসংগত বলে সরকার সনদ বা ডিগ্রী প্রদানের প্রস্তাবটি বিবেচনা করবেন বলে কথা দেন। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য কারনে এই বিষয়ে বিবেচনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অবশ্য এ প্রস্তাবেরই ফলশ্রুতিতে সরকার ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৩ সালে ৭৩১ নং বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী হাদিস, তাফসীর, ইতিহাস, ভূগোলকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২]

----

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৭-৮।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

জনশিক্ষা বিভাগের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্ট (১৯০২-১৯০৬) :- বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শিক্ষা বিষয়ক সরকারী পঞ্চ বার্ষিকী রিপোর্ট (১৯০২-০৬) হতে জানা যায় যে, তখন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় পূর্বের মতই দুটি বিভাগ ছিল। একটি আরবী বিভাগ যেখানে প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা দেয়া হত, অপরটি ইংরেজী বিভাগ যেখানে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হত। আরবী বিভাগের জুনিয়র শাখায় ৬ বছর ও সিনিয়র শাখায় ৫ বছর ব্যাপী পাঠ্যসূচী অনুসৃত হত। ইংরেজী বিভাগ ছিল সাধারন ইংরেজী স্কুলের মানের সমান। এখানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য ছাত্র তৈরী করা হত। তবে সাধারনত মুসলমান শিক্ষক দিয়ে ইসলামী পরিবেশে শিক্ষা দেয়া হত বলে অভিভাবকদের আপত্তির কারন হয়ে দাড়ায়নি। এরপরও উক্ত ইংরেজী বিভাগের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি বরং কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।[১]

আরবী বিভাগে শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। তবে উপরের ক্লাসে কোন কোন বিষয়ে ফার্সীর মাধ্যমেও শিক্ষা দেয়া হত। এ বিভাগে আরবী এবং ফার্সী সাহিত্য ব্যতীত বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে যেমন ফেকা, মানতিক, হিকমত, বালাগাত, 'দীনিয়াত ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হত। কুরআনের তাফসীর এবং হাদীস সমূহেও পড়ানো হত। শতকরা ৫৬ জন ছাত্র ঐচ্ছিকভাবে ইংরেজী শিক্ষায় অংশ গ্রহন করত। ১৯০৬ সনে এখান হতে ৬২ জন ছাত্র কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করে। তন্মধ্যে ৫৩ জন পাশ করে। এদের মধ্যে ২৬ জন প্রথম বিভাগে পাশ করে। ১৯০১-১৯০২ সালের এক বিবরণীতে প্রমান পাওয়া যায় যে, তখন মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ১৮টি, যার মধ্যে ৫টি ছিল সরকারী এবং ১০টি ছিল সাহায্য প্রাপ্ত। সে সময় তাদের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৮৮২ জন।[২] অপর এক বিবরণীতে প্রমান পাওয়া যায় যে, ১৯০২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কলিকাতা মাদ্রাসায় মোট ৮১৬ জন ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে আরবী বিভাগে ৩৩৯ জন, এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে ৪৩৯ জন এবং কলেজ বিভাগে ৩৮ জন ছাত্র ছিল। আরবী বিভাগে স্কুল ও কলেজ মিলে ৯ বছরের শিক্ষাক্রম ছিল। প্রথম ৫ বছর অর্থাৎ জুনিয়ার ক্লাসে উর্দু মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হত। পরবর্তী ৪ বছর তথা সিনিয়ার ক্লাসে ফার্সী মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হত। এখানে বিভিন্ন বিষয়েই শিক্ষা দেয়া হত। আরবী, ফার্সী ভাষাও সাহিত্য ছাড়াও মুসলিম

---

১. মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১। আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৯।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় যেমন, আইন শাস্ত্র, হাদীস, তাফসীর, যুক্তিবিদ্যা, অলংকার শাস্ত্র, দর্শন ও ধর্ম তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ পূর্ণ হাই স্কুল তথা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা মান পর্যন্ত শিক্ষাক্রম চালু ছিল।[১] এ রিপোর্ট হতে বুঝা যায় যে, মুসলমানরা পূর্বের তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রসর হয়। কেননা তারা তাদের ভুলগুলি আস্তে আস্তে বুঝতে থাকে। তাই এ সময় মাদ্রাসার সংখ্যাও যেমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি এর ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আর্ল কমিটির রিপোর্ট ও মাদ্রাসা সংস্কার এবং টাইটেল কোর্সের প্রবর্তন :-

এরপর ১৯০৭ -১৯০৮ সনে তদানীন্তন জনশিক্ষা কমিশনের পরিচালক আর্চডেল আর্ল এর সভাপতিত্বে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত আর্ল কমিটি অনেক বিশিষ্ট মুসলিম নেতার সঙ্গে আলিয়া মাদ্রাসায় টাইটেল (কামেল) ক্লাশ চালু করা হবে কিনা এ সমপর্কে আলোচনা করে। এতে যে সব সুপারিশ করা হয় তাদের মধ্যে এটি ছিল মূল্যবান যা বাস্তবায়িত হয়। আর্ল সাহেব উল্লেখ করেন যে আলিয়া মাদ্রাসার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক একটি আলোচনা হয়। আমি এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করি। সভায় এর আগা গোড়া পর্যালোচনায় মাদ্রাসার সিনিয়ার পর্যায়ের ক্লাশগুলিকে কলেজের সমমানের বলে ধরে নেয়া হয়। কেননা আমরা যখন দেখি সিনিয়ার ক্লাসের ছাত্ররা এম, এ বা সমতুল্য ক্লাসে আরবীর চেয়েও কঠিন পুস্তকাদি পাঠ করে, তখন তাদেরকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমতুল্য মনে না করার কোনই কারন থাকতে পারে না। সিনিয়র ক্লাশগুলিতে দর্শন, মানতেক, বালাগাত, আকায়েদ, ফেকা ও উসুলে ফেকার মত বিষয়াদি পড়ানো হয়। এগুলি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। তবে পার্থক্য শুধু ভাষাগত।[২] কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও মাদ্রাসার ছাত্রদের মান সমান না হওয়ার কোন কারন নেই।

---

১. আর, নাথন, প্রোগ্রেস অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া (১৮৯৭-৯৮, ১৯০১-১৯০২), ৪র্থ কুইন কিউনিয়াল রিভিউ অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, ১ম খন্ড, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃঃ ৩৭৫-৭৬। আর, নাথন, সি,আই,ই, রিপোর্টস অন ইসলামিক এডুকেশন এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বেঙ্গল ১৮৬১-১৯৭৭, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪২। সুফিয়া আহমেদ মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল (১৮৮৪-১৯১২) ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৭৪, পৃঃ ৭৩।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাই এ প্রস্তাবটি ছিল বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার মানকে এমন উন্নত করা, যাতে এখানকার শিক্ষা সমাপনান্তে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যেন দেওবন্ধ বা লক্ষ্ণৌ যেতে না হয়। কমিটির এ সুপারিশটি গ্রহন করে এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন।[১] কমিটি টাইটেল ক্লাসের জন্য পাঠ্যসূচী ও প্রনয়ন করে, যেমন ১ম বর্ষের জন্য (হাদীস বিভাগ) ঃ-মাকামাতে হারিরী, ৬ হতে ১০ অধ্যায় পর্যন্ত, কিতাবুল আগানী ১ম খন্ড, ১ম ভাগ, বানাতে ছায়াদ হামাছা, তিরমিজী শরীফ, ইবনে মাজা, মুসলিম শরীফ (সুন্নীদের জন্য), উসুলে কাফী (শিয়াদের জন্য), তাফসীরে বায়জাবী, তাফসীরে ছাফী (শিয়াদের জন্য) ফারায়েজ, আকায়েদে জালালী (সুন্নীদের জন্য), তানজিহুল আম্বিয়া (শিয়াদের জন্য) ছোফরা, শামছ বাজেগা, ও কাজী মুবারক ইত্যাদি। ২য় বর্ষের জন্যঃ-আবু দাউদ, নাসাঈ, কাশশাফে কামেল, তাফসীরে অছায়েল, শরহে মাকাছেক (সুন্নীদের জন্য) শোরাক (শিয়াদের জন্য)। ৩য় বর্ষের জন্যঃ- মুসলিম ও বুখারী শরীফ (সুন্নীদের জন্য) এছবতে বছার (শিয়াদের জন্য), তাফসীরে বিজ্ঞী কামেল (সুন্নীদের জন্য) মাজমউল বয়ান (শিয়াদের জন্য), শরহে মাওয়াকেফ (সুন্নীদের জন্য) এবং শরহে তাজদীদ (শিয়াদের জন্য) ইত্যাদি। টাইটেল ক্লাসের, ফেকাহ, আদব ও হেকমত বিভাগের জন্য ও অনুরূপ পাঠ্য বিষয়াদি নির্বাচন করা হয়। যেমন ফিকাহ বিভাগের জন্যঃ-ফিকাহ শাস্ত্র, উছুলে ফিকাহ বা মুসলিম জুরিস প্রুডেন্স এবং ইসলামের সাধারন ইতিহাস। আদব বিভাগের জন্যঃ- সাহিত্য, অলংকার শাস্ত্র, প্রসোডি এবং ইসলামের ইতিহাস। সাধারন এবং হেকামা বিভাগের জন্য ঃ- যুক্তি বিদ্যা দর্শন এবং ইসলামের সাধারন ইতিহাস এবং উক্ত তিনটি বিভাগের শিয়া সুন্নীদের ছাত্রদের জন্য আলাদা কিতাবেরও ব্যবস্থা রাখা হয়। টাইটেল ক্লাশের এসব পাঠ্য পুস্তক ১৯০৮ সালের ২২শে এপ্রিলের সম্মেলনের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং টাইটেল পাশের ডিগ্রী বা সনদপত্রসমূহ বিভিন্ন গ্রুপের নাম অনুসারে প্রদান করা হয়, যেমন তাজুল মুহাদ্দেসীন, তাজুল ফোকাহ, তাজুল ওদাবা ও তাজুল হোকামা ইত্যাদি।[২]

----

১. মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৩-২৪। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট ১৯১৭-১৯, ২য় খন্ড, পার্ট-১, কলিকাতা ১৯১৯, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭১ সালে মাদ্রাসায় আট বছর স্থায়ী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়েছিল এরপর ১৮৭৭ সালে পুনরায় সংস্কার ও পরিবর্তন করা হয়। এই সংস্করন ও পরিবর্তন অনুসারে জুনিয়ার ক্লাশের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে ১৮৭৭ সালের পর ৪র্থ শ্রেনী হতে ৭ম শ্রেনী পর্যন্ত উন্নীত হয় এবং ১৯০৪ সালে সিনিয়ার বিভাগে ৫টি শ্রেনী অন্তর্ভূক্ত হয়। সুতরাং ১৯০৪ সাল হতে কলিকাতা মাদ্রাসায় পাঠ্যক্রম ১২টি শ্রেনীতে বিন্যস্ত হয়, ৭টি জুনিয়ার শ্রেনী এবং ৫টি সিনিয়ার শ্রেনী। এই নতুন শ্রেনী বিন্যাস ১৯০৮ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[১] জুনিয়ার ক্লাশের জন্য উর্দু, ফার্সী, আরবী, এ্যারেথম্যাটিক, সমগ্র বিশ্বের ভূগোল বিশেষ করে ভারতীয় ভূগোল, ভারতীয় ইতিহাস এবং ড্রিল পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিনিয়র ক্লাসের জন্য এ্যারিথম্যাটিক, ইউক্লিডের প্রথম চারটি বই, যুক্তিবিদ্যা, অলংকার শাস্ত্র ,দর্শন, মুসলিম আইন এবং জুরিস প্রুডেন্স, আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য পাঠ্যসূচীভূক্ত করা হয় এবং যে ছাত্র ইংরেজী বিষয়ে পাঠ করছে তাদের জন্য ফার্সীকে ঐচ্ছিক করা হয়।[২] এরপর তিন বছর ব্যাপী সর্বোচ্চ ক্লাশ তথা টাইটেল কোর্সের ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ঐ বছরই করা হয়। টাইটেল ক্লাশ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের সমমানের করা হয়। টাইটেল পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯০৯ সালে কেবল হাদীস ও তাফসীর বিভাগ দ্বারা কলিকাতা মাদ্রাসায় উদ্বোধন করা হয়। তাছাড়া আর্ল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জুনিয়র তৃতীয় শ্রেনী অবধি ফার্সীকে বাধ্যতামূলক এবং উচ্চক্লাসের যে সব ছাত্ররা ইংরেজী সহ আরবী অধ্যয়ন করছে তাদের জন্য ফার্সীকে ঐচ্ছিক করা হয়।[৩] অতএব এভাবে আর্ল কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। মুসলিম উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে টাইটেল ক্লাসের সংযোজন ও অধ্যয়নের ফলে এক নবযুগের সূচনা হয়। এরপর নিউস্কীম মাদ্রাসা শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সমন্বয়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলা হয়। এই নিউস্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশী মুসলমানদের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং আর্ল কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের

---

১. হিষ্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪১।

২. কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট ১৯১৭ - ১৯, ২য় খন্ড, পার্ট-১, কলিকাতা, ১৯১৯, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮।

৩. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৮-২৯। মাদ্রাসা শিক্ষা ঃবাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩। মুসলিম মানষ ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮) পূর্বোক্ত পৃঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে মুসলিম শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের ও উন্নতির সূচনা হয়, নিউস্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তনের ফলে তা আরো ব্যাপক উন্নতি লাভ করে ।

নিউস্কীম মাদ্রাসার প্রবর্তন :- ১৯০৯ সালে পূর্ববঙ্গের জনশিক্ষা পরিচালক স্যার হেনরী শার্পের নেতৃত্বে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয় । ১৯১০ সালে এ ব্যাপারে কমিটি একটি রিপোর্ট পেশ করে । এতে নিউস্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয় । এ সুপারিশ প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের পূর্বেই ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ হয়ে যায় । পরবর্তী সময় ১৯১৩ সনে নাথন কমিটি কর্তৃক নিউস্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তনের বিষয় পুনরায় বিবেচিত হয় ।[১] এই স্কীম অনুযায়ী মাদ্রাসায় ক্লাশগুলিকে দুইভাবে বিভক্ত করা হয় । ঢাকা কনফারেন্স যেভাবে শ্রেনী বিন্যাসের সুপারিশ করেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি তা রদ করে মাদ্রাসার জুনিয়র বিভাগের ছয়টি ক্লাশ সিনিয়র বিভাগের ৪টি ক্লাসের সুপারিশ করে । বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত কমিটি জুনিয়র ক্লাশগুলির জন্য পাঠ্য বিষয়ের কোন রদ বদল করলেন না । তবে সিনিয়র ক্লাসের পাঠ্য পুস্তকের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেন । উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ১৯১৩ সালে আবার একটি সম্মেলনের আহবান করা হয় । এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন রবার্ট নাথন । এ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত কমিটির সমুদয় সুপারিশ সামান্য সংশোধন করে গ্রহন করা হয় এবং বিভিন্ন ক্লাসের জন্য বিভিন্ন বিষয়াদি প্রবর্তন করা হয় ।[২]

তবে এখানে একটি প্রস্তাব করা হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যসূচী অবশ্যই রচিত হতে হবে মাদ্রাসায় অধীত বিষয় সমূহের উপর ভিত্তি করে । এ প্রস্তাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নাথন কমিটি মাদ্রাসায় অনুমোদিত পাঠ্যসূচীতে কিছুটা পরিবর্তন আনেন । এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে যে পরিবর্তন আনেন তা হল জুনিয়র ৬টি ক্লাশের জন্য :- কুরআন, বাংলা, উর্দু, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজী, আরবী সাহিত্য, অংকন, হাতের কাজ ও ড্রিল ইত্যাদি । সিনিয়র ৪টি ক্লাসের জন্য আরবী সাহিত্য, ইংরেজী ও

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪ ।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

গনিতের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। মাদ্রাসার এই স্কীম সরকারের মনপুত হয়। তাই বাংলাদেশ সরকার তাদের ৪৫০ নং টি,জি, রেজিলিউশন দ্বারা ১৯১৪ সালের ৩১শে জুলাই মাদ্রাসা সমূহের এই নুতুন স্কীম তথা পূর্নগঠন ও সংস্কার পরিকলপনা অবিলম্বে অনুমোদন করেন।[১] অতপর ১৯১৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই নিউ স্কীম দেশে চালু করা হয় এবং কলিকাতা মাদ্রাসাকে এর আওতামুক্ত রাখা হয়। প্রথমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও হুগলী এ চারটি সরকারী মাদ্রাসায় পাঁচটি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় এবং বেশ কয়েকটি প্রাইভেট মাদ্রাসায় এই নিউ স্কীম পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই নতুন স্কীমের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ফার্সী ভাষার বর্জন এবং ইংরেজী বাধ্যতামূলক করন।[২] এভাবে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে এই নতুন স্কীম প্রবর্তনের ফলে এক যুগান্তরী ঘটনা ঘটে। নিউ স্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তনের ফলে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) মুসলমানদের বিশেষ উন্নতি হয় যা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই বাংলাদেশে মাদ্রাসার শিক্ষাক্ষেত্রে ইহা ছিল একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। যে সকল মাদ্রাসায় ইহা চালু হয় সে মাদ্রাসা নিউস্কীম মাদ্রাসা নামে পরিচিত হয় এবং সেগুলিকে সরকারী সাহায্য প্রদান করা হয়। যা হোক নিউ স্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং সাথে সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা নীতির বিবর্তনের ধারায় সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

অতএব এভাবে ১৯০৩ সালে মাদ্রাসা সম্পর্কিত যে পরিকলপনাগুলি উপেক্ষা করা হয়েছিল ১৯১৫ সালে নিউস্কীম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়। এই নতুন স্কীম অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার পূর্ন বিন্যাস ও পুর্নগঠিত করার পর সরকারের শিক্ষা বিভাগের সম্পূর্ন মনোযোগ এরদিকে পতিত হয়। এমতাবস্থায় যেসব মাদ্রাসা নতুন স্কীম গ্রহন করেনি বরং পুরানো পাঠ্য পুস্তক ও রীতি নীতিতে চলছিল সে সব মাদ্রাসা সরকারের অর্থ সাহায্য হতে বঞ্চিত হয় এবং এসব মাদ্রাসার ছাত্ররা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দেয়ার অধিকার ও হারিয়ে ফেলে। ১৯১৫-১৭ সালের মধ্যে এ ধরনের কোন মাদ্রাসাকেই বোর্ডের আয়ত্বাধীন বলে গন্য করা হয়নি। উল্লেখ্য যে,

---

১. মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬। আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৬। হিষ্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ। পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৬।

২. মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

সন্দ্বীপের আহমদীয়া মাদ্রাসাকে নিউ স্কীমের বিরোধীতার কারনে বোর্ডের অধীনস্থ মাদ্রাসার তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়।[১] তবে নতুন শিক্ষা নীতির ধারা হতে পৃথক থেকে এবং সরকারী অর্থ সাহায্য হতে বঞ্চিত হয়ে এসব পুরানো পন্থী মাদ্রাসা ক্রমশ ধ্বংশ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি বরং মাদ্রাসাগুলি তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়েই বেচে ছিল।

এই নতুন স্কীম অনুযায়ী আরবী শিক্ষার নামে ইংরেজী শিক্ষার এই প্রাধান্য জনগনের মনে হযবরল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ক্রমশ সকলের মনে পুরোনো শিক্ষার প্রতি মমত্ববোধ জেগে উঠতে থাকে। ইংরেজী ও আরবী মিশ্রিত এই নতুন শিক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে ছাত্ররা না ইংরেজী শিক্ষিত ছাত্রদের মত পারদর্শী হতে পারত, না আরবী ছাত্রদের মত ধর্মীয় জ্ঞানন লাভ করতে পারত। কিন্তু এমতাবস্থায় ধর্মপ্রান মুসলমানেরা সরকারী সাহায্য ও বোর্ডের পরীক্ষার তোয়াক্কা না করে নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুরানো পাঠরীতি অনুযায়ী খারেজী বা কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। এবং উত্তরোত্তর এসব মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২] এখানে উল্লেখ্য যে, যে সব মাদ্রাসা সরকারী আইন কানুন ও নিয়ন্ত্রনের বহির্ভূত এবং সরকারী আর্থিক সাহায্য ও স্বীকৃতি গ্রহন করেনি কিংবা সরকারী পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষাদান করেনি বরং সমপূর্ণভাবে বেসরকারী সাহায্য সহযোগীতা, নিজস্ব পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পরিচালিত হত, সে সব মাদ্রাসাগুলিকে খারেজী মাদ্রাসা বলা হত।

সুতরাং ঐতিহাসিক সূত্রে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা উপরোক্ত দ্বিবিধ ধারা তথা নিউস্কীম মাদ্রাসা এবং খারেজী মাদ্রাসা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে বিকাশ লাভ করতে থাকে। এই দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষনীয় মৌল বিষয় ও গ্রন্থাবলী সাধারন ও অভিন্ন হলেও কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য নিয়ে নিজস্ব ধারায় স্ব স্ব বিকাশ অব্যাহত রাখে।[৩] নিউ স্কীম মাদ্রাসার উন্নতির সাথে সাথে পুরানোপন্থী

----

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩৯-৪০।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪০-৪১।

৩. আত্ তাওহীদ, ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৮, পৃঃ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

খারেজী মাদ্রাসারও ক্রমশ অগ্রগতি হতে থাকে। ১৯২২ সাল নাগাদ যেসব নামকরা পুরানোপন্থী খারেজী মাদ্রাসা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে প্রতিষ্ঠিত হয় তার বিশেষ কতকগুলির নাম এখানে তুলে ধরা হল। যেমন ১৯০০ সালে চট্টগ্রামের হাট হাজারীতে মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। আধুনিক কালে গোটা বাংলাদেশের সীমারেখায় ১৯০৮ সালে এখানেই সর্ব প্রথম উচ্চ পর্যায়ের হাদীস ও কুরআন শিক্ষার সূত্রপাত হয়।[১] কাঠগড় ইসলামিয়া মাদ্রাসা সন্দ্বীপ নোয়াখালী, কমিদপুর কাদেরিয়া মাদ্রাসা রংপুর, দারুল উলুম মাদ্রাসা ঢাকা, লতিফিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা মীরের শ্বরাই চট্টগ্রাম, কেরামতিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা নোয়াখালী, ফেনী সিনিয়র মাদ্রাসা নোয়াখালী, নাজিরিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা কুমিল্লা, মনিরুল ইসলাম সিনিয়ার মাদ্রাসা আজমপুর চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা পাবনা, সীতাকুন্ড সিনিয়র মাদ্রাসা চট্টগ্রাম, দারুল উলুম মাদ্রাসা চট্টগ্রাম, ফুরফুরা সিনিয়ার মাদ্রাসা হুগলী, হাম্মদিয়া মাদ্রাসা ঢাকা, বশিরিয়া আহমদিয়া মাদ্রাসা সন্দ্বীপ নোয়াখালী, শামসুল উলুম মাদ্রাসা ঢাকা, ইসলামিয়া মাদ্রাসা নোয়াখালী, বসুরহাট ইসলামিয়া মাদ্রাসা নোয়াখালী, নীলাম বাজার মাদ্রাসা আসাম, সাসারাম সিনিয়র মাদ্রাসা আড়া বিহার ইত্যাদি।[২]

মুসলিম শাসনামল হতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী ধর্মীয় শিক্ষা বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে এসেছে। এসব মাদ্রাসা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচীর ও পরিবর্তন হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে অবিভক্ত বাংলা এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে স্বীকৃতি প্রাপ্ত অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব মাদ্রাসার সংখ্যাও ছাত্র সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে নিম্নে প্রদর্শন করা হল। যেমন :-

সন	স্বীকৃতি প্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	মন্তব্য
১২০১-১৭৫৭	৮০,০০০	-	উক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা মুসলিম শাসনামলে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সম্মিলিতভাবে ছিল
১৭৮১-১৮১৬	১টি সরকারী মাদ্রাসা	-	কলিকাতা মাদ্রাসা

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬।

২. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

১৮১৭-১৮২৮	২টি সরকারী মাদ্রাসা		কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসা
১৮২৯-১৮৫১	২টি সরকারী মাদ্রাসা	৭২	উক্ত দুটি মাদ্রাসায় দীর্ঘ ২২ বছরে গড়ে উক্ত ছাত্র সংখ্যা ছিল
১৮৬১-১৮৭০	২টি সরকারী মাদ্রাসা	১৪৭	কলিকাতা মাদ্রাসায় ৯৮ জন এবং হুগলী মাদ্রাসায় ৪৯ জন ।[1]
১৮৭৩	৫টি সরকারী মাদ্রাসা		কলিকাতা, ঢাকা, রাজশাহী, চিটাগাং ও হুগলী ।
১৮৭৬-১৮৭৭	৫ টি সরকারী মাদ্রাসা	৬৪৮	
১৮৮১-১৮৮২	৫ টি সরকারী মাদ্রাসা	১০৮৯	[2]
১৮৮৪	৬টি সরকারী মাদ্রাসা	১১৯১	৫টি সরকারী মাদ্রাসার সাথে মুর্শিদাবাদ মাদ্রাসা সংযুক্ত ।
১৮৮৫	১০টি সরকারী মাদ্রাসা	১৩৮৬	৫টি সরকারী মাদ্রাসায় ছাত্র ১০৫৭ জন এবং ৫টি বেসরকারী মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা ৩২৯ জন মোট ১৩৮৬ জন ।[3]
১৮৮৬-১৮৮৭	১০টি মাদ্রাসা	১৫০৮	
১৮৮৭-১৮৮৮	১২টি মাদ্রাসা	১২২৯	৫টি সরকারী এবং ৭টি বেসরকারী মাদ্রাসা[4]
১৮৮৮-১৮৮৯	১২টি মাদ্রাসা	১৪৫৬	
১৮৯১-১৮৯২	১২টি মাদ্রাসা	১৬২৮	
১৮৯২-১৮৯৩	১২টি মাদ্রাসা	১৭২২	

----

১. রিপোর্ট অব দি (এম,ই,সি) মাদ্রাসা এডুকেশন কমিশন, ১৯৩৮ পৃঃ১০-১১ । উদ্ধৃত, হিষ্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ পূর্বোক্ত, পৃঃএ্যাপেনডেক্স সি, পৃঃ২১৪ ।

২. রিপোর্ট অব দি এম,ই,এ,সি ১৯৩১, পৃঃ৮,১০ । এম,ই,সি,১৯৩৮, পৃঃ১২ । উদ্ধৃতি পূর্বোক্ত, পৃঃ এ্যাপেনডেক্স সি, পৃঃ ২১৪ ।

৩. এম,ই,সি,১৯৩৮, পৃঃ ১৩ । এম,ই,এ,সি, পৃঃ১৫ । উদ্ধৃত, হিষ্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, এ্যাপেনডেক্স, সি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৪ ।

৪. তারিখ ই মাদ্রাসা ই আলিয়া, ২য় খন্ড, পৃঃ ২ । উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৪-১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯৬-১৮৯৭	১২টি মাদ্রাসা	৩০১৭	এম,ই,এ,সি, পৃঃ ১৫
১৮৯৯	১৮টি মাদ্রাসা		৫টি সরকারী ও ১৩টি সাহায্যপ্রাপ্ত।
১৯০১-১৯০২	১৮টি মাদ্রাসা	৩৮৮২	এম,এই,এ,সি, পৃঃ ১৫।
১৯০২-১৯০৩	১৮টি মাদ্রাসা	১৬২৮	
১৯০৭	১৮টি মাদ্রাসা	১৪৬৪	[1]

এছাড়া সে সময় বেসরকারী উদ্যোগে ও সাহায্যে প্রচুর মাদ্রাসা মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করত। এভাবে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যে দেশের আনাচে কানাচে প্রচুর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল।

অতএব সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, বৃটিশরা বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা দখলের পর হতেই মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার অবলুপ্তির জন্য সর্বদিক দিয়েই আপ্রান চেষ্টা করে। বিশেষ করে মুসলিম শিক্ষার প্রতি সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বৈষম্যমূলক আচরন ও পক্ষপাতিত্ব করে। কেননা বৃটিশদের ভয় ছিল যে, মুসলমানরা যদি শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রগতি লাভ করে তবে হয়ত রাজনৈতিক কোন বড় ধরনের ঝামেলা হতে পারে, তাতে এ দেশে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই বৃটিশরা শিক্ষা নীতির ব্যাপারে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহন করে এবং অত্যন্ত কৌশলে কমিটি গঠন, সংস্কার আর সুপারিশের নামে শুধু সময়ক্ষেপন করে। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য সঠিক নীতি, পাঠ্যসূচী গ্রহন করা হয়নি বরং মুসলিম শিক্ষাকে বিতর্কিত করে নেতৃস্থানীয়দের ব্যস্ত রেখেছেন। ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করা হলেও মুসলমানদের আকৃষ্ট করার মত পাঠ্যসূচী প্রনয়ন করা হয়নি, তাই মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষাকে মনে প্রানে গ্রহন করতে পারেনি। কেননা আরবী ফার্সীর পরিবর্তে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান সমৃদ্ধ পাঠ্যসূচী প্রনয়ন করায় মুসলমানরা ধর্মহীনতার ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু তাই বলে তারা ইংরেজী শিক্ষাকে ঘৃনা করেনি। বরং তারা চেয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস, অনুভূতি সমৃদ্ধ আরবী, ফার্সী শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষার সাথে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করতে। কিন্তু বৃটিশ সরকার তা হতে দেয়নি। তাই মুসলমানরাও শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহনের সাথে আপোষ করতে পারেনি, আর এখানেই ছিল ধর্মীয় শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার দ্বন্দ্ব। কাজেই দেখা যাচ্ছে বৃটিশ সরকার স্বীয় স্বার্থে ধর্ম শিক্ষাসহ ইংরেজী শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচী প্রনয়ন করেননি এবং কোন প্রকার উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করেনি।

----

১. হিস্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মেকেলের উক্তি হতে আমরা এর সত্যতার প্রমান পাই । তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানদের জন্য কোন ভাল স্কুলই ছিলনা, তাই এখন আমাদের প্রথম কর্তব্য হল সে রকম একটি ভাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ।[১] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বৃটিশ সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেনি, বরং ধ্বংশ করার জন্যই বিভিন্ন কুট কৌশল অবলম্বন করেছে । মুসলমানদের সে সময়ের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে ব্যয় বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলা যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি ইংরেজী শিক্ষাও চর্চা করা হয়নি । যার দরুন তারা সমাজে দারুনভাবে পিছিয়ে পড়ে । তাছাড়া সরকার আইন করে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য বন্ধ করার কারনে অনেক মক্তব মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু মুসলমানরা শত বাধা বিপত্তি অভাব, অনটনও চএশাসুকে উপেক্ষা করে মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজেদের উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন স্থানে মক্তব, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে থাকে । এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ সরকারী সাহায্য ও নিয়ন্ত্রন মুক্ত থেকে সাধারন মানুষের আর্থিক সাহায্যে ও দানে চলতে থাকে । এসব মাদ্রাসায় সম্পূর্ণ ধর্মীয় বিষয় সম্বলিত পাঠ্যসুচির প্রবর্তন করা হয় । তাই সরকারী সাহায্য ও নিয়ন্ত্রনমুক্ত বলে এসব মাদ্রাসাকে কাওমী বা খারেজী মাদ্রাসা বলা হত । অপরদিকে কিছু সংখ্যক মাদ্রাসা সরকারী নিয়ন্ত্রনে ও সাহায্যে পরিচালিত হত এবং এতে ইংরেজী ও পার্থিব বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হয়, যাকে নিউ স্কীম মাদ্রাসা বলা হত । তবে এ ধরনের মাদ্রাসা সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার জন্য খুবই অপ্রতুল ছিল । কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানদের সাধারন ও ধর্মীয় শিক্ষার চাহিদা বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মক্তব ও খারেজী মাদ্রাসাতেই মিটত । এভাবে বিংশ শতাব্দীর গোড়া হতে বাংলাদেশে উক্ত দুটি ধারায় ধর্মীয় শিক্ষা চলতে থাকে । কিন্তু মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষার বিতর্কের অবসান ও সমাধান তখন পর্যন্ত ও সম্ভব হয়নি ।

বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা (১৮০০-১৯০০):

মুসলিম শাসন পূর্ব যুগ হতে এদেশে সাধারনত হিন্দু ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল । তবে এ সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বেশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু শাসক ও অভিজাত ব্রাহ্মনবাদী হিন্দুদের

১. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২০ ।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচারে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা এক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে হিন্দুরাই সমাজের কর্তাব্যক্তি হয়ে বসে। ইতিহাসে প্রমান পাওয়া যায় যে, মুসলিম শাসন পূর্ব যুগে বৌদ্ধরা শিক্ষা দীক্ষায় খুবই উন্নত ছিল। কিন্তু হিন্দুরা শিক্ষায় এত উন্নত ছিলনা। কেননা তখন হিন্দু ধর্মে কৌলিন্য প্রথাও শ্রেনীভেদের কারনে সমাজ বিভক্ত ছিল। হিন্দু সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে এই শ্রেনী ভেদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কেননা হিন্দু ধর্মে ব্রাম্মনরাই উচ্চ বংশজাত বলে গন্য হত। তাই একমাত্র তাদেরই লেখাপড়া শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার অধিকার ছিল। তথাকথিত নিম্ন শ্রেনী হিন্দুদের শিক্ষার কোন অধিকার ছিলনা। অবশ্য ব্রাক্ষনদের শিক্ষার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা আবার সবাই শিক্ষিত ছিলনা তাই হিন্দু ব্রাক্ষন্যবাদীদের এরূপ অসম নীতি ও মন মানসিকতার কারনে হিন্দু সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই অনুন্নত ছিল। এতে হয়ত ব্রাম্মন্যবাদী হিন্দুদের এক ষড়যন্ত্র বলে অনুমান করা যায়। কেননা অধিকাংশ মানুষ শিক্ষিত হলে নিম্নশ্রেনী হিন্দুদের উপর শাসন শোষন, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ থাকবেনা। তাই তারা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের জাল বিস্তার করে, সুকৌশলে ধর্মের আবরনে অধিকাংশ হিন্দুদেরকে শিক্ষা হতে বঞ্চিত করে ব্রাক্ষন্যবাদীরা সমাজে আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস পায়।

কিন্তু এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয়। মুসলমানদের উদার নৈতিক শাসন ব্যবস্থায় সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই পরিবর্তনের ঢেউ হিন্দু সমাজের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। কেননা মুসলমানদের সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থায় হিন্দুরাও এগিয়ে আসতে থাকে। যারা অস্পৃশ্য, ঘৃনিত বলে ব্রাক্ষন্য সমাজে বিবেচিত হত তারাও শিক্ষার সুযোগ পায়। এভাবে হিন্দু সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রান চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তাই অভিজাত জমিদার শ্রেনী, বিত্তশালী, এমনকি পন্ডিতেরাও ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজ বাড়ীতে কিংবা বাড়ী সংলগ্ন স্থানে এবং মন্দিরে, চন্ডি মন্ডপে, পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা করতে থাকে। এভাবে এক্রমশ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূলত ধর্মীয় শিক্ষাই প্রাধান্য পেত, তবে পাশাপাশি পার্থিব প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হত। এ সময় শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যক্তি ও সমাজ কেন্দ্রিক ছিল। কেন্দ্রিয় কোন প্রথা সিদ্ধ নিয়ম পদ্ধতি ও পরিকল্পিত কোন শিক্ষা ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না। ব্যক্তি উদ্যোগ ও নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতিতে গঠন ও পাঠন ও শিক্ষা সূচী প্রনীত হত। এভাবে সমগ্র মুসলিম শাসনামল হিন্দু সমাজে শিক্ষা ব্যক্তি প্রচেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিকাশ ঘটতে থাকে। তবে এ সময় হিন্দু শিক্ষিতের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের হার অধিক ছিল। যা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কেননা ধর্মীয় শিক্ষা মুসলমানদের নিকট ধর্মের অংগ হিসেবেই বিবেচিত হত। তাই তারা জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান চর্চাকে অগ্রাধিকার দিত। কিন্তু হিন্দু সমাজে শিক্ষাকে এভাবে দেখা হত না, তাই তারা পিছিয়ে পড়ে। তবে বৃটিশ শাসনামলে ইহা সমপূর্ণ উলটে যায়। কেননা নানা কারনেই মুসলমানরা সরকারী অবহেলা, ঔদাসীনতা, পক্ষপাতিত্ব, দূরভিসন্ধির শিকার হয়। অপরদিকে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন দারিদ্রতা এবং বৃটিশ বিরোধী মনোভাব ইত্যাদির কারনে শিক্ষাক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা সরকারী সুযোগ সুবিধা গ্রহন করে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যায়। বাংলাদেশে হিন্দুরা ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে উন্নতি ও বিকাশ লাভ করল সে বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

(ক) হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা (প্রাথমিক):-

মুসলিম শাসনামল হতে ইংরেজী শাসন প্রবর্তনের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে দুটি বৃহৎ জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা দুটি পৃথক ধারায় চলে এসেছে। হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস, কৃষ্টি সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব থাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে ও এর প্রভাব প্রতিফলন ঘটে। হিন্দুদের সন্তানেরা ধর্ম শিক্ষার জন্য পাঠশালা, টোল ইত্যাদিতে অধ্যয়ন করত। পাঠশালা ছিল হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষার মূল কেন্দ্র। দেশের গ্রামে গঞ্জে এসব পাঠশালা শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বৃটিশ শাসনামলেও তা চলতে থাকে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে এদেশে পাঠশালার শিক্ষাই ছিল শিক্ষার মূল ভিত্তি। সে সময় বাংলাদেশে অনেক পাঠশালা ছিল। ১৮০৩ সালে ওয়ার্ড লিখেছেন যে, বাংলাদেশের প্রায় সব গ্রামেই লেখাপড়া শিক্ষার পদ্ধতি এবং অংক গনিত শেখানোর জন্য পাঠশালা ছিল।[১] এসব পাঠশালার

১. ওয়ার্ড, ভিউস অব দি হিন্দুস, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬০। উদ্ধৃত, বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাংগালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য আজকের মত কোন পাকা ঘর ও জায়গা ছিলনা। সাধারনত খড়ের ছাওয়া মাটির ঘরে কিংবা কোন ছায়াদার গাছের তলায় এসব পাঠশালা বসত। অধিকাংশ দরিদ্র জনগনের শিক্ষার প্রয়োজন এই পাঠশালা বহুকাল যাবত ধরে মিটিয়ে আসছিল।[১] এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পন্ডিত মহাশয়ের ঘরে কিংবা কোন বিত্তশালীদের বাড়ীতেও খোলা হত। বিত্তশালী শিক্ষানুরাগী হিন্দুরা তাদের স্বীয় উদ্যোগে নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহও রক্ষনা বেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করত। এ সকল প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত মিশ্রিত বাংলা, শিক্ষা দেয়া হত। সম্পূর্ণ হিন্দু পদ্ধতিতে হিন্দু ধর্ম এবং "পুরান" শিক্ষা দেয়া হত। এজন্য এ সব পাঠশালায় মুসলমান ছাত্রদেরকে আকৃষ্ট করতে পারত না।[২] অর্থাৎ মুসলমান ছাত্ররা এসব পাঠশালায় হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র ও ধর্ম শিক্ষা দিত বলে তারা এখানে শিক্ষা গ্রহনের জন্য আসত না।

এসব পাঠশালাতে গুরু ঠাকুর বা পন্ডিত মশাই বাংলা পড়াতেন, এছাড়া চিঠিপত্র লেখার নিয়ম কানুন, জমিনের দলিল পত্র লেখার নিয়ম কানুন এবং জমির কালি মাপা শিক্ষা দিতেন। সে সময় সুদে ধার দেয়া মহাজনী ব্যবসা ছিল, তাই সুদের হিসাব ছাড়াও অন্যান্য হিসাব পন্ডিতও গুরু ঠাকুরেরা শিক্ষা দিতেন।[৩] তাছাড়া এসব পাঠশালায় অক্ষর জ্ঞান ও হাতের লেখা ছাড়াও ছাত্রদের দৈনন্দিন চাহিদা মত কড়াকিয়া গন্ডাকিয়া ইত্যাদি টুকিটাকি হিসাব নিকাশ ও শিক্ষা দেয়া হত। পাঠশালায় কোন ছাপানো বইপত্র ছিল না। লেখাপড়ার কাজ সাধারনত মুখে মুখেই চলত। অর্থাৎ গুরু মশাই মুখে মুখে বলতেন, ছাত্ররা তার সাথে সাথে উচ্চারন করে যেত। এক্ষেত্রে শিক্ষার মান যাই হোক না কেন সারা দেশেই শিক্ষার জাগরন ছিল। পাঠসালা ও মক্তবের পাঠ্য বিষয়ে কোন পার্থক্য ছিল না।[8] অর্থাৎ পাঠশালা যেমন ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে দৈনন্দিন জীবনের কিছু

----

১. বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

২. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর "ময়মনসিংহ", পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৮।

৩. ওহীদুল আলম, "চট্টগ্রামের ইতিহাস" (চট্টগ্রাম ১৩৯৬ বাংলা) ১ম সংস্করন, পৃঃ ১০১-০২।

৪ঃ তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিম বঙ্গ, (কলিকাতা, ১৩৮৩ বাংলা), পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিসাব নিকাশ ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত, তেমনি মক্তবেও ধর্মীয় বিষয়ের সাথে অনুরূপভাবে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। তাই ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে উভয় প্রতিষ্ঠান একই ছিল।

এই পাঠশালার পাশাপাশি গ্রামে গঞ্জে বাড়িতে বাড়িতে কৃত্তিবাসী রামায়ন, কালীদাসী মহাভারত এবং মধ্যযুগীয় নানা ধরনের কাব্য পাঠের প্রচলন ছিল। এছাড়া যাত্রা, কথকতা, কবিগান, রামায়ন গান, পদাবলী, কীর্তন প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হত। এভাবে পাঠশালা শিক্ষার সাথে সাথে লোক শিক্ষাযুক্ত হয়ে জনগনকে সাধারন শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়েছিল।[১] এ থেকে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের জনগন গ্রামে গঞ্জে গান, কবিতা, যাত্রা ইত্যাদি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও শিক্ষা গ্রহন করতে পারত। এসব গান, কবিতা ধর্ম ভিত্তিক গল্প কাহিনী দ্বারা রচিত হত। তাই এই লোক শিল্প চর্চার মাধ্যমে সাধারন মানুষ ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারত। এভাবে বাঙ্গালী হিন্দু ধর্ম শিক্ষা ও ধর্ম চর্চা বৃটিশ শাসনামলের গোড়ার দিকেও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

এসব পাঠশালার কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুচারু রূপে অব্যাহত গতিতে চল্লেও শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত শিক্ষক গুরুদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তারা সাধারনত বিনা বেতনেই শিক্ষা দিয়ে থাকত, যদিও বা বেতন দেয়া হত তা খুবই সামান্য, যা বলার মত নয়। হয়ত বা কোন সময় বছর শেষে ছাত্রগন গুরু দক্ষিনা হিসাবে ধান চাউল দিয়ে থাকত। কিন্তু তবুও শিক্ষক গুরুগন স্বজাতীর স্বার্থে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে যেত এবং শত অভাব থাকলেও এতেই তারা তৃপ্ত হত। এ ব্যাপারে লর্ড মেয়োর এর বর্ননা হতে আভাস পাওয়া যায় যে, তিনি ১৮১৫ সালে বাংলাদেশের গ্রাম্য পাঠশালা ও শিক্ষকগনের দুঃখ দুর্দশা ও জনগনের কঠিন জীবন সংগ্রাম দেখে অত্যন্ত মর্মাহতও ব্যথিত হন। তিনি এ সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের নিকট যে হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী এক বিবরন লিখে পাঠান তাতে গ্রাম্য এ শিক্ষকগনকে অতি দরিদ্র ও অভাব গ্রস্থ বলে উল্লেখ করেন।[২] তিনি ১৮১৫ সালের ২রা অক্টোবর এক মন্তব্য পত্রে উল্লেখ করেন যে, দেশীয় পাঠশালার শিক্ষকগন অতি

---

১. বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা: বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

২. শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সামান্য বেতনের কাজ করে ছাত্রদের লেখন, পঠন ও গনিতের প্রাথমিক বিষয়গুলি শিক্ষা দিতেন। তারা যে সামান্য বেতন গ্রহন করেন, তা গ্রামের কারো পক্ষেই দেয়া কঠিন নয়। এরা ছাত্রদের যেটুকু বিদ্যা শিক্ষা দেন তা গ্রামের জমিদারদের সেরেস্তার কাজ, হিসাব রক্ষনের কাজ এবং ব্যবসা ও দোকান্দারি কাজের জন্য যথেষ্ট।[১] লর্ড মেয়োর দেশীয় পাঠশালাগুলির উপযোগীতা উপলব্ধি করে এসব পাঠশালার উন্নতি ও প্রসারের জন্য সরকারের অর্থ ব্যয় করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাছাড়া তিনি এ দেশীয় জনগনের শিক্ষার উন্নতির জন্য বরাদ্দকৃত এক লক্ষ টাকা গ্রামীন এসব পাঠশালার উন্নতির জন্য ব্যয় করার আবেদন করেন। কিন্তু সরকার লর্ড মেয়োর এর কথায় কোন কর্নপাত করলেন না। শিক্ষাখাতে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলেও পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৮১৩ সাল হতে ১৮২৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কোমপানী এদেশীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য বার্ষিক গড় পড়তায় মাত্র সাড়ে সাত হাজার টাকা ব্যয় করেন।[২] এরফলে অভাবগ্রস্থ শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেভাবেই থেকে যায়।

এ সময়ে কলিকাতা এবং অন্যান্য এলাকায় শিক্ষা প্রসারের জন্য খৃষ্টান পাদ্রীগন বেশ উদ্যোগী হয়। তারা কোথাও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোথাও বা সমষ্টিগতভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। এ বিষয়ে পাদ্রী উইলিয়াম কেরী বিশেষ অবদান রাখেন। ১৮০০ সালে তিনি শ্রীরামপুরে আসেন। এখানে মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড নামে আরো দুজন পাদ্রী তার সঙ্গী হন। এরা বাংলাদেশে বহু পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ১৮১৭ সালের মধ্যেই শ্রীরামপুরের চর্তুদিকে কমপক্ষে প্রায় ৪৫টি পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল। সবমিলে প্রায় দু'হাজার ছাত্র এসব পাঠশালায় অধ্যয়ন করত।[৩] শ্রীরামপুর মিশনের পরেই রবার্ট 'মে' ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে চচুড়ায় নিজের বাড়ীতে 'বেল' পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। এরপর মিঃমে, ক্রমশ অনেকগুলি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৮ সালে

---

১. এইচ,শার্প,ব্যুরো অব এডুকেশন ইন্ডিয়া সিলেকশনস ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস ১ম খন্ড (১৭৮১-১৮৩৯) কলিকাতা ১৯২০পৃঃ২৪। উদৃত, বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষাঃবাঙালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

২. শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০। আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৮-৩৯

৩. জে,সি,মার্শম্যান,দি লাইফ এন্ড টাইম অব কেরী, মার্শম্যান এন্ড ওয়ার্ড, ২য় খন্ড,১৮৫৯। যোগেশ চন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, পৃঃ১৪, উদৃত, বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

মিঃ মে যখন মৃত্যুবরন করেন তখন তাঁর পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৩৬টি এবং এর ছাত্রসংখ্যা ছিল হিন্দু মুসলিম মিলে প্রায় তিন হাজার ।[১]

এছাড়া বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় হিন্দুদের অনেক পাঠশালা বা বাংলা বিদ্যালয় ছিল । এ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে কয়েকটি জেলার পাঠশালার সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন । যেমন মেদিনিপুরে ৫৪৮টি ,মুর্শিদাবাদে ৬২টি, বীরভূমে ৪০৭টি, বর্ধমানে ৬২৯টি এবং দিনাজপুরে ১১৯টি পাঠশালা ছিল ।[২] এ্যাডামের উক্ত তথ্য হতে বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র উল্লেখিত অঞ্চলেই পাঠশালা সীমাবদ্ধ ছিল না বরং বাংলাদেশে সর্বত্র হিন্দু অঞ্চলে ধর্ম শিক্ষার জন্য অনেক পাঠশালা ছিল এবং এসব পাঠশালায় বহু সংখ্যক হিন্দু ছাত্র অধ্যয়ন করত । তবে মুসলমানরাও শিক্ষা গ্রহন করত কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগন্য । কয়েকটি জেলার পাঠশালার ছাত্রদের হিসাব থেকে তা অনুমান করা যাবে যেমন ।মুর্শিদাবাদ পাঠশালায় হিন্দু ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯৯৮ জন, মুসলমান ছিল মাত্র ৬২ জন, বর্ধমানে হিন্দু ছিল ১২,৪০৮ জন, মুসলমান ছিল ৭৬৯ জন এবং বীরভূমে হিন্দু ছিল ৬১২৫ জন এবং মুসলমান ছিল ২৩২ জন । এসব পাঠশালায় মুসলিম ছাত্র সংখ্যা কম হওয়ার কারন হল এখানে সংস্কৃত উদ্ভূত বাংলা শিক্ষা দেয়া হত বেশী এবং এর প্রায় শিক্ষক ছিল হিন্দু । তাছাড়া কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার পন্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার সাথে সামন্জস্য রেখে বাংলা ভাষার পাঠ্য পুস্তক রচনা করতেন । এগুলি এসব পাঠশালায় শিক্ষা দেয়া হত । কিন্তু পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) মুসলমানগণ সংস্কৃত উদ্ভূত বাংলার সাথে পরিচিত ছিল না । এছাড়া পাঠ্য পুস্তকগুলি সাধারনত হিন্দু ধর্ম ও ধর্মীয় উপকথা সম্বন্ধীয় ছিল । এ কারনে মুসলমানগণ এসব পাঠশালাতে শিক্ষা লাভে উৎসাহ দেখাত না ।[৩] যার ফলে এখানে মুসলমানদের উপস্থিতি খুবই কম ছিল ।

---

১. যোগেশ চন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, পৃঃ৯ ।উদ্বৃত পূর্বোক্ত, পৃঃ১২ ।বেল পদ্ধতিটি আমাদের দেশীয় পাঠশালার "সদারপোড়ো" এর অনুরূপ ।সদারপোড়ে যেমন অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ছাত্রদের শিক্ষা নিয়ে গুরুমহাশয়ের শ্রমের লাঘব করতেন,তেমনি ইংল্যান্ডের কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই প্রথা ল্যাংকেষ্টার এবং বেল সাহেব ভারতীয় পদ্ধতির অনুকরনে এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন ।এই বেল সাহেবের নামানুসারেই এই পদ্ধতির নামকরন করা করা হয় বেল পদ্ধতি " ।দুঃবঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃবাংগালীর শিক্ষাচিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩ ।

২. জে,লং এ্যাডামস রিপোর্ট,পৃঃ১৫৩,১৫৬,১৭৬ ।উদ্বৃত, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), পূর্বোক্ত, পৃঃ১১৭ ।

৩. জে,লং ,এ্যাডামস রিপোর্ট,পৃঃপৃঃ ৯৭,৯৯,১৫৬ ।উদ্বৃত, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) পূর্বোক্ত, পৃঃ১১৭-১৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাডাম এসব পাঠশালার পাঠ্যসূচীর কথা উল্লেখ করেছেন যে, ছাত্রদিগকে প্রতি দিন সকালে হাটু গেড়ে নত মস্তকে স্বরস্বতী বন্দনা আবৃত্তি করতে হত। তারা শুভংকরের গণিতের নিয়মগুলি উচ্চসুরে আবৃত্তি করে শিখতো। তাদেরকে কড়াকিয়া, গন্ডাকিয়া, কাঠাকিয়া, শতকিয়া, যোগ বিয়োগ, গুন ভাগ এবং কৃষি বাণিজ্য বিষয়ক হিসাবের নিয়ম কানুন ও মুখস্ত করতে হত। পত্র লেখা, মনসা মঙ্গল প্রভৃতি তাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল।[১] এ্যাডাম পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক সম্পর্কে আরো উল্লেখ করেন যে, এতে অমর সিংহ, চানক্য, স্বরস্বতী বন্দনা, মানভঞ্জন প্রভৃতি পড়ানো হত। বাংলার হিন্দি স্কুলগুলিতে পাঠ্য বইয়ের মধ্যে থাকত দানলীলা, দধীলীলা, প্রভৃতি। এসব পাঠ্য পুস্তকে কৃষ্ণের বালক সুলভ ভোগ বিলাসের বিষয় ছিল এবং সেগুলিই পড়ান হত।[২] এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ করা যায় যে, পাঠশালায় ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোর্তিবিদ্যা, কড়াকিয়া, শতকিয়া ইত্যাদি অন্যান্য যে কোন ধরনের শিক্ষাই দেয়া হোক না কেন, মূলত এসব শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার সমপর্ক ছিল অত্যন্ত প্রবল ও নিবীড়। কাজেই এসব পার্থিব শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষা পাঠশালায় অত্যাবশ্যক ছিল।

বৃটিশ সরকার বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ে ফিলট্রেশন নীতি অবলম্বন করে দেশীয় পাঠশালা সমপর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। দেশীয় পাঠশালা সমপর্কে সরকারের এই বিমাতা সুলভ মনোভাব সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের ভাবিয়ে তুলে। কেননা ইংরেজী শিক্ষা ও জ্ঞান তখন আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা লাভের একমাত্র উপায় ছিল। তাই ইংরেজী শিক্ষার জন্য দেশবাসী তীব্র আগ্রহ দেখে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সভার রাধা কান্তদেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাম কমল সেন, প্রসন্ন কুমার প্রভৃতি বাংলা ভাষার মাধ্যমে হিন্দু ছেলেদের শিক্ষাদানের জন্য একটি আদর্শ পাঠশালা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করেন। পাঠশালার জন্য অর্থ সংগ্রহ, ছাত্র নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্যসূচী প্রনয়ন এবং পুস্তকাদি রচনা ইত্যাদি কাজের জন্য ডেভিড হেয়ার, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাম কমল সেন, রাম চন্দ্র বিদ্যা বাগীস প্রভৃতিকে নিয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করেন। কমিটি একটি পাঠ্যসূচী প্রনয়ন করেন, তাহল, প্রথম শ্রেনীতে অক্ষর জ্ঞান দান, বানান শিক্ষা, ইতিহাস, ব্যাকরনও

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ৯৭,৯৯, ১৫৬। উদ্ধৃত পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮।

২. এ্যাডামস্ রিপোর্ট (৩য়) পৃঃ ২১, ৫৪। উদ্ধৃত বৃটিশ নীত ও বাংলার মুসলমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

গনিতের প্রাথমিক সূত্র, গোলাধ্যয়ের মুল প্রকরন এবং ভারত বর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শিক্ষা। দ্বিতীয় শ্রেনীতে ব্যাকরন, অংক, ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা, গোলাধ্যায়, জ্যোতির্বিদ্যা, শুদ্ধভাবে ভাষা বলার বিধি, ইংল্যান্ড ও ভারত বর্ষের ইতিহাস এবং পত্র লিখন পদ্ধতি। তৃতীয় শ্রেনীতে শুদ্ধরূপে ভাষা বলার নিয়ম শিক্ষা, জমিদারী ও বানিজ্য সম্পর্কীয় ব্যবহার, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, জ্যোতির বিদ্যা, বীজ গনিত, রাজনীতি, নীতি বিদ্যা, ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা, সরকারের আইন ও আদালতের রীতি ব্যবহার শিক্ষা ইত্যাদি। ১৮৪০ সালের ১৮ই জানুয়ারী অনেক নেতৃস্থানীয় ইংরেজ ও বাঙালীর সামনে বাংলা পাঠশালার পাঠ আরম্ভ হয়।[১]

এদিকে অধ্যক্ষ সভার প্রচেষ্টায় নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী পাঠশালার জন্য পাঠ্য পুস্তকাদী রচনার ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছিল। জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কর্তৃত্ব পাওয়ার পর এ সম্পর্কে একটি সাব কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরকে একমাত্র বাঙালী সদস্য রাখা হয়। হিন্দুর আচার আচরন প্রাচ্য দর্শন বা ভাবধারা যাতে পাঠ্য পুস্তকে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য জনশিক্ষা সমিতি এ নিয়ম করে দিলেন যে, একমাত্র ইংরেজীতে পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তা তাদের সাব কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে এবং সাব কমিটির দ্বারা অনুমোদন করিয়ে, তবে বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ হবে। এ ধরনের নীতির ফলে পাঠশালার আদর্শ ব্যহত হল এবং এরফলে জাতীয় ভাবাদর্শমূলক পাঠ্য পুস্তক রচনার আর আশা থাকল না। এতে পাঠশালার অবস্থা খারাপ হতে থাকে। তাই অধ্যক্ষ সভা পাঠশালার শোচনীয় পরিনতির কথা জানিয়ে কাউন্সিলকে দুবার পত্র লিখেন। কিন্তু কাউন্সিল তাদের কথায় কোন গুরুত্ব দিলেন না। একারনে ১৮৪৩-৪৪ সালে পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা অনেক কমে গেল। কিন্তু কাউন্সিল পাঠশালার উন্নতিকল্পে কোন ব্যবস্থায় গ্রহন করলেন না।[২]

১৮৪০ সালের ১৩ই জুন দেবেন্দ্র নাথ তত্ত্ববোধিনী নামে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। এই পাঠশালা হিন্দু কলেজের পাঠশালার থেকে ভিন্নতর ছিল। হিন্দু কলেজ পাঠশালায় ধর্মালোচনার অবকাশ ছিল না অথচ মিশনারীরা ইংরেজী অবৈতনিকে বিদ্যালয় স্থাপন করে ইংরেজী শিক্ষা দানের

---

১. ব্রজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, উদ্বৃত, বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

আড়ালে শিক্ষার্থীদের খৃষ্ট তত্ত্বই অধিক হারে শিক্ষা দিত । দেবেন্দ্র নাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার এক পাঠ্যসূচী প্রনয়ন করেন । তা হল প্রথম শ্রেনীর জন্য বাংলা পাঠ্য পুস্তক, যেমন কঠোপনিষৎ. রাজা রাম মোহন রায়ের গ্রন্থের চুম্বক, তত্ত্ব বোধিনী সভার বক্তৃতা, ব্যাকরন, পদার্থ বিদ্যা, ভূগোল, অংক । ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক যেমন-রীডার নম্বর ফোর, পোয়েট্রিক্যাল রীডার নম্বর টু, গ্রামার, হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল ইত্যাদি । দ্বিতীয় শ্রেনীর জন্যঃ- বাংলা পুস্তক যেমন, ব্যাকরন, জ্ঞানানব, ভূগোল ও অংক । ইংরেজী পুস্তক যেমন রীডার নম্বর থ্রী, পোয়েট্রিক্যাল রীডার নম্বর ওয়ান, গ্রামার, হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল ইত্যাদি । তৃতীয় শ্রেনীর জন্য- বাংলা পুস্তক যেমন-বর্ণমালা ২য় ভাগ, মনোরঞ্জন, ইতিহাস, ভূগোল, অংক । ইংরেজী বিষয় যেমন-রীডার নম্বর টু, স্পেলিং নম্বর টু, ইত্যাদি । চতুর্থ শ্রেনীর জন্য- বাংলা বিষয় যেমন নীতি কথা ২য় ভাগ, বর্ণমালা ২য় ভাগ, অংক । ইংরেজী বিষয় যেমন রীডার নম্বর ওয়ান, স্পেলিং নম্বর টু । পঞ্চম শ্রেনীর জন্য বাংলা বিষয় যেমন নীতি কথা ১ম ভাগ, বর্ণমালা ১ম ভাগ, অংক ইংরেজী যেমন-ইজিপ্রাইমার । ষষ্ঠ শ্রেনীর জন্য বাংলা যেমন বর্ণমালা ১ম ভাগ, অংক, ইংরেজী যেমন ইজি প্রাইমার ।[১] ইত্যাদি ।

১৮৪৪ সালে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কেবল মাত্র জনগনের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করে তিনি কাউন্সিল অব এডুকেশনকে এড়িয়ে স্বয়ং সরকারের রেভিনিউ বোর্ডের নিয়ন্ত্রনে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহন করেন । এই পরিকল্পনা মতে লর্ড হার্ডিঞ্জ সমগ্র বাংলাদেশে ১০১টি ভার্নাকুলার বা মাতৃভাষা আদর্শ পাঠশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন । তন্মধ্যে ৪২টি বিদ্যালয় পূর্ব বাংলায় স্থাপিত হয়েছিল । এই বিদ্যালয় সমূহে বাংলা ভাষার মাধ্যমে লিখন, পঠন, গনিত, ভূগোল এবং পাক ভারতীয় ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হত । কিনতু হার্ডিঞ্জের চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা শিক্ষার প্রতি সরকারী ঔদাসীনতার কারনে ও উপযুক্ত পরিদর্শক, পরিচালক, এবং পাঠ্য পুস্তকের অভাবে তিন চার বছরের মধ্যেই এসব মাতৃভাষা পাঠশালার দুর্দশা দেখা দেয় । ১৮৫২ সালে ১৯শে এপ্রিল বাংলা বিদ্যালয়গুলি যখন কাউন্সিল অব এডুকেশনের নিয়ন্ত্রনে আসে তখন এদের অনেক দুরাবস্থা ছিল । অত্যন্ত দুঃখ জনক যে, বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার দশ বছরের মধ্যেই কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারনে ২৬টি বিদ্যালয় ব্যতীত বাকী সমুদয় বিদ্যালয় স্বাভাবিক কারনেই বন্ধ হয়ে যায় ।[২]

১. বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃবাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫ ।
২. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৯ ।এস,এন,মুখার্জী, হিষ্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া আধুনিক যুগ) ৩য় সংস্করণ, পৃঃ৯৫ ।উদ্বৃত, বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষাঃবাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা, পৃষ্ঠঃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, পাঠশালাগুলি হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল কিন্তু এ সময় তা থিতিয়ে পড়ে। কেননা এ সময় ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে পুরানো শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্য হিনদু সমাজ তেমন গুরুত্ব দিচ্ছিল না। তারা ইংরেজী শিক্ষার আহবানে সাড়া দিয়ে সে দিকেই ঝুকে পড়ছিল। এতে তারা যেমন বৃটিশদের প্রিয় ও আস্থা ভাজন হয়ে উঠে, অপরদিকে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহন করে সরকারী বড় বড় চাকুরী ও দখল করতে থাকে। বৃটিশ সরকার তাদেরকে অধিক আস্থাভাজন মনে করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাও দেন। কিন্তু মুসলমানদের বেলায় তা ঘটেনি। এরফলে হিন্দু সমাজে যেমন শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পায়, তেমনি অপরদিকে তারা সমাজে অধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর হয়ে উঠে। কিন্তু দেখা যায় যে, মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যেই শিক্ষার হার বেশী ছিল। যাই হোক হিন্দু সমাজ অধিকতর ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ঝুকে পড়ার কারনে পাঠশালাগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। কেননা এ সময় ধর্মীয় পুরানো কাহিনী পড়ারমত তাদের আর সময় ও মন মানসিকতা ছিল না। তাছাড়া সরকারের নীতির কারনে যেমন তেমনি হিন্দু বিত্তশালী ও অভিজাতদের সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পাঠশালাগুলি হারিয়ে যেতে থাকে। কাজেই এভাবে বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগের অভাবে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক পাঠশালাগুলি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। বৃটিশ সরকার ১০১টি মাতৃভাষা স্কুলের নামে এসব পাঠশালার উন্নত সংস্করনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। সেটা হিন্দু জনগনের অনাগ্রহের কারনে হোক, কিংবা সরকারী উদাসীনতা ও পরিচালনার ব্যর্থতার কারনেই হোক, বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই আধুনিকতার ছোয়ায় পাঠশালার গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমে যায় এবং এসব পাঠশালা ক্রমশ আধুনিক বিদ্যালয়ে পরিনত হতে থাকে। তবে গ্রামে গন্জে কিছু কিছু ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যে পাঠশালা ছিল না তা নয় কিন্তু সেটা ক্রমশ দিন দিন নগন্য হয়ে আসছিল।

হান্টার কমিশন বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্কে যেরূপ গন্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দের মতামত সংগ্রহ করেন। তেমনি তিনি হিন্দু সমাজের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কাছ থেকে এ সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করেন। এসব নেতৃস্থানীয় বাঙালী কমিশনের কাছে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দুদের চিন্তা ধারার

Dhaka University Institutional Repository

একটি পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধান সম্পর্কে ডাঃ মহেন্দ্র পাল সরকার উল্লেখ করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা এমন ভাবে হওয়া উচিত, যাতে দেশের বৃহৎ থেকে বৃহত্তর অংশ পরিব্যাপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌছায় যেন দেশের কোন শিশুই সে শিক্ষা হতে বঞ্চিত না হয়। আর পাঠ্যসূচীও দেশীয় পাঠশালার পাঠ্যসূচীর অনুরূপ হওয়া উচিত। অর্থাৎ মানসাংক, ক্ষেত্র তত্ত্ব এবং এগুলির সংগে বিভিন্ন সাধারন বস্তু এবং তাদের গুন ও ধর্মের আলোচনা।[১] অর্থাৎ ডাঃ মহেন্দ্র পাল সরকারের মতে দেশীয় পাঠশালার মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষা চর্চা, প্রাথমিক ধরনের বিজ্ঞান চর্চা এবং তার সাথে পাঠশালার শিক্ষা যেন গ্রাম জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের নিকট মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের ছোট বড় সব গ্রামেই দেশীয় পাঠশালা স্থাপন করা উচিত এবং এসব দেশীয় পাঠশালা উন্নতির জন্য সরকারের জমিদারদের সহযোগীতা কামনা করা উচিত এবং জমিদারদেরও সরকারের সহযোগীতা করা উচিত। তিনি সরকারী প্রাথমিক স্কুল পছন্দ করেন না বরং সারাদেশ ব্যাপী দেশীয় পাঠশালার প্রসার কামনা করেন। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণ দাশ পাল কমিশনের নিকট মন্তব্য করেন যে, গুরু মহাশয়দের পাঠশালা অদ্যাবধি জনগনের শিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। উক্ত পাঠশালাতেই এ দেশের সন্তানেরা পাটি গনিত, জমিদারী ও ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ শিক্ষা গ্রহন করত এবং উক্ত পাঠশালাতেই তারা ভূমি জরীপ ব্যবসা বানিজ্য এবং বিচার সংক্রান্ত কাজ কর্ম শিখত। কিন্তু বর্তমানের প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা ভ্রমাত্মক। কেননা বর্তমান প্রাথমিক স্কুলে প্রাচীন পাঠশালার কোন অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। তিনি উল্লেখ করেন যে, পূর্বের পাঠশালার প্রকৃষ্ট ধারাগুলি বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও অক্ষুন্ন রাখা প্রয়োজন, অর্থাৎ এ স্কুল গুলিতেও শুভংকর পদ্ধতিতে মানসিক ও লিখিত পাটি গনিত, হস্তলিপি, জমিদারী খাতাপত্র লেখা, ও জমিদারী হিসাব রাখা, ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাবপত্র ইত্যাদি পাঠের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত[২]।

----

১. রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া এডুকেশন কমিশন, ইভিডেন্স বিফোর বেঙ্গল অব প্রোভিনশিয়াল কমিটি, পৃঃ ৩৬৩ উদ্ধৃত, বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃবাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩।

২. রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া এডুকেশন কমিশন, ইভিডেন্স বিফোর বেঙ্গল অব প্রোভিনশিয়াল কমিটি, পৃঃ ২৯৪, উদ্বৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪-০৫।

Dhaka University Institutional Repository

হান্টার কমিশনের নিকট বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব যে মতামত প্রকাশ করেন তাতে বুঝা যায়, তাদের কেউ আধুনিক পাঠ্যসূচীর অধ্যয়ন চাইছেন না। তারা এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভ্রমাত্মক বলে অভিহিত করেন। এ শিক্ষা দেশ ও জাতির কোন উপকারে আসবেনা বলে তারা এই স্কুলগুলিকে সমর্থন করেন নি। বরং প্রাচীন পাঠশালার শিক্ষা ব্যবস্থাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এসব পাঠশালার মূল কাঠামো বজায় রেখে সংস্কারের কথা বলেছেন। কিন্তু সরকার এর প্রতি তেমন মনোযোগী হলেন না, বরং সরকারী স্কুলের প্রতিই গুরুত্ব দিয়ে চলেন। ফলে সরকারের সহযোগীতার অভাবে দেশীয় পাঠশালাগুলির অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে থাকে এবং অনেক বন্ধ হয়েও যায়। তাই সরকারের একটা দুরভি সন্ধি কাজ করছিল যে, দেশীয় পাঠশালাগুলিকে নানাভাবে বিলুপ্ত করা এবং স্কুলে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন করা। মনরো, এলফিন ষ্টোন, এ্যাডাম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দেশীয় পাঠশালাকেই ভিত্তি করে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকারকে বার বার সুপারিশ করেন, কিন্তু সরকার সে কথার কোন গুরুত্ব দেননি। তবে এখানে একটি কথা উল্লেখ্য যে, এসব দেশীয় পাঠশালাগুলিতে অনেক ভুল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আবহমান কাল হতে বাংলাদেশের হিন্দু শিশুদের উপযোগী ধর্মীয় ও অন্যান্য শিক্ষা দিয়ে আসছিল এবং সমগ্র দেশে এই পাঠশালার শিক্ষা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। হিন্দু অভিজাত, জমিদার ও বিত্তশালীরা তাদের অর্থ সাহায্যে নীজ বাড়ীতে কিংবা অন্য কোন স্থানে গ্রামে গঞ্জে এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করে দেশীয় শিক্ষা সম্প্রসারনে সহযোগীতা করেছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসনের অল্প কিছু দিনের মধ্যে দেশের গ্রামগুলি নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। অনাহার, অধ্যাহার, দুর্ভিক্ষ, বৃটিশদের শোষন ইত্যাদি কারনে এসব পাঠশালা পরিচালনার সামর্থ মানুষ হারিয়ে ফেলে। বিত্তশালীদের আর্থিক সাহায্যও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং তাছাড়া সাধারন মানুষ চাকুরী লাভের আশায় ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। এভাবে বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থায় পড়ে ঐতিহ্যবাহী দেশীয় পাঠশালাগুলি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং এর পরিবর্তে আধুনিক পাশ্চাত্য ধাচে সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে

অতএব হিন্দু জমিদার ও বৃটিশ সরকারের সহায্যে সহযোগীতা হতে বঞ্চিত হয়ে দেশীয় পাঠশালাগুলি বন্ধ হতে থাকে। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র বিত্তশালী ও মধ্যবিত্ত শ্রেনীর স্বার্থের অনুকূলে এবং সরকারী সাহায্যে মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের স্বার্থে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একে একে ইংরেজী

Dhaka University Institutional Repository

স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । এভাবে বৃটিশ সরকার সার্বজনীন শিক্ষার দ্বার স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়ে তথা কথিত ধর্ম নিরপেক্ষ বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার দরজা খুলে দিয়ে মুষ্টিমেয় শহরবাসীর স্বার্থ রক্ষা করে । কিন্তু দেশের অধিকাংশ গ্রামের জনগনের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃটিশ সরকার পাঠশালার শিক্ষা পদ্ধতি বন্ধ করে দেয় ।

(খ)হিন্দু উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা(টোল) ঃ-

প্রাচীন কাল হতে বাংলাদেশে পাঠশালা শিক্ষা যেমন হিন্দু সমাজে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে প্রচলিত ছিল, তেমনি টোল নামে খ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হিন্দু উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল । বৃটিশ শাসন পর্যন্ত টোলের শিক্ষা ব্যবস্থা টিকে ছিল এবং উচ্চ ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও লাভ করেছিল । কিন্তু বৃটিশ সরকারের শিক্ষানীতির কারনে এবং সারাদেশ ব্যাপী ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, প্রভাব ও আধুনিকতা পুরানো ধাচের টোলের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলে । বৃটিশ সরকার ও এ দেশীয় হিন্দু জমিদার, বিত্তশালীরা এই টোলের শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেননি এবং কোনরূপ ব্যবস্থাও গ্রহন করেনি । যারফলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টোলের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে ও এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তদস্থলে ইংরেজী স্কুল কলেজ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । নিম্নে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল ।

এদেশের পাঠশালার শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা কিন্তু টোল ছিল হিন্দুদের সংস্কৃত শিক্ষার মূল কেন্দ্র । হিন্দু ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার জন্য এই টোলে বা চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করত । পাঠশালা ও টোলের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না । সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দু'ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল । কৃষক,চাষী ও ব্যবসায়ীদের জন্য ছিল পাঠশালা এবং ধর্ম, ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত লোকদের জন্য ছিল টোল । সংস্কৃত বিদ্যা চর্চায় মূলত ব্রাহ্মনদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার । তাই টোল সাধারনত ব্রাহ্মনদের দ্বারাই পরিচালিত হত । দেশের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে তারাই ছিল ধারক ও বাহক । চরক ও সশ্রুতির চিকিৎসা পদ্ধতি, সংস্কৃত জ্ঞান ভান্ডারে আবদ্ধ থাকায় বৈদ্যরাও টোলে অধ্যয়ন করত ।[১] উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য টোল বিরাট ভূমিকা পালন করত এবং সারা বাংলাদেশে বেশ প্রভাবও বিস্তার

১. শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিম বঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল । এতে বহু উচ্চ শিক্ষার্থীদের সমাগম হত । হিন্দু ছাত্ররা এখানে ধর্ম, দর্শন, যুক্তি বিদ্যা, আইন ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যা শিক্ষা গ্রহন করত । টোলে সাধারন ব্রাহ্মনরাই লেখাপড়া করত । তাছাড়া টোলে অন্যান্য জাতি (যেমন বৈদ্যরা) চিকিৎসা বিষয়ক ও ব্যাকরন শিক্ষা লাভ করত ।[১] অনেক টোল লাখেরাজ ভূমির অনুদানে চলত । যেমন রংপুরে একটি টোল ছিল যার ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৫ বিঘা ভূমি প্রদান করা হয়েছিল ।[২]

এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান (টোল) জমিদার, বিত্তশালী ও অভিজাতদের নিকট হতে অনুদান ও অর্থ সাহায্য পেত । তাছাড়া সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে লাখেরাজ ভূমি প্রদান করতেন । অনেক সময় বিত্তশালীরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বীয় বাড়ীতে কিংবা অন্য কোন স্থানে টোল প্রতিষ্ঠা করতেন ।[৩] সাধারনত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র ঘর বা বাড়ী ছিল না । প্রায়ই শিক্ষকের ঘরে অথবা চন্ডি মন্ডপে ও মন্দিরে বা কোন বিত্তশালী গৃহস্থ, কৃষকের বাড়ীতে এসব বিদ্যালয় স্থাপিত হত । টোলের শিক্ষাকালের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না । এই শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারনত অবৈতনিক ছিল । শিক্ষকগণ অর্থ উপার্জন অপেক্ষা স্বধর্মীয় প্রেরনাতেই শিক্ষকতা করতেন । এজন্য অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কোন শিক্ষক স্বীয় ছাত্রদেরকে আহার প্রদান করতেন ।[৪] এই শিক্ষাদানের বিনিময়ে মজুরী হিসেবে শিক্ষকেরা প্রতিষ্ঠাতাদের নিকট হতে

----

১. উইলিয়াম এ্যাডাম, থার্ড রিপোর্ট অন দি ষ্টেট অব এডুকেশন ইন বেঙ্গল ১৮৩৮, পৃঃ৬০, উদ্ধৃত এম,কে,ইউ,মোল্লা, "দি নিউ প্রোভিন্স অব ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম",১৯০৫-১১, দি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ রাজশাহী ইউনির্ভাসিটি, প্রকাশ (ঢাকা ১৯৮১) পৃঃ ১৫৩ ।

২. উইলিয়াম এ্যাডাম, রিপোর্ট অন ভার্নাকিলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল এনড বিহার,১৮৩৫, ১৮৩৬, ১৮৩৮, এডিটর এ বশু, পৃঃ ৭২ ।উদ্ধৃত, দি নিউ প্রোভিন্স অব ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম ১৯০৫-১১, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৩ ।

৩. দি ইমপেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া, দি ইন্ডিয়ান এ্যামপায়ার ৪র্থ খন্ড, এ্যাডমিনেসেট্রটি নতুন দিল্লী ভারত, পৃঃ ৪০৭ ।

৪. আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৯ । দি ইমপেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া, দি ইন্ডিয়ান এ্যামপায়ার ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪০৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

লাখেরাজ ভূমি পেতেন । তাছাড়া সাধারন গৃহস্থের নিকট হতে নানাবিধ জিনিষ,অর্থ, চাঁদা এবং বিত্তশালী ও অভিজাতদের নিকট হতে নিয়মিত সাহায্য পাওয়ার ও ব্যবস্থা থাকত ।[১] এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজকের মত কোন পাকা কিংবা উন্নত ঘর ছিলনা । খড় কাদা মাটি দ্বারা তৈরী হত । এ সমস্ত কুড়ে ঘরকে 'সরশ বাটি মন্ডপ' নামে অভিহিত করা হত । এ ঘরগুলি একদিকে খোলা ও তিনদিকে বেড়া আবদ্ধ থাকত । এ সমস্ত ঘর সাধারনত ২০ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট চওড়া বিশিষ্ট হত । ছাত্র শিক্ষক উভয়ই মাটিতে বসত । তবে শিক্ষক আলাদা একটি মাদুরের উপর বসতেন এবং ছাত্ররা অন্য একটি মাদুরের বসত । কিছু সংখ্যক ছাত্র শিক্ষকের ডানদিকে, কিছু সংখ্যক, বামদিকে এবং কিছু সংখ্যক মুখমুখি বসত । এভাবে সমস্ত ঘর ভরে যেত, ডান বাম দিকে কোন স্থান খালি থাকত না । টোলে শিক্ষার কাজ সাধারনত সকাল ৭টা হতে শুরু করে অবিরাম দুপুর পর্যন্ত চলত । আবার বিকেল হতে রাত পর্যন্ত শিক্ষাক্রম চলত ।[২]

আমরা দেখতে পাই যে, রাজশাহী অঞ্চলে বহু টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল । কেননা সে সময় রাজশাহীতে রাজা জমিদারদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী । তাই তারা ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনে কিংবা স্বীয় জমিদারী পরিচালনার জন্য শিক্ষিত লোকের প্রয়োজনে এসব চতুষ্পাঠী বা টোল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । বৃটিশ শাসন পর্যন্ত বহু সংস্কৃত টোল রাজশাহীতে বর্তমান ছিল । সাতুল, তাহিরপুর পুঠিয়া, নাটোর ও দিঘাপাতিয়া বংশের রাজাদের রাজত্বের সময়ে তাদের রাজ্যে অনেক চতুষ্পাঠী টোল ছিল এবং এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষনা-বেক্ষনের জন্য রাজারা প্রচুর অর্থ ও ভূমি ব্রাহ্মনদেরকে দান করতেন । কথিত আছে যে, রাজশাহী প্রদেশের চতুষ্পাঠী রক্ষার জন্য মহারানী ভবানী বৃত্তি দান করে যান এবং এই দান স্থির রাখার জন্য জেলার কালেক্টর সাহেবের সাথে এরূপ চুক্তি হয় যে, বার্ষিক রাজস্বের সাথে রানীর বার্ষিক বৃত্তির টাকা সংযোজিত হবে ।[৩]

রাজশাহী জেলার চৌগ্রাম থানার অন্তর্গত তাজপুর গ্রামে একটি বিখ্যাত টোল ছিল । এর অধ্যাপক ছিলেন শ্রীপতি বিদ্যালংকার । এই টোল রক্ষার জন্য মহারানী ভবানী বার্ষিক ৯০ টাকা

---

১. রিপোর্ট অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া (১৮৯৭-৯৮,১৯০১-০২) পূর্বোক্ত, পৃঃ৪১৩ ।শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮ ।
২. রিপোর্ট অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪১৩ ।
৩. শ্রীকালী নাথ চৌধুরী, 'রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (কলিকাতা,১৩০৮ বাংলা) পৃঃ ৬৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

দান করতেন । রাজশাহী জেলার মাটি কোপা গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ টোল ছিল । এই টোলে নাটোরের আমহাটি গ্রামের বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশিষ্ট পন্ডিত, কালিকা প্রসাদ চক্রবর্তী অধ্যয়ন করেছিলেন রাজশাহীর নাটোরের নিকট আমহাটি গ্রামের কাশীকান্ত ন্যায় পঞ্চানন নিজ বাড়ীতে এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিল । তার চতুষ্পাঠীতে মহারানী ভবানী মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি দিতেন । ন্যায় পঞ্চাননের মৃত্যুর পর বৃটিশ সরকার ঐ বৃত্তি বন্ধ করে দেন । এছাড়া রাজশাহীর অন্তর্গত চৌগ্রামের নিকট "বড়ে" গ্রামে রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্যের এক চতুষ্পাঠী ছিল । এই চতুষ্পাঠীতে রানী ভবানী মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি প্রদান করতেন । ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর বৃটিশ সরকার ঐ বৃত্তি বন্ধ করে দেন ।[১] এ থেকে বুঝা যায় যে, রাজশাহী অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক টোল চতুষ্পাঠী ছিল এবং এসব প্রতিষ্ঠান রাজা, জমিদার ও বিত্তশালীদের অনুদানে পরিচালিত হত । এমনিভাবে দেশের বিভিন্ন হিন্দু এলাকায় টোল ছিল এবং তা ব্যক্তি উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হত । নোয়াখালী জেলায় ১৪টি সংস্কৃত টোল ছিল । এর পাশাপাশি আরো দুটি স্কুল ছিল যেখানে সংস্কৃত শিক্ষা দেয়া হত । এসব কটি প্রতিষ্ঠানে ২৫০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহন করত ।[২] ১৯০৬-৭ সালের দিকে বগুড়া জেলায় ৩টি সংস্কৃত টোল ছিল, এতে ৩৩ জন ছাত্র বিদ্যা শিক্ষা গ্রহন করত ।[৩] উইলিয়াম এ্যাডাম নাটোরের শিক্ষা জরিপের উপর ভিত্তি করে যে দ্বিতীয় রিপোর্টটি তৈরী করেছিলেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সেখানে তিনি ৩৮টি সংস্কৃত কলেজ দেখতে পেয়েছিলেন, যার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৯৭ জন । সংস্কৃত শিক্ষায়তনে ভর্তির গড় বয়স ছিল ১১ বছর এবং শিক্ষা সমাপনের গড় বয়স ছিল ২৭ বছর ।[৪] ১৮৯১ সালের দিকে নদীয়ায় ৮টি সংস্কৃত টোল ছিল এবং এর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯৯ জন। কোয়েন তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, ১৮৬৭ সালের দিকে এখানে ১২টি টোল ছিল এবং ১৫০ জন ছাত্র ছিল । ফরিদপুরের কাটালি পারায় একটি বিখ্যাত টোল ছিল ।[৫]

---

১. রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ৬৮,৬৯,৭০ ।

২. জে,ই,উইবষ্টার, ইষ্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম ডিষ্ট্রিকট, গেজেটিয়ার্স" নোয়াখালী", (এলাহাবাদ, ইন্ডিয়া ১৯১১) ,পৃঃ ৯৯ ।

৩. জে,এন,গুপ্ত,ইষ্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ারস"বগুড়া", (এলাহাবাদ,ইন্ডিয়া ১৯১০) পৃঃ ১৪৮ ।

৪. সৈয়দ নুরুল্লাহ, এবং জে,পি,নায়েক,"এ ষ্টুডেন্টস হিষ্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া,৫ম সংস্করণ (বোম্বে, মাদ্রাস, কলিকাতা, লন্ডন,১৯৬৪) পৃঃ১৫ ।

৫. দিলীপ সিনহা, নাইনটিনথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল (আসপেক্টস অব সোসিয়াল হিষ্ট্রি,(কলিকাতা, ১৯৬৫) পৃঃ ৪৮-৪৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

এসব টোলে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করা হত যেমন সাহিত্য, ব্যাকরন,কাব্য ছন্দ ইত্যাদি। এছাড়া দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, অংক, ধর্মতত্ত্ব এবং কোন কোন স্থানে বেদ বেদান্ত ও পড়ান হত। এফ,এ, সাক্সীর ময়মনসিংহের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণে প্রতীয়মান হয় যে, টোলে সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যেই হিন্দু শিক্ষার্থীদের বিদ্যা শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল।[১] যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠান সাধারনত ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হত, তাই এর নিয়ম কানুন ,শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মধ্যে ছিলনা। অর্থাৎ হয়ত এক এক এলাকার টোলের পাঠ্যসূচী এক এক রকমের থাকত এবং পদ্ধতিগতদিক থেকে বিভিন্নতা থাকত। কেননা তখনো এসবপ্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রিয় কোন নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা ছিল না। তবে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে দেশের সর্বত্র টোল একই রকম ছিল।

পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর খ্যাতির দিক থেকে নদীয়ার পরেই এর স্থান ছিল। কেননা বিক্রমপুর তৎকালীন সময়ে প্রচুর সংখ্যক সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র টোল ছিল এবং এখানকার শিক্ষারও যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৮৩৮ সালে সাধারনভাবে এই স্থানে সোনারগাঁও ও সমগ্র জেলাব্যাপী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ১২৫টি। এতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ৮২৮ জন। উক্ত বিদ্যালয়মসূহের মধ্যে ৪৬৭ জন ছাত্রসহ ৬৮টি বিদ্যালয় "কলাপ ব্যাকরন' বা সংস্কৃত ব্যাকরন শিক্ষা দেয়া হত। ৩০৬০ পাতা বিশিষ্ট মোট পুস্তকের সংখ্যা ছিল ২০টি এবং শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সীমা ছিল দশ বছর। ১২৭ জন ছাত্রসহ ৩৩টি বিদ্যালয়ে ন্যায় শাস্ত্র বা তর্ক বিদ্যা এখানে অধ্যয়ন হত এবং ইহা জ্ঞানের একটা প্রধান শাখা হিসেবে বিবেচিত হত। এতে পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ছিল সাতটি। একজন ছাত্রের যুক্তি,তর্ক ও কৌশল শিক্ষার পারদর্শিতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সীমা ধরা হত ১২ বছর। ১৩৪ জন ছাত্রসহ অবশিষ্ট ২৪টি বিদ্যালয়ে হিন্দু শাস্ত্র বেদ চর্চা হত। ১২৪৩ পাতা বিশিষ্ট গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ৩০টি এবং এগুলো পাঠন পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ধরা হত ৮ বছর।[২] বিক্রমপুরে

---

১. এফ,এ,সাক্সী, বেঙ্গল ডিসিষ্ট্রিক গেজেটিয়ার ময়মনসিংহ(কলিকাতা ১৯১৭)। উদ্ধৃত বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর ময়মনসিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৮,রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭।

২. জেমস টেলর, অনুবাদক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান,"কোম্পানী আমলে ঢাকা," বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করন (ঢাকা ১৯৭৮,) পৃঃ ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

অনুশীলিত অন্যান্য শাস্ত্রাদি হল জ্যোর্তি বিদ্যা এবং আয়ুর্বেদিক বা চিকিৎসা বিষয়ক শাস্ত্র । জ্যোর্তির বিদ্যার চর্চা ও অনুশীলন বৈদিক ব্রাহ্মন সমপ্রদায়ের পন্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । অন্য কেউ এ বিষয়ে তেমন অধ্যয়ন করত না । এ সকল পন্ডিতেরা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহনের সময় নিরূপন করে প্রতি বছর এ সমপর্কে পত্রিকা প্রকাশ করতেন । আর্শগী ব্রাহ্মনগণ ঐসব পঞ্জিকা নকল করে শহরে বিক্রয় করত । বাখেরগঞ্জের বাকলায় এ ধরনের একটি প্রতিদ্বন্দী পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় । কিন্তু এগুলির কোনটাই নদীয়া থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকার মত উন্নত মানের ছিল না এবং এত ব্যাপক প্রচলনও ছিল না । কিন্তু বিক্রমপুরে সাধারনত জ্যোর্তিবিদ্যা অপেক্ষা চিকিৎসা বিদ্যার অধিক চর্চা ও অনুশীলন হত । দেশের বেশীর ভাগ জনপ্রিয় ও মূল্যবান চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থরাজি বিক্রমপুরেই লিখিত হয়েছিল, এজন্য বিক্রমপুর সমগ্র দেশ ব্যাপি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল । বিক্রমপুরের সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্রের গুরু ও পন্ডিতেরা জ্ঞান সাধনা ও চর্চার অধিক উৎসাহের জন্য শিষ্যদেরকে বিনামূল্যে আহার বাসস্থান ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করতেন এবং নিজেরা ধর্মপ্রান ও দানশীল ব্যক্তিদের মঞ্জুরকৃত দানের সাহায্যে পরিবারের ভরনপোষন করতেন ।[১]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ঢাকা জেলায় সর্বমোট ১২৫টি সংস্কৃত স্কুল ছিল এবং এতে ৮২৮ জন ছাত্র বিদ্যা শিক্ষা লাভ করত । উক্ত বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ব্যাকরন শিক্ষা দেয়া হত যার জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয় সময় সীমা ছিল দশ বছর । ধর্মগ্রন্থ ''বেদ'' পাঠ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ছিল ৮ বছর এবং যুক্তি তর্ক কৌশলে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সময় ছিল ১২ বছর । তাছাড়া ১৮৩৮ সালে ঢাকা শহরে ১১টি হিন্দু স্কুল ছিল এবং এতে ৩০২ জন শিক্ষার্থী বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করত এবং মুসলমানদের জন্য ৯টি স্কুলে ১১৫ জন শিক্ষা গ্রহন করত । হিন্দু শিক্ষার্থীরা প্রতিমাসে দু'আনা বেতন দিত এবং মুসলমানদের জন্য বেতন মওকুফ ছিল এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যক্রম খুবই সাধারন ও বাস্তবমুখী ছিল । এখানে সাধারনত লিখন ও পঠন শিখানো হত এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষি কাজের জন্য হিসাব নিকাশ শিক্ষা দেয়া হত ।[২]

---

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৬ ।

২. জেমস টেইলর, টপোগ্রাফী অব ঢাকা, পৃঃ ২৭৪, উদ্ধৃত বি,সি,এ্যালেন,ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ঢাকা, (এলাহাবাদ,১৯১২), পৃঃ ১৫৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, পূর্ব বাংলার অন্তর্গত ঢাকার বিক্রমপুরের এই বিশাল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রটি বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত গবেষনা, জ্ঞান সাধনা ও চর্চায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে ছিল এবং দেশব্যাপী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসনামলে সরকারী শিক্ষানীতি তথা ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করা হবে না, এরূপ ঘোষনার কারন এবং হিন্দু জমিদার ও বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, আর্থিক অনটনে পড়ে এসব সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র এক সময় কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। যার অস্তিত্ব শুধু ইতিহাসের পাতায় থেকে যায়। তাই একদিকে আর্থিক অভাব অনটন, অপরদিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব, পার্থিব লোভ এবং সরকারী উচ্চ চাকরীর আশা সব মিলিয়ে এসব শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তখন হিন্দু সমাজে যেন ফুরিয়ে যায়। তাই সরকার ও হিন্দু নেতৃস্থানীয়রা যদি একটু সহানুভূতিশীল হতেন এবং ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাকে নতুন সংস্করনের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতেন তাহলে হয়ত এই সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রটি ধ্বংশ হয়ে যেত না। কাজেই এই বিশাল শিক্ষায়তনের ধ্বংশের মুলে যেমন সরকার দায়ী তেমনি এদেশের হিন্দু বিত্তশালী ও নেতৃস্থানীয়রা সমান দায়ী।

এ্যাডামের রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, সমগ্র বাংলাদেশে (বাংলা ,বিহার) ১৮৩৫ সালে হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার জন্য টোলের সংখ্যা ছিল প্রতি জেলায় গড়ে ১০০টি। সবকটি টোলের ছাত্র ও শিক্ষকের মিলিত সংখ্যা এ্যাডামের হিসাব অনুযায়ী কম করে হলেও তখন প্রায় ১২৬০০ জন ছিল।[১] এ্যাডাম উল্লেখ করেন যে, টোলের জন্য শিক্ষকেরাই তৈরী করতেন মাটির ঘর। প্রতিষ্ঠান ছিল আবাসিক এবং শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ছাত্ররা ভিক্ষা করে খাদ্য সংগ্রহ করত। তাঁর মতে টোল ছিল তিন প্রকারের। প্রথম প্রকারের প্রতিষ্ঠানে ব্যাকরন, ছন্দ ও সাহিত্য পড়ানো হত। দ্বিতীয় প্রকার প্রতিষ্ঠানে ন্যায় শাস্ত্র ও কাব্য এবং তৃতীয় প্রকার প্রতিষ্ঠানে প্রধানত তর্ক শাস্ত্র পড়ানো হত। টোলের পন্ডিত ছিলেন ব্রাহ্মন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এক নাটোর থানার টোলের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সামগ্রিকভাবে একটা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান। কিন্তু পরিবেশগত

---

১. জেমস টেইলর, টপোগ্রাফী অব ঢাকা, পৃঃ ২৭৪, উদ্ধৃত, বি,সি,এ্যালেন, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ার 'ঢাকা', (এলাহাবাদ, ১৯১২,) পৃঃ ১৫৯।

২. শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিম বঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০। শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

কারনে শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নগতি ছিল । এখানকার শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত । অব্রাহ্মন ছাত্ররা সাধারনত টোলে পড়ার সুযোগ পেতনা । টোলের শিক্ষার অধপতনের মূলে এ্যাডাম তৎকালীন সামাজিক,অর্থনৈতিক দুর্দশা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন ।[১] তাছাড়া লর্ড বেন্টিং ও তার পরিষদ এদেশের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন যে, ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানোই বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য । তাই শিক্ষার জন্য সমস্ত বরাদ্দকৃত অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে ।[২] এই সিদ্ধান্তের অবশ্য আগে হতেই দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা অধপতনের যাত্রা শুরু হয়ে যায়, সরকারী এই নীতি ও সিদ্ধান্তের কারনে সে অধপতন আরো দ্রুততর হয় । তাছাড়া ১৮৩৭ সালে লর্ড বেন্টিং দেশের সাধারন অফিস আদালতের ভাষা ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকে রাজ ভাষা ও অফিস আদালতের ভাষা আইন করে ঘোষনা করায় শিক্ষার উপর বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । এতে হিন্দু সমাজ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ঝুকে পড়ে, যারফলে টোলের অবস্থা অবনতি শুরু হয় । এভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে টোল বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষায় বিপর্যয় দেখা দেয় । মহেষ চন্দ্র ১৮৯১ সালে বাংলা বিহার, উড়িষ্যার টোলগুলির যথা সম্ভব পরিদর্শন করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন । এতে দেখা যায় বাংলাদেশের প্রখ্যাত পন্ডিতগন তাদের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা দিচ্ছেন । বাংলা ও উড়িষ্যার ৭৬১টি টোল পরিদর্শন করে মহেশ চন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী কিছু নির্বাচিত টোলের পন্ডিতদের ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করেন এবং পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে টোলের পন্ডিত ও ছাত্রদের সন্তোষজনক পারিতোষিক দানের ও প্রথা প্রবর্তন করেন ।[৩] এভাবে মহেশ চন্দ্র টোলগুলির পুনরুজ্জীবনের আয়োজন করেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয়নি, টোল ধ্বংশ হয়ে যায় ।

অতএব উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, সরকারী শিক্ষানীতি ,তৎকালীন সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার অবনতি ও দুরাবস্থা, জমিদার ও বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

---

১. শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০ ।

২. শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিম বঙ্গ, পূর্বোক্ত,পৃঃ ২০ ।

৩. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭ । উদ্বৃত বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি কারনে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টোল বিলুপ্ত হয়ে যায়। যদি সময়মত সরকার ও এদেশীয় নেতৃস্থানীয় হিন্দু সমাজ এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহন করত, তাহলে হয়ত হাজার বছরের এই শিক্ষায়তন এভাবে আধুনিকতার ছোয়ায় ও ইংরেজী শিক্ষার চাপে সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে যেতনা। তাই এই বিলুপ্তির জন্য সরকার যেমন দায়ী তেমনি এ দেশের ধর্ম বিমুখ নেতৃস্থানীয় ও বিত্তশালী হিন্দু সমাজ ও সমানভাবে দায়ী।

(গ) বৃটিশ সরকারের নীতি ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা :-

প্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যে পাঠশালা ও টোল শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছিল তা বৃটিশ শাসনামলে বিভিন্ন কারনেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সে স্থান এভাবেই নিশ্চল থেকে যায়নি ধীরে ধীরে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসব স্থান দখল করে নেয়। সরকারী শিক্ষা বিভাগের অবিরাম প্রচেষ্টা এবং হিন্দু সমাজের অতি আগ্রহের ফলে ইংরেজী শিক্ষা তাদের মধ্যে অনেক অগ্রগতি ঘটে এবং এ সুযোগে পাঠশালা ও টোলের পরিবর্তে প্রচুর সংখ্যক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। তাছাড়া ইংরেজ সরকার হিন্দু ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষার আধুনিক সংস্করন হিসেবে কলেজ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং এর ফলশ্রুতিতে সংস্কৃত কলেজ ও স্থাপিত হয়। নিম্নে হিন্দু ধর্মীয় উচ্চতর শিক্ষা ব্যাপারে বৃটিশ সরকার যে নীতি অবলম্বন করেছেন সে সম্পর্কে জনসাধারনের কি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

উচ্চতর হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার জন্য কোম্পানী সরকারের বেনারসের তৎকালীন রেসিডেন্ট মিঃ জনাথন ডানকান ১৭৯১ সালে বেনারসে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[১] হিন্দু ধর্ম ও সাহিত্য চর্চা, গবেষনা ও সংরক্ষনের জন্য কলেজটি স্থাপন করা হয়। কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপনের পিছনে কোম্পানীর যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে, সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পিছনেও তাদের একই উদ্দেশ্য কাজ করেছে। অর্থাৎ মাদ্রাসার ছাত্রদের মত সংস্কৃত কলেজের হিন্দু

---

১. শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮। শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭। শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিম বঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১। এ হিষ্ট্রি অব ইংলিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া ১৭৮১-১৮৯৩, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্ররাও যাতে হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা যথাযথভাবে প্রদান করার দক্ষতা অর্জন করে ইউরোপীয় বিচারকদের সহায়তা করতে পারে ।[১] সংস্কৃত কলেজে হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র, ঔষধ, বোটানী, সঙ্গীত, কলা, বিজ্ঞান, অংক, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস, ন্যায়শাস্ত্র, কবিতা, যন্ত্র কৌশল, ব্যাকরন, হিন্দু আইন, প্রভৃতি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ।[২] সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রথমদিকে এই কলেজকে বার্ষিক ১৪ হাজার টাকা মঞ্জুরী প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে এই অনুদান বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয় । কলিকাতা মাদ্রাসার মত বেনারস সংস্কৃত কলেজ ও পন্ডিতদের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার ফলে নানা প্রকার সমস্যা দেখা দেয় । এরফলে কর্তৃপক্ষ একজন ইউরোপীয় সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করে কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁর উপর হস্তান্তর করে ।[৩]

হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা আপাত দৃষ্টিতে ভাল মনে হলেও এর পিছনে কোম্পানীর এক অসৎ উদ্দেশ্য কাজ করেছে বলে মনে হয় । কেননা ধর্মের সুরসুরি দিয়ে ধর্মের আবরনে এ দেশের বৃহত্তর হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রেখে সমর্থন আদায় করা ও তাদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল । কাজেই সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে এ দেশের হিন্দু ও মুসলিমদের খুশি করার জন্য এগুলি ছিল তাদের একমন ভোলানো প্রয়াস মাত্র । শুধু তাইনয় তাদের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের জনগোষ্ঠীকে এমনভাবে শিক্ষিত করা, যাতে এরা কোম্পানীর অধিনেই নিম্নতম চাকরী করার যোগ্যতা অর্জন করবে এবং যাতে তাদেরকে দাসের মত ব্যবহার করা যেতে পারে । তাই তাদের এ শিক্ষানীতি ছিল সুদূর প্রসারী এবং অত্যন্ত রাজনৈতিকও সাম্রাজ্যবাদী শোষনের হাতিয়ার । আর ইহা হিন্দু মুসলিম উভয়ের উপরই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করেছিল । যদিও হিন্দুরা সে চক্রান্তের মাঝেও ইংরেজী শিক্ষা করে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল ।

----

১. এ ষ্টুডেন্টস হিষ্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২ ।

২. শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮-৯ । এ হিষ্ট্রি অব ইংলিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, ১৭৮১-১৮৯৩, পৃঃ ১৯ ।

৩. এ ষ্টুডেন্টস হিষ্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩ । এ হিষ্ট্রি অব ইংলিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯ । শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

তবে হেষ্টিংস, জনাথন ডানকান তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই ভারতবর্ষে শিক্ষা, সভ্যতাও শিল্প সাহিত্য বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনায় ও কারনে এ দেশীয় জনগনকে অজ্ঞতা ও অন্ধকারে রাখাই তাদের নিকট অধিক যুক্তিযুক্ত বলে স্থির হয়েছিল।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থায় সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে অভূতপূর্ব দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। এতে কোম্পানীর কর্মচারীদের নৈতিক চরিত্র ও মান অতি নিম্ন স্তরে চলে গিয়েছিল। এরফলে লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালে সমপূর্ণ নতুন উদ্যোগে ও উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজের উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতি গ্রস্থ অত্যধিক অমিতাচারী, নবীন সিভিল সার্ভেন্টদের মনে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বাঞ্চনীয় সৎ গুন বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা। এই প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলিম আইন, ভারতের ঐতিহ্যগত ইতিহাস, নৈতিক গুনাবলী বিকাশের উপযোগী বিষয়, প্রাচ্য ও ভারতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ইত্যাদি পাঠ্যসূচী প্রনয়ন করা হয়।[২] অর্থাৎ চরিত্র গঠন ও নৈতিক গুনাবলী শিক্ষা দেয়ার জন্য হিন্দু ও মুসলিম আইন ও ধর্মাশ্রিত বিষয়গুলিই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে গুরুত্ব সহকারে পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে ধর্মীয় শিক্ষাকেই একটু অন্যভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

এদেশে ইংরেজরা তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে যতই জাকিয়ে বসতে লাগলো ততই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব বেড়েই চল্লো। এতে লোকজন বিশেষ করে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ঝুকে পড়তে শুরু করল। অথচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থিতিবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রগতিবাদী নেতৃস্থানীয় হিন্দু সমাজ চুপ করে বসে থাকলনা। বেসরকারী উদ্যোগে তারা ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে উঠল। এর ফলশ্রুতিতে ১৮১৫ সালে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে কলিকাতা হিন্দু কলেজ উদ্বোধন করা হয়। প্রথমত ২০জন

----

১. এস,এ,নুরুল্লাহ, এ ষ্টুডেন্ট হিষ্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, ৫ম সংস্করন, কলিকাতা ১৯৬৪, পৃঃ ৫৯। উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৫) পূর্বোক্ত,পৃঃ১৮.

২. শিক্ষন প্রসংগে শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজের যাত্রা শুরু হয়, পরবর্তীতে এর সংখ্যা দাড়ায় ৩৯ জন ছাত্রে ।[১] অপরদিকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি । কিন্তু হিন্দু বিত্তশালী ও শিক্ষানুরাগীরা শুধুমাত্র সরকারের উপর নির্ভর করে নিশ্চুপ বসে থাকেনি । তারা তাদের স্বজাতিকে পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তুলার জন্য বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে থাকে এবং শিক্ষা ব্যাপারে এক সামাজিক আন্দোলন ও গড়ে তুলে । তারা ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিয়ে পার্থিব প্রয়োজনীয় শিক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে । কাজেই তারা এভাবে সমাজে সামাজিক ও আর্থিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজী শিক্ষা করে ইংরেজদের তোষন নীতির বিনিময়ে উচ্চ চাকরী দখল করে সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে ।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতারা চেয়েছিলেন যে, তাদের সন্তানেরা এই কলেজে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা পাবে । সে হিসেবে তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ভদ্র ঘরের হিন্দু ছেলেদের ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষাসমূহ এবং এশিয়া ও ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষা দেয়া । এই হিন্দু কলেজটি দুটি অংশে গঠন করা হয়, একটি অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপর অংশ উচ্চ শিক্ষার (কলেজ) জন্য । উচ্চ শিক্ষা শাখায় ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কাল নিরুপন বিদ্যা, অংক, রসায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিজ্ঞান পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় । ইতিহাসে মধ্যে গ্রীক, রোম, ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের ইতিহাস, এছাড়া আরব ও তুর্কী ইতিহাস ও পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।[২] ১৮২৬ সাল পর্যন্ত এই কলেজটি বিদ্যালয় নামে পরিচিত ছিল, এরপর থেকে সরকারী খাতায় পাকাপাকিভাবে হিন্দু কলেজ নামে অবহিত হয় । প্রতিষ্ঠাতারা এ কলেজের জন্য গোড়ার দিকেই ১১৩১৭৯ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন । এই কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব ভার পুরাপুরি ভারতীয় পরিচালক বর্গের হাতেই অর্পন করা হয় । প্রথম হতেই এই কলেজে অবৈতনিকভাবে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয় । এরফলে অলপ কিছু দিনের মধ্যেই কলেজ মারাত্মক

----

১. রিপোর্ট অব দি ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫ । দিলীপ কুমার চট্টপাধ্যায়, ডাইনামিকস্ অব সোসাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল (১৮১৭-১৮৫১) প্রথম প্রকাশ কলিকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ২৬০ ।

২. এশিয়াটিক জার্নাল ফর নভেম্বর, ১৮৩২, পৃঃ ১১৫ । উদ্ধৃত ডাইনামিকস্ অব সোসাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল (১৮১৭-১৮৫১) পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬০ । শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিম বংগ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ সংকটে পতিত হয়। ১৮২৩ সালের দিকে তাই কলেজের পরিচালক সমিতি আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য সরকারের স্মরনাপন্ন হয়। এতে সরকার কয়েকটি শর্তে রাজী হয়। শর্তাদির মধ্যে অন্যতম শর্ত হল, সরকার যখন টাকা দিবে তখন কলেজ পরিচালনা ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি রাখার অধিকার সরকারকে দিতে হবে। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত এবং জেনারেল কমিটির সচিব হোয়েস হেম্যান উইলসন ঐ তদারকীর দায়িত্ব নিয়ে সরকারী তরফ হতে কলেজের ভিজিটর বা পরিদর্শক নিযুক্ত হন।[১]

ইতিমধ্যে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ক্লাশ খোলার কথা বিবেচনা করা হয়। সরকার হিন্দু কলেজের উন্নতির জন্য ব্যবস্থাপনার ভার নিজ হাতে গ্রহন করেন এবং পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্যের ও ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত কলেজের সাথে হিন্দু কলেজের আর্থিক সাহায্য দানের কথাও উল্লেখ করেছেন।[২] প্রস্তাবটি হেরিংটন অনুমোদন করেন। উইলসন এবং হেরিংটন একজন সেক্রেটারী অন্য জন প্রেসিডেন্ট হলেন। তাঁদের মতানুসারে সরকার হিন্দু কলেজের উচ্চ ক্লাশগুলিকে সংস্কৃত কলেজের সাথে মিলিত করেছেন। এরমধ্যে ইংল্যান্ড হতে দর্শন শাস্ত্র সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আনা হলে সরকার হিন্দু কলেজে নিরিক্ষাধর্মী দর্শন শাস্ত্র বিভাগের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।[৩]

এদিকে বিচারালয়ের উপদেষ্টা মন্ডলীর আদেশক্রমে কমিটি হিন্দু কলেজের জন্য প্রচুর মন্জুরী বরাদ্দ করে। ইংরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষার উৎসাহ দেয়ার জন্য মাসিক ১৫ টাকার ৮টি বৃত্তি ব্যতীত কলেজে প্রতিমাসে ৩০০ টাকার মন্জুরী দেয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজী শিশু শিক্ষামূলক পুস্তক প্রকাশের জন্য সরকার শিক্ষা তহবিল হতে ৪১,৩৭৬ টাকা এবং ইংল্যান্ড হতে বই ক্রয়ের জন্য ৫ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখে। হিন্দু কলেজে ইংরেজী এবং অংক শিক্ষা দানের ব্যাপারে অতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে এডুকেশন প্রেসের সুপারিনটেনডেন্ট টেইলারকে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।[৪] কাজেই ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলে

---

১. শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিম বঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৪।

২. বেঙ্গল পাবলিকেসন্স, ১৭ই জুলাই ১৮২৩, নং ৪২। উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ১১৮।

৩. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান(১৭৫৭-১৮৫৬), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮।

৪. উদ্ধৃত, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণ হিন্দুদের সন্তানেরা উচ্চমানের ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পায় । ইংরেজী বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা চালু হয় এবং ধর্মের পরিবর্তে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শাখার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা হয় ।[১] এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, হিন্দু কলেজ একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথচ এর প্রতি সরকারের সহানুভূতি অপরিসীম । কেননা এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ধর্মীয় শিক্ষা উঠিয়ে দিয়ে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করাই সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, তাই ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্য খুবই নগন্য ছিল , পক্ষান্তরে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্যের পরিমান অনেক বেশী ছিল । তাই সংস্কৃত কলেজ সরকারী হওয়া সত্ত্বেও সেখানে হিন্দু কলেজের তুলনায় সাহায্য অনেক কম ছিল । যেহেতু সেখানে সংস্কৃত শিক্ষাকেই প্রাধান্য দেয়া হত । অতএব এ থেকে বুঝা যায় যে, ধর্মীয় শিক্ষাকে বিলোপ করে ইংরেজীকে প্রতিষ্ঠা করাই বৃটিশ সরকারের নীতি ছিল ।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রকাশের পথ খুলে যায় । কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়নের সমপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টির জন্য আরেকটি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসছিল ।[১] তাই ১৮২১ সালের ২১শে আগস্ট ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বড় লাট হেস্টিংস কাশীর সংস্কৃত (বেনারস) কলেজের ন্যায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করেন এবং কলেজের জন্য বার্ষিক ২৫/৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন । তিনি উল্লেখ করেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হলেও এক্ষণ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে তাঁদের ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার বেলায় এ প্রতিষ্ঠান সহায়তা করবে ।[২] কিন্তু রাজা রাম মোহন রায় ১৮২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করে বড় লাট লর্ড আর্ম হার্স্টকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেন । পত্রে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে এদেশে সংস্কৃত ও প্রাচ্য

----

১. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১ ।

২. ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃঃ১,৩ । উদ্ধৃত বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭ । ব্যুরো অব এডুকেশন ইন্ডিয়া, সিলেকশন ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস, পৃঃ ৭৯, ১৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

দর্শন শিক্ষা করা দেশ বাসীর জন্য ক্ষতির কারণ হবে । তিনি উল্লেখ করেন যে, কেননা এগুলি এখন বাতিল ও অপ্রয়োজনীয় বিদ্যা । এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশবাসীকে ধর্মান্ধতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে । এর পরিবর্তে তিনি উদার ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও ইউরোপীয় দর্শন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করেন । যেখানে শিক্ষার বিষয় হবে গনিত, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা, শরীর বিদ্যা, জীব বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ের বিভিন্ন শাখা । কাজেই সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা না করে আধুনিক শিক্ষা দেয়ার জন্য উপযুক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত , কেননা হিন্দুরা সংস্কৃত শিক্ষা চায় না, চায় আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক পশ্চিমা বিদ্যা । কিন্তু পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটির তীব্র বিরোধীতার কারনে রাজা রাম মোহনের সুপারিশ বাতিল হয়ে যায় এবং যথা সময়ে ১৮২৪ সালে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ।[১]

১৮২৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সংস্কৃত কলেজে ক্লাশ শুরু হয় । সংস্কৃত কলেজে প্রথমত ছয়টি শ্রেনী ছিল, যেমন ব্যাকরন, কাব্য, অলংকার শাস্ত্র, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্র । এগুলি ব্যতীত ও সময় নতুন শ্রেনীর ও উদ্ভব হয়েছিল । যেমন জ্যোতিষ শাস্ত্র, বৈদ্যক (চিকিৎসা) ইংরেজী ,বাংলা এবং পুরাবৃত্ত ।[২] ১৮৫০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগ সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষা কাউন্সিলের সমপাদক মোয়াটকে একটি রিপোর্ট পাঠান । এই রিপোর্টে তিনি ব্যাকরন, সাহিত্য, অলংকার, জ্যোতিষ ,স্মৃতি , ন্যায়, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্য ও অধ্যয়ন সমপর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন । ইংরেজী শিক্ষা সমপর্কে তাঁর অভিমত হল ইংরেজী চর্চা ঐচ্ছিক না রেখে আবশ্যিক করতে হবে এবং ইংরেজী অধ্যয়ন অলংকার শ্রেনীতেই শুরু করতে হবে ।[৩] এরপর বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে কলেজের উন্নতিকল্পে প্রচুর পরিবর্তন আনেন । ১৮৫১ সালের জানুয়ারী থেকে তিনি উক্ত কলেজে

---

১. রিপোর্ট অব দি ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন, এ্যাপয়েন্ট বাই দি রেজুলেশন অব দি গর্ভনমেন্ট অব ইন্ডিয়া কলিকাতা ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮২, পৃঃ ১৬ ।এশিয়াটিক জার্নাল ফর ডিসেম্বর ১৮২২, পৃঃ ৫৫১-৫৩ । উদ্বৃত ডাইনামিকস্ অব সোসাল চেন্জ ইন বেঙ্গল (১৮১৭-১৮৫১) পৃঃ ২৪৮ । বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭, ৮৮ ।

২. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস,১ম খন্ড,পূর্বোক্ত,পৃঃ৫১-৫২, উদ্বৃত , বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাংগালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭ ।

৩. বঙ্গ দেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২-৫৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

কায়স্থদের লেখা পড়া করার অনুমতি দিলেন এবং ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সকল হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন । ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্বে ছিল তবে মাঝখানে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পুনরায় তিনি তা প্রবর্তন করেন এবং ইংরেজীতে গনিত পাঠন ও পাঠনেরও ব্যবস্থা করেন । তিনি স্বয়ং দুইটি সংস্কৃত ব্যাকরন রচনা করেন "দুরূহ মুগ্ধবোধের" স্থলে সেগুলি পাঠের ব্যবস্থা করেন ।[১]

পরবর্তীতে মহেশ চন্দ্র অধ্যক্ষ হয়ে মৃত কল্প সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবনে আত্মনিয়োগ করেন । এ উদ্দেশ্যে তিনি কলেজে সংস্কৃত 'উপাধি' পরীক্ষা প্রবর্তন করেন । মহেশ চন্দ্র ডি,পি,আই, এগফটকে 'উপাধি' পরীক্ষার সিলেবাস তৈরী করে পাঠান এবং সাহিত্য দর্শন, স্মৃতি ও বেদ এই চার বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহনের প্রস্তাব করেন । মহেশ চন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে ১৮৭৯ সালের ১৪ই এপ্রিল সংস্কৃত কলেজে প্রথম সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা গ্রহন করা হয় । পর পর কয়েকবার সংস্কৃতি উপাধি পরীক্ষায় বাঙ্গালী যুবকদের আগ্রহ দেখে মহেশ চন্দ্র উৎসাহিত হলেন এবং তাঁর প্রস্তাবে ১৮৮১ সাল হতে সংস্কৃত কলেজ 'উপাধি' শ্রেনী খোলা হয় । এদিকে ১৮৭৮ সন থেকে ঢাকা 'সারস্বত সমাজ' সংস্কৃত পরীক্ষা নিয়ে উপাধি দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন । বাংলাদেশে কতগুলি প্রতিষ্ঠান এই পরীক্ষা নেয়াও দেওয়ার ব্যাপারে ঢাকা সারস্বত সমাজের অনুসরন করছিল । সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে এরূপ বিশৃংখলা নিরসনের জন্য মহেশ চন্দ্রের প্রস্তাবের ১৮৮৪ সন থেকে পুরাতন উপাধি যেমন বিদ্যা বিনোদ, স্মৃতি ভূষন, বেদান্ত বাগীশ, প্রভৃতি বিলুপ্ত করে "তীর্থ" উপাধি প্রবর্তন করা হয় ।[২]

এভাবে কলিকাতা কেন্দ্রিয় সংস্কৃত কলেজ হিন্দু সমাজে নামে মাত্র ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে আসছিল কিন্তু ধর্ম শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত ছিল । এস্মান্বয়ে ইংরেজীই প্রাধান্য পেয়ে আসছিল । এ কলেজ যেহেতু শহর কেন্দ্রিক ছিল, অন্য কোথাও এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়নি তাই

---

১. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১-৫২ ।উদ্ধৃত, বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃবাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা ,পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৮ ।

২. গোপিকা মোহন ভট্টাচার্য, কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃঃ৪৬ ।উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৮-৭৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

সকলের পক্ষে শহরে এসে পড়াশুনা করার আর্থিক সামর্থও তাদের ছিলনা । তাই আস্তে আস্তে সংস্কৃত তথা ধর্মীয় শিক্ষা হতে মানুষ ক্রমাগত দূরে সরে যেতে থাকে । তাই দেখা যাচ্ছে যে, বৃটিশ সরকারের লোক দেখানো নীতিতে মানুষকে সন্তুষ্ট করার ও তাদের সমর্থন আদায় করার লক্ষ্যে ধর্ম শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল ইংরেজী শিক্ষারই কেন্দ্র । কেননা সমগ্র বাংলাদেশে এ ব্যাপারে তারা আর কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেনি এবং এ শিক্ষার প্রসারের কোন জোড়ালো ব্যবস্থাও গ্রহন করেনি । বেসরকারী উদ্যোগেও এ ধরনের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি । তাই সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ক্রমশ বাংলাদেশে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং ইংরেজী শিক্ষা প্রাধান্য পেতে থাকে । কাজেই বৃটিশ সরকারের শিক্ষানীতির কারনে এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এদেশ হতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষা বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যায় ।

সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, হিন্দু ধর্ম শিক্ষা প্রাচীনকাল হতে পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী ইত্যাদির মাধ্যমেই চলে এসেছে এবং সমগ্র দেশে তা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভও করে । এসব প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষার সাথে সাথে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত । বৃটিশ শাসন পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠান একই ধারাবাহিকতায় চলে এসেছে এবং বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকেও এ শিক্ষাই চলে আসছিল । কিন্তু বৃটিশদের এদেশে ক্ষমতা পাকাপোক্ত হবার পর তারা এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চালায় এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে অনুৎসাহিত করতে থাকে । আইন করে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়, পক্ষান্তরে ইংরেজী স্কুলে সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি করা হয় । এরফলে আর্থিক অনটনে পড়ে পাঠশালা, টোল ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যেতে থাকে । কেননা এ সব প্রতিষ্ঠান সাধারনত পূর্ব হতেই সরকারী ও বিত্তশালীদের আর্থিক সাহায্যেই চলে এসেছে, তাই সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষায়তনগুলিও বন্ধ হয়ে যেতে থাকে । কিন্তু হিন্দু বিত্তশালীরা এসব ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেননি এবং কোন ব্যবস্থাও গ্রহন করেনি । বরং তারা ইংরেজী শিক্ষাকেই প্রাধান্য দিয়েছে । তাই সরকারী, বেসরকারী সহায্য ও পৃষ্ঠ পোষকতার অভাবে এসব প্রাচীন ধর্মীয় শিক্ষালয়গুলি ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে অবলুপ্তি ঘটতে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে সরকার লোক দেখানো কয়েকটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এসব সংস্কৃত কলেজ ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হলেও, তা প্রকৃতপক্ষে ক্রমাগত ইংরেজী শিক্ষালয়ে পরিনত হয়ে যায়। কেননা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহন করলে সরকারী চাকুরী পাওয়া যায় এবং সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তাই ছাত্ররা ইংরেজীর প্রতিই ঝুকে পড়ে। এভাবে সমগ্র দেশে ইংরেজীর প্রভাবে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা এক সময় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। যদিও বা গ্রামে গঞ্জে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে, তবে তাদের অবস্থা অত্যন্ত করুন ও হৃদয়বিদারক। শুধুমাত্র কতিপয় মানুষের ধর্মানুভূতি ছিল বলেই তাদের দয়া দাক্ষিন্যে ও সাহায্যের উপর নামকাওয়াস্তে টিকে থাকতে পারে। সেখানে যেমন ছাত্রের অভাব ছিল তেমনি শিক্ষার উপকরনেরও অভাব ছিল। কাজেই এভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে, সরকারের শিক্ষানীতির কারনে এবং এ দেশের বিত্তশালী হিন্দুদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা ইত্যাদি কারনে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি কালের বিবর্তনে সময়ের প্রয়োজনে ধ্বংশ প্রায় হয়ে যায়।

উপসংহার ঃ

১২০২-৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় হতে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয় পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর মুসলমান আমীর, সুবাদার, নবাব ইত্যাদি শাসকরা কখনো স্বাধীনভাবে, কখনো পাঠান ও মুগলদের প্রতিনিধি হিসেবে এদেশ শাসন করেছে। যুগে যুগে এসব শাসকগণ শিক্ষা গ্রহনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। বখতিয়ার খিলজী ছিলেন তাদের অন্যতম পথিকৃত। কেননা তিনি ভেবেছিলেন এদেশে মুসলমানরা নবাগত, তাই মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই শিক্ষা। এজন্যই তিনি সর্বাগ্রে মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তাঁর পথ অনুসরন করে অনেক শাসক মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় বহু সংখ্যক আলেম, সুফী, দরবেশ প্রমুখ ইসলাম প্রচারকারী দল ও এদেশে আগমন করে এবং মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে নতুন মুসলমানদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া বিত্তশালী ও জমিদারগণ তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজ বাড়ীতে মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং এর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য লাখেরাজ ভূমির ব্যবস্থা করে দিতেন। এ ছাড়া সাধারন মানুষরাও অর্থ সাহায্য দিয়ে এ ধরনের অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চালাত। এভাবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে মাদ্রাসা, মক্তব গড়ে উঠতে থাকে। এ সকল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারনতঃ ধর্মীয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হত। পাশাপাশি পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়েও যেমন যুক্তি বিদ্যা, তর্ক বিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা, গনিত, রসায়ন, অলংকার শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হত। তবে ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও হাদীস কুরআন চর্চাকেই প্রাধান্য দেয়া হত। এসব শিক্ষা অবশ্য আরবী, ফার্সী ভাষার মাধ্যমেই দেয়া হত, কেননা তখন ফার্সীই ছিল রাজভাষা ও অফিস আদালতের ভাষা। তাই এ সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। এভাবে দীর্ঘকাল তথা বৃটিশ শাসন পূর্ব পর্যন্ত মাঝে মাঝে পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাক্রম চলে এসেছে।

পলাশীর পরাজয়ের পর এদেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন আসে। বৃটিশরা ক্ষমতা দখলের পর হতেই মূলত মুসলমানদের শিক্ষার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। যাতে মুসলমানরা আর রাজনৈতিকভাবে মাথা চারা দিয়ে না উঠতে পারে। তাই ১৭৬৫ সালে কোম্পানী যখন রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পায় তখন হতে এ দেশের বিত্তশালী ও অভিজাতদের উপর অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে থাকে। একদিকে মহা দুর্ভিক্ষ (১৭৭৬) অপর দিকে কোম্পানীর অত্যাচার ইত্যাদি কারনে এদেশের বিত্তশালী ও অবস্থাপন্ন কৃষকরা সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। তারা অর্থনৈতিকভাবে মহা সংকটে পতিত হয়। অপরদিকে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারনে মুসলিম জমিদারগণ তাদের জমিদারী হারায়। এতে তারা যেমন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তেমনি এসব মাদ্রাসা, মক্তবে যে আর্থিক সাহায্য দেয়া হত তাও অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয় ১৮২৮ সালে নিস্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন দ্বারা দেশের এসব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে যে নিস্কর ভূমি ছিল তাও সরকার অধিগ্রহন করে নেয়। এতে দেশে যা কিছু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল তা অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসনামলে এ উপমহাদেশের রাজভাষা ছিল ফার্সী । কোম্পানী এ দেশের শাসনভার গ্রহন করার পর মাত্র কিছু দিন ফার্সী অফিস আদালতের ভাষা ছিল । কিন্তু কিছু দিন পরেই ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকে অফিস আদালতের ভাষা করা হয় ।কিন্তু ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির পথে আর একটি মারাত্মক আঘাত আসে । বৃটিশ শিক্ষার ভাষা, বিষয়, পদ্ধতি পরিবর্তন করে মূলত এ দেশের সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার ধারায় সংকট সৃষ্টি করে । প্রধানত ঃ ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল ভাষা জ্ঞান দ্বারা চাকুরী জীবি, অনুগত ও বংশবদ একটি মুৎসুদ্দী শ্রেনী সৃষ্টি করা । তাই তারা দেশের লোকদের প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে তুলার শিক্ষানীতি ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহন করেনি । আর ইহা করা হয়েছে ঔপনিবেশিক স্বার্থের কারনেই । এভাবে সরকারী সাযায্য সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা একদম ভেঙ্গে পড়ে । তাছাড়া দারিদ্রের কারনে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহন করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে । ফলে মুসলিম সমাজের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক চরম বিপর্যয় দেখা দেয় ।

শিক্ষানীতির সাহায্যে মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি বিনষ্ট করে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমূলে ধ্বংশ করাই ছিল ইংরেজদের সুগভীর চক্রান্ত । কেননা ইতিপূর্বেই তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পংগু করে দেয়া হয়েছে, এখন যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে ও ধ্বংশ করা যায় তাহলে কোন দিন আর মাথা তুলে দাড়াতে পারিবেনা । তাই মুসলমানদের শিক্ষাকে ধ্বংশ করার জন্য প্রকৃত শিক্ষানীতি গ্রহন করেনি, শুধু লোক দেখানো ও সময় ক্ষেপনের জন্য কমিটি গঠন, সুপারিশ ইত্যাদি করে অভিনয় করা হয়েছে মাত্র । এভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পংগু করার উদ্দেশ্য সুদৃঢ় প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহন করে । এমনি করে বিভিন্ন কারনে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে এবং শিক্ষিতের হার কমে যায় । অথচ মুসলিম শাসনামেল এ দেশে মুসলিম শিক্ষিতের হার ইংরেজ আমলের চেয়ে বহুগুনে বেশী ছিল । কাজেই একদিকে সরকারের অবহেলা, ঔদাসীনতা, পক্ষপাতিত্ব ও দুরভিসন্ধি, অন্যদিকে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন, দারিদ্রতা এবং বৃটিশ বিরোধী মনোভাব ইত্যাদি কারনেই মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে ।

Dhaka University Institutional Repository

এদেশ বাসীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য ইংরেজ সরকার যে শিক্ষানীতি গ্রহন করে, তা মুসলমানদের নিকট গ্রহনযোগ্য হয়নি নানা কারনে। কেননা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যে শিক্ষা নীতি গ্রহন করে সে শিক্ষা পদ্ধতিতে মুসলমানদের আজীবনের ভাবধারাকে সযত্নে উপেক্ষা করা হয়। অর্থাৎ এ শিক্ষা নীতিতে মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ, সংস্কৃতিকে ভুলুন্ঠিত করা হয়েছে অন্য কথায় ধর্মীয় শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ইংরেজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যারফলে মুসলমানরা ইংরেজদের এ শিক্ষানীতি, নীতিগত ভাবে মেনে দিতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরোধিতা করছে তা নয়, বরং তারা চেয়েছে ধর্ম শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহন করতে। ধর্ম শিক্ষাকে বাদ দিয়ে নয়। যেহেতু বৃটিশ সরকার ধর্ম শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শুধু ইংরেজী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে, তখনই মুসলমানরা বিরোধীতা করেছে। তাছাড়া বৃটিশরা মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষাকে তুলে দেয়ার চক্রান্ত করে যারফলে মুসলমানদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং এ কারনে বৃটিশদেরকে আর তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। কেননা তারা ছল বলে কৌশলে এ দেশের ক্ষমতা গ্রহন করেছে অর্থনৈতিকভাবে মুসলমানদের পঙ্গু করে দিয়েছে এবং এখন শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করে মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত করেছে এবং ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটানোর চক্রান্ত হচ্ছে বলে তারা অনুমান করে। তাই মুসলমানরা ইংরেজদের এ শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহন করতে পারেনি।

ইংরেজ সরকার মুসলিম ভাবধারা বিরোধী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা মুসলমানদের নিজস্ব আদর্শে প্রতিষ্ঠিত মক্তবের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দেয়। কেননা এ সমস্ত মক্তব, মাদ্রাসা লাখেরাজ সম্পত্তির আয়ের দ্বারা পরিচালিত হত। কিন্তু যখন লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন বলবৎ হল তখন মুসলমানদের এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এতে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্যোগময় অবস্থায় পতিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের এরুপ দুঃখ দুর্দশার কথা জওহারলাল নেহেরুর এক উক্তি হতেও জানা যায়। তিনি উল্লেখ করেন যে,

When the British seiged power in Bengal there were a very large number of "Muafis" that is taxfree grants of land. May of these were personal

Dhaka University Institutional Repository

but most were in the shape of endowments for educational institutions. A vast number of elementary schools of the old type subsisted on them, as well as some institutions for higher education.[১]

বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার ও মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ দুঃখ দুর্দশার কথা অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি উল্লেখ করেন যে, At an out by of 80,00,000 upon Resumption proceedings, an additional revenue of 30,00,000 a year was permanently gained by the state, representing a capital of five percent of six million sterling. A large part of this sum was derived from lands held rent free by Musalamans or by Muhammadan foundation. Hundreds of ancient families were ruined, and the educational systems of the Musalamans, which was almost entirely maintained by the rent free grants, received it death blow. The scholastic classes of the Muhammadans emerged from the eighteen years of harrying, absolutely ruined.[২] বৃটিশ সরকারের এহেন মনোবৃত্তির কারণে এ দেশের মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়।

কিন্তু এত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পরেও বৃটিশ সরকার এদেশ হতে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে পারেনি। এরই মাঝে শিক্ষানুরাগী মুসলমানদের সাহায্য সহযোগীতায় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রামে গঞ্জে মক্তব, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তাছাড়া আলেম, সূফীগণও তাদের সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ধর্মীয় শিক্ষাকে অব্যাহত রাখে। এই দুঃখসময়ে যদি ত্যাগী ও শিক্ষানুরাগী মুসলমানেরা এগিয়ে না আসতেন, তাহলে হয়ত এদেশ হতে মুসলিম ধর্মীয়

----

১. মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬।
২. মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে যেত । কিন্তু তারা তা হতে দেয়নি । তাদের এ অবিস্মরণীয় অবদানের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে মওস্ব মাদ্রাসা নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্মীয় শিক্ষা টিকে যায় ।

তবে বৃটিশ সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমিটি গঠন করে মাদ্রাসা সংস্কার তথা ধর্মীয় শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহন করে এবং পাঠ্যসূচীর ও পরিবর্তন করে । মাদ্রাসাতে ইংরেজী বিভাগ খোলা হয় । কিন্তু এ সংস্কার মুসলমানদের নিকট বাস্তব সম্মত নয় বলে কিংবা ধর্ম শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করা হয়েছে বলে তাদের নিকট ইহা গ্রহণযোগ্য হয়নি । ফলে সমস্ত সংস্কার কমিটি ও তাদের সুপারিশ শিক্ষানীতি আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারেনি । এভাবে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং হিন্দুদের তুলনায় বহুগুণে পিছিয়ে যায় । তখন নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিভিন্নভাবে বুঝাতে পারেন । তাদের প্রচেষ্টায় ক্রমশ মুসলমানরা ইংরেজীর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে । মন মানসিকতাও ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকে ও এর গুরুত্ব বুঝতে থাকে । কেননা যুগের তাগিদেই এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল ।

তাই মুসলমানগণ জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে শেষ পর্যন্ত আরবী ও ফার্সীর মোহ ত্যাগ করে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে এবং সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা কাজে লাগাতে থাকে । সনাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা ও আধুনিক পদ্ধতির স্কুল কলেজের শিক্ষার দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্তের পরিবর্তন নিয়ে মুসলমানদের শিক্ষা চিন্তায় দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়ে যায় । ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা একেবারে ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি । তাই মাদ্রাসা শিক্ষাকে টিকিয়ে রেখেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকী করণের চেষ্টা করা হয় । মাদ্রাসার শিক্ষাসূচীতে ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয় সাধন করা হয় ।[১] ফলশ্রুতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ১৯১৫ সালে নিউ স্কীম মাদ্রাসার প্রবর্তন করা হয়, এসব মাদ্রাসা দেশ ব্যাপী প্রচলিত হয় । তবে এসব মাদ্রাসার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল ছিল ।

----

১. উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২ ।

Dhaka University Institutional Repository

এসব মাদ্রাসা সম্পূর্ণরূপে সরকারী নিয়ন্ত্রণে ও সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হত । কিন্তু এ ব্যবস্থার প্রতি দেশের অনেক মুসলমানের সমর্থন পাওয়া যায়নি । তাই তারা নিজ উদ্যোগে সম্পূর্ণ ভিন্নধাচে, সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও সরকারী সাহায্য বর্জিত সম্পূর্ণ খাঁটি ধর্মীয় শিক্ষার জন্য এক শ্রেণীর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ; যাকে খারেজী বা কওমী মাদ্রাসা বলা হয়ে থাকে । এ ধরনের মাদ্রাসা বাংলাদেশে ক্রমশ বিকাশ লাভ করতে থাকে এবং এসব মাদ্রাসা অধিকাংশ মুসলমানদের শিক্ষার চাহিদা মিটাতে থাকে । তাই এ সময় হতে বাংলাদেশে দু'ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রচলন দেখা যায় । এ্যাংলো এ্যারাবিক শিক্ষা হিসাবে নিউ স্কীম মাদ্রাসা এবং খাঁটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে খারেজী মাদ্রাসা ।

অতএব আমরা এখন বলতে পারি যে, মুসলিম শাসনামল হতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বাংলাদেশে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা নানা ক্ষাতে প্রতিঘাত ও প্রতিকূল অবস্থার সাথে যুদ্ধ করে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে । এসব সত্বেও, মাদ্রাসায় সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী বিবর্তনের ধারায় বিবর্তিত হয়ে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা উপরোক্ত দ্বিবিধ ধারা তথা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার সমন্বয়ে নিউ স্কীম মাদ্রাসা এবং খাঁটি ধর্ম শিক্ষা হিসেবে খারেজী বা কাওমী মাদ্রাসার শিক্ষা বিকাশ লাভ করতে থাকে কিন্তু তখনও বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে । কোনটি সঠিক আর কোনটি সঠিক নয় এ সমস্যার সমাধান ও বিতর্কের অবসান তখনও সম্ভব হয়নি ।

অপরদিকে বৃটিশদের কূট কৌশলেও ইংরেজীর প্রভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠশালা, টোল ইত্যাদির সংখ্যাও মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে থাকে এবং ধ্বংসের সম্মুখীন হয় । কেননা এসব শিক্ষায়তনগুলিও সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের উপরই নির্ভরশীল ছিল । তাই যখন সরকারী সাহায্য ও বিত্তশালীদের সহযোগীতা বন্ধ হয়ে যায় তখন এ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও আর্থিক সংকটে পড়ে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যায় । সেগুলিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিত্তশালী অভিজাত হিন্দু সমাজ এগিয়ে আসেনি, বরং তারা ইংরেজী শিক্ষাকেই প্রাধান্য দিয়ে সেদিকে অগ্রসর হয়েছে এবং সরকারেকে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে চাপ প্রয়োগ করেছে । অনেকে আবার

Dhaka University Institutional Repository

স্বীয় উদ্যোগে ইংরেজী শিক্ষাকে সম্প্রসারনের জন্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন । এভাবে ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলনে হিন্দু সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হয় এবং বৃটিশদের সুদৃষ্টিতে পড়ে বড় বড় চাকরী হস্তগত করতে থাকে । কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনীহার কারনে পাঠশালা, টোল ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে । মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রে যেমনটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে আসে, হিন্দুদের ধর্মীয় শিক্ষা রক্ষার বেলায় তাদের মধ্যে তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি , তাই পাঠশালা, টোল ধ্বংশ প্রায় হয়ে যায়, কিন্তু মুসলমানদের মক্তব, মাদ্রাসা টিকে যায় ।

অবশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, বৃটিশ সরকারের শিক্ষা নীতি, ইংরেজী, শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান, কূটকৌশল এবং এ দেশের কিছু সংখ্যক মানুষের ইংরেজ তোষন নীতি ও ইংরেজী প্রীতির কারনে ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয় এবং গোটা ব্যবস্থাই উলট পালট হয়ে যায় এবং কালের বিবর্তনে, সময়ের তাগিদে ও পার্থিব প্রয়োজনে ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবর্তন ও বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং শিক্ষাকে সংস্কারের নামে পরিবর্তন করে আধুনিকী করনের প্রচেষ্টা চালান হয় । কিন্তু এত চএশান্‌, কূটকৌশল ও আর্থিক সাহায্য বন্ধ করেও এদেশের মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষা হতে বঞ্চিত করা যায়নি এবং হাজার বছরের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতি হতে ধর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষা হতেও বিমুখ করা যায়নি । অবশ্য সময় সময় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হলেও ধ্বংস করা যায়নি । তাই এ দেশের মানুষের কাছে ধর্ম যেমন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বেঁচে আছে তেমনি ধর্মীয় শিক্ষাও মাথা উঁচু করেই বেঁচে আছে এবং আগামীতেও থাকবে ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ পঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

১। অজয় রায় -'বাংলা ও বাঙালী', বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৮।

২। অতুল সুর, ডঃ-'বাংলার সামাজিক ইতিহাস', ১ম প্রকাশ, কলিকাতা ১৯৭৬।

৩। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়- 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ৩য় খন্ড, ১ম পর্ব, ২য় সংস্করণ কলিকাতা ১৯৮০।

৪। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় - 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খন্ড, ২য় পর্ব', ২য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৮১।

৫। আবদুর রহিম, মুহম্মদ ডঃ- 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১৫৭৬) ১ম খন্ড, অনুবাদ, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

৬। আব্দুর রহিম, মুহম্মদ ডঃ - 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭) ২য় খন্ড, অনুবাদ, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ১ম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮২।

৭। আব্দুর রহিম, মুহম্মদ ডঃ - 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭- ১৯৪৭) ১ম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭৬।

৮। আব্দুর রহিম, মুহম্মদ ডঃ- আব্দুল মোমিনচৌধুরী ডঃ ও অন্যান্য বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮১।

৯। আজিজুর রহমান মল্লিক, ডঃ- বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) অনুবাদ দিলওয়ার হোসেন, ১ম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮২

১০। আব্দুল করিম, প্রফেসর - 'বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) ২য় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

১১। আব্দুল করিম ডঃ - 'পাক ভারতে মুসলিম শাসন, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ১ম প্রকাশ ঢাকা ১৯৬৯ ।

১২। আব্দুল করিম ডঃ 'বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৫৯ ।

১৩। আব্দুল করিম ডঃ 'বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ।

১৪। আলী কে, অধ্যাপক- 'বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৬

১৫। আবুল হোসেন কাদেরী,শেখ মোঃ ডঃ- ' পূর্ব পাকিস্তানের আওলীয়া দরবেশ ।'

১৬। আকরাম খাঁ, মৌলানা মোহাম্মদ- ' মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৫ ।

১৭। আব্দুল মওদুদ - মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় মুদ্রন, ঢাকা ১৯৮২ ।

১৮। আব্দুল মান্নান তালিব - " বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা- ১৯৮০ ।

১৯। আব্দুল হাই, হুমায়ুন - ' মুসলিম সংস্কারক ও সাধক ' বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৭৬ ।

২০। আব্দুল হাই,মুহম্মদ ও - ' বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৬৪ ।
আলী আহসান, সৈয়দ

২১। আব্দুল হক ফরিদী - ' মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৮৫ ।

২২। আব্দুস সাত্তার ' আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা ১৯৮০ ।

২৩। আব্দুল জলীল এ,এফ,এম,- 'সুন্দর বনের ইতিহাস, ১ম,২য়,৩য় খন্ড, ঢাকা ১৩৭৬বাংলা ।

Dhaka University Institutional Repository

২৪। আব্দুল জলীল এ,এফ,এম, - 'পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ, খুলনা, ১৯৭৫ ।

২৫। আব্দুল বারী,আ,ফ,ম, ডঃ - 'আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, ময়মনসিংহ ১৯৭২ ।

২৬। আব্দুল ওয়াহিদ ডঃ - 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৬ ।

২৭। আব্দুল হক চৌধুরী - চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ২য় খন্ড ।

২৮। আবুল মনসুর আহম্মদ - 'বাংলাদেশের কালচার, ঢাকা ১৯৭৬ ।

২৯। আবুল হাসনাত নাদবী - 'হিন্দুস্থান কী কাদীম মদ্রসগাহ, আজমগড়, ১৯৩৬ ।

৩০। আমীরুল ইসলাম, সৈয়দ - "বাংলাদেশ ও ইসলাম, ১ম খন্ড, ঢাকা ১৩৯৪,বাংলা ।

৩১। আবু তালিব, মোহাম্মদ - 'উত্তর বঙ্গের ইসলাম প্রচারের গোড়ার কথা ।

৩২। আসাদুজ্জামান আসাদ(সম্পাদিত) - ' যশোহর জেলার ইতিহাস, ২য় মুদ্রন, ঢাকা ১৯৯০ ।

৩৩। আসাদুজ্জামান,মোহাম্মদ(অনুবাদক) - ' কোম্পানী আমলে ঢাকা, বাংলা একাডেমী,১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৮, মূল জেমস টেইলর' টপোগ্রাফী অব ঢাকা ।

৩৪। আবিদ আলী খান,এম,মালদহী (অনুবাদক) আবুল কাশেম ভূইয়া,মোঃ ও শহী- দুল কাজী,মোঃ,অধ্যাপক, "গৌড় ও পান্ডুয়ার ইতিহাস" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ ।

৩৫। আনিসুজ্জামান ডঃ - 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮) ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৬৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। আহমদ শরীফ ডঃ - মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, ১ম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৭ ।

৩৭। আহমদ শরীফ ডঃ - 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, ১ম প্রকাশ বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ ।

৩৮। আজহার আলী, মোহাম্মদ - 'শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১ম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৬ ।

৩৯। আজিজুল হক, মোহাম্মদ - 'বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, (অনুবাদক) মুস্তফা নুরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৬৯ ।

৪০। আবু তালিব, মোহাম্মদ - 'উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা', রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫ ।

৪১। ইউসুফ হোসেন ডঃ - ' মধ্যযুগের পাক ভারতীয় সংস্কৃতি ', অনুবাদক ফারুক মাহমুদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৬৭ ।

৪২। ঋতে প্রকুমার রায় - 'ভারতের শিক্ষা সমস্যা, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭৭

৪৩। এনামুল হক মোহম্মদ ডঃ - 'বঙ্গে সুফী প্রভাব', কলিকাতা ১৯৩০ ।

৪৪। এনামুল হক মোহম্মদ ডঃ ও আব্দুল করিম - ' আরাকান রাজ্য সভায় বাংলা সাহিত্য' কলিকাতা, ১৯৩৫ ।

৪৫। এনামুল হক মোহম্মদ ডঃ - ' পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম প্রচার ।

৪৬। এনামুল হক মোহম্মদ ডঃ - 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য, '২য় মুদ্রন, ঢাকা ১৯৬৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। ওয়াকিল আহমদ ডঃ : 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা' ১ম খন্ড, ১ম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী,ঢাকা ১৯৮৩।

৪৮। ওয়াকিল আহমদ ডঃ : 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা,' ২য় খন্ড, ১ম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী,ঢাকা ১৯৮৩।

৪৯। ওয়াকিল আহমদ : 'মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক,১ম সংস্করন ঢাকা ১৯৬৮।

৫০। ওয়াকিল আহমদ : 'সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য',১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৮।

৫১। ওহীদুল আলম : 'চট্টগ্রামের ইতিহাস,১ম সংস্করণ,চট্টগ্রাম ১৩৯৬বাংলা।

৫২। ওসমান গনী : 'পল্লী বাংলার ইতিহাস '।

৫৩। কাসেম মোহাম্মদ : 'বাংলাদেশ জাতি ও সংস্কৃতি, 'বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪

৫৪। কালী নাথ চৌধুরী, শ্রী : 'রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,'কলিকাতা,১৩০৮ বাংলা।

৫৫। কৃষ্ণ কুমার পাল চৌধুরী :(সম্পাদনা) সিলেট কথা,' ১ম সংস্করণ, সিলেট, ১৯৮৬।

৫৬। কাদের ,এম,এ, : 'শিক্ষাএম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক,১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮০।

৫৭। কাশিম ফিরিশ্‌তা : 'ভারতের মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস'।

৫৮। গোলাম হোসায়ন সলীম : 'বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ উস সালাতীনের বঙ্গানুবাদ) অনুবাদক আকবর উদ্দীন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫৯। গোলাম সাকালায়েন : 'পূর্ব পাকিস্তানের সূফী সাধক' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৮ বাংলা।

৬০। গোপিকা মোহন ভট্টাচার্য : 'কলিকাতা সংস্কৃতি কলেজের ইতিহাস', ১ম,২য় খন্ড।

৬১। গোপাল হালদার : বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২য় খন্ড, ঢাকা ১৯৭৪

৬২। গৌর দাস হালদার,অধ্যাপক : 'ভারতের শিক্ষা সমস্যা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ),১ম প্রকাশ কলিকাতা, ১৯৭১।

৬৩। গৌরদাস হালদার, অধ্যাপক ও ক্ষতেন্দু কুমার রায় : 'শিক্ষন প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস,১ম প্রকাশ কলিকাতা,১৯৭৩।

৬৪। ছদরুদ্দীন, এস,এম, : 'আমাদের শিক্ষা', ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৩৫৭ বাংলা।

৬৫। তোফায়েল আহমদ : 'আমাদের প্রাচীন শিল্প, ১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৪।

৬৬। তাপস গঙ্গোপাধ্যায় : 'শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিম বঙ্গ', কলিকাতা ১৩৮৩ বাংলা।

৬৭। দীন মুহম্মদ,কাযী : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ৩য় খন্ড, ১ম সংস্করণ ঢাকা ১৯৬৮ ইং।

৬৮। দীনেশ চন্দ্র সরকার, ডঃ : পাল সেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা ১৯৮২।

৬৯। দীনেশ চন্দ্র সেন শ্রী : 'বৃহৎ বঙ্গ' (প্রাচীন কাল হতে পলাশী পর্যন্ত) ২য় খন্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত,১৩৪২ বাংলা।

৭০। নোমান রাজা, অধ্যাপক : 'বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা ১৯৮৪।

৭১। নূর মোহম্মদ আজমী : 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা ১৯৬৬।

৭২। নিযাম উদ্দীন আহমদ,খাজা : 'তবাকাত-ই-আকবরী', ১ম খন্ড, অনুবাদ, আহম্মদ ফজলুর রহমান, বাংলা একাডেমী,ঢাকা ১৯৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩। নীহার রঞ্জন রায় : 'বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৩ বাংলা।

৭৪। নিতাই দাস : 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি।

৭৫। নলিনী ভূষন দাস গুপ্ত : 'ভারতের শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা, ১ম প্রকাশ, কলিকাতা ১৯৮৬।

৭৬। প্রদ্যোত্য কুমার মাইতি ডঃ : 'বাংলার লোক ধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, ১ম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৮৮।

৭৭। ফজলুল হাসান ইউসুফ ডঃ : 'বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৬।

৭৮। ফজলে রাব্বী, খন্দকার : (মূল ফার্সী) হকিকতে মুসলিমান-ই-বাঙ্গালা, (ইংরেজী) দি অরিজিন অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল, এর বাংলা অনুবাদ বাংলার মুসলমান, অনুবাদক মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮।

৭৯। ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত ডঃ : বাংলার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন), ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮৩ বাংলা।

৮০। মতিয়ুর রহমান : ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮১।

৮১। মমতাজুর রহমান তরফদার : 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক' বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮১।

৮২। মাহমুদুল হাসান, সৈয়দ : 'বাংলাদেশের মসজিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৭।

৮৩। মাহবুবুল আলম : 'চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানা আমল) চট্টগ্রাম ১৯৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

৮৪। মর্তুজা আলী, সৈয়দ : 'হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস,৩য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৮ ।

৮৫। মনসুর মুসা (সম্পাদনা) : 'বাংলাদেশ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭৪ ।

৮৬। মোমিন উল্লাহ,মোহাম্মদ, অধ্যাপক : 'শিক্ষার ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮০ ।

৮৭। মোজাম্মেল হক,এ,কে,এম, : 'সংক্ষিপ্ত শিক্ষার ইতিহাস, ১ম সংস্করণ,ঢাকা ১৯৭৬ ।

৮৮। মিছের মোহাম্মদ,কাজী : 'রাজশাহীর ইতিহাস,১ম খন্ড, ১ম মুদ্রন, বগুড়া, ১৯৬৫ ।

৮৯। মিছের মোহাম্মদ, কাজী : 'বগুড়ার ইতিকাহিনী (অতীত ও বর্তমান) বগুড়া ১৯৫৭ ।

৯০। মিছের মোহাম্মদ, কাজী : 'রাজশাহীর ইতিহাস,২য় খন্ড ,বগুড়া, ১৯৬৫ ।

৯১। মোশাররফ হোসেন,সৈয়দ : 'দিনাজপুরে ইতিহাস' ।

৯২। মাহবুবুল আলম : 'চট্টগ্রামের ইতিহাস,(কোম্পানী আমল) চট্টগ্রাম ১৯৬৬ ।

৯৩। মুনতাসীর মামুন : 'উনিশ শতকের পূর্ব বঙ্গের সমাজ,(১৮৫৭-১৯০৫) ১ম প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৮৬ ।

৯৪। যোগেশ চন্দ্র বাগল : 'বাংলার জনশিক্ষা ' ।

৯৫। রহমান আলী তায়েশ,মুনশী : 'তাওয়ারিখে ঢাকা, অনুবাদক, ডঃ আ.ন.ম.শরফুদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৮৫ ।

৯৬। রুহুল আমিন, মৌলানা : 'বঙ্গ আসামের পীর আওলীয়া কাহিনী ।

৯৭। রইছ উদ্দীন, কে,এম, : 'বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা,(প্রাচীন, মধ্য,আধুনিক যুগ) ঢাকা ১৯৮৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

৯৮। রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় : 'বাংলার ইতিহাস, ১ম খন্ড, কলিকাতা ১৯৭১।

৯৯। রমেশ চন্দ্র মজুমদার : 'বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, (মধ্যযুগ) ২য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৮০ বাংলা।

১০০। রমেশ চন্দ্র মজুমদার : 'বাংলাদেশের ইতিহাস ৩য় খন্ড,(আধুনিক যুগ) কলিকাতা ১৩৮১, বাংলা।

১০১। লুৎফর রহমান খান, মোঃ : 'বাংলাদেশ সন্ধানে', ঢাকা ১৩৮৪ বাংলা।

১০২। লুৎফর রহমান,মুহম্মদ,শেখ ও মাহদুল মান্নান : 'মুসলিম শাসনে ভারত ও বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৭৫।

১০৩। শরিফা খাতুন ডঃ : 'তুলনা মুলক শিক্ষা তত্ত্ব, ১ম খন্ড, ১ম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩।

১০৪। সিরাজুল ইসলাম ডঃ : 'বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, (১৭৫৭-১৮৫৭),প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী,ঢাকা১৯৮৪।

১০৫। সাইফ উদ্দীন,মোহাম্মদ : (সমপাদিত) 'মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস,১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৮৭।

১০৬। সুবোধ কুমার মুখপাধ্যায় : 'প্রাক পলাশী বাংলা সামাজিক ও আর্থিক জীবন, (১৭০০-১৭৫৭) ১ম প্রকাশ, কলিকাতা ১৯৮২।

১০৭। সুকুমার সেন,শ্রী : 'বঙ্গ ভূমিকা (খ্রীঃপূর্ব ৩০০ হতে খ্রীঃপর ১২৫০)কলিকাতা ১৯৭৪।

১০৮। সুধীর কুমার মিত্র : 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, ১ম খন্ড,২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬২।

১০৯। সুখময় সেন গুপ্ত : 'বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষাঃবাঙালীর শিক্ষা চিন্তা (১৮৩৫-১৯০৬) কলিকাতা ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১১০। সুখময় মুখোপাধ্যায় : 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (স্বাধীন সুলতানদের আমল ১৩৩৮-১৫৩৮) তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৮০ ।

১১১। সুখময় মুখোপাধ্যায় : 'বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব (১২০৪-১৩৩৮), ১ম প্রকাশ, কলিকাতা ১৯৮৮ ।

১১২। হিমাংশু মোহন চট্টপাধ্যায় শ্রী : 'বিক্রমপুর, ১ম খন্ড, (প্রাচীন কাল হতে ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত) ঢাকা ১৩৩৮ বাংলা ।

ইংরেজী গ্রন্থ

১। অমিতাভ মুখোপাধ্যায় : 'দি ট্রান্স ফরমেশন অব কাস্ট মর্ডান বেঙ্গল, (সম্পাদনা) এস, পি, সেন ।

২। আব্দুল ওদুদ, কাজী : দি মুসলমান্স অব বেঙ্গল স্টাডিজ ইন বেঙ্গল রেনেসা, জাদবপুর ।

৩। আবদুল করিম : 'মোহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯০০ ।

৪। আব্দুল করিম : 'মুর্শিদকুলী খান এন্ড হিজ টাইমস ।

৫। আব্দুল লতিফ : 'মোহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল, ট্রানজেকশনস্ অব বেঙ্গল, সোসাল সাইনস্ এসোসিয়েশন, কলিকাতা ১৮৬৮ ।

৬। আব্দুল লতিফ খান : এ শর্ট একাউন্টস অব মাই হাম্বল ইফোর্টস্ টু প্রমোট এডুকেশন, (ইস্পেশিয়াল এ্যামংগস্ মোহামেডান) কলিকাতা ১৮৮৮

৭। আয়ুব আলী, এ, কে, এম, ডঃ : 'হিস্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ (ডাউন টু ১৯৮০) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

৮। আশরাফ, কে,এম, : 'লাইফ এন্ড কনডিশন অব দি পিপুল অব হিন্দুস্থান ।

৯। আলী,এইচ,মিসেস : 'অবজারভেশনস্ অব দি মুসলমান অব ইন্ডিয়া,১ম খন্ড

১০। ইলিয়ট এন্ড ডুজন : 'হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইটস্ ওন হিষ্ট্রিয়ানস্, ১ম খন্ড ।

১১। ইউক্লিড, এইচ,স্কুফ : '(সমপাদিত) পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি, লন্ডন ১৯১২ ।

১২। একরাম, এস,এম, : 'কালচারাল হেরিটেজ অব পাকিস্তান, লন্ডন,১৯৫৬ ।

১৩। ওয়ার্ড, ডাব্লু : 'এ,ভিউ,অব দি হিষ্ট্রি লিটারেচার এন্ড ম্যাথোলোজী, অব দি হিন্দোস, ২য় খন্ড,শ্রীরামপুর, ১৮১৮ ।

১৪। কোরেশী, আই,এইচ,ডঃ : মুসলিম কমিউনিটি অব ইন্দোপাকিস্তান সাবকন্টিনেন্ট ।

১৫। এনামুল হক, ডঃ : 'হিষ্ট্রি অব সুফীইজম ইন বেঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ,১ম প্রকাশ,ঢাকা ১৯৭৫ ।

১৬। ইছহাক, মুহম্মদ ডঃ : " ইন্ডিয়াসস্ কন্ট্রিবিউশন টু দি স্টাডি অব হাদীস লিটারেচার, ঢাকা ইউনিভার্সিটি,২য় মুদ্রন, ঢাকা১৯৭৬

১৭। কটন, জে,এস, : ' প্রোগেস অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া (১৮৯২-৯৩, ১৮৯৬-৯৭) থার্ড কুইন কিউনাল রিভিউ, লন্ডন১৮৯৮ ।

১৮। কী,এফ,ই : ' হিষ্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান, কলিকাতা ১৯৫৯ ।

১৯। খান,এম,এইচ, ডঃ : 'এন্ড আর্লি হিষ্ট্রি অব টেকনিক্যাল অব পেপার ম্যানুফ্যাকচার ইন বেঙ্গল, দি ইষ্টার্ণ লাইব্রেরীয়ান, দ্বাদশ খন্ড, ঢাকা ১৯৮৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

২০। চ্যাটার্জি, এস, কে : 'দি অরিজিন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, লন্ডন ১৯৪৩।

২১। দিলীপ সিনহা : 'নাইনটিনথ্ সেনচ্যুরী বেঙ্গল (আসপেকটস্ অব সোসাল হিষ্ট্রি) কলিকাতা ১৯৬৫।

২২। দিলীপ কুমার চট্টপাধ্যায় : 'ডায়নামিকস্ অব সোসাল চেন্জ ইন বেঙ্গল (১৮১৭-১৮৫১) ১ম প্রকাশ, কলিকাতা ১৯৯০।

২৩। দীনেশ চন্দ্র সেন : 'ট্রপিক্যাল সিলেকশনস্ ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলী লিটারেচার, ২য় খন্ড।

২৪। দেলোয়ার হোসেন মোঃ : 'এ স্টাডি অব নাইনটিনথ্ সেনচ্যুরী হিস্ট্রোরিক্যাল ওয়ার্কস অন মুসলিম রুল ইন বেঙ্গল, ১ম প্রকাশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭।

২৫। দত্ত, কে,কে : 'আলী বর্দি এন্ড হিজ টাইমস্।

২৬। নুরুল্লাহ, সৈয়দ, নায়েক, জে, পিঃ 'এ স্টুডেন্ট হিষ্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, ৫ম সংস্করণ, বোম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতা, লন্ডন, ১৯৬৪।

২৭। নাথন, আর : 'প্রোগ্রেস অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া (১৮৯৭-৯৮-১৯০১-২) ফোর্থ কুইন কিউনাল রিভিউ অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, ১ম খন্ড, কলিকাতা ১৯০৪।

২৮। টিটাস এম, টি : 'ইন্ডিয়ান ইসলাম, দি রিলিজিয়াস ওয়েজ অব ইন্ডিয়া সিরিজ।

২৯। ডাউ, আলেকজান্ডার : 'দি হিষ্ট্রি অব হিন্দুস্তান, ১ম খন্ড, লন্ডন, ১৭৭০।

৩০। ডিক্‌শিট কে, এন, : 'মেমোয়ার্স অব দি আর্কিওলোজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া নং ৫৫, কলিকাতা ১৯৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩১। প্রদীপ সিনহা : 'নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরী বেঙ্গল (আসপেকটস অব সোসিয়াল হিষ্ট্রি) কলিকাতা ১৯৬৫ ।

৩২। বার্নিয়ার : 'বেঙ্গল ইন দি সিকসটিনথ্ সেঞ্চুরী (সম্পাদনা) জে এন, দাস গুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৪ ।

৩৩। ব্যাকল্যান্ড,সি,এফ : 'বেঙ্গল আন্ডার দি লেফটেন্যান্ট গর্ভনর, ১ম খন্ড ।

৩৪। মোহর আলী,মোহাম্মদ ডঃ : 'হিষ্ট্রি অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল, ১বি,খন্ড,(মুসলিম রুল ইন বেঙ্গল ১২০৩-১৭৫৭),ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ১ম সংস্কারন, রিয়াদ ১৯৮৫ ।

৩৫। মোহর আলী, মোহাম্মদ ডঃ 'হিষ্ট্রি অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল,১,এ ,খন্ড,(৬০০-১১৭০) ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, ১৯৮৫ ।

৩৬। মল্লিক, এ,আর : 'বৃটিশ পলিসি এন্ড দি মুসলিম ইন বেঙ্গল (১৭৫৭-১৮৫৬) ঢাকা ১৯৭৭ ।

৩৭। মাইন উদ্দীন আহমেদ : 'রিফ্লেকশনস্ অন দি বেঙ্গল রেনেসাস ।

৩৮। রাউলিনশন, এইচ,বি : ইন্ডিয়া, এ শর্ট কালচারাল হিষ্ট্রি ,লন্ডন, ১৯৩৭ ।

৩৯। রমেশ চন্দ্র মজুমদার (সম্পাদনা): ' দি হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল,১ম খন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৪৩ ।

৪০। রমেশ চন্দ্র মজুমদার : ' দি হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল, ১ম খন্ড, (হিন্দু পিরিয়ড) ২য় সংস্করন, ঢাকা ১৯৬৩ ।

৪১। রইছ উদ্দিন,আ,ন,ম, ডঃ ' সম্যানিশ কন্ট্রিবিউশন টু দি স্টাডি অব হাদীস লিটারেচার, করাচী, পাকিস্তান,১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩। সেন, ডি,সি : 'টিপিকাল সিলেকশনস্ ফ্রম ওল্ড লিটারেচার ,২য় অধ্যায় ।

৫৪। সিনহা, ডি,পি : 'দি এডুকেশনাল পলেসি অব দি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইন বেঙ্গল টু ১৮৫৪, ১ম প্রকাশ, কলিকাতা ১৯৬৪ ।

৫৫। হান্টার, উইলিয়াম : 'দি এ্যানালাস অব রুরাল বেঙ্গল, ১ম খন্ড, লন্ডন ১৮৮৩ ।

৫৬। হান্টার উইলিয়াম : 'এ স্টাটিকাল একাউন্ট অব বেঙ্গল, ১ম প্রকাশ, দিল্লী ১৯৭৩, লন্ডন, ১৯৭৭ ।

৫৭। হোসাইন খান যোবায়ের, মোহম্মদ(অনুবাদক) মোঃ আজিমুদ্দীন খান ও হোসাইন যোবায়ের : ' একাডেমী অব এডুকেশনাল রিসার্স অল পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফোরেন্স, করাচী, ১৯৬৪-৬৫ ।

৫৮। হলওয়েল : ' এ এডুকেশন ইন বৃটিশ ইন্ডিয়া (১৭৮১-১৮৯৩) ১ম প্রকাশ, লন্ডন ১৮৯৫, পুন মুদ্রন, দিল্লী ১৯৮১ ।

আরবী গ্রন্থ

১। আবুল হোসাইন আলী বেন হোসাইন আল মাসুদী : মুরুজুজ মাহাব ওয়া মাদানুজযাওয়াহির (১৩০৩ হিঃ) অনুবাদক-ইলিয়ট এ্যারাব জিওগ্রাফার্স ।

২। ইবনে খুরদাদবীহ, : 'কিতাব আল মাসালিক ওয়াল মামালিক, অনুবাদক-ইলিয়ট এ্যারাব জিওগ্রাফার্স ।

৩। গোলাম হোসেন সৈয়দ : 'সিয়ার উল মুতাআক্ষেরীন, ৩য় খন্ড ।

৪। শিবলী নুমানী : 'মালাকাত-ই-শিবলী,আজমগড়, ১৯২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

সেন্সাস রিপোর্ট

১। ওমালী, এল,এস,অস,এস, ঃ 'সেন্সাস অব ইন্ডিয়া ১৯১১,৫ম খন্ড,পার্ট-১,বাংলা বিহার, সিকিম, উড়িষ্যা, কলিকাতা ১৯১৩।

২। থমসন, ডাব্লু,এইচ, ঃ 'সেন্সাস অব ইন্ডিয়া, ১৯২১,৫ম খন্ড,পার্ট-১,বেঙ্গল, কলিকাতা ১৯২৩।

৩। ঃ 'সেন্সাস অব ইন্ডিয়া, ৫ম খন্ড,১৮৯১ (আওয়ার প্রেভিন্স অব বেঙ্গল এন্ড দেয়ার ফিউডাটরিজ) কলিকাতা'৯৩।

৪। ঃ সেন্সাস অব ইন্ডিয়া, ৪র্থ খন্ড, ১৮৯১।

৫। ঃ 'রিপোর্ট অব দি সেন্সাস অব বেঙ্গল, ৬ষ্ঠ খন্ড,পার্ট-১, কলিকাতা ১৯০১।

-ঃ বিভিন্ন রিপোর্ট ঃ-

১.এ্যাডাম, উইলিয়াম, ঃ 'থার্ড রিপোর্ট অন দি ষ্টেট অব এডুকেশন ইন বেঙ্গল১৮৩৮

২। এ্যাডাম উইলিয়াম, ঃ 'রিপোর্ট অন ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল এন্ড বিহার ১৮৩৫, ১৮৩৬, ১৮৩৮।

৩। নাথন, আর ঃ রিপোর্ট অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া (১৮৯৭-৯৮,১৯০১-০২ ফোর্থ কুইন কুইনাল রিভিউ, ১ম খন্ড কলিকাতা ১৯০৪।

৪। ঃ 'রিপোর্ট অব বেঙ্গল প্রোভিনশিয়াল কমিটি,এডুকেশন কমিশন পার্ট-২, প্যারা ১৮৩।

৫। ঃ 'জেনারেল রিপোর্ট অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন ইন বেঙ্গল ১৮৭২-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬। নাথন আর, : 'সিলেকশন ফ্রম দি রেকর্ডস অব দি গর্ভনমেন্ট অব ইন্ডিয়া, নং সি,সি,ডি, ২৪১,বেঙ্গল এডুকেশনাল ইনডোমেন্টস কমিটি রিপোর্ট, কলিকাতা ১৮৮৮ ।

৭। : 'রিপোর্ট অব দি ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন ১৮৮৩ ।

৮। : 'রিপোর্ট অব দি ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন,এ্যাপয়েন্ট বাই দি রেজুলেশন অব দি গর্ভনমেন্ট অব ইন্ডিয়া, কলিকাতা ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮২ ।

৯। : 'বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ ১৪ইং আগষ্ট ১৮৩১ ২ ৩৭ বার্ষিক রিপোর্ট ১৮৩০ ।

১০। : 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট, ১৯১৭-১৯, ২য় খন্ড, পার্ট-১ ।

১১। : 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট,১৯১৭-১৯,১ম খন্ড, পার্ট-১, কলিকাতা ১৯১৯ ।

জেলা গেজেটিয়ার

১। অনিল চন্দ্র গুপ্ত (সমপাদিত): সিলেকশনস্ ফ্রম কলিকাতা গেজেট ১৮২৪-১৮৩২ ।

২। উইবাষ্টার ,জে,ই : 'ইষ্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার্স 'নোয়াখালী' এলাহাবাদ ইন্ডিয়া ১৯১১ ।

৩। এ্যালেন, বি,সি : 'ইষ্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার্স,'ঢাকা',এলাহাবাদ ১৯১২ ।

৪। ওমালী এল,এস,এস, : 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার 'পাবনা',কলিকাতা ১৯২৩ ।

৫। গুপ্ত, জে,এন, : 'ইষ্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার্স 'বগুড়া', এলাহাবাদ, ইন্ডিয়া ১৯১০ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬। নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদক) : 'বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর 'ময়মনসিংহ' প্রকাশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রনালয়, ঢাকা ১৯৮২।

৭। নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদক) : 'বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার 'রাজশাহী' প্রকাশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রনালয়, ঢাকা ১৯৯১।

৮। লতিফ, এম, এ, (মেজর জেনারেল অবঃ) : 'সাধারন সম্পাদক :" বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার' পটুয়াখালী, ১৯৮৬।

৯। সাক্সী এম, এ, : ' বেঙ্গল ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার 'ময়মনসিংহ' , কলিকাতা ১৯১৭।

১০। দি ইমেপরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া (দি ইন্ডিয়ান এ্যামপায়ার), ১ম খন্ড, (ডিসক্রেপটিভ) নতুন সংস্করন, নতুন দিল্লী, ইন্ডিয়া।

১১। ডি ইমেপরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া (দি ইন্ডিয়ান এ্যামপায়ার) ৪র্থ খন্ড, (এডমিনেসট্রেটিভ) নতুন দিল্লী, ইন্ডিয়া।

১২। হান্টার, উইলিয়াম : ' ইমপায়ার গেজেটিয়ার, ১৩শ খন্ড।

জার্নাল

১। কোরেশী, আই, এইচ, ডঃ : 'টেকস্ টাইল ইন ইন্দো পাকিস্তান ডিউরিং মিডল এইজ, জার্নাল অব দি পাকিস্তান হিস্ট্রোরিকাল সোসাইটি, ১ম খন্ড, ২য় অধ্যায়, ১৯৫৩।

২। জিয়া উদ্দিন, ডঃ : 'নেজামে ইমতেহান, মুসলিম ইউনিভার্সিটি জার্নাল, ১ম খন্ড

Dhaka University Institutional Repository

৩। বিনয় কুমার সরকার : 'বেঙ্গলিজম ভার্সাস এ রিয়ালাইজেশন ইসলাম এন্ড ইউরোপ আমেরিকা, কৃষ্ণ নগর কলেজ, শত বার্ষিকী,সংখ্যা১৯৪৮ ।

৪। মোল্লা, এম,এ,ইউ : 'ডি নিউ প্রোভিন্স অব ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম ১৯০৫-১৯১১, দি ইনসটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ১৯৮১ ।

৫। শহিদুল্লাহ,এম,ডঃ : 'দি ইনফ্লুয়েন্স অব উর্দু হিন্দি অব বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ লিটারেচার,জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান,১ম অধ্যায়,৭ম খন্ড, ১৯৬২ ।

৬। সগীর হাসান আল মাসুমী : 'বেঙ্গলিস্ কন্ট্রিবিউশন টু ইসলামিক স্টাডিজ,জার্নাল অব দি ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান,৫ম খন্ড ,২ জুন-১৯৬৭ ।

৭। সেন, এস,কে(সম্পাদিত : 'বিপ্রদাস মনসা মঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি,কলিকাতা ১৯৫৬ ।

৮। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি (জে,এ,এস,)২য়, খন্ড, ১৮৩৩ ।

৯। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি (জে,এ,এস) ৮ম খন্ড , ৪,১৮৬৬ ।

১০। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান,৮ম খন্ড ,নং- ২ ।

১১। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ (জে,এসএস ,বি) ১ম খন্ড, ১৮৩২ ।

১২। জে,এ,এস,বি, ১৮৪৪ ।

১৩। জে,এসএস,বি, ১৮৭০ ।

১৪। জে,এস,এস,বি, ১৮৭৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। জে,এ,এস,বি - ১৮৭৫ ।

১৬। জে,এস্এস,বি, -১৮৭৮ ।

১৭। জে,এ,এস,বি, ১৮৯৮ ।

১৮। এশিয়াটিক জার্নাল, ডিসেম্বর, ১৮৮২ ।

ইনসাইক্লোপেডিয়া

১। ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা, ১৫তম সংস্করন, ২য় খন্ড, শিকাগো, লন্ডন,১৯৭৩-৭৪ ।

২। দি ওয়ার্লড বুক ইন সাইক্লোপেডিয়া, ২য় খন্ড, শিকাগো, লন্ডন, সিডনী ১৯৮৮ ।

৩। সটাটিস্টিকাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ ।

সেমিনারে বক্তৃতা

১। এছহাক, মোহাম্মদ : 'বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সংস্কার ও সংস্থার ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির যৌথ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষন আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা ৩০শে মার্চ ১৯৮৩ ।

২। নিমাই সাধন বসু : 'মুগল আমলে বাংলার জমিদার', বেতার ভাষন ২১শে জুলাই ১৯৮১ ।

৩। হাছানদানী, এ,এইচ,ডঃ : "আর্লি মুসলিম কনটাক্ট উইথ বেঙ্গল, 'প্রোসিডিংস অব দি পাকিস্থান হিস্ট্রোরিকাল কনফারেন্স, সেশন,করাচী,১৯৫১ ।

৪। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন কর্তৃক ২৫,২৬,২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত "শিক্ষা ও পরিকল্পনা" বিষয়ক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ সংকলন "শিক্ষা ও পরিকল্পনা" প্রকাশ, কুমিল্লা ১৯৮১ ।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র পত্রিকা

১। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, প্রবন্ধকার ডঃ আ.ন.ম.রইছ উদ্দিন,"বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব" অক্টোবর, ডিসেম্বর সংখ্যা, ঢাকা ১৯৮৭ ।

২। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, প্রবন্ধকার আব্দুল মান্নান কাজী, "বাঙালী মুসলমানের শিক্ষান্দোলনও বাংলা সাহিত্য", শ্রাবন, আশ্বিন, সংখ্যা, ঢাকা ১৩৬৮ বাংলা ।

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সমপাদনা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঊনবিংশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯১ বাংলা, জুন- ১৯৮৪ ।

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সমপাদনা, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী,একবিংশ সংখ্যা,ফাল্গুন ১৩৯১, বাংলা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ।

৫। দৈনিক ইত্তেফাক, প্রবন্ধকার তোফায়েল আহমদ, "যুগে যুগে বাংলাদেশ", ১১ই অক্টোবর ১৯৯৫

৬। দৈনিক ইত্তেফাক, প্রবন্ধকার, তারেক ফজল,"বাংলার জনপদ ঃউৎপত্তি ও বিকাশ",২৯শে জুলাই ১৯৯৩ ।

৭। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৪০ ।

৮। আত্ তাওহীদ- ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা, সমপাদনা অধ্যাপক মুহাম্মদ রশীদ ,৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা ১৯৭৮ ।

৯। । সন্ধান কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষনা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র, ১ম বর্ষ, জুন-জুলাই সংখ্যা ২-৩, ঢাকা ১৯৬৪ ।

১০। ইসলাম প্রচারক, আষাঢ় সংখ্যা, ১২৯৯ বাংলা ।

১১। সাপ্তাহিক নতুন, ৫ম সংখ্যা ১৯৫৪ ।